

বনফুল

রচনাবলী ১২

বনফুল রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা ঃ
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬০

প্রকাশক ঃ
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

উপন্যাস

ভুবন সোম

উৎসর্গ

অনুজ শ্রীমান নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

অনিল অনেক আগে থেকে এসেই জাহাজঘাটে পৌঁছেছিল। সোজা মাঠ থেকে এসেছিল সে মাঠামাঠি হেঁটে। তার কাপড়ে অসংখ্য চোর-কাঁটা, পা দুটি ধূলিধূসরিত। সে এসে দেখলে, ঘাট-গাড়ি তখনও আসেনি, স্টীমারও বেশ 'লেট' আসছে। গঙ্গার ধারে গিয়ে পূর্বদিগন্তে দৃষ্টি-নিবদ্ধ ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। না, জাহাজের কোন চিহ্নই নেই, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। তবু সে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ উড়ন্ত হাঁসের সারি দেখতে পেয়েছিল সে। রাজহাঁসের সারি, ইংরেজিতে যার নাম 'বার হেডেড্ গুজ', এ দেশের শিকারীরা যাকে বলে 'গীজ'। লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনিল।

মনে পড়ল গত বছর একসঙ্গে গোটা তিনেক রাজহাঁস মেরেছিল সে। হঠাৎ ফড়িংকে মনে পড়ল। সে-ও সঙ্গে ছিল। রোগা-রোগা চেহারা, লাল-ডোরা-কাটা কামিজ গায়ে, বড় বড় হলদে দাঁত, কটা চুল, কটা চোখ। অর্ধেকের উপর মাংস সে একাই খেয়েছিল। খুব খেতে পারত। অনিল তাকে আবার আসতে বলেছিল, কিন্তু সে আর আসেনি, আসবেও না। মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে বেচারা মাত্র মাস ছয়েক আগে। বেশ মনখোলা লোক ছিল ফড়িং, কোন কথা গোপন রাখতে পারত না। এমনকি সে-যে একবার চুরি করেছিল সে গল্পও করেছিল তার কাছে। ফড়িঙের কথা মনে পড়াতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অনিল।

'অনিলবাবু যে, কি খবর, কতক্ষণ এসেছেন ?'

রেলের টিকিট-কলেক্টার সখীচাঁদ এসে কখন পিছনে দাঁড়িয়েছিল অনিল তা টের পায়নি।

'এইমাত্র এসেছি। ভুবনকাকা এই স্টীমারে আসছেন। তাঁকে নিতে এসেছি। স্টীমার তো খুব 'লেট' দেখছি আজ—'

'হ্যাঁ, খুব লেট। আপনার কাকা আছেন না কি ? জানতাম না তো ! কোথা থেকে আসছেন তিনি ?'

'সাহেবগঞ্জ থেকে। ভুবন সোম, আমার আপন কাকা নন—কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বহুকালের। নিজের কাকার চেয়েও বেশী আপন উনি।'

'ভুবন সোম মানে ? এ. টি. এস্. ভুবন সোম ?'

'হ্যাঁ।'

এ শুনে সখীচাঁদের চোখ-মুখ-নাক-ভুরু-থুতনী সব কুঁচকে গেল একসঙ্গে, এবং তা গেল ব'লে একটু অপ্রস্তুতও হয়ে পড়ল সে। অনিলবাবুর কাছে এ ভাবটা প্রকাশ না হ'লেই যেন ভাল হ'ত। কিন্তু সামলে নিলে সে পর-মুহূর্তে।

'মিস্টার সোম যে আপনার কাকা, তা জানতুম না।'

অনিল হেসে বললে, খুব কড়া অফিসার, নয়?'

'খুব। বাপের কুপুত্তুর যাকে বলে। নিজের ছেলের চাকরিটিই খেয়ে দিয়েছে। জানেন নিশ্চয়ই।'

মৃদু হেসে অনিল মাথা নাড়ল—'জানি।'

'এখানে আসছেন কেন?'

'পাখী শিকার করতে।'

'খুব ভাল শিকারী বুঝি।'

'শখ আছে খুব। তবে প্রায়ই মারতে পারেন না।'

'পাখীরা তো আর রেলের চাকর নয়!'

একটা তিক্ত হাসি হেসে এগিয়ে গেল সখীচাঁদ। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'গঙ্গার ধারে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, তার চেয়ে চলুন আমার বাসায়। স্টীমারের এখনও অনেক দেরী। ততক্ষণ বরং একদান দাবায় বসা যাক, চলুন।'

'তাই চলুন। বউ এসেছে?'

'আরে না মশাই। আমাদের সমাজে 'গওনা'র অনেক ঝন্‌ঝট।'

খাঁটি বাঙালী হলে ঝঞ্ঝাট বলত। সখীচাঁদ যদিও চমৎকার বাংলা বলতে পারে, কিন্তু জাতে সে বিহারী গোয়ালা। সেই জন্তেই 'দ্বিরাগমন' না বলে 'গওনা' বললে। সম্প্রতি 'যাদব' উপাধি ধারণ ক'রে ওদের জাতভাইরা অনেকে আত্মমর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করছে, লেখাপড়াও শিখছে অনেকে। সখীচাঁদের কথাবার্তা শুনে ওকে বিহারী বলে মনেই হয় না। ঘাট থেকে মাত্র সাত-আট মাইল দূরে এক গ্রামে ওর শ্বশুরবাড়ী। ভেবেছিল, এখানে যখন বদলি হয়ে এসেছে তখন এইখানেই বউকে নিয়ে আসবে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর মুরুব্বীরা 'ঝন্‌ঝট' লাগিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে নাকি শুভদিন নেই। তার উপর ওই ভুবন সোম তার নামে রিপোর্ট করেছে। দোষ তার ছিল অবশ্য, কিন্তু আজকাল ঘুষ কে না নিচ্ছে! উপরি-পাওনা পেলে কে ছাড়ে! ওই যে মোটা কালো মালবাবুটি, ঘুষ নিয়ে নিয়ে লাল হয়ে গেল। সে তো মাত্র দু-চার টাকা কামিয়েছিল। সাহেব অফিসার হ'লে একটু ধমক দিয়ে ছেড়ে দিত। কিন্তু সোম সাহেব (বাঙালী সাহেব কিনা) লম্বা রিপোর্ট করেছেন নাকি। সখীচাঁদ আপিসে খবর নিয়েছিল, আপিসে এখনও রিপোর্ট পৌছয়নি, হয়তো পাঠায়নি এখনও, কিন্তু পাঠাবে ঠিক। লোকটা 'নম্‌রি' বদমাশ। বাঙালীরা যাকে 'একের নম্বর বদমাইশ' বলে, বিহারীরা তাকে বলে 'নম্‌রি বদমাশ'। ভুবন সোমের সঙ্গে অনিলবাবুর আত্মীয়তা আছে শুনে সখীচাঁদের একটু আশা হ'ল, যদি—

'আচ্ছা, মাসখানেক আগে যখন সোম সাহেব এখানে এসেছিলেন তখন তো আপনার কাছে যাননি?'

'না। তখন ছুটি ছিল না বোধ হয়। এখন ছুটি নিয়ে আসছেন শিকার করবার জ।'

'আপনাদের বাড়িতেই থাকবেন?'

'আর কোথা যাবেন এখানে! সহজে অবশ্য উনি কারও বাড়িতে উঠতে চান না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওর আলাদা সম্পর্ক। বাবাকে দাদা বলতেন, আর ঠিক দাদার মতই শ্রদ্ধা করতেন। আমাকেও নিজের ছেলের মতই ভালবাসেন।'

সখীচাঁদের আশা-প্রদীপের শিখা আর একটু উজ্জ্বল হ'ল। একটু ইতস্তত ক'রে সে বললে, 'বড্ড কড়া অফিসার কিন্তু উনি, এটা বদনাম সুনাম যা-ই বলুন। দেখুন না সামান্য একটা কারণে আমার নামে রিপোর্ট করেছেন শুনলাম। পট্ ক'রে চাকরিটা যদি চ'লে যায়, মহা মুশকিলে প'ড়ে যাব এ বাজারে। বাজারটা কি রকম দেখছেন, আমার এই পোস্টের জন্যে বি. এ. এম. এ. পর্যন্ত দরখাস্ত করেছিল। আচ্ছা, আপনি যদি একটু—'

ইতস্তত ক'রে থেমে গেল সখীচাঁদ। কিন্তু অনিলের বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

'ও বাবা, সে আমি পারব না। আর তাতে উলটো ফল হবার সম্ভাবনা। সুপারিশ করলে উনি ভয়ানক চ'টে যান।'

'ও, তাই নাকি?'

সখীচাঁদ মনে মনে কিন্তু বললে, 'খচ্চড়!'

নীরবে কিছুক্ষণ হেঁটে অবশেষে সখীচাঁদের কোয়ার্টারে পৌঁছল তারা। খড়ের ছাউনি, দরমার ঘর। ছোট একটু বারান্দা আছে। তাতে রোদও এসে পড়েছিল একফালি।

'রোদেই বসা যাক, কি বলেন! কাল থেকে বেশ শীত পড়েছে।'

'হ্যাঁ, রোদেই ভাল।'

বারান্দার একধারে হাল্‌কা ছোট একটা কাঠের টেবিল ছিল। সেইটেকে টেনে সখীচাঁদ রোদে নিয়ে এল, তারপর ঘরে ঢুকে বার করলে দুটো টিনের চেয়ার। তারপর আবার ঘরে ঢুকে গেল। খট্ খট্ ক'রে শব্দ হতে লাগল একটা।

'অনিলবাবু, একবার ভিতরে আসুন তো!'

অনিল ভিতরে ঢুকে দেখল সখীচাঁদ একটা টেবিলের ড্রয়ার ধ'রে টানাটানি করছে। 'জাম হয়ে গেছে ড্রয়ারটা, দেখুন তো খুলতে পারেন কি না! আপনার গায়ে তো খুব জোর শুনেছি। সর্বন্ বড়ইকে দিয়ে বানিয়েছিলাম, কড়া মজুরি নিয়েছে, বললে—আস্‌লি টিক, কিন্তু কাণ্ড দেখুন। এ ড্রয়ার কি আমার ওয়াইফ খুলতে পারবে?

'ড্রয়ার খুলে কি হবে এখন? চলুন দাবায় বসা যাক।'

'আরে মশাই, ড্রয়ারের ভিতরেই যে দাবার গুটিগুলো রয়েছে।'

'ও!'

অনিল একবার টেনে দেখলে, সত্যিই বেশ আঁট।

'বেশ এঁটে গেছে। কাঁচা আমকাঠ দিয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ করুন, আপনি টেবিলটাকে খুব শক্ত ক'রে ধ'রে থাকুন, আমি খুব জোরে টানব, টেবিলটা যেন স'রে না আসে।'

'দাঁড়ান, তা হ'লে টেবিলটাকে সরিয়ে নিই একটু। দেওয়ালে ঠেস দিলে একটু সাপোর্ট পাব।'

তাই করা হ'ল। অনিল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। একটানে খুলে ফেললে ড্রয়ারটা। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল। দেওয়ালের উপর টেবিলের ঠিক সামনেই বাঁধানো ফটো টাঙানো ছিল একটা। সখীচাঁদের মাথা লেগে মেঝেয় প'ড়ে চুরমার হয়ে গেল তার কাঁচখানা।

'ও-হো-হো-হো, এ কি করলাম ?'

আর্তনাদ ক'রে উঠল বেচারা।

'মাথায় লাগল না কি ?'

অনিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

'না, মাথায় লাগে নি।'—তারপর মুচকি হেসে বললে, 'বুকে লেগেছে। কার ছবি জানেন এটা ? দেখুন।'

অনিলের হাতে ছবিটা দিলে সে। একটি হাস্যমুখী কিশোরীর ফটো। নীচে নামও লেখা আছে, ইংরেজিতে কিন্তু—মিসেস বৈদেহী যাদব।

মুচকি হেসে সখীচাঁদ বললে, 'আমার বউ। মাইনর স্কুলে পড়ে।'

'আপনার মত বাংলা বলতে পারে ?'

'আমার চেয়েও ভাল। ওদের মামার বাড়ি যে পাকুড়, সবাই বাংলা বলে সেখানে।'

'ফোটো তুললে কে ?'

সখীচাঁদ মুচকি হেসে উত্তর দিলে, 'আমার শালা। তার শ্বশুর তাকে খুব দামী ক্যামেরা দিয়েছে একটা। খুব ছবি তুলে বেড়াচ্ছে, আমারও ছবি একখানা তুলে নিয়ে গেছে। দিন ওটা, আজই সাহেবগঞ্জে পাঠাতে হবে ঘোষালের হাতে, বাঁধিয়ে আনবে আবার। আনতেই হবে।'

সখীচাঁদ ছবিখানি খবরের কাগজে পরিপাটি ক'রে মুড়ে একটি সরু দড়ি দিয়ে ভাল ক'রে বাঁধলে, তারপর ট্রাঙ্কের ভিতর রেখে দিলে সেটি।

'আসুন এইবার, বসা যাক একদান।'

দুজনে বাইরে গিয়ে টেবিলে দাবার ছক পেতে বসল।

॥ দুই ॥

পরিধানে সাহেবী পোশাক, মুখে পাইপ ভুবন সোম জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে একটা ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আত্মনিমগ্ন হয়ে নিজের কথাই চিন্তা করছিলেন। যখনই তিনি একা থাকেন তখনই তিনি আর বর্তমানে থাকতে পারেন না, অতীতে ফিরে যান। অতীত জীবনেরই পর্যালোচনা করছিলেন তিনি মনে মনে।

সোম সাহেবের আসল বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু শরীর তত অপটু হয়নি। মাথার সামনের-দিকের চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে, জুলফির চুলেও পাক ধরেছে দু-একটায়, চোয়ালের দাঁতও দু-একটা তুলিয়েছেন, কিন্তু শরীর বেশ মজবুত আছে। আপিসের খাতায় তাঁর বয়স চুয়ান্ন। তাঁকে তার চেয়েও কম দেখায়। বছর খানেক পরেই রিটায়ার করতে হবে তাঁকে। রিটায়ার করবার পরও অনেকে চাকরিতে 'এক্স্টেনশন' পেয়েছেন, কিংবা নূতন চাকরিতে বহাল হয়েছেন, কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে সে সবের আশা নেই। তাঁর সার্ভিস রেকর্ড খুব ভাল, তবু আশা নেই। কারণ তিনি খোশামোদ করতে পারেন না, আজকালকার উপরওয়ালারা কেউ তাঁর উপর সন্তুষ্ট নন। সারাটা জীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, কিন্তু অন্যায়ভাবে কারও কাছে মাথা নোয়াননি কখনও। সাহেবেরা তাঁর কদর করত, তাই সামান্য কেরানীর পদ থেকে আজ তিনি এ. টি. এস. হতে পেরেছেন। এদের আমল হ'লে পারতেন না। এরা প্রথমেই খোঁজ করত লোকটার কি জাত হরিজন কি না, তারপর খোঁজ করত সত্যাগ্রহ ক'রে জেল হয়েছিল কি না। যোগ্যতার প্রশ্ন সবশেষে। প্রথম তিনটে ভাল-ভাবে মিললে যোগ্যতা না থাকলেও চলে। মিনিস্টারদের কারও সঙ্গে যদি আত্মীয়তা থাকে, তা হ'লে তো কথাই নেই। ভুবন সোমের এসব সুবিধা ছিল না, তাই চাকরির মেয়াদ যে বাড়বে না তা তিনি জানতেন। এও তিনি জানতেন যে, পূর্বজন্মে সম্ভবত কোনো গুরুতর পাপ করেছিলেন, তাই এ দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে এত শাস্তিভোগ ক'রে গেলেন। তাঁর মাঝে মাঝে মনে হ'ত, এর চেয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে জন্মালে বোধ হয় বেশী সুখী হতাম। শুধু চাকরি-জীবনেই নয়, সামাজিক জীবনেও তিনি ক্রমাগত মার খেয়েছেন। কেউ তাঁর মুখের দিকে চায় নি। নিজের বাবা মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু—কেউ না। তাঁর বয়স যখন ষোল তখনই তাঁর ঘাড়ে প্রকাণ্ড সংসার এবং প্রচুর ঋণের বোঝা চাপিয়ে তাঁর বাবা সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে মারা গেলেন, সম্ভবত স্বর্গেই গেলেন। সেসব দিনের কথা মনে করলে এখনও ভয় হয় ভুবন সোমের। বাড়িতে একটি পয়সা নেই, বাজারে কেউ ধার দিতে চায় না। সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন সেদিন। সূর্য ওঠে কি না, উঠলেও তার থেকে আলো বেরোয় কি না—

এ খবর রাখবারও সময় পাননি তখন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দু হাত তুলে নমস্কার করলেন ভুবন সোম। নমস্কারটা পিতৃবন্ধু যোগেন হাজরার উদ্দেশ্যে। যখনই তাঁর কথা মনে পড়ে নমস্কার করেন। লোকটি তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু সাঁচ্চা লোক ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর ওই লোকটিই এসে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন নিঃস্বার্থভাবে। ডি. টি এস. আপিসে চাকরি করতেন, স্বয়ং ডি. টি. এস.-এর নেকনজর ছিল তাঁর উপর। তিনিই ব'লে-ক'য়ে ভুবন সোমের চাকরিটি ক'রে দেন। তাঁর নিজের ছেলে তখন এণ্ট্রান্স পাস করেছে, কিন্তু তিনি তাকে না ঢুকিয়ে ভুবন সোমকেই ঢুকিয়ে দিলেন চাকরিতে। আজকাল হ'লে অবশ্য পারতেন না। আজকাল ভদ্রসন্তানদের কিছু হবার উপায় নেই, মুচি-মেথর হাড়ি-ডোম হ'লে তো কথাই নেই, নিদেন পক্ষে নাপিত বা গোয়ালাও হতে হবে। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের ছেলে হওয়াটা আজকাল অপরাধের মধ্যে গণ্য। স্বাধীনতা পেয়ে কি চতুর্ভুজই হয়েছি আমরা! চারিদিক চোরে ভ'রে গেছে। দু-চারজন ছাড়া আজকাল ট্রেনে টিকিট কিনে চড়ে না কেউ। টিকিট-কলেক্টর আর গার্ডে মিলে সড় করে দু-চার পয়সা ক'রে নিয়ে দলকে দল প্যাসেঞ্জার পার ক'রে দিচ্ছে। বড় বড় গাঁটও চ'লে যাচ্ছে ব্রেকভ্যানে বিনা পয়সায়। হাতে-নাতে ধ'রে উপরে রিপোর্ট করলেও ফল হয় না, মিনিস্টারের আত্মীয়ের আত্মীয় তস্য আত্মীয় হ'লেও ছাড়া পেয়ে যায়। স্বাধীনতা মানে ছোটলোকদের স্বাধীনতা, ভদ্রলোকদের বিপদ।...

ভুবন সোম পাইপটাতে টান দিলেন। ধোঁয়াটাকে মুখের ভিতর পুরে ব'সে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর আস্তে আস্তে ছাড়লেন সেটা। আবার অতীত জীবনের হিসাব-নিকাশে মন দিলেন পা দোলাতে দোলাতে। সারা জীবনটাই লড়াই করতে করতে কেটেছে তাঁর। মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর কেবল একটি বিষয়েই একাগ্র লক্ষ ছিল, পান থেকে চুন খসছে কি না! ভুবন সোম যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন যাতে না খসে, তবু তাঁকে খুশী করতে পারেন নি। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব সাধ আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকা মানে দিনগত পাপক্ষয় করা। তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল মেয়েদের ভাল ক'রে বিয়ে দিতে পারেননি। কর্তা থাকলে নাকি ওই পেঁচামুখী হাড় হারামজাদা মেয়ে দুটি রাজার বাড়িতে পড়ত। চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি ভুবন সোম। দুটি বোনের বিয়ে দিতে পাঁচটি হাজার টাকা ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। তা ছাড়া মায়ের সব গয়নাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু তবু ওই বিরিঞ্চিলাল আর জগন্নাথ ছাড়া অন্ত কোন পাত্র জুটল না, জোটাতে পারা গেল না। এ দেশে বিরিঞ্চিলাল আর জগন্নাথের চেয়েও খারাপ পাত্র ঢের আছে, তারাও বিয়ে-থা ক'রে ঘরসংসার পেতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করছে। কিন্তু তাঁর গুণবতী বোন দুটি তা পারলে না। শ্বশুরবাড়ি গেলই না, বললে—পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারব না। মা-ও তাদের কথায় সায় দিলেন। পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া,

পদ্ম পুকুর, সাপ—কত কি আছে, সেখানে কি থাকা যায়! কিছুতেই গেল না। ফলে, ভগ্নীপতি দুটি কিছুদিন পরে ঘাড়ে এসে চড়ল। আর চ'ড়েই রইল। ভায়ে-ভাগ্নীদের ভার ভুবন সোমকেই নিতে হয়েছে। বহু জায়গায় ব'লে ক'য়ে বিরিঞ্চি আর জগন্নাথের চাকরিও তিনি ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা আলাদা বাসা করে নি, মা-ই করতে দেন নি। যখন চাকরি হ ল তখনও তারা ভুবন সোমকে একটি পয়সাও সাহায্য করত না। অথচ গোপনে গোপনে এসেন্স কিনে আনত, রাবড়ি কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত। ভাবটা, ভুবন সোম যেন তাদের পালন করতে বাধ্য। বংশবৃদ্ধিও বন্ধ করে নি। দুই ভগ্নীর চোদ্দটি ছেলে মেয়ে হয়েছিল। এরা ভুবন সোমের সংসারকে তছনছ করেছে। শখ ক'রে বাগান করেছিলেন। একটি ফুল গাছে থাকতে দেয় নি, বাড়িতে সুস্থির হয়ে ঘুমুতে পর্যন্ত দেয় নি, দিনরাত চেঁচামেচি কান্নাকাটি। শেষটা চুরি করতে আরম্ভ করল। পকেট থেকে পয়সা চুরি অনেক আগে থেকেই করত, একদিন বড় বউয়ের গয়না পর্যন্ত চুরি গেল। কিন্তু তাদের ভাল ক'রে শাসন করবার উপায় ছিল না মায়ের জন্যে। মা তাদের আগলে আগলে বেড়াতেন, তাদের জন্যে অনর্গল মিথ্যে কথা বলতেন। ওই রাবণের গুষ্টিকে খাওয়াতে হ'ত ব'লে ভুবন সোম নিজে কখনও ভাল জিনিস খান নি। চুনো মাছও সব দিন জোটেনি। সাধারণ ডাল ভাত তরকারি খেয়েই জীবনটা কেটেছে। ভাল ডালও জোটেনি। দিনের পর দিন লম্বা কলাইয়ের ডাল, মাঝে মাঝে ফ্যান মিশিয়ে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, অন্য ডাল আর ভালই লাগে না। হজমও হয় না। সেদিন একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন হয়েছিল—চপ কাটলেট দোলমা ডেভিল কত রকম কি ছিল তাঁর ভালই লাগল না। উচ্ছেভাজা, বেগুনভাজা, পটলভাজা থাকলে খেতেন হয়তো। দুধ পর্যন্ত খেতে পাননি প্রথম জীবনে। বাড়িতে গাই ছিল একটা, সের দুই দুধ হ'ত, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে এক ফোঁটা জোটেনি। মা আফিং খেতেন, তাঁর জন্য ঘন ক'রে জাল দেওয়া হ'ত খানিকটা, আর বাকিটা জল মিশিয়ে ছোট-ছেলেগুলো খেত। তিন-চারটে ছোট ছেলে সর্বদাই থাকত সংসারে। তাদের বঞ্চিত ক'রে দুধ খাওয়ার কথা ভাবতেও পারেন নি তিনি। তিনি ভাবতে পারেন নি, কিন্তু শরীর সহ্য করবে কেন? একদিন আফিস থেকে ফেরবার সময় মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলেন। চন্দর ডাক্তার এলেন। বললেন ব্লাড-প্রেসার খুব কম, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার। মাছ মাংস ডিম দুধের লম্বা ফর্দ দিয়ে গেলেন একটা। মা অবশ্য বলেছিলেন, শরীরের জন্যে যখন দরকার তখন ধার ক'রেও ওসব খেতে হবে। কিন্তু ভুবন সোম জানতেন, মা ধার শোধ করবেন না, করতে হবে তাঁকেই। এমনিই তো জিভ বেরিয়ে পড়েছে। দিন দুই পরে ভুবন সোম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন ডাক্তারবাবু, ওসব স্পেশাল খাবার আমি একা সকলের সামনে বসে খেতে পারব না। সবাইকে খাওয়াবার সামর্থ্যও আমার নেই, আপনি বরং আমাকে কোনও পেটেণ্ট টনিক দিন। চন্দর ডাক্তার সাধারণত রোগীর মন জুগিয়ে চলতেন। কেউ যদি বলত—ডাক্তারবাবু, অম্বল খাব?

খেও।' ডায়াবিটিস-রোগী পেড়াপেড়ি করলে চিনি খাবার অনুমতিও পেত তাঁর কাছে।' একটি বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন কিন্তু। মিথ্যে সার্টিফিকেটটি কখনও লিখতেন না। পাকা-গোঁফ পাকা-ভুরু সদাপ্রসন্ন-মুখ চন্দর ডাক্তারের চেহারাটা ভেসে উঠল ভুবন সোমের মনে। তিনি কি একটা বিলিতি পেটেন্ট টনিক লিখে দিয়েছিলেন তাঁকে, নাম মনে নেই এখন। শিশিতে পোরা চিকেন্‌স্ এক্‌স্ট্র্যাক্ট, পুরনো পোর্ট আর কডলিভার অয়েলও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিনতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছিল ভুবন সোমের। দ্বিতীয় বার আর কেনেন নি।

…উঠে পড়লেন ঈজিচেয়ার থেকে। হু-হু ক'রে কনকনে হাওয়া দিচ্ছে একটা। হাত-ব্যাগ থেকে মংকি-ক্যাপটা বার ক'রে পরলেন। বেশ শীত পড়েছে। মংকি-ক্যাপটা প'রে আরাম পেলেন। তাঁর বড় পুত্রবধূ এইটি বুনে পাঠিয়েছে তাঁকে সম্প্রতি। মেয়েটি এসব শৌখিন কাজে খুব দড়; কিন্তু বড়ি দিতে পারে না, আচার করতে পারে না, ওসব কিনে খায়। রাঁধা ডাল-ভাতও বাজার থেকে কিনে খেতে পারলে বাঁচে ওরা। কলকাতায় নাকি পাইস হোটেল হয়েছে। 'উঃ, উচ্ছন্নের পথে কি রকম সাঁ-সাঁ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটা, কি ছিল আর দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল!'—আপন মনেই কথা ক'য়ে উঠলেন ভুবন সোম। তারপর চাইলেন গঙ্গার চরের দিকে। দু পাশেই গঙ্গার চর। অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কই, পাখী তো দেখা যাচ্ছে না একটাও! অথচ অনিল লিখেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসেছে। কই?

'চেয়ারটা একটু সরিয়ে দেব সার্ ওদিকে? এখানটায় বড্ড হাওয়া।'

ঘাড়ের পাশেই কথা শুনে চমকে উঠলেন ভুবন সোম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, জাহাজের টি. টি. সি. কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'দরকার হ'লে আমি নিজেই সরিয়ে নেব। তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি নিজের কাজ কর গে যাও।'

ছোকরাটি অপ্রস্তুত হয়ে চলে যাচ্ছিল।

'শোন।'

ফিরে এল আবার।

'কি নাম তোমার?'

'বিকাশেন্দু গুপ্ত।'

'একটা ভুল ধারণা নিশ্চিহ্ন ক'রে মন থেকে মুছে ফেল তোমরা। খোশামোদ ক'রে আমাকে কখনও খুশী করতে পারবে না। নেভার। আমি ওল্‌ড্ স্কুলের লোক, ডিউটি ফার্স্ট সেল্‌ফ লাস্ট—এই হচ্ছে আমার মোটো। ভালভাবে ডিউটি কর, খুশী থাকব, কাজে ফাঁকি দিলে কিছুতেই রেহাই পাবে না, সেলাম করে করে ঘাড় বেঁকিয়ে ফেললেও পাবে না। বুঝলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, যাও।'

ছোকরা ঘাড় হেঁট ক'রে চ'লে গেল। তার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ ভুবন সোম। হঠাৎ ভাল লেগে গেল ছেলেটিকে, বস্তির ছেলেগুলো প্রায় ডেঁপো হয়, এ সেরকম নয়। পকেট থেকে নোটবুক বার করে নামটা লিখে নিলেন। যদি সুযোগ পান তুলে দেবেন ছোকরাকে। পাইপে আবার তামাক ভরতে লাগলেন। নিবিষ্ট চিত্তে পাইপটি মনোযত্ত ক'রে ভরে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন মিনিটখানেক। একটা মাছরাঙা পাখী জলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সেটা, পাখা দুটো কাঁপতে লাগল খালি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, ছোট একটা মাছ মুখে করে উড়ে গেল পর-মুহূর্তে। দৃশ্যটা ভারি ভাল লাগল তাঁর। পাইপে টান দিলেন, টান দিয়েই মনে পড়ল, ধরানো হয়নি এখনও। দু-তিনবার চেষ্টা করেও ধরানো গেল না, বড্ড জোর হাওয়া। উঠে কেবিনের ভিতর গেলেন, সেখানে নিপুণভাবে পাইপটি ধরিয়ে ফিরে এলেন আবার। আবার ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। মাছরাঙা পাখীটাকে আর দেখতে পেলেন না। পাইপে টান দিতে দিতে আবার নিজের অতীত জীবনে ফিরে গেলেন তিনি।

···শুধু বোনদের নিয়ে নয়, ভাই দুটিকে নিয়েও কম ভুগতে হয়নি তাঁকে। দুটির মধ্যে একটিরও পড়াশোনা হয়নি। পড়াশোনা করলেই না। প্রতিটি ক্লাসে এক-আধবার নয়, তিন-চারবার ক'রে ফেল মারতে লাগল দুজনেই। ফোর্থ ক্লাসেই গোঁফ উঠে গেল। ভুবন সোম তবু হাল ছাড়েন নি। কিন্তু স্কুলের হেড মাস্টার মহাদেববাবু ছিলেন কড়া লোক, তিনি দুটোরই নাম কেটে দূর ক'রে দিলেন। ভুবন সোমকে বললেন, ওদের স্কুলে রাখা চলবে না, ছোট ছোট ছেলেদের সিগারেট খাওয়া শেখাচ্ছে। লেখাপড়ার ওইখানেই ইতি হয়ে গেল। মা বলেছিলেন ওদের কলকাতায় বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াতে। ভুবন সোমের সামর্থ্যে কুলোয় নি। এ নিয়ে মা কিছুদিন ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করলেন, তারপর থেমে গেলেন। ভাই দুটি লেখাপড়ায় সুবিধা করতে পারেনি যদিও, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে নাম করেছিল। বিপ্‌নে গোঁফ কামিয়ে এমন 'ফিমেল' পার্ট করতে লাগল যে, ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল চারিদিকে। আর খোকনা নাম করেছিল ফুটবল খেলায়। দিগ্বিজয়ী সেণ্টার ফরোয়ার্ড হয়েছিল সে। এক হিসেবে ভালই হয়েছিল বলতে হবে, বি. এ., এম. এ. পাস ক'রে আর কটা ল্যাজ গজাত, গজালেও সেই ল্যাজ গুটিয়ে চাকরিই তো করতে হত শেষ পর্যন্ত। বিপ্‌নে খোকনাও চাকরি পেয়েছে, ভাল চাকরি। থিয়েটারের জোরেই ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসে চাকরি হয়ে গেল বিপ্‌নের। ওর 'সীতা'র পার্ট দেখে ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসের বড়বাবু একেবারে কেঁদে কাদা হয়ে গেলেন। তার পরদিনই ডেকে চাকরি দিলেন ওকে। খোকনারও তাই। খেলার জোরে চাকরি। মোহন-বাগানের খেলা ছিল একটা বাজে টিমের সঙ্গে। সবাই জানত গোহারান হারবে বাজে টিমটা। কিন্তু জিতে গেল খোকনা থাকাতে। খোকনা তাদের হয়ে সেণ্টার ফরোয়ার্ড

খেলেছিল। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন মেকেঞ্জি লায়ালের বড় সাহেব। খোকনা তাঁর নজরে প'ড়ে গেল, ফলে চাকরিও হ'ল। ভুবন সোম পাইপ টানতে টানতে ভাবতে লাগলেন, মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। অথচ···

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি। একটা চরে অজস্র চখাচখী ব'সে রয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। এখানে নৌকা ক'রে আসা যায় না? অনিল কি ব্যবস্থা করেছে কে জানে! যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ চখাগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

শিকার করাটাই এখন তাঁর একমাত্র শখ। শুধু শখ নয়, মুক্তির উপায়। সংসারের ঝামেলা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়ে আসবার নানা ক্ষেত্র তিনি খুঁজেছেন সারা জীবন। পান নি। ছবি এঁকেছিলেন দিন কতক। এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড তাঁকে ওয়াটার-কলারে দীক্ষা দিয়েছিল। খাসা লোক ছিল মিস্টার ব্রাউন। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে যেত বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে চমৎকার লোক ছিল। ওর পাল্লায় প'ড়ে ভুবন সোম দু-এক চুমুক মদও খেয়েছেন মাঝে মাঝে। আপত্তি করলে বলতেন, জলে আর মদে কোন তফাত নেই, কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত। তারপর হা-হা ক'রে হেসে বলতেন, সেই জন্যে দামেরও তফাত, একটার দাম কিছু নয়, আর একটা টেন রুপিজ পার বট্‌ল্! সেকালে দশ টাকায় এক বোতল ভাল স্কচ হুইস্কি পাওয়া যেত। ব্রাউন তাঁকে ছবি আঁকতে শিখিয়েছিল। ছবি এঁকেছিলেন দিন কতক, এঁকেছিলেন— মানে, আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হয় নি কিছুই। নিশ্চিন্ত মনে বসতেই দেয় নি কেউ তাঁকে। ছুটি তো মাত্র একটি দিন—রবিবার। আর সেই দিনই যত রাজ্যের ফরমাশ। চাল আনো, ডাল আনো, ধোপা আসছে না—খবর নাও, ছেলেদের জামা করাতে হবে—দরজী ডাকো। বাড়িতে অতগুলো ধুমদো ছোঁড়া দু বেলা ভাত মারছে, কেউ কুটোটি নেড়ে সাহায্য করবে না, তারা করতে চাইলেও গিন্নী করতে দেবে না। ওরা নাকি ভাল পারে না। সব ভুবন সোমকে একা করতে হবে। কাজকর্ম সেরে দুপুরের দিকে যেই ছবি আঁকতে বসতেন, অমনি একপাল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াত, বর্ষাকালে আলো জ্বাললে যেমন গাঁধি-পোকা আসে ঠিক তেমনি। কেউ এটা টানছে, কেউ ওটা ঘাটছে, কেউ খুনসুটি করছে, কেউ জলের বাটিটাই উলটে দিলে, একবার রঙের বাক্সটাই ফেলে দিলে তাঁর ভাগ্নেটা। কাউকে কিছু বলবার জো নেই, বললেই তাদের মায়েদের মুখ ভার। একদিন আপিস থেকে ফিরে দেখলেন অর্ধ-সমাপ্ত তাঁর একটা ছবিতে কাদা মাখিয়ে রেখেছে কে। গিন্নী নির্বিকারভাবে বললেন, 'হয় বিলু না হয় নিপুর কাণ্ড। তোমার মত ওদেরও হয়তো ছবি আঁকবার শখ হয়েছে, বাপকে যা করতে দেখবে তাই তো করবে ওরা, ওদের আর দোষ কি? বিলুটা কাল তোমার মত প্যাকাটি ধরিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।' ছেলে দুটোর পা ধ'রে শানে আছাড় মারবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু অনেক ইচ্ছার মত সে ইচ্ছাও দমন করেছিলেন সেদিন।

কয়েকদিন পরে বড় তুলিটাই গায়েব হয়ে গেল।' গিন্নী বললেন, 'ইঁদুরে নিয়ে গেছে বোধ হয়। তোমাকে কতদিন থেকে বলছি ইঁদুরের একটা ব্যবস্থা কর, তা তুমি কিছুতেই করবে না, তোমার তুলি তো তুচ্ছ, লক্ষীর আসনই কেটে নিয়ে গেছে।' একটা জাঁতিকল কিনে আনলেন, ইঁদুর ধরা পড়ল না, একটা ভাগ্নের আঙুল কেটে গেল। সে নিয়ে কি তুমুল হৈ-চৈ বাড়িতে। ডাক্তার ওষুধ ইন্‌জেক্‌শন—নগদ পনেরোটি টাকা বেরিয়ে গেল।

এই চলছে সারাটা জীবন। আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছেন—যাতে তাঁর আনন্দ, বাড়ির মেয়েদের ঠিক তার উপরই আক্রোশ। সোজাসুজি বাধা দিতে পারে না, কারণ বাধা দেবার শক্তি নেই কিন্তু মনে মনে গজরাতে থাকে। তাঁর স্ত্রীর জ্বালাতেই ছবি আঁকা ছাড়তে হ'ল তাঁকে। কারণ ছবি আঁকতে গেলে বাড়িতে এমন একটা পরিবেশ হওয়া দরকার যা ছবি আঁকার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর জ্বালায় তাঁর বাড়িতে তা হ'ল না, হওয়া যে অসম্ভব ছিল তা নয়। হ'ত না, হতে দিত না। মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর জন্য নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছিল ভুবন সোমকে। কিন্তু একটি উপকার করেছিলেন তিনি, ওই দজ্জাল বাঘিনী বউটাকে দাবিয়ে রাখতে পেরেছিলেন! তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন টুঁ শব্দটি করতে পারে নি। তিনি মারা যাবার পর থেকেই ঘুড়িলাফ খেতে লাগল।

পাইপ টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভুবন সোম। তারপর উঠে পায়চারি করলেন একটু। আবার বসলেন।

হ্যাঁ, ছবি আঁকার শখ বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। ব্রাউন সাহেব মারা যাওয়াতে উৎসাহের উৎস শুকিয়ে গেল আরও। অদ্ভুত এবং শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল লোকটার। রিটায়ার করবার পর সে মাঝে মাঝে কোথায় বেরিয়ে যেত। পরে জানা গেল, মাঠে বা জঙ্গলে ব'সে ছবি আঁকে। রেল-লাইনের ধারে ব'সে ছবি আঁকছিল একদিন। লাইনটা বেঁকে গিয়েছিল সেখানে। এক ছুটন্ত ইঞ্জিন এসে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে গেল তাকে। ড্রাইভারের দোষ ছিল না, সে দেখতেই পায় নি তাকে, যখন পেল তখন আর অত স্পীডে থামবার উপায় ছিল না, তখন ব্রেক কষলে ইঞ্জিনই উলটে যেত। ব্রাউন সূর্যাস্তের ছবি আঁকছিল, তার নিজের রক্তেই ক্যান্‌ভাসটা লালে লাল হয়ে গেল।

হ্যাঁ, ছবি আঁকা ছাড়তে হয়েছিল ভুবন সোমকে। কিছুদিন কিছুই করেন নি। কিন্তু ছুটির দিনে কিছু একটা নিয়ে না থাকলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

অতঃপর তিনি অবসর-বিনোদনের যে উপায়টি অবলম্বন করেছিলেন সেটিও শেষ পর্যন্ত ফলপ্রদ হয় নি, কারণ গোড়াতেই গলদ হয়েছিল তাঁর। অবসর-বিনোদন মানে অবসর-বিনোদন, ওর সঙ্গে আর কিছু জড়াতে গেলেই সব মাটি হয়ে যায়। অবসর-বিনোদনও হবে, আর তার সঙ্গে সংসারের উপকারও হবে—এ রকম গোঁজামিলন শেষ পর্যন্ত সুখকর হয় না, টেঁকেও না। ইংরেজিতে লেখা একটা বই একবার হাতে এসে

পড়ল তাঁর, তাতে নানা রকম আচার মোরব্বা জ্যাম জেলি করবার করমুলা ছিল। হঠাৎ তাই নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এর জন্তে ইংরেজি বাংলা বই কিনলেন, তৈজসপত্র কিনলেন, এমন কি নতুন রকম উনুনও একটা তৈরি করালেন যাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারেন। ঘুপচি রান্নাঘরে উনুনের কাছে উবু হয়ে ব'সে রান্না করবার চেয়ে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করা কম কষ্টকর। মেয়েদের জন্তেও তিনি ওই রকম উঁচু উনুন করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা রাজী হয় নি, ঠাট্টা করেছিল তাঁকে। আশ্চর্য এই মেয়ে জাত! যাই হোক, নিজের জন্তে বারান্দায় বেশ চমৎকার একটি উনুন করিয়েছিলেন তিনি। পয়সা থাকলে বিলিতি লোহার 'ওভেন' কিনতেন, কিন্তু তত পয়সা ছিল না তাঁর। এতেই ধার করতে হয়েছিল। তোড়জোড় ক'রে নূতন পথে পা দিলেন একদিন। আশা করেছিলেন, এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে পারবেন—অবসর-বিনোদন ক'রে আনন্দ-লাভও হবে, সংসারের উপকারও হবে। তাঁর সহধর্মিণী জীবনে কখনও কোন বিষয়ে সহযোগিতা করেন নি তাঁর সঙ্গে। এ বিষয়েও করলেন না। একটি মন্তব্য করেছিলেন শুধু, কথাগুলো ছোরার মত তাঁর মনে বিঁধে আছে এখনও। তিনি যেদিন পেয়ারার জেলি করবার জন্তে পাকা পেয়ারা কিনে আনলেন, গিন্নী পেয়ারাগুলোর দিকে একনজর চেয়ে বলেছিলেন 'সব কর্মে হয়েছ যশী, বাকি আছে শুধু ভীম একাদশী। ফরসা-কাপড়-পরা মেছুনী সব। কে যেন বলেছিল, 'যত সব এঁটো-কলাপাতা শিবের মাথায় উড়ে এসে পড়েছে।' ঠিক বলেছিল। গিন্নীর কথায় অবশ্য দমেন নি ভুবন সোম, অধিকতর উৎসাহে লেগে পড়েছিলেন।

প্রতি রবিবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নিয়েই মেতে থাকতেন। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো এই সময় তাঁর সহায়তা করেছিল খুব। তাঁর চেয়েও বেশি মেতে উঠেছিল তারা। এসব কাজে ফাই-ফরমাশ খাটবার লোক না থাকলে কাজ এগোয় না। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো হামে-হাল হয়ে থাকত। কাউকে কিছু একটা বললেই হ'ল, অমনি ছুটে চ'লে যাচ্ছে। কি উৎসাহ তাদের! সে কদিন সত্যই তারা খুব খেটেছিল। ওরা অমন ক'রে না খাটলে কাজ এগোত না। বাড়ির মেয়েরা তো সাহায্য করতই না, উল্‌টো বাগড়া লাগাবার চেষ্টা করত। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে গিন্নী কোনদিন মাথা ঘামান নি, কে কোন্ ক্লাশে পড়ে তাও বোধ হয় জানতেন না। তিনি হঠাৎ একদিন ব'লে বসলেন, 'রবিবারে ছেলেমেয়েগুলো কোথায় পুরনো পড়া পড়বে, হাতের লেখা লিখবে—তা নয়, চরকির মত ঘোরাচ্ছ ওদের! এটা আন, ওটা আন, এটা ধর, ওটা ধর! সর্বাঙ্গ জ'লে উঠেছিল ভুবন সোমের, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করেন নি তিনি। দিনকতক পরে গিন্নীর কথায় আর অঙ্গও জলত না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল—আব বা আঁচিলের মত, গ্রাহ্যই করতেন না। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিলে পড়লেন তিনি, যখন ওগুলো তৈরী হ'ল। শিশি শিশি জ্যাম জেলি মোরব্বা আচার,

টিন-টিন বিস্কুট—এত সব খাবে কে ? বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে দিন-কতক। বড়গুলো ছুঁলে না। ডেকে জোর ক'রে দিলে খেত অবশ্য, কিন্তু মাথা নীচু ক'রে মুচকি মুচকি হাসত, যেন রসিকতা করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। গিন্নী একদিন বললেন, 'কেন ওই সব অখাদ্যগুলো জোর ক'রে খাওয়াচ্ছ ওদের ? অসুখ করবে যে ! ভোনাটার পেট-খারাপ হতেই হৈ-হৈ প'ড়ে গেল বাড়িতে, যেন ইতিপূর্বে তার আর কখনও পেট-খারাপ হয় নি ! জন্মে থেকেই যে ও পেট-রোগা, এটা ভুলে গেল সবাই। খোঁড়া কুণ্ডু ডাক্তারটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল—'ফুড'-পয়জনিংয়ের সব সিম্‌টম মিলে যাচ্ছে।' হাড়-হারামজাদা ছিল ব্যাটা। বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল—ঘনশ্যাম কুণ্ডু এম. ডি, এফ ডি. এস.। এফ. ডি. এস. মানে—ফিমেল ডিজিজ স্পেশালিস্ট ! পাছে লোকে বুঝতে না পারে তাই বাংলা হরফেও লিখে দিয়েছিল 'স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ'। গরিব ঘরের জোয়ান জোয়ান মেয়েদের ব্যাটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখত সামনে, আর বিদঘুটে বিদঘুটে প্রশ্ন করত তাদের। মুদির দোকান ছিল আদি কুণ্ডুর, তার ছেলে ঘনা, চক্রবর্তীর বাগানে দেওয়াল টপকে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে প'ড়ে পা-টি ভাঙে। তাতেও চৈতন্য হয় নি। নেংচে নেংচে সারা শহরময় ঘুরে বেড়াত, হেন দুষ্কার্য নেই যা করে নি। সেই ঘনা একদিন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে হয়ে গেল ডাক্তার কুণ্ডু. দামামা পিটিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগল তাঁর বাড়ির সামনেই, প্রবীণ চন্দন ডাক্তারকে ঠাট্টা করত আড়ালে। অথচ ওই চন্দন ডাক্তার না থাকলে ও বাঁচতই না। উঃ, এ দেশে কী না হয় ! সবই সম্ভব। ভোনাটার জন্যে ভাল ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি এসে বললেন, 'না, ফুড-পয়জনিং নয়, তবে ওসব আর খেতে দেবেন না ছেলেদের।' ব্যাস্‌, আর যাবে কোথা ? যে আলমারিতে ওই জ্যাম-জেলি-আচার-মোরব্বার শিশিগুলো ছিল গিন্নী তাতে তালা মেরে দিলেন একটা, যাতে কেউ সেগুলো দেখতে পর্যন্ত না পায়। তাঁর এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি ছিলেন, তিনিই কেবল বললেন 'খাসা হয়েছে তোর আমের আচার। ওরা কেউ না খায় আমিই খাব।' কিন্তু আমের আচার মাত্র চার শিশি ছিল, পিসিমাকে দিয়ে দিলেন সেগুলো, কিন্তু বাকি জিনিসগুলো নিয়ে কি করা যায় ? শেষটা কেষ্টার শরণাপন্ন হলেন একদিন। তাঁর বন্ধু বিষ্টু মিস্তিরের ছেলে কেষ্টা মনিহারির দোকান করেছিল একটা। তাকে গিয়ে একদিন বললেন, সে যদি ওগুলোর কোনও গতি ক'রে দিতে পারে। কেষ্ট ছেলে ভাল। সে বললে, 'জেঠামশাই, আমি জিনিসগুলো দোকানে রেখে দিতে পারি, কিন্তু কেউ নেবে না। ফুড-পয়জনিংয়ের একটা গুজব র'টে গেছে কিনা।' কোনও একটা দরকারী জিনিসের খবর নিতে যাও কারও কাছে, বলবে—জানি না, কিন্তু ফুড-পয়জনিংয়ের খবরটা সবাই জানে। 'আশ্চর্য দেশ ! জঘন্য—জঘন্য !'—কথা ক'য়ে উঠলেন, ভুবন সোম, তারপর পাইপে একটা টান দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাইপ নিবে গিয়েছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে আবার কেবিনের দিকে যাচ্ছিলেন পাইপ ধরাতে, কেবিনের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। মনে হ'ল, এত জোর হাওয়ায় পাইপ ধরাবার চেষ্টা বৃথা, বার বার নিবে যাবে, তামাকই উড়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে সিগার ধরাবার চেষ্টা করা যাক। ফিরে এসে ব্যাগ থেকে সিগার বার করলেন। সেটি নিপুণভাবে দাঁত দিয়ে কেটে আবার গেলেন কেবিনের দিকে। সিগার-প্রসঙ্গে একটি মজার কথা মনে পড়ল তাঁর। অনেক দিন আগেকার ঘটনা। কথা অবশ্য মজার নয়—দুঃখের, কিন্তু মজাই লেগেছিল তাঁর। সিগার কিনে আনবার জন্যে একবার তিনি তাঁর ভাগ্নে হনুকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। ভাগ্নেটি কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে বললে, বাজারে ভিড়ের মধ্যে নোটটা পকেট থেকে কে তুলে নিয়েছে সে বুঝতে পারে নি, তাই ধারে সিগার এনেছে কেষ্টর দোকান থেকে। আজকাল বাজারে পিক-পকেটের অভাব নেই, তাই কথাটা খুব বেশি অবিশ্বাস করেন নি ভুবন সোম। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ওরই পকেট থেকে ওরই ছোট ভাই জাম্বু বার ক'রে ফেললে নোটটা। জামাটি খুলে হনু স্নান করতে গিয়েছিল, সেই অবসরে জাম্বু ওর পকেট সার্চ ক'রে ফেলেছে। সেই সময় ভাগ্যে গিন্নী এসে পড়েছিল তাই বামালসুদ্ধ ধরা পড়ল, তা না হ'লে নোটটি সম্ভব ও-ই গাপ করত। জাম্বুর বয়স তখন মাত্র আট, সেই বয়সেই সুযোগ পেলে ও সকলের পকেট হাঁটকাত। দৌহিত্র দুটির সার্থক নামকরণ করেছিলেন মা—হনুমান আর জাম্বুবান।

ভুবন সোম সিগারটি ধরিয়ে আবার বাগিয়ে বসলেন ঈজিচেয়ারে। বিগত জীবনের আচার-মোরব্বার শিশিগুলি আবার ভেসে উঠল তাঁর মানসপটে। বিলিয়ে দিতে হয়েছিল সেগুলোকে। তাও কি কেউ নিতে চায়? বাড়ির কাছাকাছি কেউ নিলে না, তিনি দেনও নি। ও-সব খেয়ে যদি কারও সামান্য কিছু অসুখ হ'ত তা হ'লে ওই খোঁড়া শালা রটাত যে ফুড-পয়জনিং হয়েছে। পাড়ার কাউকে দেন নি, দূরের লোকদের দিয়েছিলেন। তাও খোসামোদ ক'রে দিতে হয়েছিল। যখন টুরে বেরুতেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। সঙ্কুচিত মুখে বলতেন, 'নিজে হাতে করেছি, খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে।' কোনও বাঙালীর মুখ দিয়ে 'ধন্যবাদ' কথাটা বেরোয় নি, প্রশংসাও না। দোষই বরং ধরেছিলেন, কেউ কেউ। মৃগেন ভাদুড়ীকে ভিনিগারে (-) ভেজানো ম্যাংগো-স্লাইস দিয়েছিলেন। তিনি পরে একদিন বললেন, 'খেতে পারলুম না মশাই, পচা আমানির গন্ধ!' সম্ভবত জীবনে ও-জিনিস প্রথম খেলেন। গুপ্ত বললে, 'পেয়ারার জেলিটা বড্ড বেশি টক হয়ে গেছে।' চরণ মুকুজ্যে বললে, 'এ কি বিস্কুট মশাই, ঠিক থাপড়ার মত।' জ্যাম খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল কিন্তু ফোরম্যান মিস্টার স্মিথ। সাহেব কিনা! সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ তো দিয়েইছিল, তারপর লম্বা চিঠিও লিখেছিল একখানা, জ্যাম তৈরী করবার নূতন একটা রেসিপিও পাঠিয়ে দিয়েছিল। আলাদা জাত ওরা, গুণীর সমঝদার, ভদ্রতাজ্ঞান আছে, কোথায় কি করতে হয় জানে, তাই দাবড়ে দুনিয়াটা শাসন ক'রে বেড়াচ্ছে। ওদের সঙ্গে এঁরা গেছেন টক্কর দিতে! কেমন

এক চালে মাত ক'রে পাকিস্তানটি ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে গেল! শুধু পাকিস্তান কেন, হিন্দুস্থানেও কি শান্তি আছে? প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঝগড়া। এখন ভোগ কর স্বাধীনতা। মাউন্টব্যাটেন মহাত্মা গান্ধিকে বলেছিল 'মিস্টার গান্ধি, ইওর কংগ্রেস ইজ, নাউ উইথ মি।' এ কথার অর্থ, যেই একটু ক্ষমতার গন্ধ পেয়েছে অমনি হামলে পড়েছে তোমার ভক্তের দল। গান্ধিকে মেরেই ফেললে। এক হিসেবে অবশ্য ভালই হয়েছে, ইদানীং ওর যে রকম মতিগতি হচ্ছিল তাতে নিদেন পক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেকটি লোককে উনি মসজিদে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়িয়ে তবে ছাড়তেন। কথাটা ভেবে নিজেরই খারাপ লাগল তাঁর। মনে মনে গান্ধিজিকে ভক্তিই করতেন তিনি। লোকটা যে অসাধারণ রকম অদ্ভুত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বহুকাল আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন মিস্টার এম. কে. গান্ধি—মহাত্মা গান্ধি হন নি, ভুবন সোমও এ. টি. এস. হন নি। ভুবন সোম তখন সামান্য কেরানী, থার্ড ক্লাসের পাস পান। বারহারোয়া স্টেশনে একটা থার্ড ক্লাস গাড়িতে চড়েছেন, গাড়িতে অসম্ভব ভিড়, তবু নজরে পড়ল প্রকাণ্ড পাগড়ি-পরা রোগা একটি লোক এক কোণে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর পাশে ব'সে আছে দাড়িওলা এক বুড়ো। কে তো কে, কত রকম চেহারাই তো ট্রেনে দেখা যায়! প্রথমটা গ্রাহ্য করেন নি ভুবন সোম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে হ'ল। বুড়োটা একটু পরে কাশ্‌তে কাশ্‌তে ঘড় ঘড় ক'রে খানিকটা কফ তুললে এবং সেটা বাইরে না ফেলে হড়াৎ করে ফেললে গাড়ির মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ি-পরা লোকটি খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে হিন্দিতে বললেন, এটা অন্যায় করলেন আপনি, মেঝের উপর থুতু ফেলছেন কেন? বাইরে ফেলুন অতিশয় সঙ্গত প্রতিবাদ। দাড়িওলা বুড়োটি কিন্তু হাড-হারামজাদা। কথার জবাবই দিলে না প্রথমটা। হাঁপাতে লাগল। হাঁপানির ধাক্কাটা সামলে স্বরূপটি প্রকাশ করলে তারপর। চোখ পাকিয়ে বললে, ঠাণ্ডা লেগে তার বুকে সর্দি বসেছে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে আরও ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, সুতরাং সে গাড়ির মেঝেতেই থুতু ফেলবে। এতে যদি কেউ অসুবিধা বোধ করেন তিনি অন্যত্র যেতে পারেন। গাড়ি কারও বাপের সম্পত্তি নয়। ভুবন সোমের রাগে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। অকারণে পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে মহা মুশকিলে পড়তে হয়—অনেক ধাক্কা খেয়ে এটা পূর্বেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। চুপ ক'রেই রইলেন তিনি। ওই রোগা পাগড়ি-পরা লোকটি কিন্তু যা করলেন তা অদ্ভুত। তিনি খানিকটা খবরের কাগজ ছিঁড়ে নিজে হাতে মেঝে থেকে কফটা তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। দাড়িওলা বুড়ো চোখ পাকিয়ে চেয়ে দেখল, কিছু বলল না। তারপর আবার কাশির ধমক এল তার, আবার সে হোয়াক ক'রে মেঝেতেই গয়ের ফেললে। পাগড়ি-পরা লোকটি আবার সেটি কাগজে পুঁছে বাইরে ফেলে দিলেন। গাড়িসুদ্ধ লোক ব'সে ব'সে নিখরচায় মজা দেখছিল। দূর থেকে মজা দেখাটাই আমাদের জাতীয় স্বভাব—পথে কোথাও সামান্য

একটু কিছু হ'লেই হ'ল, অমনি ভিড় জ'মে যায়। বুড়োটা তৃতীয় বার কফ ফেললে গাড়ির মেঝেতে। পাগড়ি-পরা লোকটি তৃতীয় বার সেটা কাগজে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। বুড়ো এবার চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইল পাগড়ি-পরা লোকটার দিকে, তারপর হিন্দিতে বললে, 'এ আপনি কি করছেন!' পাগড়ি-পরা লোকটি কিছু না বলে' মৃদু হাসলেন শুধু—অপূর্ব মিষ্টি হাসিটি—ভুবন সোম অমন মিষ্টি হাসি আর কখনও দেখেন নি। গাড়ির সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল বুড়োর কাশির ধমক আবার কখন আসবে। ঠিক যেন একটা ফুটবল ম্যাচ দেখছিল সবাই। একটু পরেই কাশির চতুর্থ ধমক এল, কিন্তু এবার বুড়ো আর কফটা গাড়ির মেঝেতে ফেললে না, মুখ বাড়িয়ে বাইরেই ফেললে। হো-হো ক'রে হেসে উঠল গাড়িসুদ্ধ লোক। এর পরই ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। দেখা গেল, কয়েকজন ভদ্রলোক ফুলের মালা হাতে নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। পাগড়ি-পরা লোকটি নামতেই তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। তখন ব্যাপারটা জানা গেল। ওই পাগড়ি-পরা রোগা লোকটি আফ্রিকা-ফেরত ব্যারিস্টার, দিগ্বিজয়ী মিস্টার এম. কে. গান্ধি।

…ভুবন সোম সিগারে টান দিতে দিতে চরের দিকে চেয়ে পা নাচাতে লাগলেন। কত জিনিসই দেখলেন জীবনে, আর জীবনটাও দেখতে দেখতে কেমন কেটে গেল—সকাল সন্ধ্যা রাত্রি কতবার এল আর গেল! মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন চাকরিতে ঢুকেছি—। ওটা কি? মাছরাঙা? উঠে দাঁড়ালেন তিনি। না, মাছরাঙা নয়। এ পাখী আগে অনেকবার দেখেছেন, নামটা জানা নেই। হাঁস কি কোন রকম? না, হাঁসের চেহারা নয় ঠিক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটি ভদ্রলোক বাইনাকুলার দিয়ে পাখীটিকে দেখেছেন। এগিয়ে গেলেন সেদিকে ভুবন সোম। ভদ্রলোক চোখ থেকে বাইনাকুলার নাবাতেই চোখাচোখি হ'ল তাঁর সঙ্গে।

'কি পাখী ওটা বলুন তো, নাম জানেন?'

'ইংরেজী নাম টার্ন (tern), ল্যাটিন নাম Sterna aurantia gray, বাংলা নাম ঠিক জানি না। কেউ কেউ গাংচিল বলেন, কিন্তু আমার মনে হয় ওটা ভুল।'

'ও!'

ভুবন সোম অবিলম্বে স'রে এলেন তাঁর কাছ থেকে, এসে আবার চেয়ারে বসলেন। মনে মনে বললেন, একটি রত্ন দেখছি। এখানে এসে আবার বিদ্যে ফলাতে না শুরু করে! আজকাল এই এক নতুন ধরনের ফ'ড়ে হয়েছে! ও পাখীর ল্যাটিন নাম বলবার কি দরকার ছিল তোর! কেবল নিজের বিদ্যে জাহির করবার চেষ্টা, আর কিছু নয়।

নানাভাবে ঘা খেয়ে খেয়ে মানুষের সঙ্গই আর ভাল লাগে না তাঁর। আচার-মোরব্বা ছেড়ে যখন শিকারে যেতে আরম্ভ করলেন তখন সঙ্গে একজন না একজন বন্ধুকে নিয়ে আসতেন। আজকাল আর আনেন না। তাদের কচকচির জ্বালায় অস্থির

হয়ে উঠতে হ'ত। যে মুক্তির আশায় শহরের ঝামেলা থেকে পালিয়ে আসা, সেইটেই পাওয়া যেত না।

ভূতনাথ নিজের কেরানির গল্প করত খালি, ও ছাড়া আর অন্য কথা কইতে জানে না সে। কি ক'রে সে সাহেবকে থ ক'রে দিয়েছিল, বড় সাহেবের মেম কেন তাকে বার বার ডেকে পাঠায়, তার স্ত্রীর হাতের লেখা মুক্তোর মত ব'লে তার ছেলেটার হাতের লেখাও ঠিক ছাপার অক্ষরের মত, হেড মাস্টারটা তাকে পারশিয়ালিটি ক'রে প্রমোশন দেয় নি, কিন্তু তার হাতের লেখা দেখামাত্রই গড়সন্ সাহেব নিজের অফিসে লুফে নিয়ে নিলে তাকে তার জামাই এত বড়লোক যে ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ না ক'রে কোথাও যায় না—ক্রমাগত এই সব গল্প। থামতে জানে না, ব'লে চলেছে তো ব'লেই চলেছে।

ভূতনাথকে বাদ দিয়ে দ্বিজেনকে নিয়ে এলেন একবার। ও যে অমন একটা নরক, তা ধারণা ছিল না তাঁর। আপিসে আড়ালে-আবডালে এক-আধটা অশ্লীল কথা বলত, কিন্তু মাঠের মাঝখানে ফাঁকায় এসে একেবারে লাগাম ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। এমন কাঁচা খিস্তি ভুবন সোম ইতিপূর্বে শোনেন নি। তাক লেগে গেল তাঁর। ডিপার্টমেণ্টাল এগজামিনে তিনবার ফেল করেছে, কিন্তু হ্যাভেলক এলিস, অনঙ্গ রঙ্গ, কামসূত্র সব মুখস্ত। ক্রমাগত আওড়াতে লাগল সেই সব। এক-একটা গল্প বলে, চোখ নাচায় আর হা-হা ক'রে হাসে। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যায় নিজেরই, তখন একটু বেঁকে দু হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে আর বলে, 'মাইরি বলছি, এরাই মেরে ফেলবে আমাকে।' একবার হা-হা ক'রে এমন হেসে উঠল যে, ঝিলের পাখীগুলো সব ভড়কেই গেল, রেঞ্জের মধ্যে এলই না আর। সুতরাং দ্বিজেনকে বাদ দিতে হ'ল। ও-রকম লোককে নিয়ে নির্জন ফাঁকা মাঠে আসা যায় না। অথচ ও মনে করে যে, ও যা বলছে তা উচ্চাঙ্গের গল্প সব।

দ্বিজেনের পর এসে জুটল ছট্টু সেন। সে আবার আর এক চীজ। শিকারের সব বাহাদুরিটা একাই নিতে চায়। পাখী দেখবামাত্র আগে দৌড়ে গিয়ে দড়াম দড়াম ক'রে ফায়ার করতে শুরু করবে, পাখী যদি পড়ে নিজেই গ্রাস করবে সেটা। যদি দুটো পড়ে দুটোই নিজে নেবে, তোমাকে একটাও দেবে না। দাঁত বার ক'রে বলবে, এ দুটিতে আমার কি হবে ভাই! রাবণের গুষ্টি, এক টুকরো করেও কুলুবে না। চল, দেখা যাক আরও যদি পাওয়া যায় কয়েকটা!' কিন্তু আর কি পাওয়া যায় দু-দুবার ফায়ারিংয়ের পর! দুবার ছট্টু সেনকে এনেছিলেন, দুবারই এই কাণ্ড। আর তাকে আনেন নি।

বার কয়েক কার্তিক মুখুজ্জেকে সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু লোকটা ঘোর অপয়া। যতবার নিয়ে এসেছেন পাখী তো দূরস্থান – পাখীর একটি পালক পর্যন্ত আনতে পারেন নি। একবার একটা লালশরের পায়ে ছররা লাগল, কিছুদূর গিয়ে পড়ল সেটা, ধরাও গেল। কিন্তু ফিরে এসে যেই অনিলের হাতে দিতে যাবেন অমনি হাত-ফসকে সেটাও উড়ে গেল। এ ঘটনার পর থেকে কার্তিককেও আর আনেন না।

* কাউকেই আর আনেন না, এমন কি অনিলকেও নয়। অনিল ছেলে ভাল, কোনরকম বদচাল নেই, কিন্তু তার সামনে শিকার করতে ভয় পান ভুবন সোম। মিস্ করলে ভয়ানক চ'টে যায় ছোকরা। ওর নিজের লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ। ওর বয়স পঁচিশ, আর ভুবন সোমের প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু ও সেটা বুঝবে না। মিস্ করলেই এমন ভুরু কোঁচকাবে যে, তার মুখের দিকে ঘণ্টাখানেক চাওয়া যাবে না। মুখ ফুটে একটি কথা অবশ্য বলবে না, কিন্তু মুখ গোঁজ ক'রে থাকবে। সে আরও অস্বস্তিকর। তাই আজকাল একাই যান ভুবন সোম, কাউকে সঙ্গে নেন না। অনিল অবশ্য সব যোগাড়যন্ত্র ক'রে দেয়।

একা একা যাওয়ার বিশেষ আনন্দ আছে একটা। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দ, যা খুশী যতক্ষণ খুশী করবার আনন্দ। কেউ বাধা দিচ্ছে না, উপদেশ দিচ্ছে না, কানের কাছে বকবক করছে না। আপিসের দায়িত্ব থেকে, পাড়াপড়শীর উৎপাত থেকে, দেঁতো হাসি আর ছেঁদো কথার একঘেয়ে ভণ্ডামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মাথার উপর আকাশ, পায়ের নীচে মাটি, চতুর্দিকে গাছপালা, বনজঙ্গল, নদীনালা, খালবিল আর পাখী—এদের মধ্যে তুমি যা খুশী কর, যতক্ষণ খুশী থাক, যতবার ইচ্ছে ফায়ার কর, যতগুলো ইচ্ছে পাখী মার, মারতে পার বা না-পার কেউ হাসবে না, কেউ ভ্রূকুটি করবে না। পাখী শিকার করতেই তিনি যান বটে, পাখী মারবার চেষ্টাও করেন, কিন্তু পাখী মারাটাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এখন বয়স হয়েছে, মাংস আর তত ভালও লাগে না। যদিও কখনও কদাচিৎ এক-আধটা পাখী মারতে পারেন, অনিলকেই দিয়ে দেন সেটা। কারণ, তাঁর নিজের বাড়িতে খাবার লোক কেউ নেই।

কেউ নেই! সত্যটা রূঢ়ভাবে হঠাৎ এসে আঘাত করল তাঁকে। গিন্নী অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। সাবিত্রীব্রতটি উদ্‌যাপন করবার বছর খানেক পরেই মারা গেলেন। বাহাদুরি বলতে হবে এটা, কারণ সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন ক'রে সধবা অবস্থায় মারা যেতে বড় একটা দেখা যায় না কাউকে। ভাইরা যে যার জায়গায় চাকরি করছে —একজন কলকাতায়, আর একজন এলাহাবাদে। বিরিঞ্চি জগন্নাথ দুজনেই মারা গেছে। বিরিঞ্চিটা রাক্ষসের মত খেত মাপা আধ সের চালের ভাত, তদুপযুক্ত ডাল এবং তরকারি। ডায়াবিটিস্ হল, অন্ধ হয়ে গিয়েছিল শেষে। জগন্নাথ মারা গেল টাইফয়েডে, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ইন্‌ফেক্‌শনটি নিয়ে এল রামপুরহাট থেকে। ওটাও কম পেটুক ছিল না। বিধবা বোন ছবি এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সে আছে এখন ছেলেদের কাছে—একজন লিলুয়ায় থাকে আর একজন জামালপুরে। তাঁর খাতিরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বড় সাহেব দুজনকেই রেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি অনুরোধ করেন নি। কারও জন্যে কখনও করেন নি, মাথা নোয়ান নি কারও কাছে কখনও। সাহেবরা সেইজন্যেই বেশি খাতির করত। তাঁর বড় ছেলে বিলু এখন বিলেত-ফেরত মস্ত সায়েব, শ্বশুরের খরচে বিলেতে গিয়েছিল। দিল্লীতে থাকে। সাহেব মানে ঘোর স্বার্থপর। আপনি আর

কোম্পানি, নিজের মাগছেলে নিয়েই ব্যস্ত। ছোট ছেলে নিপুটাই কেবল এতদিন তাঁর কাছে ছিল, সে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় পাস ক'রে রেলে ঢুকেছিল, বেশ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটাও দাগী হয়ে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারেন নি তিনি। একবার এইরকম শিকার থেকে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারলেন। সেবার এক ফায়ারে অনেকগুলো 'টিল' পড়েছিল। প্রায় বিশ-পঁচিশটা। অনেক বিতরণ ক'রেও গোটা পাঁচ-ছয় থেকে গেল। বাড়ি নিয়ে এলেন, ভাবলেন নিপুটা রাঁধবে। তাঁর দূর-সম্পর্কের এক বিধবা পিসিমা নিরাশ্রয় হয়ে তাঁর কাছে আছেন, তিনিই আজকাল রাঁধেন-বাড়েন. কিন্তু তিনি মাংস ছুঁতে চান না। ভুবন সোমও জোর করেন না। মাংস হ'লে নিপুই রাঁধে। টিলগুলো দেখে পিসিমা বললেন, 'মহা মুশকিল হ'ল দেখছি। নিপুও বোধ হয় ওসব ছোঁবে না আর। সব যোগাড় ক'রে দিচ্ছি, তুমিই না হয় আলাদা স্টোভে চড়িয়ে দাও।' শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন তিনি, নিপু মাংস ছোঁবে না মানে? হঠাৎ হ'ল কি? পিসিমা বললেন, 'ও জটাবাবার কাছে মন্ত্র নিয়েছে যে। নিরামিষ খাচ্ছে কদিন থেকে। ভোরে উঠে নাক টিপে প্রাণায়াম করে।'

নিপু তখন বাড়িতে ছিল না। নিজেকেই রাঁধতে হ'ল। নিপু বাড়ি এলে জিগ্যেস করলেন তাকে, 'তুমি নিরামিষ খাচ্ছ শুনলাম ব্যাপার কি!' নিপু বললে, 'আমি মন্তর নিয়েছি, গুরুদেব বৃথা মাংস খেতে বারণ করেছেন।' ভুবন সোম তখুনি ছোঁড়া চাকরটাকে বেলপাতা পেড়ে আনতে বললেন। বাড়ির ঠিক পাশেই হেলেপড়া বেলগাছ আছে একটা। তৎক্ষণাৎ বেলপাতা এসে গেল। ভুবন সোম তখন নিপুকে বললেন, 'এই বেলপাতায় মন্তরটি লিখে এখুনি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এস! এসে মাংসের ঝোল মেখে ভাত খাও। ও-সব বুজরুকি এ বাড়িতে চলবে না।'

নিপু মুখ গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বেরিয়ে গেল। কিছুতেই মাংস ধরাতে পারলেন না তাকে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই স'রে পড়ল একদিন। খবর পেলেন, আপিসেও যায় নি, আপিস থেকে ছুটিও নেয় নি। পরে জানা গেল, গুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশিতে গেছে। সুতরাং চাকরিটি গেল। নিজের ছেলে ব'লে এতবড় অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না তিনি, ছেলে ব'লে আরও বেশি করেন না। সে নাকি তার গুরুর আশ্রমে গিয়ে বাস করছে আজকাল, সেখানকার ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে মাস্টারি করে। যে তিনবার চেষ্টার পরে থার্ড ডিভিশনে আই. এ. পাস করেছে, সে মাস্টারি করে! ভাগ্যে বিয়ে দেন নি, দিলে বউটার হাড়ির হাল হ'ত।

হঠাৎ আবার মনে হ'ল, এখন বাড়িতে তিনি একা। তিনি আর ওই অথর্ব পিসিমা। যে বাড়ি করবার জন্যে কত হাঙ্গামা, কত মেহনত, কত লোকের কাছে ছুটোছুটি, কত জায়গায় চড়া সুদে টাকা ধার করা, সেই বাড়ি এখন খাঁ-খাঁ করছে, চামচিকে আর চড়ুই পাখীর আড্ডা হয়েছে। আপন জন কেউ নেই। তিনি চোখ বুজলে মেরামতের অভাবে ইটের স্তূপ হয়ে যাবে দু' দিন পরে।···

সিগারে মৃদু টান দিতে দিতে পায়ের পাতা নাচাতে লাগলেন ভুবন সোম। হ্যাঁ, পাখীর প্রতি লোভ নেই তাঁর। পাখী শিকার করবার জন্যে আসেন না তিনি। ভিড় থেকে হাঁফ ছাড়বার জন্যে পালিয়ে আসেন, বাইরের খোলা-মেলা জায়গায় অন্যমনস্ক হয়ে নিজেকে ভুলে থাকার জন্যে চ'লে আসেন মাঝে মাঝে। এবার কিন্তু পাখী মারতে হবে। ওই অনিল আর ছট্টু সেনকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তিনিও ইচ্ছে করলে পাখী মারতে পারেন। প্রায়ই মারতে পারেন না তা সত্যি, হাত কেঁপে যায় তাও সত্যি, কিন্তু ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই তিনি মারতে পারেন। এবার প্রমাণ ক'রে দিতে হবে সেটা। অনিলটা অবশ্য সঙ্গে যেতে চাইবে, কিন্তু তিনি কাউকে সঙ্গে নেবেন না। যে ভদ্রলোকটি বাইনাকুলার নিয়ে পাখী দেখছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে ভুবন সোমের দিকেও চেয়ে দেখছিলেন।

আশ্চর্য লোকটি, নিজের সঙ্গেই কথা কইছেন!

॥ তিন ॥

জাহাজ অবশেষে জেটিতে এসে ভিড়ল। ঘাটে ট্রেন আগেই এসেছিল। যে ঘাট একটু আগে প্রায় জনশূন্য ছিল তা জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষের লোকই যেন ভিড় করেছে এসে। কত রকমের চেহারা কত রকমের মোট-ঘাট, কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ, কত রকমের বেয়াদপি, কত রকমের ভদ্রতা! যাত্রীদের চিৎকার, কুলিদের হাঁকাহাঁকি, ফেরিওলাদের বিচিত্র ডাক, ভিখারীদের 'মিলে বাবা এক পয়সা' 'পুলিসের হুমকি'—সরগরম হয়ে উঠেছে জায়গাটা। ঘাট-গাড়ির যাত্রীরা আগেই এসেছিল, এবার জাহাজের যাত্রীরা নামতে লাগল! মনে হ'ল, দুটো নদী যেন মিশল দু দিক থেকে এসে। অনিল একটু ফাঁকায় একটা উঁচু জায়গার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজ থেকে যে জনস্রোত নামছিল তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সে। ভুবন সোমের সোলার টুপিটা প্রথমে তার নজরে পড়ল, তারপর মুখের সিগারটা। এগিয়ে গেল। সামনাসামনি হতেই ঝুঁকে প্রণাম করল।

'থাক্, থাক্—'

ভুবন সোম মুখে ও-কথা বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে খুশী হলেন। আজকালকার অনেক ছেলেমেয়েই হেঁট হয়ে গুরুজনদের প্রণাম করে না। অনেকে 'কুড়ুলে পেন্নাম' করে। কেউ কেউ বিহারীদের নকল ক'রে 'নমস্তে' বলতে শিখেছে, কেউ কেউ আবার 'জয় হিন্দ'। 'রাম রাম' শোনেন নি এখনও কারও মুখে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা অপমানজনক মনে করেন ওঁরা। বন্ধুর ছেলে বিজয়া-দশমীর দিন বাড়িতে এল,

মিষ্টিগুলি গপ গপ ক'রে খেলে, কিন্তু প্রণাম করলে না, এও দেখেছেন ভুবন সোম। অনিল ও-দলের নয়। ভাল বংশ যে। বংশের মহিমা যাবে কোথা ?

'হাতে ওটা কি ?'

অনিলের হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় কি যেন ছিল।

'কলাইয়ের ডাল। আপনার জন্যে কিনলুম। এখানে হর্‌বন্‌সের দোকানের ডালটা খুব ভাল !'

'হিং আছে বাড়িতে ?'

'আছে।'

'হিংয়ের ফোড়ন দিতে বলিস। বউমা ভাল আছে তো ?'

'ভাল আছে। তবে ওরা এখানে কেউ নেই, বাপের বাড়ি গেছে।'

'ও। রান্নাবান্না করছে কে ?'

'ঠাকুর আছে।'

'মৈথিলি ? তবেই সেরেছে ! রাঁধে কেমন ?'

'ভালই রাঁধে।'

'চল্‌, ওঠা যাক। কুলিটা কোথায় গেল—এই, ইধার লে আও—'

ট্রেনের অভিমুখে অগ্রসর হলেন তিনি। অনিল পিছু পিছু চলল। একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা খালি ছিল, তাতেই গিয়ে চড়লেন। জানালার ধারে একটি সীটে বাগিয়ে ব'সে সিগারটি ধরালেন। তারপর অনিলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবার ভাল বিলিতি টোটা এনেছি।' তারপর হেসে বললেন, 'গেল বারের কথা মনে আছে তোর ? ছি-ছি, কি দুর্বুদ্ধিই হয়েছিল ? ও-সব কি আমাদের কম্মো ! ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো গেলে কেউ আর গরু কিনত না। মাঝ থেকে কিছু পয়সা জলে দিয়েছিলাম কেবল।'

অনিলের মুখও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গত বছর ভুবন সোম নিজেই বাড়িতে টোটা তৈরি করেছিলেন। বাইরে থেকে দেখতে মন্দ হয় নি। ফায়ার করবার পর আওয়াজও হয়েছিল, কিন্তু ছর্‌রাগুলো বেশিদূর গেল না। কয়েক হাত গিয়েই মাটিতে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে প'ড়ে গেল। একটি ছর্‌রা কোন পাখীকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নি, শব্দ শুনে পালিয়ে গেল তারা। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পাখীর খুব কাছে যাবার চেষ্টাও করেছিলেন, তবু লাগল না। একটি পাখীও মারতে পারেন নি গেল বার।

'এবার কি ব্যবস্থা হয়েছে ? পাখী এসেছে ?'

'গঙ্গার চরে খুব এসেছে।'

'সেখানে যাব কি করে ?'

'একটা মোষের গাড়ি ব্যবস্থা করেছি। আমারই গাড়ি। সেই গাড়ি করে ভোরে কিষণপুর যেতে হবে। সেখান থেকে হাঁটাপথে যেতে হবে আরও কিছুদূর, তারপর গঙ্গার চর পাওয়া যাবে। সেই চরে অনেক পাখী বসছে আজকাল। চখা, গীজ্‌, টিল্‌,

পিন্‌টেল, সব রকম আছে। আমি গিয়েছিলাম একদিন। বলেন তো আপনার সঙ্গেও যেতে পারি।'

'না, আমি একলাই যাব।'

অনিল এইটেই প্রত্যাশা করছিল। এ-প্রসঙ্গে হয়তো আর একটু আলোচনা হত, কিন্তু সখীচাঁদ যাদব একটা নূতন গড়গড়া নিয়ে হাজির হওয়াতে তা আর হল না। সখীচাঁদ ভুবন সোমকে ঝুঁকে একটা নমস্কার করে অনিলকে বললে, 'এখানে হুঁকো পাওয়া গেল না। আমাদের রাধানাথবাবু এই গড়গড়াটি কাল আনিয়েছেন, এখনও ব্যবহার করা হয় নি। এইটেই নিয়ে যান।'

'বেশ।'

গড়গড়াটি গাড়ির কোণে রেখে ভুবন সোমকে আর একবার ঝুঁকে নমস্কার করে ভিজে বেড়ালের মত মুখ করে সখীচাঁদ গাড়ি থেকে নেবে গেল। যাবার আগে একটা আধুলিও দিয়ে গেল অনিলের হাতে। হুঁকো কেনবার জন্যে এটা সে সখীচাঁদকে দিয়েছিল একটু আগে। সখীচাঁদকে দেখে ভুবন সোমের মনে পড়ল, তার নামে যে রিপোর্ট করেছিলেন সেটা এখনও পাঠানো হয় নি। ফিরে গিয়েই পাঠাতে হবে। যত বয়স হচ্ছে স্মৃতিশক্তি ততই কমে আসছে।

গড়গড়াটার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'গড়গড়া কার জন্যে?'

'আপনার জন্যে। আপনার জন্যে কাটিহার থেকে যে হুঁকোটি আনিয়েছিলাম সেটা ভেঙে গেছে। এখানে সখীচাঁদবাবুকে একটা হুঁকো কেনবার জন্যে পয়সা দিয়েছিলাম, কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল না।'

'ও-গড়গড়া তুমি ফেরত দিয়ে এস। ওতে আমি তামাক খাব না।'

'খাওয়াদাওয়ার পর তামাক না খেলে আপনার কষ্ট হবে না? ভাল তামাক আনিয়ে রেখেছি।'

'কিছু কষ্ট হবে না। ও-গড়গড়া তুমি ফেরত দিয়ে এস।'

অগত্যা গড়গড়া নিয়ে অনিলকে আবার নাবতে হল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ভুবন সোম অনিলের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। স্নানাহার সারতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মৈথিল ঠাকুরের রান্না খেয়ে খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, 'এ যে মেয়েদেরও কান কেটেছে রে! এ রকমটা তো প্রায় দেখা যায় না। যত্ন করিস ব্যাটাকে।' ভুবন সোম যার উপর খুশী হতেন তাকে 'ব্যাটা' বলতেন, আর যার উপর চটতেন তাকে বলতেন 'বেটাছেলে'।

অনিল তামাকের সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছিল। ভাল অম্বুরী তামাক, টিকে, কলকে—সব। হুঁকোটাই ছিল না শুধু।

ভুবন সোম বললেন, 'এক কাজ কর্। তোদের তো অনেক কলাগাছ রয়েছে। মোটা দেখে একটা ডাঁটা কেটে আন্। আমি হুঁকো বানিয়ে নিচ্ছি।'

তাই হ'ল। পশ্চিমের বারান্দায় ব'সে তামাক খেতে খেতে ভুবন সোম আপন মনেই বলে উঠলেন, 'এমন দিনও গেছে, যখন দু হাত দিয়ে কলকে ধ'রে তামাক খেয়েছি। উনি আবার আমাকে গড়গড়া দেখাতে এসেছেন!' অনিল ঘরের ভিতর তাঁর শোবার জন্য বিছানা করছিল, শুনে মুচকি হাসলে একটু। একা একা আপন মনে কথা কওয়া ভুবন সোমের অনেক দিনের অভ্যাস। ঠিক মনে হয়, যেন কারও সঙ্গে কথা কইছেন।

অনিল বেরিয়ে এসে বললে, 'কাকাবাবু, বিছানা হয়ে গেছে। এবার আপনি একটু বিশ্রাম ক'রে নিন।'

'ঘুম হবে না। দিনে ঘুমনো অভ্যাস নেই, আপিস করতে হয়, আর ছুটির দিনে হয় শিকার না হয় মাছ ধরা। তবু একটু শোব।'

একটি ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে শুলেন ভুবন সোম। শোওয়ার সময় উপন্যাস পড়া বহুকালের নেশা। আসবার সময় উপন্যাসটি হুইলার থেকে কিনে এনেছিলেন। প্রথম পাতাটি প'ড়েই ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন তিনি। প্রথম পাতাতেই দু-দুটো খুন। মেয়ে আর তার মাসী, দুজনকেই গুলি করেছে। রিভলভারও একটি নয়, তিনটি। তিনটি রিভলভারই ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে। জমজমাট ব্যাপার। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই পাতা কয়েক প'ড়ে গেলেন তিনি, তারপর সশব্দে বইটা বন্ধ ক'রে দিলেন। অতি বাজে গল্প। ঘুমও হ'ল না। সামনের দেওয়ালে অনিলের বাবার ছবি টাঙানো ছিল একটা। ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'মরে বেঁচেছ দাদা। বেঁচে থাকলে অনেক দুর্গতি হ'ত। পুণ্যবান লোক তাই ড্যাংডেঙিয়ে চ'লে গেছ, আমাদের অদৃষ্টে কি যে আছে ভগবানই জানেন!'

উঠে পড়লেন তিনি। বিছানা থেকে নেবে কপাটটা খুলে পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। অনিলকে দেখা গেল না। কিন্তু সিগারেটের গন্ধ পাওয়া গেল। ভুবন সোমের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা। ছোকরা সিগারেট ধরেছে তা হ'লে! আড়ালে খাচ্ছে, তবু ভাল। খুশী হলেন তিনি। ছেলেটা সত্যিই ভাল, অমন বাপের ছেলে ভাল হবেই তো, আজকালকার হতভাগা ছোঁড়া হ'লে নাকের উপরই ধোঁয়া ছেড়ে দিত। ভুবন সোম জুতোটি পরে কামিজটি গায়ে দিয়ে সন্তর্পণে নেবে গেলেন। গেলেন সেই জমিটা দেখবার জন্য। অনিলদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে যে জমিটা আছে, সেখানে ভুবন সোম একদিন বাড়ি করবেন ঠিক করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক বাড়িটা যখন ধারে বিক্রি হয়ে গেল তখন তাঁকে সপরিবারে পথে দাঁড়াতে হ'ত যদি অনিলের বাবা তাঁদের আশ্রয় না দিতেন। সদাশয় লোক ছিলেন অনিলের বাবা। তিনিই যোগাড়যন্ত্র ক'রে ওই জমিটা নামমাত্র খাজনা আর সেলামিতে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন জমিদারের কাছ থেকে। বলেছিলেন, 'এইখানেই আপাতত ঘর বাঁধ তোমরা, পরে পয়সা হ'লে শহরে

জমি কিনো। ঘরের ভিত পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মায়ের জেদাজিদিতে শেষ পর্যন্ত বাড়ি আর হয় নি এখানে। চড়া সুদে টাকা ধার করে ওই শহরেই জমি কিনে বাড়ি করতে হয়েছিল ভুবন সোমকে। এই জমিটা কিন্তু এখনও আকর্ষণ করে তাঁকে। অতীতের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। তখন বুচকুন চাকরটা বেঁচেছিল, দুলাল বেঁচেছিল, টুনি ছিল, টগর ছিল···তাই যখনই এখানে আসেন জমিটাকে একবার দেখে যান। এবার কিন্তু জমির ভিতর ঢুকতে পারলেন না তিনি। জমিটাকে ঘিরে বাংচিতার বেড়া দেওয়া রয়েছে। কেউ কিনেছে বোধ হয়! গত বছর পর্যন্ত এমনি প'ড়েই ছিল। বেড়ার ধারেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম। দেখলেন, জমির মাঝখানে—যেখানে তিনি বৈঠকখানা করবেন ভেবেছিলেন—একটা খড়ের আটচালা রয়েছে। তার ভিতর ঢেঁকিতে সুরকি কুটছে দুজন মজুরনী। ভুবন সোমকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিলে একজন, আর একজন মুচকি হাসল। 'আ মোলো।'—ব'লে ভুবন সোম সেখানে থেকে স'রে গেলেন। ফিরে এসেই দেখা হ'ল অনিলের সঙ্গে।

'কোথা গিয়েছিলেন আপনি কাকাবাবু? কফি তৈরী।'

'কফি? কফি খাচ্ছ নাকি আজকাল?'

'না, আপনার জন্যে আনিয়েছি। কাটিহার থেকে আনিয়েছি। এখানে ভাল চা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমি জানি আপনি বিকেলে কফি খান।'

ভুবন সোম স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন অনিলের মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'আনিয়েছ যখন খাব কফি। কিন্তু কাজটি অন্যায় করেছ।'

'অন্যায় কেন?'

'আমাকে পর করে দিয়েছ। আমি তোমাদের ঘরের লোক, ঘরে যা থাকবে তাই খেয়ে আনন্দ করব। আমার জন্যে আলাদা কিছু বন্দোবস্ত করেছ মানেই আমাকে পর মনে করছ!'

'না না, এ কথা বলছেন কেন? বাবার জন্যেও তো কত কিছু আনাতে হ'ত। দিনাজপুর থেকে কাটারিভোগ চাল, কলকাতা থেকে গাওয়া ঘি, ভাজা মুগের ডাল, গয়ার তামাক—আপনি নিজেই এনে দিয়েছেন কতবার—'

'আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলে না তুমি। যাক, চল, কতক্ষণ কফি ভিজিয়েছ?'

'মিনিট দুই তিন হবে।'

'আর একটু ভিজুক।'

দুজনে ভিতরে গেলেন।

কফিপর্ব শেষ হ'ল যথাকালে। একটু পরেই মৈথিল ঠাকুরটি একটি বড় 'টাইমপিস' ঘড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অনিল সেটি তার হাত থেকে নিয়ে বললে, 'ঠিক আছে তো? সেবার তো খারাপ ক'রে দিয়েছিল!'

'বললেন তো ঠিক চলছে।,

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপার কি, কার ঘড়ি ?'

ঘড়ি আমারই। পোস্টমাস্টারবাবুর ছেলেটির সামনে পরীক্ষা, তাই চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রোজ এলার্ম দিয়ে ভোরবেলা উঠে পড়ে। আজ আমাদেরই উঠতে হবে, তাই আনিয়ে রাখলাম।'

ভুবন সোম মন্তব্য করলেন, 'চাওয়ার জ্বালায় অস্থির! ভাগ্যে আমাদের চোখ-কান হাত-পাগুলো শরীর থেকে খোলা যায় না, গেলে তাও চেয়ে নিয়ে যেত। চেয়ে চেয়ে আমার গ্রামোফোনটার দফা তো নিকেশ ক'রে দিয়েছে। রেকর্ডগুলো তো একটিও গোটা নেই, সেদিন দেখি স্প্রিংটাও ভেঙে দিয়েছে, আর ঘুরছে না। আপদ গেল, নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমি ঘড়িটা বাজিয়ে দেখে নাও। কিছু বলা যায় না, হয়তো কার্যকালে বাজবে না। কটার সময় উঠতে হবে ?'

'দুটোর সময়। চা-টা খেয়ে বেরুতে তিনটে বাজবে। সেখানে ভোরের আগে পৌঁছনো দরকার। গাড়ির গাড়োয়ানকেও আজ রাত্রে এখানে শুতে বলেছি।'

'ভাল করেছ। গাড়ি এখানে আছে তো ?'

'গাড়ি তো আমার নিজেরই। মোষ দুটো এবার নতুন কিনেছি।'

'আগে তো তোমাদের গরুর গাড়ি ছিল, মোষ কিনতে গেলে কেন? মোষ জানোয়ারটা সুবিধের নয়। যমের বাহন—'

'বর্ষাকালে মোষের গাড়ি ছাড়া চলে না। এখানকার রাস্তা যা খারাপ, বর্ষাকালে গরুতে টানতে পারে না। এখানকার রাস্তা ঘাট ভাল হয়ে যাবে শুনছি—মোটরেবল্ রোড হবে নাকি—সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্ট টাকা দিচ্ছে—'

'আমি শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি না যে হবে। এদের জনকয়েক হচ্ছে ভাল অভিনেতা, স্টেজে ভাল বক্তৃতা দেয়, মনে হয় যেন আকাশের চাঁদ পেড়ে কিষাণদের পিলসুজটিতে বসিয়ে দেবে, আর বাকিগুলো চোর—ছিঁচকে চোর। টাকা হয়তো খরচ হবে, কিন্তু সেটা পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খেয়ে ফেলবে। ভাল রাস্তা হবে না। সে আশা ক'রো না।'

ভুবন সোম ঈজিচেয়ারটাতে অঙ্গ প্রসারিত করলেন, তারপর সিগার ধরালেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ধূমপান ক'রে বললেন, 'রাত্রে সকাল সকাল খেয়ে শোব। লাইট খাবারের ব্যবস্থা ক'রো।'

'আপনার জন্যে সরু-চাকলির ব্যবস্থা করেছি। তাই তো আপনি খান ?'

'মৈথিল ঠাকুর সরু-চাকলি করতে পারবে ?'

'ও সব পারে। আপনার সঙ্গেও কিছু খাবার দিয়ে দেব।'

'দিও। ওই চরে খিদে পেলে বিপদে প'ড়ে যাব। ওখানে তো বালি ছাড়া আর কিছু নেই।'

'একটু দূরে গ্রাম আছে। দুধ পাবেন—'

'রাম বল। দুধ খাবে কে! দুধ হজমই হয় না—'

॥ চার ॥

দুর্গানাম স্মরণ ক'রে ঠিক ভোর তিনটের সময় মহিষ-বাহিত শকটে আরোহণ করলেন ভুবন সোম। গাড়িতে মোটা ক'রে বিছানা করা ছিল, কম্বল তো ছিলই, লেপও দিয়ে দিয়েছিল অনিল।

'আপনি লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। সকাল হতে হতে পৌঁছে যাবেন। বলেন তো আমিও যাই সঙ্গে। জায়গাটা আপনার অচেনা তো, এর আগে কখনও যান নি।'

'না না, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, শুয়ে পড়গে যাও।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর ভুবন সোম অনুভব করলেন, মহিষ দুটি যদি এই রকম বেগে দৌড়য় তা হ'লে ঘুম তো হবেই না, শরীরের হাড়গুলি আস্ত থাকবে কি না সন্দেহ।

'তোমার নাম কি বাবা?'

'ভুট্টা।'

'একটু আস্তে চালাও।'

'জী হুজুর।'

গাড়ি কিছুক্ষণ আস্তে চলল। লেপটি মুড়ি দিয়ে ভাল ক'রে শুলেন ভুবনসোম।

ছপ্পর-দেওয়া গাড়ি, বিছানাটিও বেশ মোটা আর নরম, আরামেই চোখ বুজলেন তিনি। সামান্য একটু তন্দ্রাও এসেছিল, কিন্তু ভেঙে গেল। মোষ দুটো আবার ছুটছে। তিনি কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বাইরে মুখ বাড়ালেন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে এক ফালি। সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় যা তিনি দেখলেন তাতে শিউরে উঠলেন। ভুট্টা যা করছে তাতে মোষ কেন হাতীও ছুটবে। সে মোষ-দুটির পিছনের পায়ের ফাঁক দিয়ে নিজের পা ঢুকিয়ে দিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে মোষ দুটোকে। কি সর্বনাশ, এ তো মেরে ফেলবে দেখছি। এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিঙওলা মোষকে কাতুকুতু দিলে ক্ষেপে গিয়ে ওরা কি না করতে পারে!

'বাবা ভুট্টা!'

'জী হুজুর।'

'তুমি চাপটালি খেয়ে ব'স। পা ঝুলিও না।'

ভুট্টা একটু অবাক হয়ে ফিরে চাইল তাঁর দিকে। ঠিক বুঝতে পারল না, বাবু কি করতে বলছেন।

'কি হুজুর? কি করৈলে কহিছ?'

ভুবন সোম তার মুখের বিস্ময় ভাবটা দেখতে পেলেন না। তখনও বেশ অন্ধকার ছিল, কিন্তু এটা তিনি বুঝলেন যে চাপটালি কথাটি ওর বোধগম্য হয় নি। ও কথার হিন্দি প্রতিশব্দ তাঁরও জানা ছিল না। তিনি হিন্দি ভাল জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন নি কখনও। বিহারীদের সঙ্গে তিনি হয় বাংলায় না হয় ইংরিজিতে কথা বলেন। যারা বাংলা ইংরিজি কিছুই বোঝে না, তাদের কাছে ভাঙা ভুল হিন্দি ব'লেই কাজ চালিয়ে নেন। চাপটালির হিন্দি প্রতিশব্দ না জানার দরুন যে এমন বিপদে পড়বেন তা ভাবেন নি ইতিপূর্বে। মোষ ছুটো আবার খুব জোরে ছুটতে লাগল ছপ্ ‌পরে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। এ কি এক উন্মাদ লোকের হাতে ছেড়ে দিলে তাকে অনিল! মোষ ছুটোকে ক্রমাগত কাতুকুতু দিয়ে যাচ্ছে! এই অন্ধকারে খানায়-খন্দে না ফেলে দেয়! বুড়োবয়সে হাড় ভাঙলে আর জুড়বে না। চাটুজ্যে বুড়োবয়সে পায়ের হাড় ভেঙেই ম'ল। গ্যাংগ্রিন হ'ল শেষটা। তিনি হিন্দিতেই অবশেষে বললেন, ভুট্টু, পয়ের ঝুলায়কে নেই বৈঠো।

'তব হাঁকবে কৈসে বাবু?'

'মহিষ কো কাতুকুতু নেই দেও।'

'কুতু? কুতু কোন চিজ ছে?'

কাতুকুতুর হিন্দিও ভুবন সোমের জানা নেই। মহা মুশকিল!

'এতনা জোর সে নেই হাঁকাও।'

'বহুৎ দূর যাইলে পড়তে যে। বাবু কহি দেল্‌কে, আঁধার রহতে রহতে পৌছা দে।'

'না বাবা, তুমি আস্তে চল।'

'তব কিরিণ উগি যাইতে, চিড়িয়া নেহি মিলতে।'

ভাবার্থটা বুঝতে পারলেন ভুবন সোম—সূর্য উঠে যাবে, পাখী পাওয়া যাবে না।

'না মিলুক, তুমি আস্তেই চল একটু।'

ভুট্টা কিন্তু কর্ণপাতই করলে না তাঁর কথায়। পর-মুহূর্তেই একটা মোষের পিঠে দমাস্ ক'রে এক ঘা লাঠি বসিয়ে ব'লে উঠল, 'বাবু হেনো' বুলৈছে, শালা বোচা!'

এর প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারলেন ভুবন সোম। বাবুর মত হাঁটছেন, শালা কুমীর। একটু কৌতুক অনুভব করলেন তিনি। যে আইন অনুসারে মানুষকে বাঁদর বললে গালাগালি দেওয়া হয়, ভুট্টা সেই আইনই অনুসরণ করেছে, বেআইনী কিছু করে নি। কিন্তু এরকম গালাগালি এই প্রথম শুনলেন তিনি।

'একটু আস্তে আস্তে চালা বাবা। বেঘোরে প্রাণটা না যায়!'

'তোঁ শুতি রহনি রেজাই ওড়িকে। কুছু ডর নেহি ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে একটি মোষের ল্যাজ মুচড়ে তালু ও জিহ্বার সহযোগে টক্ টক্ শব্দ করতে লাগল সে। ভুবন সোম অনুভব করলেন, মানা ক'রে একে নিরস্ত করা যাবে না। প্রথমত ভাষায় কুলুচ্ছে না, দ্বিতীয়ত অনিলের আদেশ—তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। সে আদেশ ও অমান্য করবে না। কিন্তু এইভাবে গাড়ি চললে তো তাঁর শরীরের সব কজাগুলোই ঢিলে হয়ে যাবে, বন্দুকই ধরতে পারবেন না। তখন তিনি এক কৌশল অবলম্বন করবেন ভাবলেন। গল্প ক'রে ওকে যদি একটু অন্যমনস্ক ক'রে দেওয়া যায় তা হ'লে হয়তো ফল হতে পারে। মহিষ দুটোর দিকে ও যদি একাগ্র হয়ে থাকে তা হ'লে আজ আর নিস্তার নেই। কিন্তু কি গল্প করবেন ওর সঙ্গে! ও পলিটিক্স বোঝে না, পরচর্চাও করা যাবে না ওর সঙ্গে, রেলওয়ে অ্যাডমিনষ্ট্রেশন বা বিলিতি নভেলের মর্মও ওর অজ্ঞাত। চাষবাস সম্বন্ধে কিছু বললে হয়তো ও আলাপ করতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিজেই তিনি কিছু জানেন না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ শুরু করলেন তাই।

'ভুট্টা, তোমার নামটি তো চমৎকার! কে রেখেছিল এ নাম?'

'মৌসি।'

'মাসী? বাঃ!'

তখন ভুট্টা নিজের জন্মকাহিনী বলতে লাগল। শুনে ভুবন সোমের মনে হ'ল, এ তো দ্বিতীয় বুদ্ধদেব দেখছি। ভুট্টার জন্ম নাকি ভুট্টাক্ষেতেই হয়েছিল, ওর আসন্নপ্রসবা মা তখন ভুট্টা কাটছিল। ভুট্টাকে প্রসব ক'রে সেই ক্ষেতেই মৃত্যু হয় ওর মায়ের। ওর মাসী তখন ওকে 'গোদ' নেয়, অর্থাৎ পোষ্যপুত্র হিসাবে মানুষ করতে থাকে। তারপর ওর 'মৌসা' অর্থাৎ মেসো যখন মারা গেল তখন ভুট্টার বাবা তার বিধবা শালীকেই বিয়ে ক'রে ফেলল। ভুট্টাক্ষেত অবশ্য লুম্বিনী উদ্যান নয়, কিন্তু মিল আছে অনেক। ভুবন সোম যা আশা করেছিলেন তাই হ'ল, গল্প করতে করতে ভুট্টা মহিষ দুটির প্রতি আর মন দিতে পারল না তত। গাড়ির গতি বেশ মন্থর হয়ে এল। কিন্তু গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দ্বিগুণ উৎসাহে ঠেঙাতে শুরু করলে মোষ দুটোকে আর নাক দিয়ে এক রকম 'র্থা' 'র্থা' শব্দ করতে লাগল। ল্যাজও মোচড়াতে লাগল, আবার মোষের পেটের তলায় পাও চ'লে গেল ফের। অন্যমনস্কতা-জনিত গাফিলতিটা সে যেন সুদসুদ্ধ সংশোধন করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ল। মরি-বাঁচি ক'রে ছুটতে লাগল মোষ দুটো।

'আস্তে—আস্তে—একটু আস্তে বাবা।'

ভুট্টা হাসিমুখে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে তাঁর দিকে, ভীত শিশুর দিকে বয়স্করা যেমন ভাবে চায়। একটু একটু আলো ফুটছিল, তার মুখটা তিনি দেখতে পেলেন এবার। ব্যাটা হাসছে! রাগে সর্বাঙ্গ জ'লে গেল তাঁর। কিন্তু এখন ক্রোধ প্রকাশ করলে চলবে না, কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

আবার প্রশ্ন করলেন তাকে, 'কি খেতে ভালবাস তুমি ভুট্টা?'

'জী?'

'কোন্ খানা তুমরা পসিন্ হ্যায়।'

'বুটয়ো শাত্তু।'

'বুটের ছাতু? হামার ভি পসিন্ হ্যায়।'

ভুট্টা ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

'গুড় দেকে, না, তেল মিরচাইন দেকে?'

'যো কুছ্ হোয় সবহি আচ্ছা।'

'ভাত ভালবাসতা হ্যায়, না, রোটি?'

'রোটি।'

'আর তরকারি?'

'করেলা।'

উচ্ছে দিয়ে রুটি খেতে কেমন লাগে! আশ্চর্য রুচি তো!

'আলু পরবল?'

'হ্যাঁ, উসব ভি কুছ কুছ। মগর করেলায়ো ছোকা পেঁয়াজয়ো সাথ, বড়ি আচ্ছা ছে।

গাড়ির গতি বেশ মন্থর হয়ে এল। ভুবন সোম স্থির করলেন, খাদ্য-প্রসঙ্গই, এখন চালিয়ে যেতে হবে কিছুক্ষণ। একটু ভাবতে চেষ্টা করলেন পেঁয়াজের সঙ্গে উচ্ছে ভেজে রুটি দিয়ে খেতে কেমন লাগবে! তাঁর তো বমি হয়ে যাবে। অথচ ওই হ'ল ওর প্রিয় খাদ্য। ভূত কি আর গাছে ফলে! কিন্তু ঠিক এই সময়ে যা ঘটল তাতে খাদ্য-প্রসঙ্গ হারিয়ে গেল। একসঙ্গে সমস্ত পাখীগুলো ডেকে উঠল। ভুবন সোম হকচকিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বললেন না, বলতে পারলেন না। ভোরে পাখীরা ডাকে, চিরকাল ডেকেছে, এই অতি-প্রত্যাশিত ব্যাপারটাই এত অপরূপ মনে হ'ল তাঁর কাছে যে, তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। উঠে বসলেন এবং স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে।

মহিষগুলোও আর ছুটছিল না, ভাল রাস্তা পেয়ে স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল, মনে হচ্ছিল তারাও যেন উপভোগ করছে ব্যাপারটা। ভুবন সোম দেখলেন, পূর্বাকাশ অরুণ-রাগরঞ্জিত হয়েছে। শহুরে-মানুষ ভুবন সোমের কি ভালই যে লাগছিল! ভুট্টা কিন্তু বিশেষ বিচলিত হয় নি, মাছের কাছে জলের অভিনবত্ব নেই, এ সব সে রোজই দেখছে। মিলের চোঙা দেখলে সে বরং বিস্মিত হ'ত। সে কেবল ব্যস্ত হচ্ছিল কি ক'রে বাবুকে সে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারবে। মহিষদুটিকে পুনরায় উত্তেজিভ করতে শুরু করেছিল সে, ভুবন সোম আর মানা করলেন না। বেশ লাগছিল। একটু পরে বেশ আলো ফুটল। ভুবন সোম আর মহিষের বিষয় চিন্তাই করছিলেন না। রাস্তার দু পাশে সবুজ ক্ষেতের সারি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। মুগ্ধনেত্রে তাই দেখছিলেন। কি গাছ গুগুলো? ধান? না, ধান তো এ অঞ্চলে হয় না। ভুট্টাকে প্রশ্ন করলেন। ভুট্টা একটা গোল গোছের উত্তর দিল।

'গহুম, য আর বুট ছে।'

গম, যব আর ছোলা ? কোন্‌টা গম, কোন্‌টা যব আর কোন্‌টাই বা ছোলা ! হঠাৎ একটু লজ্জিত হলেন ভুবন সোম। কিছুই জানেন না। সারাজীবন বাজে খবর সংগ্রহ ক'রে বেড়িয়েছেন খালি। পূর্বাকাশ আরও লাল হয়ে উঠল।

হঠাৎ একটা জিনিষ চোখে পডাতে বেশ একটু কৌতূহলী হলেন তিনি। ক্ষেতের মাঝখান থেকে ফুর্‌র্‌র্‌ ক'রে একটা ছোট্ট পাখী আকাশের দিকে সোজা উড়ে গেল, তারপর সেই শূন্য থেকেই গান গাইতে লাগল, ঝুপ ক'রে নেবে পড়ল আবার ক্ষেতের ভিতর। আর একটা উডল, আর একটা, আর একটা গানে গানে আকাশ ভ'রে যাচ্ছে।

'ভুট্টা, কি পাখী ওগুলো ?'

'ভর্‌থা—'

নির্বিকারভাবে উত্তর দিল ভুট্টা। পাখীর গান যেন তার কানেই ঢোকে নি।

'ভর্‌থা ! সে আবার কি পাখী ?'

'গহুমাকা খেতো পর খোতা বানাই করিকে আন্‌ডা পারৈছে।'

কিছু বুঝলেন না ভুবন সোম। লার্ক বললে বুঝতেন, কিন্তু 'ভর্‌থা, বলাতে বুঝলেন না। ভরদ্বাজ বললেও বুঝতেন না, 'ভর্‌থা' ভরদ্বাজেরই অপভ্রংশ। গমের ক্ষেতে খোতা মানে বাসা বানিয়ে ওরা ডিম পাড়ে—এ খবর ভুট্টা জানে, অথচ তিনি জানেন না। বেশ লজ্জিত হলেন ভুবন সোম। কিন্তু তিনি এত মুগ্ধ হযে গিয়েছিলেন যে, লজ্জার ভাবটা মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না।

গাড়ি চলতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চলল। চেনা অচেনা আরও অনেক রকম পাখী নজরে পডতে লাগল। দেখলেন, ভুট্টাও অধিকাংশ পাখী চেনে না। যেগুলোকে চেনে না সেগুলোকে বলছে 'জংলি চিড়িয়া'। যে দু-একটার নাম বলল সেগুলো সম্ভবত ভুল। ভুবন সোমই ধরে ফেললেন দু-একটা। একটা ফিঙেকে বললে, 'নীলকন্‌ঠ্‌।' (নীলকণ্ঠ)। ভুবন সোম নীলকণ্ঠ চেনেন, ফিঙেও চেনেন। ভুট্টাকে বললেন, 'না, ওটা নীলকণ্ঠ নয়।'

ভুট্টা একটুও অপ্রতিভ হঁ'ল না। আকর্ণ হেসে বললে, 'তব দুসরা কুছু হোতৈ।'

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড ঘটল।

'হো হো হো হো—'

তড়াক ক'রে লাফিয়ে পড়ল ভুট্টা। একটা মোষ জোয়াল ফেলে দিয়েছে, কাৎ হয়ে গেছে গাড়িটা। ভুট্টা কিন্তু মোষটাকে বাগাতে পারলে না। মোষটা উল্টো দিকে ঘুরে চোঁ-চোঁ দৌড় মারল। ভুবন সোম বেকায়দায় পড়ে গেলেন একটু। তিনি একটা সিগার

ধরাবার চেষ্টায় ছিলেন। নিরস্ত হলেন। দ্বিতীয় মোষটাও পালাবার চেষ্টা করছে। কি আপদ! হঠাৎ ভুট্টা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'আই রে বাপ, বিহনিয়া—'

'বিহনিয়া কি রে?'

'বিহনিয়া ভৈঁস। উতরি যা বাবু, জলদি সে উতরি যা—'

তাড়াতাড়ি গাড়ির পিছন দিক থেকে লাফিয়ে নেবে পড়লেন ভুবন সোম, কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি। গাড়ি থেকে নেবেই কিন্তু বুঝতে পারলেন। একটু দূরে ক্ষেতের মাঝখানে আর একটি মহিষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিঙে কাদা মাখা, কুচকুচে কালো গা। মৃদু কিন্তু গম্ভীর মেঃ-মেঃ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। মাথা ক্রমশই বেঁকছে। ভাব-ভঙ্গি মোটেই ভাল নয়।

কাছেই একটা শিমুলগাছ ছিল। ভুট্টা আদেশের ভঙ্গিতে তাঁকে গাছটায় চড়তে বলল।

'জলদি—জলদি—জলদি চঢ়ি যা বাবু, ই শালা বড়ি বদমাস ছে।'

সে নিজেই ছুটে এসে ভুবন সোমকে পাঁজা-কোলা ক'রে গাছতলায় নিয়ে এল, তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, ওহি ডালটো পকড়ি লে! জলদি—জলদি—'

নাগালের মধ্যে একটা ডাল ছিল সেইটে ধ'রে ঝুলে পড়লেন তিনি, তারপর ভুট্টার সাহায্যে কোনক্রমে উঠলেন গাছের উপরে। গাছে উঠে দেখলেন সংঘর্ষ বেধে গেছে। আগন্তুক মহিষটা গাড়ির মহিষটাকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করেছে, আর ভুট্টা এক-জোড়া দড়ি-বাঁধা বাঁশ নিয়ে ঠেঙিয়ে চলেছে আততায়ী মোষটাকে। ভুট্টার বিক্রম দেখে তাক লেগে গেল ভুবন সোমের। ও বাঁশই বা পেলে কোথায়? তিনি জানতেন না যে, গাড়িকে দাঁড় করাবার জন্য ওই রকম দড়ি-বাঁধা বাঁশ প্রত্যেক গাড়ির সঙ্গে থাকে এক-জোড়া। 'সিপাহা' ওর নাম। বীরবিক্রমে লড়তে লাগল ভুট্টা। গাড়ির প্রথম মোষটা তো আগেই পালিয়েছিল। দ্বিতীয়টাও পালাল। দ্বিতীয় মোষটা যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুট দিল তখন আগন্তুক মোষটা আর সেখানে দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করল না, সেও ছুটে চ'লে গেল। সে এসেছিল তার এলাকা রক্ষা করতে। এর পুরো তাৎপর্যটা পরে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভুট্টাই তাঁকে বলেছিল। বিহনিয়া মোষ হচ্ছে—ব্রিডিং বাফেলো, নিজের এলাকায় সে দ্বিতীয় পুরুষ-মহিষকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। যদি কোনও পুরুষ-মহিষ ঢুকে পড়ে আর সে তা টের পায়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে এগিয়ে আসবে। মহিষের ওই মেঃ-মেঃ শব্দটারই অনুবাদ হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি। যুদ্ধ করতে করতে হয় সে নিজে মরবে, না হয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে তাড়াবে। যে বিহনিয়ার পাল্লায় ভুবন সোম পড়েছিলেন সেটার নাকি দোর্দণ্ড প্রতাপ। এ অঞ্চলের কোনও মোষ তাকে হারাতে পারে নি। ডাক্তারবাবুর একটা মোষকে সে মেরেই ফেলেছে।

ভুবন সোম গাছের উপর থেকে সব দেখছিলেন। তিনটে মোষই যখন রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে তখন সহসা আর একটা শত্রুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে

হ'ল তাঁকে। গাছটায় অসংখ্য লাল পিঁপড়ে রয়েছে। কি করবেন ভাবছিলেন, এমন সময় ভুট্টা বলল, 'অব উতরিয়ে হুজুর।'

ভুট্টা খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেটা। অপ্রত্যাশিতভাবে বিহনিয়ার আবির্ভাব হওয়াটা যেন তারই দোষ। এই শীতেও ঘেমে উঠেছিল বেচারা। ডান হাতের একটা আঙুলও জখম হয়েছিল একটু। কিন্তু এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। বাবুর 'মেহমান' (অতিথি) যে এই বিপদে প'ড়ে গেলেন এর জন্যেই সে লজ্জিত। যে বাঁশজোড়া দিয়ে বিহনিয়াকে পিটেছিল তারই সাহায্যে সে গাড়িটাকে তুলে দাঁড় করালে। তারপর কুণ্ঠিতদৃষ্টি তুলে ভুবন সোমকে বললে, 'অব উতর যাইয়ে হুজুর।'

নাববার তাড়া ভুবন সোমেরও কম ছিল না, পিঁপড়ে দেখে তিনি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্যান্টের ভিতর যদি ঢুকে পড়ে তা হ'লে খুবই কাবু ক'রে ফেলবে। ভুট্টার সাহায্য না নিয়ে এক লাফে নেবে পড়লেন তিনি। নেবেই মনে হ'ল, নাবলাম তো, কিন্তু অতঃপর ? গাড়ির মোষ দুটো তো পালিয়েছে। পায়ে হেঁটে অগ্রসর হওয়া কি সমীচীন ? বিহনিয়াটা মার খেয়ে ছুটে পালাল বটে, কিন্তু আবার যদি ফিরে আসে ! আসা অসম্ভব নয়, কাছে-পিটেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে। বেশী দূরে যায় নি। বড় বড় কি গাছ ওগুলো ? ভুট্টা বললে—রাহার, মানে অড়র গাছ। ওই অড়রক্ষেতেই ঢুকেছে বিহনিয়া, গাছের উপর থেকে দেখেছেন তিনি।

ভুট্টা বললে, 'না, সে আর আসবে না এখন।' কি করা যায় তা হ'লে ? ভুট্টা প্রস্তাব করলে, 'এখান থেকে মহেন্দর সিংয়ের 'ডোটা'য় যাওয়া যাক, বেশী দূর নয়, কাছে।' 'ডোটা' কি ? মাঠের মাঝখানে সম্পন্ন গৃহস্থ চাষীরা যে আস্তানা করে তাকে এ দেশে 'ডোটা' বলে। ভুট্টা বললে, সে তাঁকে তাঁর মালপত্রসমেত মহেন্দর সিংয়ের ডোটায় পৌঁছে দিতে চায়। সেখানে আর একটা গাড়ি পাওয়াও অসম্ভব নয়। মহেন্দর সিংয়ের নিজেরই গাড়ি আছে। গতবার বুত্তরের মেলায় একজোড়া ভাল বলদও কিনেছেন তিনি। অনিলবাবুকে খুব খাতির করেন মহেন্দর সিং। তাঁর মেহমানকেও করবেন। আর মহেন্দর সিংয়ের ডোটা থেকে গঙ্গার চরও খুব বেশী নয়। বাবু ইচ্ছে করেন তো হেঁটেও যেতে পারবেন। হেঁটে গেলেই বরং তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন। গাড়িতে গেলে ঘুরপথে যেতে হবে, দেরি হবে। ভুট্টা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে গাড়ির মোষ দুটোর সন্ধান করবে।

ভুবন সোম দেখলেন, প্রস্তাব অসঙ্গত নয়, মন্দও নয়। এ ছাড়া গত্যন্তরও তো নেই। রাজী হলেন। ভাগ্যে বিহনিয়াটা এসে গাড়িটাতে ধাক্কা মারে নি, তা হ'লে তাঁর বন্দুক টোটা সব নয়-ছয় হয়ে যেত। সাহেবী পোশাক প'রে এসেছিলেন তিনি। চেস্টারফিল্ডটি খুলে রেখেছিলেন। এবারে সেটি গায়ে দিলেন। তারপর বন্দুকটি কাঁধে ক'রে টোটাগুলি পকেটে পুরে হ্যাটটি মাথায় দিয়ে ভুট্টার পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

অনিল একটা টিফিন-কেরিয়ারে খাবার দিয়েছিল, সেইটে ভুট্টা হাতে ক'রে ঝুলিয়ে নিলে। তাঁর কাঁধে মিলিটারি ফ্লাস্কে জল ছিল। আর কোনও আসবাব ছিল না তাঁর। দরকারও ছিল না।

...মহেন্দর সিংয়ের ডোটাতে পৌঁছে দেখা গেল, সেখানে কেউ নেই। একটি খোড়ো ঘর আছে শুধু। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। চারদিকে মাটির উঁচু বারান্দা। পুবদিকের বারান্দায় বেশ মজবুত গোছের একটি তক্তাপোশও রয়েছে। আর সামনের উঠোনে রয়েছে একটা কুয়া। আর কিছু নেই। অনেক দূর মাঠে একটা ছোঁড়া ব'সে ঘাস কাটছে। ভুট্টা টিফিন-কেরিয়ারটি নাবিয়ে গেল তার কাছে। ভুবন সোম চৌকিটির উপর ব'সে পাইপটি ধরালেন। তাঁর মনে হ'ল, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে এ সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাওয়া শক্ত।

ভুট্টা ফিরে বললে, মহেন্দর সিং এখানে নেই। নিজের গরুর গাড়িতে চেপে তিনি বারো ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে বিবাহের ভোজ খেতে গেছেন। কবে ফিরবেন তা অনিশ্চিত। তাঁর কামৃতিও (চাকরের সর্দার) এখানে নেই। কিছুদিন পূর্বে গোয়ালাদের সঙ্গে ভূঁইহারদের যে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে তাতে আসামী হয়ে হাজতবাস করছে সে। অন্যান্য চাকরবাকরও সেই কারণে পলাতক, কারণ পুলিস দেখলেই গ্রেফতার করবে। ভুট্টা বললে, ভোজ খাবার ছুতোয় মহেন্দর সিংও সম্ভবত এই কারণেই সরেছেন। যে ঘাস কাটছে তার নাম ভাগিয়া। সে যদিও মহেন্দর সিংহের চাকর নয়, তবু সে-ই এখন এখানকার রক্ষক, কারণ তার ফুফাই (পিসে) মহেন্দর সিংয়ের কামৃতি। ভুট্টাকে সে আশ্বাস দিয়েছে যে, বাবুর যদি কিছু দরকার হয় এবং তা যদি তার সাধ্যাতীত না হয় তা হ'লে সে তা নিশ্চয়ই ক'রে দেবে। ভাগিয়ার কাছ থেকে আর একটি সাংঘাতিক খবরও ভুট্টা নিয়ে এল। আর একদল শিকারী নাকি খুব ভোরে নৌকো ক'রে এসেছে। খবরটি শুনে দ'মে গেলেন ভুবন সোম। মনে মনে বললেন, তা হ'লে মা-গঙ্গাকে প্রণাম করে এখান থেকে ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু ফিরবারও উপায় নেই, মোষ দুটি পালিয়েছে।

'তোর মোষ দুটোকে ধ'রে আনতে কত সময় লাগবে?'

'ওকরো কি কুছু ঠিক ছে! কাঁহা পর ভাগলোছে, খোঁজেলো পড়তে।'

'দেখ্, যত শিগগির পারিস খুঁজে আন্। আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখি ততক্ষণ পাই যদি কিছু।'

ভুবন সোম দেখলেন, ভুট্টা চাকরটি সত্যিই ভাল লোক। যাওয়ার আগে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুয়া থেকে এক কলসী জল তুলে দিয়ে গেল। জল তোলবার জন্তে কুয়ার ধারেই বাঁশের তৈরী লাট ছিল এবং তাতে বাঁধা ছিল একটা লোহার কলসী। যাওয়ার আগে ব'লে গেল যে, মোষ দুটোকে খুঁজে সে ওই শিমুলগাছের পশ্চিম দিকে

ভগণ্ড মোড়লের যে বাড়ি আছে সেখানেই থাকবে। ভগণ্ড মোড়লের গোয়ালে মোষ দুটোকে বেঁধে রেখে তারপর এখানে আসবে। কারণ বিহনিয়ার এলাকায় ওদের আর নিয়ে আসা নিরাপদ নয়। মনে হচ্ছে ওই শিমুলগাছটাই সম্ভবত ওর এলাকার খুঁটি অর্থাৎ সীমাচিহ্ন। এই প্রসঙ্গে সে একটি কৌতুকজনক খবর দিলে। বললে, প্রথম মোষটা যে জোয়াল ফেলে পালিয়েছিল তার কারণ, সে বুঝতে পেরেছিল যে সে অন্য একটা বিহনিয়ার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছে। বিহনিয়ারা গোবর দিয়ে নিজেদের এলাকা চিহ্নিত ক'রে রাখে। সেই গোবর দেখে কিংবা সেই গোবরের গন্ধ পেয়ে অন্য মোষেরা বুঝতে পারে যে, তারা শত্রুর এলাকায় পদার্পণ করেছে আর বেশী দূর অগ্রসর হ'লে যুদ্ধ অনিবার্য। ভুবন সোমের আবার মনে হ'ল, কত জিনিসই যে জানি না। ভুট্টা চ'লে যাওয়ার আগে খেয়েও নিলেন তিনি। টিফিন-কেরিয়ার খুলে কিন্তু চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল তাঁর। এ-হে-হে-হে, এ কি করেছে অনিল, ডিমের ওমলেট আর আমের আচার দিয়েছে! দুটো জিনিসই যে অযাত্রা তাই এই সব কাণ্ড হচ্ছে। খেলেন তবু। কয়েকখানা লুচি আর গোটা চারেক সন্দেশও ছিল। তাঁর ক্ষিধে পায় নি তেমন, তবু কাজটা মিটিয়ে ফেললেন। তা ছাড়া আর একটা কথাও তাঁর মনে হ'ল, এই টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে কত ঘুরবেন তিনি! এখানে রেখে যাওয়াও নিরাপদ নয়। ওই ভাগিয়া বিশ্বাসযোগ্য কি না কে জানে! খুব সম্ভবত নয়। ভুট্টা টিফিন-কেরিয়ারটা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে তাঁর জলের ফ্লাস্কে জল ভ'রে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। ভুবন সোমের মনে হ'ল, এই ফ্লাস্কটাকে কাঁধে ক'রে বেড়ানোও এক ঝঞ্ঝাট। শীতকালে জলতেষ্টা পাবে না। যদি পায়, পাশেই তো গঙ্গা। ফ্লাস্কটাও দিয়ে দিলেন তাকে।

···ভুট্টা চ'লে গেল, ভুবন সোম পাইপটি ধরালেন। সামনের দিকে চেয়ে ব'লে উঠলেন, 'বা বা বা বা!' পূর্বদিগন্তে রঙের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একরাশ মেঘ জমেছিল সেখানে, খেলাটা আরও জ'মে উঠেছিল তাই। সূর্য চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে উঠি উঠি করছেন, উঠেছেন হয়তো, কিন্তু মেঘের ভিড় ঠেলে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি এখনও। তবে সূর্যকে রুখবে কে। ভুবন সোম পাইপে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে উপভোগ করছিলেন দৃশ্যটা। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ যেখানে গিয়ে আকাশে মিশেছে ঠিক সেইখান থেকে শুরু হয়েছে লাল রঙের খেলা। চক্রবালরেখার গাছগুলো মনে হচ্ছে যেন কালি দিয়ে আঁকা। তারপরে লাল। একরকম লাল নয়, নানারকম লাল। লালের সীমা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে নীল—উজ্জ্বল নীল।

ভুবন সোম এককালে ছবি আঁকতেন, রঙের এই খেলা খুবই ভাল লাগছিল তাঁর। একটা রঙ আর একটা রঙের সঙ্গে কেমন বেমালুম মিশে গেছে, একটু গরমিল নেই, এতটুকু ছন্দপতন নেই।

আবার মনে পড়ল গার্ড মিস্টার ব্রাউনের কথা। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে খুব উঁচুদরের

কথা বলত সে। তাঁর মুখের সামনে হাত নেড়ে একদিন বলেছিল, 'বাবু, যদি রঙের খেলায় ভালভাবে মেতে যেতে পার, তা হ'লে ভগবানকে পাবে। চার্চেও যেতে হবে না, মন্দিরেও যেতে হবে না। কলার ইজ গড্—বর্ণই ব্রহ্ম।' তিনি হিন্দুর ছেলে 'শব্দব্রহ্ম' কথাটা শুনেছিলেন। কিন্তু বর্ণও যে ব্রহ্ম – এ কথা মিস্টার ব্রাউনই বলেছিল তাঁকে। ব্রাউন সাহেবের চেহারাটা আবার ভেসে উঠল মনে, খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। বড় বড় নীলচে চোখদুটো সর্বদাই জলভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। চোখের নীচের দিকটা ছিল ফোলা-ফোলা। মাথায় অবিন্যস্ত রেশমের মত চুল। টুকটুকে গালদুটিতে জরার চিহ্ন, খুব সরু সরু শিরাও দেখা যেত গালে। ড্যাবডেবে চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে যেদিকে চেয়ে থাকত, চেয়েই থাকত—চোখের পলক পড়ত না। চোখের নীচের পাতার কোলে টলটল করত জল! হাত নেড়ে কথা কইত, হাতের আঙুলগুলো কাঁপত, ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার পাবদুটোতে বাদামী রঙের ছোপ ধ'রে গিয়েছিল ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার জন্য। ব্রাউন বলেছিল, বর্ণই ব্রহ্ম।

হঠাৎ মনে পড়ল নাতনী রেবাকে। সে তাঁকে রবি ঠাকুরের একটা গান শুনিয়েছিল একবার—'সবার রঙে রঙে মেশাতে হবে। ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়, পর পর তবে'। 'ওটা বাজে কথা, সবার রঙে রঙ মেশানো যায় না'—হঠাৎ ব'লে উঠলেন ভুবন সোম। নাতনী রেবার কথাটা কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। অনেক দিন তাদের খবর পান নি। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে না। লিখবে কেন, দরকার তো আর নেই। মনে পড়ল রেবার একটা চোখ বসন্ত হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওই কানা মেয়ের আর বিয়ে হবে না। তাই ওর বাপ-মা গান-বাজনা শেখাচ্ছে ওকে, ভাবছে কিছু একটা অবলম্বন হবে তবু। কিন্তু ভুবন সোম জানেন, হবে না। স্ত্রীলোকের অবলম্বন পুরুষ, পুরুষের অবলম্বন স্ত্রীলোক, এ ছাড়া অন্যরকম কিছু হয় না, হতে পারে না। হলেই গড়বড়। বিদ্যাসাগরের মত লোক তাই বিধবাদেরও বিয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকেছিলেন।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালেন ভুবন সোম। দুম দুম ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হল যেন কোথায়।

'এঃ পাখীগুলো সব উড়িয়ে দেবে দেখছি—'

বন্দুকটা কাঁধে তুলে এগিয়ে গেলেন। যেখানে ভাগিয়া ব'লে ছোঁড়াটা ঘাস কাটছিল, সেখানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, গঙ্গার চরে যাওয়ার রাস্তা কোন্ দিকে ? ছোঁড়া কোনও জবাবই দিলে না। কালা নাকি ! প্রথমে বাংলায় বলেছিলেন, এবার হিন্দিতে বললেন।

'গঙ্গাকা কিনারামে যানে কা রাস্তা কিধার ?'

ভাগিয়া নীরব।

আপন মনে ঘাসই কেটে যাচ্ছে তাঁর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে।

'আ মোলো। বাতে কাহে নেই বোল্‌তা হায় ?'

ভাগিয়া ঘাড় তুলে তাঁর দিকে একবার চাইল কেবল, কোন জবাব দিল না।

'আরে গঙ্গা কিনারামে যানে কা রাস্তা কিধার বোল দেও না একটু।'

'রাস্তা নেই ছে।'

বলে কি! রাস্তা নেই! পুনরায় প্রশ্ন করলেন। আবার ভাগিয়া চুপ। আশ্চর্য ত্যাঁদড় ছোঁড়া! কিন্তু ভুবন সোমও নাছোড়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগলেন তিনি।

শেষে ছোঁড়া নিজস্ব ভাষায় যে জবাব দিলে তার সারমর্ম হচ্ছে, এখান থেকে গঙ্গার চরে যাবার কোনও রাস্তা নেই। যদি কেউ যেতে চায় তা হলে ওই অড়হরক্ষেতের ভিতর দিয়ে দিয়ে যেতে হবে। অড়হরক্ষেত পার হয়েও রাস্তা নেই, আছে গম আর যবের ক্ষেত। তার সরু আল দিয়ে দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আর একটা অড়হরক্ষেত, সেটা পার হয়ে তবে গঙ্গার চর। গম আর যবের ক্ষেত সরু আলের উপর দিয়েই পার হতে হবে, কারণ ফসলে পা দিলে ক্ষেতের মালিক ভিখন গোপ লাঠিহাতে তেড়ে আসবে। সে ক্ষেতের এক প্রান্তে একটা ঝোপড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে ব'সে আছে। আর বাবু যদি রাস্তা দিয়ে যেতে চান তা হ'লে যে শিমুলগাছটার কাছে বিহনিয়া তাঁদের আক্রমণ করেছিল সেইখানে ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকে যে রাস্তা পুবদিকে চ'লে গেছে সেই রাস্তা ধ'রে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটি আমগাছ দেখা যাবে ডান দিকে, অনেক মুকুল হয়েছে তাতে। সেই আমগাছের পাশ দিয়ে গঙ্গার চরে যাওয়ার রাস্তা।

ভুবন সোম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ভুট্টা তাকে এইরকম একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়ে স'রে পড়ল। 'উফ!'—ব'লে চুপ ক'রে গেলেন তিনি। পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হ'ল, তিনি ভদ্রলোক, সুতরাং অসহায়। এদেরই আজকাল বাড়-বাড়ন্ত, এরা যা খুশী ক'রে যাবে, মুখটি বুজে সহ্য করতে হবে। এতদূর যখন এসে পড়া গেছে তখন গঙ্গার চরে পৌঁছতেই হবে। এই ছোঁড়াটাকেই একটু তোয়াজ করা যাক। কিন্তু কি করলে যে এই ঘেঁচিমার্কা বিচ্ছু খুশী হবে তাও তো জানা নেই। একটু ভাবলেন। তারপর কলিকালে যে মন্ত্র পাঠ করলে সব দেবতাই তুষ্ট হন সেই মন্ত্রটিই ঝাড়লেন শেষে।

সরল বাংলা ভাষায় বললেন, 'আমাকে গঙ্গার ধারে পৌঁছে দে বাবা, তোকে বকশিশ দেব। আচ্ছা, আগামই না হয় নে কিছু।'

মনি-ব্যাগটি বার ক'রে একটি দোয়ানি দিলেন তাকে। ভাগিয়া দোয়ানিটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে কানের পাতায় আটকে রেখে দিলে। চৌকো দোয়ানিটি তার কানে ঠিক ফিট্ ক'রেও গেল। ভুবন সোম দেখলেন কানে একটা বিড়িও গোঁজা রয়েছে। ছোঁড়া কিন্তু ওঠবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করলে না। যেমন ঘাস কাটছিল তেমন কাটতে লাগল।

'কি রে, দু আনা পছন্দ হ'ল না বুঝি? আচ্ছা, আরও দু আনা নে। ওঠ্ এইবার, আমাকে পৌঁছে দে বাবা।'

মনি-ব্যাগ বার ক'রে খুঁজে-পেতে আর একটি চৌকো দোয়ানি দিলেন তাকে। নিমেষের মধ্যে সেটাও সে আর একটা কানে ফিট্ ক'রে নির্বিকারভাবে ঘাস কাটতে লাগল। রাগে সমস্ত শরীর রি-রি ক'রে উঠল ভুবন সোমের। কিন্তু তখনই মনে হল, রেগে বেসামাল হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিটখানেক।

নীরবতায় ফল হ'ল। ভাগিয়া ঘাসের বোঝাটা বেঁধে ফেললে, তারপর তার উপরে চ'ড়ে দমক দিলে দু-চারবার। আবার মনোমত ক'রে বাঁধলে, তারপর কাস্তেটা তাতে গুঁজে দিলে। এর পর সে যা করলে তা একেবারে নাটকীয়। একটি পাঁচ টাকার নোট সে বাড়িয়ে দিলে ভুবন সোমের দিকে। নিজস্ব ভাষায় বললে, বাবু যখন ব্যাগ খুলে দোয়ানি বার করছিলেন তখনই নোটটা ঘাসের উপর প'ড়ে গিয়েছিল, সে এতক্ষণ ঘাস চাপা দিয়ে ছিপিয়ে (লুকিয়ে) রেখে মজা দেখছিল। চোখের পাতা দুটো মিট্‌মিট্ করতে লাগল তার। একটু হাসল না কিন্তু। নীরবে এবং অবলীলাক্রমে প্রকাণ্ড ঘাসের বোঝাটা মাথায় তুলে ডোটার দিকে চলতে লাগল।

ছোঁড়ার কাণ্ড দেখে ভুবন সোম থ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুসরণ করতে লাগলেন তিনি তাকে।

ডোটায় পৌঁছে ঘাসের ঝোপটা একটা ঘরে রেখে, ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে সে বললে, 'অব চলিয়ে বাবু।'

ভুবন সোম চমৎকৃত হয়ে গেলেন। হাতের কাজটি সেরে তবে অন্যদিকে মন দিলে। পয়সা দিয়েও ওকে বিচলিত করা গেল না। পয়সার প্রতি ওর লোভই নেই সম্ভবত, থাকলে পাঁচ টাকার নোটটা ফেরত দেয়! এ রকম দেখেন নি তিনি কখনও। তাঁর ভায়ে হনুর কথা মনে পড়ল।

ভাগিয়া যেখানে বসে ঘাস কাটছিল সেইখানেই এক ছুটে চ'লে গেল আবার। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তাঁর দিকে তারপর অড়রক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ভুবন সোমের পক্ষে ওর মত ছুটে যাওয়া সম্ভব ছিল না তবু যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে গিয়ে হাজির হলেন তিনি অড়রক্ষেতের ধারে। অড়রক্ষেতের ভিতর প্রবেশ করা কিন্তু কঠিন হ'ল তাঁর পক্ষে। বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে তো ঢুকতেই পারলেন না, হাতে ঝুলিয়ে নিলেন সেটা, তারপর অতিকষ্টে ঢুকলেন। ঢুকে ভাগিয়াকে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেল ছোঁড়া।

'ভাগিয়া কোথা গেলি ?'

'আবো নি ইধর।'

তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে এগুলেন খানিকটা। সোলার হ্যাটটা মাথা থেকে বার বার প'ড়ে যেতে লাগল, আর বন্দুকটাও আটকে আটকে যেতে লাগল অড়রের গাছে। হ্যাটটা শেষে বগলদাবা করলেন।

'ভাগিয়া—'

'হ্যাঁ, ইধর ছি—ইধর ছি।'

অড়রক্ষেতের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় ভাগিয়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। অড়রগাছের পাচিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা উঠোন যেন। নিতান্ত ছোটও তো নয়। একটা কুঁড়েঘরও রয়েছে এক ধারে। ভাগিয়ার দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইতে ভাগিয়া বললে, এটা তার নিজের ক্ষেত, ওই কুঁড়েঘরে থেকে ক্ষেত পাহারা দেয় সে। রাত্তিরেও শোয়। ভুবন সোম দেখলেন, ভাগিয়ার শখও আছে। একটি ছোট খাঁচায় একটি বুনো খরগোশের বাচ্চাও পুষেছে সে। ক্ষেতের ধার থেকে কিছু দূর্বাঘাস ছিঁড়ে খরগোশের খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ভুবন সোমের দিকে চেয়ে সে বললে, 'অব চলিয়ে—'

'খরগোশ কোথা পেলি?'

ভাগিয়া সগর্বে জানালে, খরগোশটা সে ধরেছে, ছুটে ধরেছে।

'খালি ঘাস খায়?'

'দুধ ভি খাইছে। বুট ভি—'

বাক্যালাপ ক'রে বেশী সময় নষ্ট করতে চাইল না সে। আবার ঢুকে পড়ল অড়রক্ষেতে। তর্ তর্ ক'রে চলতে লাগল অড়রক্ষেতের ভিতর দিয়ে, যেন তার ঘর-বাড়ি এ সব। ভুবন সোম নিজের বাড়ির পাকা দালানেও এত স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন না। ওটাও মানুষ নয়, যেন খরগোশ। ছুটে চলেছে ব্যাটা। ভুবন সোমকেও বাধ্য হয়ে গতিবেগ বাড়াতে হ'ল। যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে। পাল্লা দেওয়া কি সোজা এই অড়রবনের মাঝখানে!

মিনিট পাঁচেক এ দুর্ভোগ ভুগতে হ'ল। অড়রক্ষেত পার হয়ে যব আর গমের ক্ষেতে এসে পড়লেন। বেশ বড় ক্ষেত এটা। এরও এক প্রান্তে ছোট একটি কুঁড়েঘর রয়েছে, আর সেই কুঁড়ের ভিতর ব'সে আছে ক্ষেতের মালিক ভিখন গোপ—এর কথা একটু আগেই ভাগিয়া বলেছিল। চেহারাটা ভীষণই সত্যি। কুচকুচে কালো, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, সমস্ত মুখটি গোঁফে-দাড়িতে ঢাকা, প্রায় চোখ পর্যন্ত ঢাকা, নাকের ছিদ্র পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—আর সে কি সাধারণ দাড়ি, জটিল দাড়ি। ভুবন সোম ভাগিয়ার নির্দেশমত আলের উপর দিয়েই সন্তর্পণে এগুচ্ছিলেন এমন সময় অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটল। ভিখন গোপ কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে খুব ঝুঁকে সেলাম করলে তাঁকে, তারপর সঙ্কুচিতভাবে একটু হাসলে। ভুবন সোম দেখলেন, লোকটি শৌখিন, সামনের দুটি দাঁতের মাঝখানে সোনার ছোট ছোট বিন্দু।

ভিখন যদি আসে মারমুখী হয়ে আসবে, এইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন ভুবন সোম। এই অতিবিনীত বশম্বদ ভিখনের মুখের দিকে চেয়ে একটু কৌতুকবোধ করলেন তিনি। সম্ভবত তার সাহেবী পোশাকের দরুনই এটা ঘটল। ভিখন গোপকে নরম হতে দেখে ভাগিয়া একটু পুলকিত হ'ল যেন। সাহেব যে এখানে এসেছেন এটা যেন তারই

কৃতিত্ব।' নিজেদের ছিকা-ছেলি ভাষায় তারপর সে ভিখন গোপকে বললে, সাহেব কেন এসেছেন। শুনে ভিখন গোপ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল, বললে, ঘাটে একটা নৌকো লাগানো আছে, তার নিজের নৌকো, সাহেব যদি সেটা ব্যবহার করেন সে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

'মাঝি-টাঝি আছে?'

'ভাগিয়া লে যৈতে।'

'ভাগিয়া নৌকো বাইতে পারবে?'

ভাগিয়া ঘাড়টা খুব বেশীরকম কাৎ ক'রে জানালে, খুব পারবে।

সরু আলের উপর পা ফেলে ফেলে চলতে ভুবন সোমের কষ্ট হচ্ছিল। এ দেখে ভিখন গোপ কখনও যা করে না তাই করলে। বললে, আপনি ক্ষেতের উপর দিয়ে ফসল মাড়িয়েই যান, দু-চারটে গাছ মরলে কি আর এমন ক্ষতি হবে!

ভাগিয়া অবাক হ'ল। এ রকমটা সে দেখে নি আগে, ভাবতেও পারে নি।

যব গমের ক্ষেত পার হয়ে আর একটি অড়রক্ষেত, তবে এটি ছোট। পার হতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। অড়রক্ষেত থেকে বেরিয়েই জল দেখা গেল। গঙ্গার ধারা নয়, খানিকটা বানের জল দু পাশের উঁচু বালিয়াড়ির মধ্যে আটকে পড়েছিল বর্ষাকালে, এখনও শুকিয়ে যায় নি। তার ধারে পৌঁছুতেই এক ঝাঁক খঞ্জন উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে একটু দূরে ব'সে ল্যাজ দোলাতে লাগল। তার মধ্যে কতকগুলো হলদে খঞ্জন দেখে অবাক হলেন ভুবন সোম। আগে দেখেন নি। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তাদের দিকে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল।

'উ সব ধোবিন্ ছে।

'ধোবিন্? না, খঞ্জন।

'নেই, ধোবিন্।'

ভুবন সোম বুঝলেন, খঞ্জনকে এরা ধোবিন্ বলে।

'নাও কাঁহা?'

'আবোনি।'

কিছুদূর বালির চড়া ভেঙে আসল গঙ্গার তীরে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন সূর্য উঠে গেছে।

আবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। হাঁসের ডাকও শুনতে পেলেন। দেখতেও পেলেন অনেক দূরে একদল হাঁস উড়ছে।

'ফট্‌ফটিয়া নাও পর সাহেবলোগে আইলোছে—'

'ফট্‌ফটিয়া নাও' মানে মোটর-বোট। মোটর-বোটে ক'রে কে এল আবার?

ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মিনিষ্টারদের কেউ বোধ হয়। এঁরা আবার মহাত্মা গান্ধীকে রাষ্ট্রপিতা বানিয়েছেন !

খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি উড়ন্ত হাঁসগুলোর দিকে। মারতে পারবেন তো সাড়ে বাইশ, মাঝ থেকে পাখীগুলোকে ভড়কে দিয়ে গেলেন।

দেখা গেল, মোটর-বোটটা ওপার ঘেঁষে চ'লে যাচ্ছে।

'সাহেবলোগ অব ইধর নেহি আইতে—'

ভিখন গোপের নৌকোটা একটু দূরে বাঁধা ছিল। তাতে উঠবেন কি না প্রথমটা ইতস্তত করতে লাগলেন ভুবন সোম। এই ছোঁড়াটার ভরসায় ওঠাটা কি উচিত হবে ? ভাগিয়া তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সম্ভবত তাঁর মনের কথাটা টের পেয়ে গেল। বললে, লগি ঠেলে ঠেলে সে ধারে ধারে নিয়ে যাবে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিছুদূর গেলেই হাঁসও পাওয়া যাবে।

দুর্গা ব'লে উঠলেন শেষে। ও বাবা, এ যে দুলছে খুব ! নৌকো ক'রে তিনি পাখী শিকার করেন নি কখনও, পায়ে হেঁটেই করেছেন বরাবর। নৌকোয় দাঁড়িয়ে 'এম' (aim) ঠিক হবে কি না কে জানে ! স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ—কথাটা মনে পড়ল।

তারপর মনে পডল টুনটুনি পাদরিকে।

সেই প্রথমে বলেছিল কথাটা।

—ভাগিয়া লগি ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভুবন সোম অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। টুনটুনি পাদরির কথাই ভাবতে লাগলেন।

প্রভাতের সূর্যকিরণে গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গশীর্ষে সোনা চকমক করছিল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আবার টুনটুনি পাদরির চেহারাটা মনে ফুটে উঠল।

·· সিগার ধরালেন। টুনটুনি পাদরির চেহারা কুৎসিত ছিল। কালো, বেঁটে, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় পাদরির টুপি, পরনে পাদরির আলখাল্লা। লোকটা খুব উপকার করেছিল তাঁর। সে-ই যোগাড়-যন্ত্র ক'রে রেভারেণ্ড ফার্গুসনকে দিয়ে এজেন্টের কাছে চিঠি লিখিয়েছিল একটা। আর তারপর থেকেই তাঁর ডবল প্রমোশন হয়ে গেল। এজেন্টের নেকনজর থাকলে কার সাধ্য আটকায় ? ওরাই সে যুগে দেবতা ছিল, অনুগ্রহ করলে পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করতে পারত।···টুনটুনি পাদরির কাছে সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ তিনি। অথচ দেখা হয়েছিল হঠাৎ, আলাপও যৎসামান্য। প্রথম আলাপ ওয়েটিংরুমে। তারপর একদিন টুনটুনি পাদরি তাঁর বাসায় এসে হাজির। বললেন, কোন একটা গ্রামে একজন রোগীর খবর নিতে গিয়েছিলেন। ট্রেনের এখনও অনেক দেরি আছে দেখে তাঁর খবরটাও নিতে এসেছেন। সেদিন রবিবার, কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল তিনি খান নি কিছু, কাছে-পিঠে কোনও হোটেল আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'কেলনারে

খেতে অনেক খরচ, সস্তা হোটেল পেলে সেইখানেই খেতাম।' ভুবন সোমের তখনও খাওয়া হয় নি, তিনি তাঁকে তাঁর সঙ্গেই খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। প্রথমে রাজী হন নি তিনি, অনেক অনুরোধ করার পর শেষে রাজী হলেন। বললেন, 'আচ্ছা, তা হ'লে এই বারান্দায় একটা কলাপাতায় ক'রে সামান্য কিছু এনে দিন। হিন্দুর বাড়িতে খ্রীষ্টানকে খাওয়ানো এক ল্যাটা তো।' ভুবন সোম বললেন, 'সে কি কথা! আমরা দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি ব'সে খাব। ওসব গোঁড়ামি আমাদের নেই। আমাদের কাছে অতিথি দেবতা।' এতেই কৃতার্থ হয়ে গেলেন টুনটুনি পাদরি। তিনি খুব যে হৈ-হৈ খাতির করেছিলেন তাও নয়, খাওয়াদাওয়া অতি সাধারণ ছিল—সেদিন মাছ পর্যন্ত কেনা হয় নি। খাওয়াদাওয়ার পর টুনটুনি পাদরি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বারান্দার চেয়ারটায়। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কত কথাই মনে পড়ছে!' ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'কি কথা?' টুনটুনি পাদরী বললেন, 'নিজের অতীত জীবনের কথা। আমি এককালে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলাম, বিশ্বাস হয় এখন? আমাদের প্রসাদ পাবার জন্যে, পাদোদক নেবার জন্যে বাড়িতে ভিড় ক'রে লোক আসত।' কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ভুবন সোম। তাঁর ধারণা ছিল, সাধারণত নীচ জাতের লোকেরাই খ্রীষ্টান হয় চাকরির লোভে। ব্রাহ্মণের ছেলে হতে গেল কেন? প্রেমে-ট্রেমে পড়েছিল নাকি? কথাটা জিগ্যেস করেছিলেন তিনি টুনটুনি পাদরিকে। উত্তরে টুনটুনি পাদরি যা বলেছিলেন তা আরও আশ্চর্যজনক। ভাল ক'রে লিখলে একখানা উপন্যাস হয়। গল্পটা আগাগোড়া এখনও মনে আছে তাঁর।

বলেছিলেন, তিনি একবার পাড়ার একটি ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যাচ্ছিলেন। গরুর গাড়ি ক'রে যাচ্ছিলেন তাঁরা। চার-পাঁচটা গরুর গাড়ি সারবেঁধে চলছিল। তখন ঘোর গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। কিছুদূর যাবার পর গরমের জন্যই হোক বা যেজন্যই হোক, গা গুলিয়ে উঠল তাঁর, তিনি বমি ক'রে ফেললেন। কিছুদূর যাবার পর আবার বমি হ'ল এবং তারপরই পেট ভাঙল। জলের মত পায়খানা হ'ল বারকয়েক! কারও বুঝতে বাকি রইল না যে, কলেরা হয়েছে। কলেরা-রোগীকে নিয়ে বিয়ে-বাড়িতে যাওয়া চলে না। তাই তাঁকে তাঁরা একটা গাছতলায় নামিয়ে রেখে চ'লে গেল। দু-একজন থাকলে পারত কিন্তু কেউ রইল না। একজনও যদি থাকত, তা হ'লে তাঁর জীবনের কাহিনী অন্যরকম হ'ত আজ। কিন্তু কেউ রইল না। সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে সেই জনহীন মাঠে একা গাছতলায় প'ড়ে তিনি রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু জল দেবে কে! খানিকক্ষণ পরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। কতক্ষণ এভাবে প'ড়েছিলেন তা তিনি জানেন না। খানিকক্ষণ পরে অনুভব করলেন, কে যেন তাঁকে কাঁধে ক'রে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সর্বাঙ্গ বমি আর বিষ্ঠায় মাখামাখি। কে তাঁকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে! যমদূত না কি! খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন যমদূত নয়, দেবদূত। দীর্ঘকান্তি বলিষ্ঠ ঋজুদেহ সাহেব একজন,

ক্রিশ্চান মিশনারি। তিনি তাঁকে একটা হাসপাতালে নিয়ে এলেন, তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করলেন, রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন, এককথায় তাঁর পুনর্জন্ম দিলেন। ভাল হয়ে আর তিনি বাড়ি ফিরে যান নি। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন। গত ত্রিশ বৎসর ধ'রে এই কাজ করছেন তিনি। পায়ে হেঁটে বহু গ্রামে গ্রামে পর্যটন ক'রে বহু নরনারীকে খ্রীষ্টান্ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। সফলও হয়েছেন।

নিজের কাহিনী শেষ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সেছিলেন টুনটুনি পাদরি। আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ ভুবন সোমের দিকে ফিরে তিনি যা বললেন তা এত অপ্রত্যাশিত যে ভুবন সোমের মনের রঙই বদলে গেল। কারণ ভুবন সোম মুখে যদিও ভদ্রতার চূড়ান্ত করেছিলেন, কিন্তু মনে মনে নাক কুঁচকে বসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দ যাই বলুন, ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টানের উপর শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। কিন্তু টুনটুনি পাদরি এবার যা বললেন তাতে চমকে উঠতে হ'ল তাঁকে।

বললেন, 'আচ্ছা মশাই, এখন যদি আমি শুদ্ধি ক'রে আবার হিন্দু হই, আপনারা আমাকে আবার ফিরে নেবেন?'

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'ও-কথা বলছেন কেন?'

টুনটুনি পাদরি আবার চুপ ক'রে গেলেন, দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে লাগলেন। তারপরে বললেন, 'বলছি, কারণ এখন আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি! যারা আমাকে গাছতলায় ফেলে পালিয়েছিল, তারা ভীরু, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু নীচ নয়। তাদের এই অধঃপতনের জন্যে তারা দায়ীও নয়, দায়ী সুদীর্ঘ পরাধীনতা। ইংরেজরা আমাদের শুধু কেরানী করতে চেয়েছিল, সত্যিকার মানুষ করতে চায় নি। বরং যাতে আমরা অমানুষ হয়ে চিরকাল ওদের গোলামি করতে থাকি সেই চেষ্টাই করেছিল ওরা। নিজে যখন খ্রীষ্টান হলাম, ওদের সঙ্গে ভাল ক'রে মেশবার সুযোগ পেলাম তখন বুঝলাম, আমাদের ওরা কি চোখে দেখে! সাম্য ওদের মুখের বুলি, আমাদের ওরা উপকার করে খ্রীষ্টধর্ম আর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রচার করবে ব'লে, কিন্তু মনে মনে ওরা আমাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। ওদের নীচতা দেখে অবাক হয়ে গেছি। ম'রে গেলেও ওদের সঙ্গে এক কবরখানায় স্থান হয় না আমাদের। আপনি যত কাজের লোকই হোন, যত বড় বিদ্বানই হোন, সাহেবদের নীচে আপনার স্থান। আমি ওদের জন্যে যত কাজ করেছি তাতে আমি এতদিন বিশপ হয়ে যেতাম, হই নি কারণ আমার চামড়ার রঙ কালো। দু-একটা ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এ দেশের লোক অধঃপতিত, তার কারণ এরা বহুকাল ধ'রে পরাধীন, বহুকাল ধ'রে অশিক্ষিত। কিন্তু এরা সভ্যতা-অভিমানী হয়েও আমাদের সম্পর্কে কতটা যে নীচ তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। আমি ভাবি, খ্রীষ্টধর্ম

প্রচার করবার জন্যে যে পরিশ্রমটা করেছি, এ দেশের অজ্ঞতা দূর করবার জন্যে তার সিকির সিকিও যদি করতাম তা হ'লে খুব বড় কাজ হ'ত। এখন এ সব করবার সুবিধা নেই অবশ্য। এখন স্বদেশহিতৈষী ভাল লোককে ওরা জেলে পুরে রাখে, দ্বীপান্তরে পাঠায়, ফাঁসি দেয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবে, হবেই একদিন, তাই ভাবছি এইবার যদি—'

এই পর্যন্ত ব'লে থেমে গেলেন টুনটুনি পাদরি। ভুবন সোম দেখলেন তাঁর চোখের কোণে জল টলমল করছে। সাহেবদের হয়ে একটা উত্তর দিতে পারতেন তিনি, কিন্তু চোখের কোণে জল দেখে আর কিছু বললেন না। টুনটুনি পাদরি চ'লে যাওয়ার মাস-খানেক পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রমোশন হয়ে গেল তাঁর। খবর নিয়ে জানলেন স্বয়ং এজেন্টের কন্‌ফিডেন্‌শাল অর্ডারে এটা হয়েছে। এজেন্ট হঠাৎ তাঁর প্রতি সদয় হতে গেলেন কেন, বুঝতে পারেন নি তিনি। মাসকয়েক পরে একদিন একটি সাঁওতাল ক্রিশ্চান এক টুকরি আম আর একটি চিঠি নিয়ে এল। চিঠি লিখেছেন রেভারেণ্ড ফার্গুসন। লিখেছেন যে পাদরি এন্‌টনিও ঘোষালের প্রতি আপনি যে সদয় ব্যবহার করেছিলেন তার জন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। পাদরি এন্‌টনিও ঘোষালের ইচ্ছা ছিল আপনাকে এক টুকরি আম পাঠাবেন। তিনি বেঁচে থাকলে নিজেই যেতেন, কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর সে বাসনা অপূর্ণ রয়ে গেল। তাঁর এ ইচ্ছার কথা আমি জানতাম, তাই জন কচ্ছপের মারফত আমগুলি আপনাকে পাঠাচ্ছি। গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। আমগুলি অবশ্য খুব ভাল ছিল না, টোকো আঁটিসর্বস্ব পাহাড়ে আম। তবু কিন্তু টুনটুনি পাদরির ব্যবহারে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন ভুবন সোম। পরে তিনি খবর পান যে, রেভারেণ্ড ফার্গুসনের সঙ্গে তখনকার এজেন্টের খুব দহরম-মহরম ছিল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, হঠাৎ তাঁর প্রমোশন হয়েছিল কেন। টুনটুনি পাদরিই কলকাঠিটি নেড়ে গিয়েছিলেন। টুনটুনি পাদরির কথা কিন্তু আর বেশীক্ষণ ভাবতে পারলেন না তিনি।

ভাগিয়া আচমকা চিৎকার করে উঠল।

'চিড়িয়া ছে বাবু, বড়কা চিড়িয়া—'

এই বলে সে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল জলে। ভুবন সোম দেখলেন একটা মরা রাজহাঁস ভেসে যাচ্ছে। ভাগিয়া সেটাকে ধরবে বলে সাঁতরাতে লাগল। ভুবন সোম প্রথমে একটু অবাক হলেন, তারপর বুঝতে পারলেন। যাবা মোটর-বোটে চড়ে শিকার করতে এসেছিল তাদের গুলিতে রাজহাঁসটা মরেছে, কিন্তু জলে পড়েছে, ওরা হয় দেখতে পায় নি কিংবা ধরতে পারে নি। ভাগিয়া প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছিল, ভুবন সোমও উত্তেজনাভরে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এদিকে আর এক কাণ্ড হচ্ছিল সেটা প্রথমে খেয়াল করেননি তিনি। নৌকোটা স্রোতে পড়েছিল আর দ্রুতবেগে স'রে যাচ্ছিল ভাগিয়ার কাছ থেকে। কি করা যায় এখন! ভুবন সোম চেষ্টা করলেন লগিটার সাহায্যে

নিজেই যদি নৌকোটাকে তীরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। পারলেন না। টাল সামলাতে পারলেন না, আর একটু হ'লে জলে পড়ে যেতেন।

'ওরে ভাগিয়া, নাও ভাস্ যাতা হ্যায়।'

ভাগিয়া শুনতে পেলে কি না বুঝতে পারলেন না। এরা অনেক সময় শুনেও কালা সেজে থাকে। এদিকে মোটেই ফিরে চাইছে না উন্মুখ হয়ে, সাঁতরে চলেছে হাঁসটার দিকে। নৌকা প্রায় মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, হাওয়ার বেগটাও বাড়ছে ক্রমশ।

'ওরে ভাগিয়া—এই ভাগিয়া—'

ফিরেও চাইলে না ভাগিয়া। সোজা সাঁতরে চলেছে। নৌকোটাও ক্রমশঃ মাঝগঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। এ কি প্যাচে পড়লেন নৌকো চ'ড়ে! বেঘোরে প্রাণটা যাবে নাকি! হঠাৎ নজরে পড়ল, আরে, সর্বনাশ! নৌকোর তলা দিয়ে জল উঠছে যে! জল ছেঁচবার জন্যে একটা পাত্রও রয়েছে দেখতে পেলেন। ভুবন সোম আর কালবিলম্ব না ক'রে জল ছেঁচতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। রবিন্সন ক্রুশোর গল্পটা মনে প'ড়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখলেন, ভাগিয়াটা করছে কি! না, ফেলবার কোন লক্ষণ নেই। নৌকো তরতর ক'রে এগিয়ে চলল।

'ওরে ভাগিয়া—'

ডাক শুনতে পেয়েছে কি না এবারও বোঝা গেল না। হাঁসের দিকেই সাঁতরে চলেছে। যাক, হাঁসটাকে ধরেছে এবার। ফিরছে, হাঁসসুদ্ধ হাতটা তুলে তাঁকে দেখাল একবার। নৌকা কিন্তু দ্রুতবেগে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভগবানই জানেন। জলছেঁচা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তাই করতে লাগলেন ভুবন সোম। দামী গরম প্যান্টটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। নগদ পাঁচটি টাকা নেবে সুলেমান এটি পেট্রল দিয়ে কেচে পরিষ্কার ক'রে দিতে। ব্যাটা বার বার সেলাম করে, কিন্তু একটি পয়সা কমাতে চায় না।

হঠাৎ ভাগিয়া সাঁতার কাটতে কাটতে চিৎকার ক'রে উঠল—'নাও ভাসলো যাইছে হো, দৌগো দৌগো,' আর ক্রমাগত চেঁচাতেই লাগল। মনে হ'ল কাকে যেন ডাকছে। এ তেপান্তর চরে কাছাকাছি কেউ আছে কি? দেখা গেল আছে। তেপান্তর চরেই তিন-চারজন ষণ্ডা গোছের লোক আবির্ভূত হ'ল। ছুটতে ছুটতে আসছে। সম্ভবত ওই অড়রক্ষেতের ভিতর কাজ করছিল ওরা। তাদের দেখে ভাগিয়া আরও চেঁচাতে লাগল। চারটে লোকই ঝপাং ঝপাং ক'রে লাফিয়ে পড়ল গঙ্গায়। নৌকো তখন অনেক দূর ভেসে গেছে। প্রায় মিনিট পনেরো সাঁতরে তারা নৌকোটাকে ধরলে এসে। হাঁসসুদ্ধ ভাগিয়াও এসে চড়ল।

ভুবন সোম দেখলেন, বেশ বড় 'পিন্‌টেল' একটা। তিনি চটেছিলেন খুব। ভাগিয়াকে জিগ্যেস করলেন, 'তুই আমার ডাক শুনতে পাস নি?'

ভাগিয়া ঘাড় কাৎ ক'রে জানালে, পেয়েছিল।

'তবে ফিরে এলি না কেন ?'

এ শুনে ভাগিয়া একটু বিস্মিত হ'ল। বললে, হাঁসটাকে ধরবে ব'লে সে জলে লাফিয়ে পড়েছিল, সেটাকে না নিয়ে ফিরবে কি ক'রে !

তারপর বললে, 'তোরে বাস্তেই তো !' মুখের ভাবটা এমন করলে যেন, যার জন্তে চুরি করি সেই বলে চোর !

ভুবন সোম বললেন, 'ও-হাঁস আমি চাই না। আমি নিজে শিকার করব। ও-হাঁস তুই নিগে যা।'

ভাগিয়ার মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল। আশা করেছিল, বাবু বাহবা দেবে।

একজন বললে, 'চল্ ঝরকাইকে খাইবো।'

ভাগিয়া হাঁসটা নৌকোর গলুইয়ের উপর রেখে দিলে।

'আরে খোক্না লেকে ভাগতো রে, নীচে রাখি দে।'

ভাগিয়া বিমর্ষ মুখে লগি ঠেলতে লাগল। হাঁসটার প্রতি আর দৃক্‌পাতও করলে না। ভুবন সোমের ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছিল বেচারা।

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'খোক্না কি ?'

তারা বললে যে, খোক্না এক রকম বাজের মত বড় পাখী, মরা পাখী দেখলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। এইজন্তেই শিকারীদের পিছু পিছু ঘোরে তারা অনেক সময়। একটা লোক হাঁসটাকে তুলে নৌকোর খোলের ভিতর রেখে দিলে। নৌকোতে দাঁড় ছিল। দাঁড় বাইতে লাগল ওরা।

'কিধর যাইবো বাবু ?'

ভুবন সোম বললেন, নৌকোয় আর যাবেন না তিনি। একবার চ'ড়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

একটু পরে বালির চরায় ওঁকে নামিয়ে দিয়ে নৌকো বাইতে বাইতে চ'লে গেল ওরা।

ভুবন সোম হাঁটতে লাগলেন।

॥ পাঁচ ॥

ভুবন সোম কতক্ষণ যে হেঁটেছিলেন তা তাঁর খেয়াল ছিল না। তিনদিকে ধু-ধু করছে বালির চর, আর একদিকে গঙ্গা। বালির চর কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও বা সমতল। কোথাও কোথাও এত উঁচু যে মনে হয়, ছোটখাটো পাহাড় এক-একটা, ওপারে কি আছে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ হেঁটে ভুবন সোম বেশ চন্‌মনে হয়ে

উঠলেন, তাঁর যৌবন ফিরে এল যেন, সোৎসাহে তিনি বালির উঁচু টিলাগুলোর উপরও উঠতে লাগলেন। উঠে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন পাখী কোথাও আছে কি না! যতদূর দেখা গেল, পাখীর চিহ্ন নেই, ডাকও শুনতে পেলেন না। ওই ফট্‌ফটিয়া নৌকোই সর্বনাশ ক'রে গেছে। এক-একটা টিলায় ওঠেন, আবার টিলা থেকে নেবে হাঁটতে থাকেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটল। চরে শুধু বালি নেই, মাঝে মাঝে গাছও আছে, বেশীর ভাগই ঝাউগাছ। ঝাউগাছে বাদামী রঙের অচেনা ছোট ছোট পাখী, চড়ুই পাখীর মত, কিন্তু ল্যাজটা খুব লম্বা—যেন সামলাতে পারছে না। ডাকটা খুব মিষ্টি। আর ক্রমাগত ডাকছে, এক দণ্ড সুস্থির হয়ে বসছে না কোথাও। এক ঝাউগাছ থেকে আর এক ঝাউগাছে উড়ে উড়ে বসছে, বসেই আবার উড়ছে। এ পাখী চেনেন না ভুবন সোম, প্রথমে ভেবেছিলেন 'বগেরি' বুঝি ; কিন্তু দেখলেন তা নয়, এ অন্য পাখী। সেই বাইনাকুলারওলা ছোকরা থাকলে ল্যাটিন নাম বলতে পারত সম্ভবত। হাঁটতে হাঁটতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করলেন ভুবন সোম। এই জনমানবহীন বালির চরেও কাক শালিক নীলকণ্ঠ আর ফিঙে প্রচুর রয়েছে। একটু দূরে গোদাচিলও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা। দু-তিন রকম মাছরাঙা পাখীও চোখে পড়ল। একটা ছোট্ট মাছরাঙা অদ্ভুত, ঠিক যেন রঙিন প্রজাপতির মত। বাটানও দেখতে পেলেন কয়েক জোড়া। এদের চেনেন তিনি। মনে পড়ল একবার বাটান মেরেছিলেন, কিন্তু কেউ খেতে পারলে না, আঁশটে গন্ধ। পাখীগুলি দেখতে কিন্তু বেশ। খুর খুর ক'রে হাঁটে, কেউ আসছে দেখলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখে, তারপর কোঁক্ ক'রে একটা শব্দ করে উড়ে যায়। আবার আর একটু দূরে গিয়ে বসে। ভুবন সোমের হঠাৎ মনে হ'ল, কিন্তু আসল পাখী কই, হাঁস তো একটিও দেখা যাচ্ছে না! শুধুহাতে ফিরতে হবে নাকি শেষটা! কিন্তু না, পাখী নিয়ে ফিরতেই হবে তাঁকে, তা না হলে অনিলের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আর একটু দূরে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আজ যদি না পাওয়া যায় এইখানেই থেকে যাবেন তিনি, কোথাও কাছে-পিঠে গ্রাম নিশ্চয়ই আছে। অনিল তো বলেছিল, আছে। হাতঘড়িটা দেখলেন, প্রায় আটটা বাজে। এত বেলায় পাখী পাওয়া শক্ত। ওই ব্যাটারাই আগে থাকতে এসে সব উড়িয়ে দিয়ে গেছে। তবে কতক্ষণ আর উড়বে ওরা, বসতে হবেই কোথাও না কোথাও। ঘাড় হেঁট করে দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে হাঁটতে লাগলেন তিনি। বালিগুলো চিকমিক করছে রোদ পড়ে।...

কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, জলের ধারে একটা ছেঁড়া খাটিয়া আর দু-তিনটে ভাঙা কলসী পড়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন কয়লাও রয়েছে। কেউ মড়া পুড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ বাবার মৃত্যুটা মনে পড়ল। তারপর মায়ের, তারপর স্ত্রীর, দুটো ভায়ের; বিহারিলালের, জগন্নাথের। সকলকে এই গঙ্গার জলে নিজে হাতে বিসর্জন দিয়ে

গেছেন তিনি। প্রত্যেকের শেষকৃত্য নিখুঁতভাবে করেছেন। তাঁর নিজের সময়ও তো আসন্ন। তাঁর মৃত্যু হ'লে কে তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে আসবে? বাড়িতে তো কেউ নেই। পাড়ার সংকার-সমিতির ছোঁড়াগুলোই আনবে হয়তো। পেটরোগা নিমাই, রগচটা শ্রীদাম, মোটা ভোম্বল, গাঁজাখোর হরেন, মাতাল ফটিক—এদের সকলের মুখগুলো ভেসে উঠল মনে। এদের কাঁধে চ'ড়েই শেষগতি হবে তাঁর! বিলেত-ফেরত বিলু আর সন্ন্যাসী নিপু আসবে কি? 'আসবে না, আসবে না, আমার দিকে কেউ কখনও তাকায় নি, তাকাবে না। বেটার লাক্‌ নেক্‌স্‌ট্‌ টাইম, মানে পরজন্মে।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বললেন ভুবন সোম। তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন।

একটা কথা মনে হ'ল হঠাৎ। বিরিঞ্চিটা মরবার দিনকতক আগে রসগোল্লা খেতে চেয়েছিল। রসগোল্লার বদলে তিনি ধমক দিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ মনে হ'ল, অন্যায় করেছিলেন। দিলে কি আর এমন হ'ত—শেষ পর্যন্ত ম'রেই তো গেল। চন্দর ডাক্তার দিতে বলেছিল, তিনিই দেন নি।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে লাগলেন। গতিবেগ মন্দ হয়ে এল, কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ হাঁটলেন। চমকে উঠলেন হঠাৎ পাখীর ডাক শুনে। চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, এক ঝাঁক টিয়া ডাকতে ডাকতে এক পাক খেয়ে উড়ে গেল আবার—যেন রসিকতা ক'রে গেল! ভুবন সোমের মনে হ'ল, ওরা বোধ হয় গঙ্গার হাওয়া খেতে এসেছিল। গঙ্গার ধারের পাখী ওরা নয়।

চলতে চলতে একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। এ ভাবে কতক্ষণ হাঁটবেন? কিন্তু গত্যন্তরই বা কি আছে, হাঁটতেই হবে—পাখী না নিয়ে আজ ফেরা চলবে না। পাখী-গুলো ভড়কেছে খুবই, কিন্তু কোথাও না কোথাও বসবে তো—সেইখানেই যাবেন তিনি। যেতেই হবে।

ফের হাঁটতে শুরু করলেন, পা দুটো ব্যথা করছিল, তবু থামলেন না। সামনে আবার একটা বালির টিলা, ওপারে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। কষ্ট ক'রে উঠলেন টিলাটার উপর। উঠে দেখতে পেলেন, একটি লোক একটু দূরে ছিপ ফেলে ব'সে আছে।

টিলা থেকে নেবে গেলেন তার কাছে। দেখলেন, লোকটা দুই হাঁটুর মাঝখানে মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে ব'সে আছে। এ রকম লম্বা জঙ্ঘা তিনি আর দেখেন নি কখনও। ঠিক যেন মনে হচ্ছে, হাড়কাটে মুণ্ডু গলিয়ে দিয়েছে।

ভাঙা হিন্দিতে প্রশ্ন করলেন, 'ইধার চিড়িয়া কাঁহা বৈঠতা হ্যায় মালুম হ্যায় কি?' শুনতেই পেল না কি! একটু চেঁচিয়ে বললেন। যখন হাড়কাট থেকে মুণ্ডুটি বের ক'রে তাঁর দিকে চাইলে তখন চাউনি দেখে মনে হ'ল, লোকটি ভাল মানুষ। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। বিস্মিত হলেন যখন সে পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে।

'আর একটু এগিয়ে যান, কিছুদূর গিয়ে ছোট একটা গ্রাম পাবেন, গ্রামটা পেরিয়ে

দেখবেন গঙ্গা একটু বেঁকে গেছে, সেই বাঁকের মুখে অনেকগুলো পাখী আছে, একটু আগেই দেখে এসেছি।'

'আপনি বাঙালী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের আগেকার বাস ছিল হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রামে। আমার ঠাকুরদা সেখান থেকে বাস উঠিয়ে চ'লে আসেন বীরভূম জেলায়। এখন সেই-খানেই বাড়ি। দুবরাজপুরের কাছেই।'

ভুবন সোম বুঝলেন, লোকটি বাক্যবাগীশ।

'এখানে কি করেন ?'

'এখান থেকে ক্রোশ দুই দূরে একটা মাইনর স্কুল আছে সেখানেই মাষ্টারি করি। চাকরি ভাল নয়, কিন্তু জল-হাওয়া ভাল। সেই লোভেই থাকা। ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী কিনা—'

'আমি সোজা চ'লে যাব ?'

'হ্যাঁ, সোজা চ'লে যান। একটু গেলেই গ্রামটা দেখতে পাবেন। ওরা লোকও ভালো।'

ভুবন সোম আর দাঁড়ালেন না, হাঁটতে শুরু ক'রে দিলেন। পাখী আছে শুনে তাঁর দেহমনে আবার উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। কিছুদূর হেঁটে সত্যিই গ্রাম দেখতে পেলেন একটা। গ্রাম মানে, দু-চারটে ছোট কুঁড়েঘর, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে চোখে পড়ল, একটা মেয়ে গোবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর একটু গিয়েই কিন্তু থেমে গেলেন। ও বাবা, এখানেই যে মোষ রয়েছে কয়েকটা! একটু দাঁড়িয়ে মোষগুলোর সঙ্গে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা ক'রে আবার চলতে লাগলেন।

তাঁর ইচ্ছে ছিল, গ্রামে গিয়ে একটু জিরিয়ে তারপর পাখীর খোঁজে বেরুবেন। একটু ক্লান্ত বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে সেদিন দুঃখ লেখা ছিল। গ্রামের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় কে একজন চিৎকার ক'রে উঠল, 'ভাগিয়ে বাবু, ভাগিয়ে—জল্‌দি ভাগিয়ে।' ভুবন সোম ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটা মোষ তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে। সেই বিহনিয়াটা! কি সর্বনাশ! প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন, কিন্তু মোষের সঙ্গে ছুটে পারবেন কেন? আর একটু হ'লেই মোষের গুঁতোয় প্রাণটা বেরিয়ে যেত তাঁর। কিন্তু যে মেয়েটা গোবর কুড়োচ্ছিল সে চিৎকার ক'রে উঠল, 'এই সুবোধ, খাড়া র।' মন্ত্রের মত কাজ হ'ল, মোষটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভুবন সোম একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। দেখলেন, মেয়েটি এগিয়ে আসছে। এসে মোষটার কান ম'লে দিয়ে বললে, 'ফের বদমাশি! এই একটু আগে অত মার খেয়েছিস তবু লজ্জা নেই!'

মোষটা ঘাড় নীচু ক'রে বকুনিটি শুনলে, তারপর ঘাড় তুলে ভুবন সোমের দিকে আবার চাইলে। তার ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নি। ভুবন সোম এতক্ষণ নজর করেন

নি, এবার দেখলেন মোষের মাথায় শিঙের ঠিক নীচেই একটা ন্যাকড়া জড়ানো রয়েছে। ভাবলেন, আর কাউকে গুঁতিয়ে খুন ক'রে এসেছে বোধ হয়, তারই কাপড়ের টুকরো শিঙে লেগে আছে।

তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন মেয়েটার মুখে বাংলা কথা শুনে। ওই মাষ্টারের মেয়ে নাকি! এইভাবে মাঠে মাঠে গোবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে!

মোষটা আবার তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মেয়েটা আবার ধমক দিলে, 'এই সুবোধ, ফের।'

মোষটা আবার দাঁড়িয়ে গেল, ল্যাজটা ঘন ঘন নাড়তে লাগল খালি।

'চল্, তোকে বেঁধে রেখে আসি, মহা পাজি হয়েছিস তুই—'

মেয়েটা সড়াৎ ক'রে চ'ড়ে পড়ল মোষটার পিঠে। কোন সুদক্ষ ঘোড়সোয়ার অত তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারত না।

ভুবন সোম অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। ওই দুর্দান্ত যমদূতের নাম সুবোধ! আশ্চর্য মেয়ে তো! মহিষমর্দিনীর কথা চণ্ডীতে পড়েছিলেন, আজ স্বচক্ষে দেখলেন।

ও বাবা, এ কি কাণ্ড! দেখলেন, মেয়েটা মোষের পিঠে শুয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম! মোষটা হেলতে দুলতে তাকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে চ'লে গেল।

অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন তিনি। দেখলেন, একটু দূরে একটা উঁচুমত জায়গা রয়েছে। তারই উপর গিয়ে বসলেন। মনে হ'ল, কি কুক্ষণেই বেরিয়েছিলেন আজ! ডিম জিনিষটা সত্যিই অপয়া, অত্যন্ত অপয়া। আর একবার ডিম সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড হয়েছিল রাজমহলে। আগে জানলে অনিলকে বারণ করতেন তিনি। আজকালকার ছোকরারা এ সব জানেও না, মানেও না। এখনও পেটে ওমলেট্ গজগজ করছে। ওটি হজম না হওয়া পর্যন্ত আজ আর নিস্তার নেই।

গঙ্গার দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন তিনি। একটা মাছরাঙা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বহমান স্রোতের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শান্তি পেলেন একটু। ক্লান্তিও ঘুচল খানিকটা।

'খাটিয়া পর বৈঠি হুজুর—'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি প্রৌঢ় তাঁকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করছেন। মুখটা অনেকটা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত—অন্তত দাড়িটা সেইরকম। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গলায় একটা ময়লা পৈতে ঝুলছে। মাঠের উপর কখন সে যে ছোট একটি দড়ির খাটিয়া পেতে তার উপর রঙিন চাদর বিছিয়ে দিয়েছে তা তিনি টের পান নি।

আবার সে হাতজোড় ক'রে ডাকলে; 'খাটিয়া পর বৈঠি, রোঁয়া।'

'রোঁয়া' মানে 'আপনি'। লোকটির মুখের ভাব ভদ্র ব'লে মনে হ'ল, উঁচু জায়গাটা

থেকে নেমে এলেন ভুবন সোম। লোকটি ঝুঁকে নমস্কার করল। ভুবন সোম প্রতি-নমস্কার ক'রে জিগ্যেস করলেন, 'কি নাম তোমার ?'

'চতুর্ভুজ গোপ।'

গয়লা অথচ গলায় পৈতে ! সবাই পৈতে নিচ্ছে আজকাল, বামুনের ছেলেরা তাই বোধ হয় পৈতে ফেলে দিচ্ছে। কতরকমই যে দেখতে হবে।

খাটিয়ায় বসলেন।

তারপর বললেন, বাংলাতেই বললেন, 'শিকার করতে এসেছি। এখানে হাঁস বসে শুনেছি—'

'চিড়িয়া তো বহুত বা —'

'কাঁহা ?'

'নওলকিশোর কা ক্ষেত বরাবর। সিধা পুরব—'

হাত তুলে সে দেখিয়ে দিলে কোথায় পাখী আছে।

ভুবন সোম উঠে পড়লেন খাটিয়া থেকে। অনেকক্ষণ দেরি হয়ে গেছে। ভাবলেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না। সন্ধান যখন পাওয়াই গেল, তখন এগিয়ে দেখাই যাক। সমস্ত ক্লান্তি যেন অপনোদিত হয়ে গেল এ সংবাদে। চতুর্ভুজ গোপ বালিয়া জেলার ভাষায় তাঁকে বললে যে, খাটিয়ার উপর আরাম ক'রে নিয়ে তারপর গেলেও চলবে। পাখীরা সমস্ত দিনই ওখানে থাকে। ভুবন সোম কিন্তু এ অনুরোধ রাখলেন না, একটি সিগার ধরিয়ে বন্দুকটি কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়লেন।

গ্রামের ভিতর দিয়েই সরু পথ। সেইটে ধ'রেই চললেন। দেখতে পেলেন বিহনিয়াকে একটা শক্ত খুঁটোয় লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বিহনিয়া ব'সেছিল, তাঁকে দেখে রোষ-কষায়িতলোচনে উঠে দাঁড়াল আবার। দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তিনি। গ্রামটা পার হয়ে আবার বালির চর। বেশ ঢালু চর। নামতে কষ্ট হ'ল না। নেমে একটু দূরে দেখতে পেলেন সবুজ ক্ষেত। ওইটেই বোধ হয় নওলকিশোরের ক্ষেত। ওরই কাছাকাছি হাঁস আছে বলেছে চতুর্ভুজ গোপ। সোৎসাহে এগিয়ে চললেন। ক্ষেতের কাছাকাছি এসে দেখলেন, ক্ষেতের মাঝখানে ব'সে কয়েকজন ঘাস কাটছে, আর কয়েকজন কি যেন ওপড়াচ্ছে।

'ইধার চিড়িয়া হ্যায় ?'

'হাঁ বাবু। আউর থোড়া আগে বঢ়িয়ে।'

একটু কৌতূহল হ'ল ভুবন সোমের। কি ওপড়াচ্ছে ওরা ?

জিগ্যেস ক'রে জানলেন, ছোলার গাছ। ওপড়াচ্ছে কেন ? বললে বড্ড বেশী ঘন হয়ে গেছে তাই। যেগুলো তুলে ফেলেছে সেগুলোও নষ্ট হবে না। ছোলার শাকও বিক্রি হয়, মানুষেও খায়, গরু-মোষেও খায়। গাছসুদ্ধ কাঁচা ছোলা পুড়িয়ে 'ওড়া' হয়। খুব সুখাদ্য।

'সিধা যাজে ?'

'হাঁ বাবু, মগর বিড়িঠো ফেক্ দিজিয়ে। মহক্ সে চিড়িয়া ভাগ যায় গা।'

ভুবন সোম সবে সিগারটি ধরিয়েছিলেন। প্রায় গোটাই ছিল, তবু ফেলে দিলেন সেটা।

ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সরু পথ, সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে নদীর বাঁকটা দেখতে পেলেন। হাঁসের ডাকও শোনা গেল। চখার ডাক। আর একটু এগিয়েই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা হ'ল তাঁর। সত্যিই এক ঝাঁক হাঁস ব'সে আছে। চখাও রয়েছে। ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন ভুবন সোম। রেঞ্জের মধ্যে আনা চাই। হাঁসের পালকগুলো যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে দেখা যাবে ততক্ষণ 'ফায়ার' করা ঠিক নয়। ডবল ব্যারেল বন্দুক তাঁর। দুটো ব্যারেলেই টোটা পুরে ফেললেন। তারপর একটু ঝুঁকে বন্দুকটা পিছন দিকে লুকিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। মনে হতে লাগল যেন একটা বিরাট ৯ (লি) হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর এইভাবে গিয়ে এক জায়গায় গুঁড়ি মেরে বসলেন তিনি। তারপর দড়াম্ দড়াম্ ক'রে দুবার ফায়ার করলেন। হাঁসগুলো কলরব ক'রে উড়ল। ভুবন সোম দাঁড়িয়ে সোৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। একটাও পড়ে নি। অত্যন্ত হতাশ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকণ্ঠে কে যেন হেসে উঠল পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, সেই মেয়েটা—যে মোষের পিঠে চড়েছিল। মুখে কাপড় দিয়ে খিল খিল ক'রে হাসছে।

আচ্ছা অসভ্য তো! সবাই অসভ্য আজকাল। মনে পড়ল, একবার কলার খোলায় তাঁর পা পিছলে গিয়েছিল, তাই দেখে গবুটা হেসে উঠেছিল হি-হি ক'রে। তার গালে ঠাস্ ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, গবু নিজের ভাগ্নে ব'লেই মারা সম্ভব হয়েছিল। একে চড় মারা যাবে না। তাই তিনি হাসিটা যেন লক্ষ্য করেন নি এমনি ভাব দেখিয়ে উড়ন্ত হাঁসগুলোর দিকেই চেয়ে রইলেন। আর একটু এগিয়ে গেলেন। ভাবলেন, এইখানেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে ব'সে থাকবেন খানিকক্ষণ। পাখীগুলো বসলে—বসবে নিশ্চয়ই—আবার চেষ্টা করবেন। আজ একটা পাখী অন্তত নিয়ে যেতেই হবে। তা না হ'লে মান থাকবে না।

'শুনুন।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সেই মেয়েটা তাঁর পিছু নিয়েছে।

'কি—'

মেয়েটা আর একটু এগিয়ে এল।

'আপনি নিরীহ পাখীদের উপর গুলি চালাচ্ছেন কেন? কি দোষ করেছে বেচারারা—'

সাংঘাতিক ডেঁপো মেয়ে তো! মুচকি মুচকি হাসছে আবার!

'তুমি মাংস খাও না বুঝি?'

'না।'

'তরিতরকারি খাও তো?'

'হ্যাঁ, তা খাই বইকি।'

'ওরাই বা কি দোষ করেছে! ওদের কেটে খাও কেন? ওদেরও প্রাণ আছে, কাটলে ওদেরও লাগে।'

'সত্যি? জানতাম না তো।'

মেয়েটি বাঁ হাতের তর্জনীতে কাপড়ের আঁচলটা জড়াতে লাগল।

'কিন্তু তরিতরকারি আর পাখী কি এক? কাটবার সময় ওদের রক্তও বেরোয় না, ওরা যন্ত্রণায় চিৎকারও করে না। কিন্তু পাখীদের মারলে তাদের রক্ত বেরোয়, তারা চিৎকার করে।'

নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁটটায় একটু চাপ দিয়ে চোখ-মুখের এমন একটা ভঙ্গী করল সে, যেন অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছে সে এবার।

'পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছে।' মনে মনে ভাবলেন ভুবন সোম।

মেয়েটিই আবার প্রশ্ন করল।

'আপনি পাখীর মাংস খুব ভালবাসেন বুঝি?'

'এককালে বাসতুম, এখন আর খাই না।'

'তা হ'লে ওদের মারতে এসেছেন কেন?'

এর কোনও সদুত্তর সহসা মাথায় এল না ভুবন সোমের। কিছু না ব'লে আবার এগোতে লাগলেন। কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা, পিছু পিছু চলতে লাগল।

'পাখী যখন খান না, তবে কেন বেচারীদের মারছেন? ছেড়ে দিন।'

'আজ একটি পাখী অন্তত মারতেই হবে, তা না হ'লে বাজিতে হেরে যাব। মান থাকবে না।'

'ও, বাজি রেখেছেন বুঝি!'

এইবার যেন একটা সঙ্গত কারণ পেল সে। কিছুক্ষণ চিন্তিতমুখে চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, 'কিন্তু আপনি যেভাবে শিকার করছেন তাতে একটি পাখীও মারতে পারবেন না, বাজিতে হেরে যাবেন।'

এ আশঙ্কা ভুবন সোমের নিজেরও হচ্ছিল।

'কি করা যায় বল তো?'

'আমি যা যা বলব তা করবেন?'

'বল কি করতে হবে!'

'আমার সঙ্গে আসুন তা হ'লে।'

যাবেন কি না প্রথমে ঠিক করতে পারলেন না ভুবন সোম। একটা ফাজিল মেয়ের ধাপ্পায় ভুলে সময় নষ্ট করা কি উচিত হবে? ও শিকারের কি জানে! শেষটা আবার কি বিপদে প'ড়ে যাবেন ঠিক নেই, ডিম এখনও হজম হয় নি।

'আসুন না।'

নাছোড়বান্দা মেয়ে, যেতেই হবে। দেখাই যাক। না হয় একটু দেরিই হবে।

মেয়েটা গ্রামের দিকে ফিরল। ভুবন সোম পিছু পিছু যেতে লাগলেন। ঢালু চড়াটা নামতে কোনও কষ্ট হয় নি। ওঠবার সময় ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। মেয়েটার কিন্তু গ্রাহ্য নেই, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। আর মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে, মুচকি মুচকি হাসছে, আর ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে। টগর অনেকটা এইরকম ছিল, মনে পড়ল ভুবন সোমের।

যেতে যেতে আলাপ হ'ল। 'তুমি বুঝি ওই মাস্টারবাবুর মেয়ে ?'

'কোন্ মাস্টারবাবুর—'

'যিনি ওইদিকে ছিপ ফেলে মাছ ধরছেন।'

'না। আমি তাঁর মেয়ে হতে যাব কেন ? আমার বাবার নাম চতুর্ভুজ গোপ, যিনি আপনাকে খাটিয়া পেতে দিলেন।'

বলে কি। ওই চৌ-গোঁপপা চতুর্ভুজের মেয়ে এমন বাংলা বলতে পারে !

'তুমি বাংলা শিখলে কি ক'রে ?'

'আমার মামারবাড়ি যে পাকুড়, সেইখানেই মানুষ হয়েছি আমি। এখানেও বাংলা পড়েছি কিছুদিন। যিনি মাছ ধরছেন তিনিই আমাকে বাংলা পড়িয়েছেন। খুব ভাল পড়ান, কিন্তু একটু কালা—'

তিনি অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

'তুমি না থাকলে ওই মোষটা আজ আমাকে মেরেই ফেলত। তোমার কথা খুব শোনে তো ! সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।'

'বাঃ শুনবে না ! আমি যে ওকে বাচ্চাবেলা থেকে মানুষ করেছি। ছেলেবেলায় খুব শান্ত ছিল, খালি ঘুমোত, তাই ওর নাম রেখেছিলাম সুবোধ। কিন্তু যত বড় হচ্ছে ততই দুর্দান্ত হয়ে উঠছে। আজ ভোরে কোথায় গিয়ে মারামারি ক'রে এসেছে। কপালটা কেটে গেছে। টিঞ্চার লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়েছি।'

ভুবন সোমের বুঝতে বাকি রইল না যে, ভুট্টার লাঠির চোটেই সুবোধের কপাল কেটেছে। কিন্তু সে কথাটা চেপে গেলেন।

'টিঞ্চার দিলেই সেরে যাবে, নয় ?'

'হ্যাঁ, তা যাবে।'

'আপনি কি বাঙালী ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে সাহেবী পোশাক পরেছেন কেন ?'

'আচ্ছা ফক্কোড় মেয়ে তো'—মনে মনে বললেন ভুবন সোম। মুখে বললেন, 'সাহেবী পোশাক পরলে চলা-ফেরার সুবিধা হয়।'

'আমার বাবার সঙ্গে আপনি চলতে পারবেন? রোজ ভোর তিনটেয় উঠে উনি হাঁসবর যান, আবার দুপুরে এখানে এসে খান। খেয়ে আবার যান, ফিরে আসেন রাত দশটায়। হাঁসবর এখান থেকে আড়াই ক্রোশ।'

'সেখানে যান কেন?'

'সেখানে আমাদের জমি আছে।'

'কিন্তু আজ তো যান নি দেখলাম।'

'না, আজ এখানেই কাজ ছিল।'

এমন সময় দূর থেকে ডাক শোনা গেল—'এ বিদিয়া, বিদিয়া গে-এ এ—'

'বাবা ডাকছেন। বাবাই আমাকে আপনার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। আপনি যেন গিয়ে আমার নামে নালিশ করবেন না। বরং বলবেন, আপনার মেয়ে বিদিয়া লছমী। কেমন?'

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে বিদিয়া ছুটল।

ভুবন সোম আর একবার ফিরে আকাশের দিকে চাইলেন। হাঁসগুলোকে আর দেখতে পেলেন না। কোথাও বসেছে নিশ্চয়। চোখে পড়ল একটা ছোট্ট সাদা মেঘ ঠিক হাঁসের মত ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। আকাশটা যেন নীল সরোবর। খানিকক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্ষেতে যে মজুরগুলো কাজ করছিল তাদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল—

'ঘণ্টাভর বাদ আইহো বাবু। অভি থোড়া দের দম্ মারিকে বৈঠি যা।'

ভুবন সোমের মনে হ'ল ফপরদালাল সর্বত্র। তিনি কি জানেন না যে, এখন অপেক্ষা করতে হবে! বিদিয়ার গ্রামের দিকে চলতে লাগলেন। একটু দূরে গিয়ে দেখলেন, বিদিয়া আবার আসছে।

'আপনি অত আস্তে আস্তে হাঁটছেন কেন, তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার জন্যে বাবার কাছে মিছিমিছি বকুনি খেলুম। বাবা বললেন—তুই দৌড়ে চ'লে এলি কেন, ওঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়। চলুন—'

ভুবন সোম গতিবেগ আর একটু বাড়ালেন। চতুর্ভুজ গোপের বাড়ির কাছাকাছি হতেই চতুর্ভুজ গোপ বেরিয়ে এল আবার। দুটি হাত জোড় ক'রে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে আবার খাটিয়ায় বসাল তাঁকে। তারপর বালিয়া জেলার ভাষাতে যা বললে তার ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়—বন্দুকের আওয়াজ সে শুনেছে। ও-রকম এলোপাতাড়ি আওয়াজ করলে পাখী পাওয়া যাবে না। এই চরে পাখী শিকারের 'ভাঁজ' ও-রকম নয়। এখানে অন্য রকম কৌশল করতে হবে। রেঁায়া এখানে খেয়েদেয়ে চারপাইয়ের উপর একটু আরাম করুন। তারপর বিদিয়া সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। ও সব জানে। ওর বয়স একটু কম হ'লে কি হবে, ও খুব চালাক মেয়ে, তবে বড় বদমাশ। কিছুদিন পরেই ওর 'গওনা' হবে, কিন্তু এখনও ওর কোন বিষয়ে সুর (হুঁশ) নেই। কার সঙ্গে কি ভাবে

কথা বলতে হয় জানে না, কি ক'রে হাঁটতে হয় তাও জানে না। কচি লেরুর (বাছুরের) মত সারাদিন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিদিয়া বাপের পিছন থেকে ইশারা করলে।

ভুবন সোম ভাঙা হিন্দিতে বললেন, 'আপকা লেড়কি তো লছমী হ্যায়।' এ রকম নির্জলা মিথ্যেকথা জীবনে তিনি খুব কম বলেছেন।

এ কথা শুনে চতুর্ভুজের সিংহতুল্য বদনটি খুশিতে ভ'রে উঠল, চোখ দুটি বুঁজে এল। ক্ষণকাল অভিভূত হয়ে থেকে সে বললে, 'আপলোগকা আশিরবাদ—'

তারপর বিদিয়ার দিকে ফিরে বললে, 'দহি-চুড়া লাও বেটি। বাবুকে খিয়াও।'

ভুবন সোম শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। বললেন, তিনি একটু আগেই খেয়েছেন, এখন ক্ষিদে নেই। বিদিয়া পিছন থেকে ধমক দিয়ে উঠল, 'তবু খেতে হবে। বাবার মান রাখবার জন্যে সামান্য একটু খান। বাড়ি থেকে অতিথি যদি না খেয়ে যায় ওঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়।'

ভুবন সোম চতুর্ভুজের দিকে ফিরে দেখলেন, সে হাতজোড় ক'রে আছে। মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু মুখভাবে যা প্রকাশিত হচ্ছে তা বলার বাড়া। ভুবন সোম আর আপত্তি করতে পারলেন না।

বিদিয়া একটি চকচকে পরিষ্কার কানা-উঁচু কাঁসার থালায় মোটা মোটা লাল চিঁড়ে নিয়ে এল।

'ও বাবা, এ যে স্বয়ং মা-লক্ষ্মী দেখছি!'—মনে মনে বললেন ভুবন সোম।

তারপর বিদিয়া নিয়ে এল মাটির ভাঁড়ে খানিকটা দই, আর কিছু ঢেলা গুড়। আর এক ছড়া মর্তমান কলা।

চতুর্ভুজ হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ভুবন সোম জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি কাছে-পিঠে কোনও দোকান আছে?'

'না, এ সবই আমাদের ঘরের।'

'তাই না কি? বাঃ! তোমার বাবাকেও দাও না, একসঙ্গে খাওয়া যাক।'

'আপনার খাওয়া না হ'লে উনি খাবেন না।'

চতুর্ভুজ হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানালে যে, বিদিয়া যা বলছে ঠিক। সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার ওইটুকু মেয়ে বিদিয়া একজন প্রবীণ বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে অনর্গল বাংলায় আলাপ ক'রে যাচ্ছে এতে সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চ'ড়ে বসেছিল; মুখ দিয়ে তার কথা সরছিল না।

ভুবন সোম যতটা পারলেন খেলেন। তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে চতুর্ভুজ গোপ খেতে বসল। তাঁর সামনেই বসল। তার খাওয়ার বহর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। আধ সের চিঁড়ে তো হবেই, তার সঙ্গে প্রায় সেরখানেক দই, পোয়াটাক গুড়,

আর গোটা ছয়েক কলা, দেখতে দেখতে নিঃশেষ ক'রে ফেললে চতুর্ভুজ। তারপর আলগোছে এক ঘটি জল খেয়ে সুদীর্ঘ ঢেঁকুর তুললে একটি।

মুখ ধুয়ে এসে চতুর্ভুজ গামছায় হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললে, রোঁয়া তা হ'লে খাটিয়ার উপর আরাম করুন, সে এখন মাঠে যাচ্ছে। বিদিয়া একটু পরে ওঁকে শিকারের 'ভাজ' সব ঠিক ক'রে দেবে।

বিস্ময়ে ভুবন সোমের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। এই গুরুভোজনের পরও লোকটা আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে যাবে!

একটু পরেই মহিষের চামড়ার তৈরি নাগরা জুতো প'রে—বাইরে চালের বাতায় গোঁজা ছিল সে দুটি—আর প্রকাণ্ড একটি তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ক'রে চতুর্ভুজ গোপ বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বার বার আশ্বাস দিয়ে গেল যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি একটু আরাম ক'রে নিন আগে!

বিদিয়া বললে, 'আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি একটু আসছি বাইরে থেকে—'

'তুমি খেলে না?'

'আমি দশটার সময় খেয়ে নিয়েছি। আমি স্কুল যেতাম তো, সেই আগেকার অভ্যাস থেকে গেছে।'

বিদিয়া একটা ছোট পাত্রে খানিকটা ছাতু মাখতে লাগল।

'ও আবার কার জন্যে?'

'সারির জন্যে। এ আমার এক জ্বালা হয়েছে, আমি শ্বশুরবাড়ি চ'লে গেলে কে যে ওকে খেতে দেবে জানি না।'

'সারি কে আবার? তোমার বোন নাকি?'

'বোন কেন হতে যাবে! পোষা শালিক পাখী।'

'কই, কোথায়?'

'এখন চরতে গেছে। একটু পরে আসবে। এসে খাবার না দেখলে হাল্লা করবে।'

বিদিয়া একটা খালি খাঁচা বার করলে। তার ভিতর ছোট একটা বাটিতে মাখা ছাতুটা রেখে, বারান্দায় টাঙিয়ে দিয়ে এল খাঁচাটা।

তারপর বললে, ওই যে তালগাছটা দেখছেন, আর একটু স'রে আসুন—তা হ'লেই দেখতে পাবেন, ওই তালগাছে ওর জন্ম হয়েছিল গত বৈশাখে। একদিন দেখি, গাছের উপর থেকে প'ড়ে গেছে ভাগ্যে আমি ওইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই দেখতে পেলাম। তারপর তুলে এনে এই খাঁচাটায় রেখে মানুষ করলাম। ওর মা এসে ওকে ফড়িং খাইয়ে যেত। আমি ছাতু খাওয়াতাম। তারপর যখন পালক-টালক গজাল, একদিন এসে দেখি, খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে নিজেই চ'রে বেড়াচ্ছে। মনে হ'ল, বাঁচলাম, রোজ রোজ কে ওর সেবা করবে! ওমা, তার পরদিন দেখি ঠিক খাঁচায় এসে ব'সে আছে।

আর রোঁয়া ফুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলছে—রেডিও, রেডিও, রেডিও, কিক্ কিক্ কিক্ রেডিও! তার মানে ছাতু দাও। দিলাম ছাতু মেখে। তারপর থেকে রোজ আসে—'

ভুবন সোম মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। 'কখন আসে?'

'কোনও ঠিক নেই। আমি কি ওর জন্যে ব'সে থাকি নাকি? খানিকটা ছাতু মেখে রেখে দিয়ে নিজের কাজে চ'লে যাই। এসে দেখি, ঠিক খেয়ে গেছে। আপনাকে দেখলে হয়তো আসবে না, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমার দাদা এসেছিল ক্যামেরা নিয়ে, ওর একটা ফোটো তুলতে চাইল, কিছুতে বসল না। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি সুবোধের মাথায় আর একটু টিঞ্চার দিয়ে আসি। খাটটা ঘরের ভিতর নিয়ে যাই চলুন। চোখে আলো লাগলে আপনার ঘুম হবে না। সারিটাও আসবে না। ধরুন তো খাটটা, আমি একলা নিয়ে যেতে পারব না—'

ঘরের ভিতর ঢোকবার ইচ্ছা ছিল না ভুবন সোমের। কিন্তু দেখলেন বিদিয়ার আদেশ অমান্য করা যাবে না। ঠিক টগরের মত, তার মত জেদীও।

ধরাধরি ক'রে খাটটা ভিতরে আনা হ'ল।

'আপনি এইখানে ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাকুন।'

'আমার দিনে ঘুমোনো অভ্যাস নেই।'

'চোখ বুঁজে শুয়ে থাকুন তবু খানিকক্ষণ। আমি আসছি—'

টিঞ্চার আয়োডিনের ছোট শিশিটা হাতে ক'রে বেরিয়ে গেল। দেখলেন, ঘরে টুকিটাকি অনেক ওষুধপত্র আছে একটা শেল্‌ফে। ভুবন সোম কি আর করবেন, শুলেন। শুয়েই কিন্তু উঠে পড়তে হ'ল তাঁকে। ও ফোটোটা কার? মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। উঠে ফোটোটার কাছে গেলেন। আরে, এ যে সখীচাঁদ যাদবের ফোটো! ও হারামজাদার ফোটো এখানে এল কি ক'রে?

'আপনি এখনও শোন নি?'

বিদিয়া ফিরে এল।

'সুবোধের কপালটা অনেকখানি কেটে গেছে সত্যি। রক্ত গড়াচ্ছে দেখলাম। টিঞ্চারে কমবে তো? বৈরিয়ার বিভূতিবাবু ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছিলাম, তিনি টিঞ্চার পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতেই ঠিক ক'মে যাবে, কি বলেন?'

'যাবে। কিন্তু খুব বেশী দিও না। রোজ একবারের বেশী দিলে ঘা বেড়েও যায় শুনেছি। আচ্ছা, এ ফোটো কার?'

বিদিয়া মুখ ফিরিয়ে লজ্জা গোপন করলে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, 'কারুর নয়।'

'কারুর নিশ্চয়ই। এ কে হয় তোমার?'

'আমার পতি।' ব'লেই এক ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

বিদিয়ার পতি সখীচাঁদ যাদব! এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ! খাটিয়ার উপর ব'সে

পড়লেন ভুবন সোম। প্রায় মিনিট দশেক বিদিয়ার দেখা নেই। একটু পরেই বারান্দায় শোনা গেল—রেডিও, রেডিও, কিক্‌ কিক্‌—

নিঃশব্দপদসঞ্চারে পিছনের একটা দরজা দিয়ে বিদিয়া এসে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বললে, 'সারি এসেছে, দেখুন।'

ভুবন সোম বারান্দায় যেই বেরিয়েছেন অমনি পিড়িং ক'রে উড়ে গেল শালিকটা।

'আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছে।'

ভুবন সোম আবার ঘরের ভিতরে এলেন। বিদিয়াও এল।

'তোমার পতি সখীচাঁদ যাদবকে আমি চিনি।'

'চেনেন ?'

'হ্যাঁ। খুব দুষ্টু সে।'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে লেখে কি জানেন ? রোজ চিঠি লিখতে। রঙিন চিঠির কাগজ খাম আর ফাউন্টেন পেন পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি রোজ চিঠি লিখি কি ক'রে বলুন তো ! এখান থেকে পোস্টাফিস দু ক্রোশ। রোজ কে চিঠি পোস্ট করতে যাবে ? মকৃখুকে অনেক খোশামোদ ক'রে একদিন পাঠিয়েছিলাম। রোজ রোজ সে যাবে কি ক'রে—'

'তা তো বটেই। মকৃখু লোকটি কে ?

'আমাদের চরবাহা, মানে আমাদের গরু-মোষ চরায়।'

'ও।'

'আপনি ওকে চিনলেন কি ক'রে ? কোথায় আলাপ হ'ল ?'

'আমিও যে রেলে চাকরি করি।'

'ও, তাই না কি ! আচ্ছা, সোম সাহেব ব'লে আপনাদের এক উপরওয়ালা সাহেব আছেন শুনেছি। তিনি কেবল সকলের নামে রিপোর্ট ক'রে বেড়ান। উনি লিখেছেন, ওঁর নামে রিপোর্ট হয়েছে। আপনার নামেও রিপোর্ট করেছে নাকি ?'

'না।'

ভুবন সোমের অবস্থা অবর্ণনীয়।

'উনি লিখেছেন, সোম সাহেব লোকটা খুব পাজী। নিজের ছেলের চাকরিটি পর্যন্ত খেয়ে দিয়েছেন। ঠিক আমার বিহনিয়ার মত, সকলকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে—'

ব'লেই হেসে ফেললে বিদিয়া।

ভুবন সোম বললেন, 'হ্যাঁ, খুব কড়া লোক। সখীচাঁদ ঘুষ নিয়েছিল—'

বাঘিনীর মত গর্জন ক'রে উঠল বিদিয়া।

'ঘুষ বলছেন কেন, 'উপরি' বলুন। প্যাসেঞ্জারদের উনি সুবিধা ক'রে দেন, তারা, ভালবেসে ওঁকে দু-চার পয়সা দেয়। এতে দোষ কি আছে ! আসলে লোকটা হিংসুট পাজী, অপরে দু পয়সা পাচ্ছে তা সহ্য করতে পারে না, তাই রিপোর্ট করেছে।'

ভুবন সোম চুপ ক'রে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলেন।

'ভুবন সোমের সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?'

'আছে।'

'তাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন তো! যদি ওঁর চাকরিটি চ'লে যায়, তা হ'লে আমার আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।'

'আচ্ছা, বলব।'

ভুবন সোম বেশ একটু বিপন্ন বোধ করছিলেন। কিন্তু কি করবেন তা তিনি জানতেন। রিপোর্ট তাঁকে করতেই হবে, কোনও কারণেই কর্তব্যে তিনি অবহেলা করবেন না। কালই তিনি ষ্টীমারে সেই ছোকরাকে জোর গলায় ব'লে এসেছেন—আমরা ওল্ড স্কুলের লোক, আমাদের মটো হচ্ছে ডিউটি ফার্স্ট, সেল্ফ লাস্ট।

'আপনি ঘুমুবেন না?'

'দিনে আমার ঘুম আসে না।'

'তবে চলুন, শিকারের ব্যবস্থাই করা যাক।'

বিদিয়া একটু পরে দুটো ময়লা শতচ্ছিন্ন কাপড় নিয়ে ফিরে এল।

'আপনার কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন, এইগুলো পরুন।'

'এইগুলো পরব? তার মানে?'

'ফরসা কাপড়চোপড়-পরা ভদ্রলোক দেখলেই হাঁসগুলো পালাবে! কিন্তু এই কাপড় প'রে যদি আপনি ওদের খুব কাছেও যান, তা হ'লেও ওরা উড়বে না। মনে করবে—আপনি বুঝি মজুর একজন। আমি কি ঠিক করেছি, শুনুন বলছি। আপনার বন্দুকটায় টোটা ভ'রে দিন, আমি সেটা নিয়ে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দিয়ে লুকিয়ে চ'লে যাই। আমাকে এমনি দেখলে ওরা উড়ত না, কিন্তু বন্দুক থাকাতে উড়তে পারে। তাই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে যাব। ওদের খুব কাছে গিয়ে আমি আপনাকে ইশারা করব। আপনি তখন এই কাপড় প'রে আর এই গামছার পাগড়ি বেঁধে এক বোঝা বুটের শাক মাথায় নিয়ে আমার কাছে চ'লে আসবেন। ওরা দেখবেন উড়বে না। আপনাকে মজুর মনে করবে। আপনি তখন ফায়ার করতে পারবেন, বাজিও জিতে যাবেন। ক টাকা বাজি রেখেছেন? বাজি জিতলে আমাকেও দেবেন তো কিছু?'

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল বিদিয়া।

'টাকার বাজি রাখি নি, মানের বাজি। ওদের ধারণা, আমি পাখী মারতে পারি না। আজ ওদের দেখিয়ে দিতে চাই যে, আমিও পারি।'

'এখানে আর কখনও আপনি এসেছিলেন?'

'না, দিলারপুর, বাঘাচরবিল, কাটাহা, ফসিয়াতল—এসব জায়গায় গেছি। কিন্তু এখানে এইবার প্রথম এলাম। মনে হচ্ছে, না এলেই হ'ত।'

ছোট ছেলেকে মা যে সুরে ভোলায়, বিদিয়ার কণ্ঠে সেই সুর ফুটল।

'এখানেও তো অনেক পাখী আছে। এবারে আপনি ঠিক মারতে পারবেন। সাহেবী পোশাক ছেড়ে এইগুলো প'রে ফেলুন। আর টোটা পুরে বন্দুকটা আমাকে দিয়ে দিন, আমি চ'লে যাই।'

'চল না; আমিও তোমার সঙ্গে যাই। কাপড় বদলাবার দরকার কি, তুমি যদি লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে পার আমিও পারব।'

'পারবেন না, আপনি যে বড্ড লম্বা। যা বলছি শুনুন।'

কাপড়গুলো যে বড্ড ময়লা!'

'ময়লা কাপড়ই তো দরকার। ময়লা-কাপড়-পরা লোকদের ওরা ভয় পায় না। ভয় পায় আপনাদের মত ফরসা-কাপড় পরা লোকদের। আর এক কাজও করতে পারেন। গাছ সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু—'

'সে আবার কি রকম?'

'আমি কতকগুলো ঝাউগাছের ডাল কেটে আপনার গায়ে মাথায় পিঠে বেঁধে দেব। আপনাকে ঠিক ঝাউগাছের মত দেখাবে দূর থেকে। ওরই ভিতর বন্দুকটাও লুকিয়ে নিতে হবে। তারপর আপনি খুব আস্তে আস্তে এগুবেন। একটু এগুবেন, আবার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। তারপর আস্তে আবার একটু এগুবেন—,'

বিদিয়া দেখিয়ে দিলে, কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে।

'এইরকম করতে করতে ওদের খুব কাছাকাছি যখন এসে পড়বেন, তখন বন্দুক চালাবেন। আপনি যদি খুব আস্তে আস্তে ওদের কাছে যেতে পারেন, তা হ'লে ওরা উড়বে না—আপনাকে ঝাউগাছ মনে করবে। দেখুন, কোন্‌টা আপনার পছন্দ সেই-রকমই ব্যবস্থা করি।'

'এ ছাড়া অন্য উপায় নেই?'

'না। তবে সকালবেলা ওরা যেমন করেছিল, তেমনি করলে হতে পারত। কিন্তু আপনার তো মোটর-বোট নেই। ওরা এসে সব পাখীগুলোকে উড়িয়ে দিলে, তারপর সেই উড়ন্ত অবস্থাতেই দমাদ্দম গুলি চালাতে লাগল তিন-চারজন মিলে। তাতে কয়েকটা জলে পড়ল। কিন্তু আপনি তা করবেন কি ক'রে? আপনার বোট নেই, তা ছাড়া আপনি একা। আমি যা বলছি তাই করুন। ঠিক মারতে পারবেন। নবাবগঞ্জের জমিদারের ছেলে ছবিলালবাবু এইরকম ক'রে শিকার করেন। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি আমি। তিনি একবার মজুর সেজেছিলেন, একবার ঝাউগাছও হয়েছিলেন। অনেকগুলো পাখী মেরেছিলেন তিনি।'

ভুবন সোম কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না সহসা। এক-একবার ভাবছিলেন, পাখী আর মারব না, ফিরে যাই। কিন্তু ছট্টু সেন, কার্তিক আর অনিলের—বিশেষ ক'রে অনিলের মুখটা মনে পড়াতে মত বদলাতে হ'ল তাঁকে। অন্তত একটা নিয়ে যেতে পারলেও মানরক্ষা হবে।

'আপনি মজুর সেজেই চলুন প্রথমে। তাতে যদি না হয় ঝাউগাছ হবেন। বন্দুকটা আমাকে দিন টোটা পুরে।

মনস্থির ক'রে ফেললেন ভুবন সোম। দেখাই যাক না, কি হয়! টোটা পুরে বন্দুকটা দিয়ে দিলেন তাকে। লক্ ক'রে দিলেন। মেয়েটা যে রকম ছটফটে আর ফাজিল, অ্যাক্‌সিডেণ্ট না ক'রে বসে!

'আপনি তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে আসুন। আমি অড়র-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছি। নওলকিশোরের ক্ষেতের মজুরগুলোকে ব'লে যাচ্ছি, তারা আপনাকে এক বোঝা বুটের শাক দিয়ে দেবে। আপনি প্রথমে যে জায়গায় বন্দুক ছুড়েছিলেন আমি তারই কাছাকাছি গিয়ে ব'সে থাকব কোথাও। যেখানে হাঁস দেখবে সেইখানেই ব'সে পড়ব। আমি ইশারা করলে, তবে আপনি যাবেন। কেমন?'

বন্দুকটি নিয়ে বেরিয়ে গেল বিদিয়া। ভুবন সোম প্যাণ্ট ছেড়ে মকৃখুর কাপড় পরতে লাগলেন। উঃ, কি দুর্গন্ধ! কখনও কাচে না বোধ হয়। চুলুহার কথা মনে পড়ল। বহুকাল পূর্বে চুলুহা ব'লে তাঁর এক চাকর ছিল। দৈত্যের মত চেহারা। কিন্তু শখ ছিল 'টাইট' গেঞ্জি পরবার। বেছে বেছে গলাবন্ধ ছোট মাপের গেঞ্জি কিনত। দু-তিনজনে মিলে তাকে পরাত সেই গেঞ্জিটা। গেঞ্জি এত টাইট হত যে, পরার পর খানিকক্ষণ হাত ঝোলাতে পারত না সে। সেই যে একবার গেঞ্জিটা পরত—বাস্। আর খুলত না সে। সেই গা থেকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে প'ড়ে যেত। এরা পারতপক্ষে কেউ কাপড়-জামা কাচে না।

হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড প'রে মাথায় ময়লা গামছার পাগড়ি বেঁধে, খালি গায়ে যখন বের হলেন ভুবন সোম তখন একটা দেখবার মত দৃশ্য হ'ল। তাঁর বুকে, পিঠে, পেটে প্রচুর লোম ছিল। বহুদিন তারা এমন মুক্ত বাতাস এবং আলোর স্পর্শ পায় নি। গঙ্গার চরের হাওয়া-আলো লেগে তাদের মধ্যেই শিহরণ জাগল প্রথম। সত্যিই ভুবন সোমের রোমাঞ্চ হ'ল। যদিও বেলা প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল, রোদও উঠেছিল বেশ, তবু একটু একটু জোরে পা চালিয়ে চলতে লাগলেন। নওলকিশোরের ক্ষেত বেশীদূর নয়। যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিলেন ততটা খারাপ কিন্তু লাগছিল না। বরং মনে হচ্ছিল যেন নব-জন্মলাভ করেছেন। হঠাৎ শৈশবসুলভ চাপল্য ফিরে এল যেন। বেশ দ্রুতপদে, প্রায় দৌড়ে, তিনি নওলকিশোরের ক্ষেতে গিয়ে পৌছলেন।

মজুরগুলো তখনও কাজ করছিল সেখানে, তাঁকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। একটা ছোঁড়া-গোছের মজুর দাঁত বের ক'রে বললে, 'চিড়িয়াকো লালচসে বাবু মজদুর বনি গেলছে।' অর্থাৎ পাখীর লোভে বাবু মজুরে রূপান্তরিত হয়েছেন।

অন্য সময় হ'লে ভুবন সোম চটে উঠতেন। এখন কিন্তু চটলেন না, উপভোগ করলেন রসিকতাটা। তাদের পাশে বসে বললেন, 'লালচসে নেহি, জিদসে। চিড়িয়া আজ মারণেই হোগা একঠো। বিদিয়া কাঁহা গিয়া?'

একজন মজুর ক্ষেত থেকে বেরিয়ে গেল। ভুবন সোমও গেলেন তার পিছু পিছু। গিয়ে দেখলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে একটু আগে তিনি ফায়ার করেছিলেন তার কাছে-পিঠে কোনও পাখী নেই, বিদিয়াও নেই।

'হে গে বিদিয়া গে—'

তারস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল মজুরটা কানে হাত দিয়ে।

'ওতনা জোর সে মৎ চিল্লাও। পাখী ভড়ক্ যায় গা।'

লোকটা হেসে বললে, তাদের ডাকে পাখী ভড়কাবে না। তারা ক্রমাগতই এ রকম হাঁকাহাঁকি করে, পাখীরা ঠিক ব'সে থাকে। আবার ঠিক তেমনি ভাবে কানে হাত দিয়ে আর একবার চেঁচালে, কিন্তু বিদিয়ার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ভুবন সোম তখন মজুরটাকে এক বোঝা বুটের শাক নিয়ে আসতে বললেন। ভাবলেন, সেইটে মাথায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে যাওয়া যাক। কিছু দূর গিয়ে বিদিয়ার দেখা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

লোকটা ঘাসের বোঝা এনে দিয়ে দাঁত বার করে বললে, 'একঠো মোটা বিড়ি মিলতিয়ে হুজুর!'

সিগার চাইছে।

'হামরা সাথ তো নেই হ্যায়। পিছে দে গা, বিদিয়াকা ঘরমে রাখকে আয়া।'

মাথায় শাকের বোঝা নিয়ে হাঁটছিলেন তিনি। কোথায় পাখী! একটিও তো দেখা যাচ্ছে না! কেবল সেই টার্ন আর মাছরাঙা আর ঝাউগাছে চড়ুই পাখীর মত সেই পাখীগুলো। অনেক দূর হাঁটবার পর হাঁসের ডাক শুনতে পেলেন। তারপর বিদিয়াকে দেখতে পেলেন। আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিদিয়া গাছ-কোমর ক'রে কাপড় পরেছে, বন্দুকটা পিঠের উপর বেঁধেছে, সাপের মত বুকে হেঁটে একটা টিলার উপর উঠছে। টিলার উপর উঠে সন্তর্পণে সে মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চাইলে। নীচেই গঙ্গা। মেয়েটার সাহস আছে বলতে হবে। ওই অপল্‌কা বালির টিলা যদি ধসে পড়ে তা হলেই মৃত্যু, অত উঁচু থেকে একেবারে জলে পড়বে।

ভুবন সোম রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন। কিছু হল না। টিলা থেকে নেবে এল বিদিয়া। হেঁটে নাবল না, বন্দুকটা পিঠ থেকে খুলে নিয়ে দু হাত ধরে ঢালু টিলা বেয়ে সর সর করে নেবে এল। শহরের পার্কে ছেলেমেয়েরা যেমন 'স্লিপ' খায় অনেকটা তেমনই করে। টিলার নীচে নেবে এদিক ওদিক চাইতে লাগল সে। তারপর দেখতে পেলে ভুবন সোমকে। ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ইশারা করলে ভুবন সোম চলতে লাগলেন। হাঁসের ডাক তিনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন, কাছাকাছি আসাতে আরও স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তারপর দেখতে পেলেন। তাদের খুব কাছ দিয়ে যেতে লাগলেন, তবু তারা পালাল না। বিদিয়া কুঁজো হয়ে হেঁটে দেখিয়ে দিলে—কুঁজো হয়ে হাঁটুন। কুঁজো হয়েই হাঁটতে লাগলেন ভুবন সোম! বিদিয়ার কাছাকাছি আসতেই বিদিয়া

বন্দুকটা তাঁর হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'অনেক বড় বড় হাঁস আছে। ঠিক টিলাটার নীচেই বেশী আছে। আপনি টিলাটার উপরে গিয়ে শুয়ে থাকুন ওপর থেকে। ঠিক নীচেই আছে হাঁসগুলো। দিন, বন্দুকটা আমি ধরছি। আপনি বুকে ভর দিয়ে ওপরে উঠুন আগে, তারপর আপনাকে বন্দুকটা দেব।'

ভুবন সোম তাই করলেন। বিদিয়া যেমন করে টিলার উপর উঠেছিল তিনিও তেমনিভাবে উঠতে লাগলেন। বিদিয়াও বন্দুকটা নিয়ে তাঁর পিছু পিছু ঠিক তেমনি-ভাবে উঠতে লাগল। টিলায় উঠে তিনিও সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখলেন অনেক হাঁস রয়েছে—গীজ, টিল্ অনেক! পঞ্চাশ গজের মধ্যেই।

বিদিয়া বন্দুকটা এগিয়ে দিলে আস্তে আস্তে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে দড়াম্ দড়াম্ করে দুবার ফায়ার করলেন তিনি। চিৎকার করে হাঁসগুলো উড়ল। বিদিয়া ছুটে নীচে নেবে গেল।

তিনিও গেলেন। একটাও পড়ে নি।

॥ ছয় ॥

প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেছে। গঙ্গার চরে একা বসে আছেন ভুবন সোম। অদ্ভুত চেহারা হয়েছে তাঁর। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড়, মাথায় ময়লা পাগড়ি। বুকে পিঠে গোঁফে ভুরুতে মাথায় বালি লেগেছে প্রচুর। বিদিয়া ঝাউগাছের ডাল কেটে আনতে গেছে। আশ্বাস দিয়ে গেছে, ঝাউগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এইখানেই আবার হাঁস পাবেন তিনি। ঠিক পাবেন। সেই আশায় বসে আছেন ভুবন সোম। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে কে যেন বলছে, ওর কথা মিথ্যে হবে না। হাঁসেরা ঠিক ঘুরে আসবে আবার। আর একটা কথাও তিনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন কেন! তিনি জীবনে কখনও কাঁদেন নি, মা বাবা স্ত্রী টগর—কারও মৃত্যুতে তিনি কাঁদেন নি। ঋণের দায়ে বাড়িটা যখন বিষুণদাস মারোয়াড়ী নিয়ে নিলে, তাঁদের পথে দাঁড়াতে হল, তখনও এক ফোঁটা জল তাঁর চোখ দিয়ে বেরোয় নি। কিন্তু, আজ এ কি হল! হাঁস মারতে পারেন নি তো কি হয়েছে! বুড়ো হয়েছেন, হাত কেঁপে যাচ্ছে, এতে কাঁদবার কি আছে? এই-ই তো স্বাভাবিক। ছি-ছি, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন মেয়েটার সামনে! যদিও ওকে বললেন যে, চোখে বালি পড়েছে বলে জল বেরুচ্ছে; কিন্তু ওর মুখ দেখে উনি তখনই বুঝলেন যে, মিথ্যে কথায় ও ভোলে নি। ও ঠিক বুঝতে পেরেছে, কোন কথা বলে নি কিন্তু। অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল কেবল তাঁর মুখের দিকে। অতবড় মুখরা মেয়ে, একটি কথা বলে নি তারপর

থেকে। যাবার আগে কেবল বলে গেল, 'আপনি বসুন এখানে, আমি ঝাউডাল নিয়ে আসি। হাঁসেরা আবার এখুনি আসবে। এবার ঠিক মারতে পারবেন।'

মারতেই হবে। হাঁস না নিয়ে তিনি যাবেন না এখান থেকে। সমস্ত রাত যদি এই চরে বসে থাকতে হয়, তাও থাকবেন।

চরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তাঁর জীবনও ঠিক এই চরের মত খাঁ-খাঁ করছে। কেউ নেই, কিছু নেই। গঙ্গার চরে তবু পাখী আসে, নৌকো ভেড়ে, চাষীরা কাজ করে, বিদিয়ারা ঘর বাঁধে; তাঁর জীবনের চরে ধূ-ধূ বালি কেবল। চর নয়—মরুভূমি, তাতে মরীচিকাও নেই, ওয়েশিসও নেই। 'নেভার মাইণ্ড, বেটার লাক্ নেক্স্ট (next) টাইম, মানে পরজন্মে আর যেন এ দেশে না জন্মাতে হয়।' বলেই থেমে গেলেন তিনি। মনে হল, না, এ দেশের দোষ কি! আজ সকাল থেকে যতগুলো লোকের সঙ্গে দেখা হল—ভুট্টা, ভাগিয়া, ভিখন, চতুর্ভুজ, বিদিয়া—এরা কি খারাপ লোক? অন্য দেশে কি এদের চেয়ে ভাল লোক আছে? না, দেশের দোষ নয়, দোষ তাঁর কপালের।...

এক বোঝা ঝাউয়ের ডাল টানতে টানতে বিদিয়া এসে হাজির হল। দড়িও এনেছে খানিকটা। হাঁপাচ্ছে।

'আসুন, তাড়াতাড়ি বেঁধে দিই। ওই দিকে দেখলাম, জুটো চখা উড়ছে। এখনও বসে নি। কিন্তু এইখানেই বসবে কোথাও। আসুন—'

ভুবন সোমের পেটে, পিঠে, মাথায় সে ঝাউয়ের ডালগুলো বাঁধতে লাগল।

'সামনের ওই ডালগুলোর ভিতর বন্দুকটা আড়াল ক'রে রাখুন। টোটা পুরেছেন?'

'পুরেছি।'

'এইখানেই বসবে চখা জুটো। আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। একটুও নড়বেন না যেন, আমি ওই অড়রক্ষেতে বসছি গিয়ে।'

সর্বাঙ্গে ঝাউডাল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ভুবন সোম। পাচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট কাটল। হাতঘড়িটা হাতেই বাঁধা ছিল তাঁর, মাঝে মাঝে আড়চোখে সেটার দিকে চেয়ে দেখছিলেন। আরও পাঁচ মিনিট কাটল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি! ঠিক আসবে, বিদিয়া যখন বলছে তখন ঠিক আসবে।

'কাঁ-আ—'

ওই আসছে। সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ বয়ে গেল তাঁর। কিন্তু একবার ডেকেই থেমে গেল কেন? আর তো ডাকছে না? কোথা গেল? ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সাহস হল না, বিদিয়া মানা করেছে। অড়রক্ষেতে বসে সে তাঁর প্রত্যেকটি আচরণ লক্ষ্য করছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

কটা ? অনেকগুলো মনে হচ্ছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

ঠিক তাঁর সামনে এসে বসল এক জোড়া চখা। খুব কাছে একটু স্থির হয়ে বসুক, এখুনি ফায়ার করব না, ভাবলেন ভুবন সোম। মিনিট খানেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফায়ার করলেন।

দুটোই উড়ে গেল।

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম।

'পড়েছে পড়েছে, একটা পড়েছে—'

চিৎকার করে বিদ্যুৎবেগে ছুটল বিদিয়া।

পড়েছে ? কোথায় ? তিনি তো দেখলেন, দুটোই উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঝাউয়ের ডালগুলো খুলে ফেললেন তিনি। চারদিকে চেয়ে বিদিয়াকে দেখতে পেলেন না। কোথা গেল ছুটে ? তারপর দেখতে পেলেন, একটা জ্যান্ত চখা নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

'এই নিন। পায়ে খুব সামান্য লেগেছে। ভয়েই পড়ে গিয়েছিল। জ্যান্তই নিয়ে যান। ভালই হয়েছে, মরে নি। আপনার বাজি জেতাও হল, এটাও মল না। ইচ্ছে করলে একে পুষতেও পারেন। পোষ মানবে কি ?'

ভুবন সোমের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

মজুরগুলো ছুটে এল মাঠ থেকে। দড়ি দিয়ে চখার পা দুটো আর ডানা দুটো বেশ ভাল করে বেঁধে দিলে তারা। হাত ফসকে আর পালাতে পারবে না। হাতে ঝুলিয়ে নেবার জন্য আর একটা ফাঁসও করে দিলে। চমৎকার বড় চখাটা। গলার কালো কণ্ঠিটা দেখিয়ে একজন বললে, এটা নর, অর্থাৎ পুরুষ চখা।

চখাটা হাতে ঝুলিয়ে চতুর্ভুজ গোপের আস্তানায় এলেন ভুবন সোম।

বিদিয়াও পিছু পিছু এল।

'এখুনি চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে, প্রায় দুটো বাজে।'

'আর কিছু খাবেন না ?'

'না।'

মকৃখুর কাপড়গুলো ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের জামা-কাপড় পরলেন ভুবন সোম। সর্বাঙ্গে বলি কিচকিচ করছে। তারপর একটু ইতস্তত করে মনিব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বার করলেন সেই নোটটা, যেটা ভাগিয়া কুড়িয়ে দিয়েছিল।

'এই নাও, তোমরা মিষ্টি খেও—'

'আপনার কাছ থেকে টাকা নেব ? কি বলছেন আপনি !'

'তোমাদের জনমজুরদের বকশিশ দিও।'

'না, কাউকে কিছু দিতে হবে না। অতিথির কাছ থেকে আমরা পয়সা নিই না।'

এর পর আর কি বলবেন ভুবন সোম! একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলেন, তারপর বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে চলি। হ্যাঁ, এই সিগার কটা ওই মজুরদের দিয়ে দিও, ওরা চাইছিল। আচ্ছা, চললুম তা হলে।'

চখাটাও হাতে ঝুলিয়ে নিলেন।

'আসুন।'

হঠাৎ হেঁট হয়ে বিদিয়া প্রণাম করল তাঁকে।

'আচ্ছা।'

ভুবন সোম এগিয়ে গেলেন কিছু দূর।

'শুনুন—'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, বিদিয়া ছুটে আসছে।

'সোম সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয় ওঁর জন্তে বলবেন একটু। চাকরিটা যেন না যায়—'

'আচ্ছা, বলব। কিন্তু ঘুষ নেওয়া যদি প্রমাণ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সোম সাহেব কিছু করতে পারবেন না। তাঁকেও তো চাকরি করতে হয়—'

'তবু বলবেন একটু।'

বিদিয়া চলে গেল।

ভুবন সোম হাঁটছিলেন। কাঁধে বন্দুক, আর হাতে চখাটা। কোথায় যাচ্ছেন খেয়াল ছিল না তাঁর। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে সোজা চলেছিলেন খুব, কিন্তু সে দিকেও আর খেয়াল ছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ হাঁটছিলেন।

'কাঁ-আ—'

চমকে উঠলেন তিনি। এইটেই ডাকল না কি!

'কাঁ-আ—

এইবার দেখতে পেলেন, আর একটা চখা তাঁর মাথার উপর উড়ছে। এরই সঙ্গীটা নাকি!

আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

সমানে মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

'এটাকেও শেষ করে দেওয়া যাক।

বাঁধা-চখাটা মাটিতে নাবিয়ে রেখে বন্দুকে টোটা পুরলেন। ঠিক মাথার উপরে উড়ছে- একটু যেন নেমে এল। ফায়ার করলেন। লাগল না। চখাটা চক্রাকারে উড়তে লাগল। খানিকক্ষণ সেটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। পালাচ্ছে না তো? আবার ফায়ার করলেন। এবারও লাগল না।

'মরুক সে—'

চথাটা তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে আবার শুনতে পেলেন —'কাঁ-আ' 'কাঁ-আ'। হাতের চথাটা ছটফট করতে লাগল। ভুবন সোম দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রায় দৌড়তে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বসলেন এক জায়গায়।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

সমানে উড়ে আসছে চথাটা সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বসতে তাঁর মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগল! ভুবন সোম পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, আরও গোটা দুই টোটা আছে! কিন্তু আর ফায়ার করতে ইচ্ছে হল না তাঁর। কিন্তু চথাটা কাঁ-আ কাঁ-আ শব্দ করে ক্রমাগত চক্রাকারে উড়তে লাগল মাথার উপর। একটু দূরে ভিখন গোপের নৌকোটা বাঁধা আছে দেখলেন। কিন্তু কাছে-পিঠে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। মহেন্দর সিংয়ের ডোটায় আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হল না। ভাবলেন, সোজা হাঁটতে হাঁটতে ঘাটেই চলে যাই।

আবার উঠে হাঁটতে লাগলেন।

'কাঁ-আ' 'কাঁ আ—'

চথাটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কি মুশকিল! বাড়ি পর্যন্ত যাবে নাকি! উপরের দিকে না চেয়েই তিনি চলতে লাগলেন। বেশ জোরে জোরে চলতে লাগলেন আবার। চথাটা কিন্তু নাছোড়বান্দা, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

এইভাবে আধ ঘণ্টাটাক কাটল। তারপর আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা। তিনি কবি নন, তবু তাঁর মনে একটা আজগুবি রূপক মূর্ত হতে লাগল ক্রমশ। তাঁর মনে হতে লাগল, যে পুরুষ-চথাটাকে তিনি জখম করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন সে যেন সখীচাঁদ, আর যেটা উড়ে উড়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসছে সে বিদিয়া। 'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ' এই ডাকের মধ্যে তিনি শুনছিলেন, 'দয়া করুন, ওকে ছেড়ে দিন। ওর চাকরিটা যেন না যায়, তা হ'লে আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।'

বন্দী পাখীটা ছটফট করছে তাঁর কবলে।

...সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। বালির চর ভেঙে হেঁটে চলেছেন ভুবন সোম। মাথার উপর করুণ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলেছে চথীটা। দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে আছেন তিনি চথাটাকে। কিছুদূর গিয়ে একটা সবুজ ক্ষেত চোখে পড়ল। চোখ জুড়িয়ে গেল যেন। মুগ্ধনেত্রে সেটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন! ক্ষেতের মাঝখানে একটা লোক ঘাস কাটছিল। সেই দিকে এগিয়ে গেলেন ভুবন সোম। লোকটাকে ডাকতেই এগিয়ে এল সে।

'এই চিড়িয়াঠোকো বন্ধন কাট দেও।'

লোকটার হাতে কাস্তে ছিল, পায়ের এবং ডানার বাঁধন অনায়াসে কেটে ফেললে সে। ভুবন সোম ছেড়ে দিলেন পাখীটাকে। নিমেষের মধ্যে সঙ্গিনীর কাছে ফিরে গেল সে। তারপর একসঙ্গে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল, ভুবন সোম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

॥ সাত ॥

সেদিনও সন্ধ্যার ষ্টীমারটা খুব 'লেট' আসছিল।

সখীচাঁদ যাদব নিজের কোয়ার্টারে বসে 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ছিল তন্ময় হয়ে। সে ঠিক করতে পারছিল না, বৈদেহীর সঙ্গে কার বেশী মিল—তিলোত্তমার, না আয়েষার! হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে পয়েণ্টস্‌ম্যান বাসদেওয়ের কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে উঠল।

'সখীচাঁদ বাবুসাহেব আয়ে হেঁ।'

সাহেব! সাহেব কে এল আবার! লণ্ঠনটি নিয়ে বেরিয়ে দেখে—ও বাবা, স্বয়ং ভুবন সোম!

ভুবন সোম বাসদেওয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আব তুম যাও।'

বাসদেও চলে গেল।

ভুবন সোম সখীচাঁদকে অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন একটা।

'তুলসীগাছ আছে তোমার বাড়িতে?'

'তুলসীগাছ! আজ্ঞে না।'

'কয়েকটা তুলসীপাতা চাই।'

'বোসবাবুর বাড়িতে আছে। আনব?'

'আন।'

সখীচাঁদ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ভুবন সোম চেয়ারে বসে বসে পা দোলাতে লাগলেন। মিনিট দশেক পরে সখীচাঁদ ফিরল একমুঠো তুলসীপাতা নিয়ে।

'কাগজে মুড়ে দেব?'

'না। তোমার ওই কলসীতে কিসের জল?'

'গঙ্গাজল, সার্‌।'

'একটা বাটিতে ঢাল।'

সখীচাঁদ উত্তরে ত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার সাহস ছিল না তার। একটা বাটিতে গঙ্গাজল ঢাললে সে খানিকটা।

'তুলসীপাতাগুলো ওর মধ্যে ফেলে দাও। আর এই পয়সাটাও দাও।'

মনিব্যাগ থেকে একটি পয়সা বার করে দিলেন তাকে।

'এইবার তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করে দিব্যি কর যে, আর কখনও ঘুষ নেবে না। হাঁ করে দেখছ কি? ওইগুলো হাতে নিয়ে তিনবার জোরে জোরে বল—আর আমি কখনও ঘুষ নেব না। জোরে জোরে বল।'

সখীচাঁদকে বলতে হল।

'এবার তোমাকে ছেড়ে দিলুম। ভবিষ্যতে এই প্রতিজ্ঞার কথা যেন মনে থাকে। আর এক কাজ করো। অনিলকে খবর দিয়ে দিও যে, এই ষ্টীমারেই আমি চলে যাচ্ছি। আজ রাত্রেই খবরটা দিতে পারবে?'

'আমিই না হয় চলে যাব সার্, ডিউটি ওভার হলে।'

'তাকে বলে দিও যে, আমি একটা চখা পেয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, সার্।'

ভুবন সোম উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সখীচাঁদ লণ্ঠনটা নিয়ে এগিয়ে আসতেই বললেন, 'না, আলো দেখাতে হবে না।'

গটগট করে এগিয়ে গেলেন জেটির দিকে।

পনর দিন পরে ঝকুসু পিওন শ্রীমতী বৈদেহী যাদবের নামে গোলাপী খামে যে চিঠিটা দিয়ে গেল তাতে সখীচাঁদ সবিস্তারে যা লিখেছিল তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ছ পাতা চিঠি। এ কাহিনীর পক্ষে যেটুকু প্রাসঙ্গিক সেইটুকু শুধু উদ্ধৃত করছি।

পুনশ্চ দিয়ে সখীচাঁদ লিখেছিল, 'দেবী, একটা সুসংবাদ আছে। ভুবন সোম আমার নামে রিপোর্ট করে নি। শুনলাম, সাহেবগঞ্জে আমাকে বদলি করেছে। ওটা খুব ভাল স্টেশন। অনেক উপরি—'

পঞ্চপর্ব

উৎসর্গ

কবি, কাহিনীকার ও সাহিত্যরসিক
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
বন্ধুবরেষু

টেলিফোন পর্ব

"হ্যালো—"

"হ্যালো, কে, আরে ভূপেশ না কি! কোথা থেকে ফোন করছ?"

"কোলকাতা থেকে। তুমি হঠাৎ দিল্লী চলে গেলে কবে?"

"দিন সাতেক হল এসেছি। বিজনেসের ব্যাপারে। কিছুদিন থাকতে হবে এখন।"

"তাই শুনলাম তোমার বাড়ি গিয়ে। একটা জরুরী দরকারে ফোন করছি সেই জন্যে। একটা খবর আমার এখনি চাই।"

"কি খবর।"

"তুমি কি আবার বিয়ে করবে ঠিক করেছ?"

"আমি! কে বললে!"

"পরেশ মল্লিকের সঙ্গে ট্রামে দেখা হল, তার কাছেই শুনলাম।"

"একবার বিয়ে করেই তো নাজেহাল হয়েছি। আবার!"

"এবার হয়তো সুখী হবে। দ্বিতীয় বার বিয়ে তো লোকে হরদম করছে।"

"আমার পক্ষে সেটা কি উচিত এই বয়সে।"

'নয় কেন! কিই বা এমন বয়স হয়েছে তোমার! পঁয়তাল্লিশ? ও, চল্লিশ। তাহলে তো তুমি ইয়ংম্যান হে। শরীরও অপটু নয়, বিয়ে করবে না কেন। ছেলেপিলে নেই, টাকার অভাব নেই, বিয়ে না করবার কোনও সঙ্গত কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না। সেদিন বাড়ি কিনেছ অতবড়। বিয়ে না করলে অত বড় বাড়ি ভরাবে কি দিয়ে।"

"পাগল না কি। লোকে কি বলবে।"

"লোকে যা খুশী বলুক তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার নিজের ইচ্ছেটা কি শুনি—"

"এই তোমার জরুরী দরকার? রাত দুপুরে এরই জন্যে ফোন করেছ—"

"আগে শোন সবটা, তার পর মন্তব্য কোরো। শুনলে বুঝবে ব্যাপারটা আমার পক্ষে কত মারাত্মকরকম জরুরী! তা না হলে কি আমি শুধু শুধু ট্রাঙ্ক কল করে পয়সা নষ্ট করছি।"

"কি বল।"

"আমার এক মাসতুতো মেজো শালীর একটি বয়স্থা মেয়ে হঠাৎ এসে আমার ঘাড়ে পড়ে গেছে। মেয়েটির বাপ মারা গেছে অনেকদিন আগেই। সে মানুষ হচ্ছিল তার

এক বিধবা মাসীর কাছে। সে মাসীও মারা গেছে মাসখানেক হল। মেয়েটি বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়েছে। হ্যালো,—শুনছ? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছিলাম কি করি, এমন সময় শুনলাম তুমি বিয়ে করবে ঠিক করেছ।"

"বাজে কথা শুনেছ—"

"পরেশ মল্লিক বললে ওই উদ্দেশ্যে তুমি নাকি একটি অনাথা মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয়ও দিয়েছ।"

"বাজে কথা বলেছে—"

"পরেশকে যতটুকু চিনি তাতে—"

"কাউকে চেনা অত সহজ নয়, ভাই। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।"

"তা মানছি। কিন্তু পরেশের মতো একজন গম্ভীর লোক বানিয়ে বানিয়ে অতগুলো মিছে কথা বলবে, এ কথা ভাবাও ঠিক নয়—"

"পরেশ তোমাকে ভাঁওতা দিয়েছে। তোমার শালীর মেয়ের অন্য কোনও ব্যবস্থা কর। তুমি চেষ্টা করলে কোথাও চাকরি জুটিয়ে দিতে পারবে। হেলথ কেমন?"

"খুব ভাল। একেবারে নিটোল চেহারা। আমি তাকে নার্সিং শেখাবার জন্যে কোথাও ভরতি করবো ভেবেছিলাম। সব ঠিকই করে ফেলছি, কাল ভরতির লাস্ট ডেট। এমন সময় পরেশের মুখে শুনলাম যে তুমি বিয়ে করছ। সত্যিই যদি বিয়ে কর আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর না ভাই। মেয়েটি তোমার ঠিক উপযুক্ত। বয়স প্রায় পঁচিশ, স্বাস্থ্যবতী, কর্মঠ। হ্যালো—আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে লোকে প্রথম প্রথম কিছুদিন বলে যে বিয়ে করব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করে। তুমি যদি আশা দাও তাহলে অপেক্ষাও করতে পারি আমি। টেক ইওর টাইম, তাড়াতাড়ি কিছু নেই—"

"তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোথা?"

"সেদিন বরেন বলে যে ছোকরাটিকে তুমি উদ্ধার করেছ তার কাছ থেকেই পেলাম। প্রথমে দিতে চায়নি, বলছিল তুমি নাকি মানা করে গেছ। খুব জরুরী দরকার আছে বলাতে ঠিকানা, ফোন নম্বর সব লিখে দিলে। ঠিকানা দিতে মানা করে গেছ কেন বুঝলাম না।"

"বিজনেস ব্যাপারে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয় ভাই। না, না, আমি এখন কোনও কিছু ঠিক করিনি। পরেশকে এমনই বলেছিলাম ঠাট্টা করে—"

"কিন্তু পরেশ যে বললে তুমি ওই উদ্দেশ্যে একটি অনাথা মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছ—"

"কাউকে আশ্রয় দিলেই বিয়ে করতে হবে তাকে! কি আশ্চর্য! পরেশ কি কি বলেছে বলতো—"

"সে বললে একদিন একটি লেখাপড়া-জানা অনাথা মেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেরুচ্ছিল, এমন সময় সেই খবরের কাগজের আপিসের সামনে তার সঙ্গে তোমার

নাকি দেখা হয়। তারপর কথা কইতে কইতে রাস্তায় এসে তুমি নাকি আশ্বাস দিয়েছ যে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। নিজের ঠিকানা দিয়ে একথাও বলেছ যে দরকার হলে সে যেন তোমার সঙ্গে দেখা করে। মেয়েটি তোমার সঙ্গে দেখাও করেছে এবং তুমি নাকি তাকে আশ্রয়ও দিয়েছ। পরেশকে তুমি নিজেই বলেছ যে যদি আবার বিয়ে কর তাহলে ওই রকম একটি মেয়েকেই বিয়ে করবে। একসঙ্গে বউ, স্টেনো এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী হবে সে। এসব বলনি তুমি পরেশকে ?"

"বলেছি। ঘটনা সবই ঠিক ! উপকরণ ঠিক আছে। আলু এবং পটল দিয়ে ছেঁচকিও বানান যায়, দমও বানান যায়। পরেশটা দমবাজ দেখছি।"

"আমার তাহলে কোনও আশাই নেই ?"

"তুমি যে রকম আশা চাইছ তা দেওয়া তো অসম্ভব আমার পক্ষে। মেয়েটিকে নার্সিং শিখতেই পাঠাও না।"

"তাইতো ঠিক করেছিলাম। এখনও তাই ঠিক আছে। ভরতি হয়তো করতে পারব, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ও পালিয়ে আসবে। ভয়ানক ভীতু, তার উপর ছুঁচিবাই আছে।"

"ও বাবা ! এই মালটিকে তুমি আমার ঘাড়ে চড়াতে চাইছ। খুব হিতৈষী বন্ধু তো—"

"হিতৈষী বলেই চাইছি। এই বয়সে তুমি যদি কোনও নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা রূপসীকে বিয়ে কর তাহলে সেটা কি ঠিক হবে ? সুলোচনার মতো মেয়েই তোমার উপযুক্ত। মহিষের মতো খাটবে আর কৃতজ্ঞচিত্তে সারা জীবন তোমার সেবা করবে।"

"দেখ ভাই ভুপেশ, ইতিপূর্বে বিয়ে তো করেছি একবার। আমার পরিবারটি অপ্সরীও ছিল না, কুবের-কন্যাও ছিল না। এক বন্ধুর স্ত্রীর অনুরোধে হা-দরিদ্রের ঘর থেকে সাদা-মাটা দেখেই বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু সে যে খুব কৃতজ্ঞ ছিল তাতো বলতে পারি না। আমাকেই বরং সারা জীবন হাতজোড় করে থাকতে হয়েছে, যেন তাকে বিয়ে করে আমি ঘোর অপরাধ করেছি—"

"এখন যদি শিক্ষিতা রূপসী মেয়ে বিয়ে কর তাহলে হাঁটুও গাড়তে হবে—"

"কি আপদ। আমি যে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছি এ ধারণা তোমার হল কি করে। আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি। পরেশ মাস্টারের মুখে একটা উড়ো খবর শুনে রাত-দুপুরে ফোনে কি কাণ্ড।"

"আমার মতো অবস্থায় পড়লে তুমিও ঠিক এই কাণ্ডই করতে। আচ্ছা, একটা কথা অন্তত দাও। বিয়ে যদি কর আমার কথাটা মনে রাখবে।"

"তুমি পুলিসে চাকরি কর, তোমার পক্ষে একটা পাত্র যোগাড় করা কি এতই শক্ত।"

"পুলিসে চাকরি করলেই যে সর্বশক্তিমান হওয়া যায় এ ধারণা কি করে হল তোমার ?"

"দেখেশুনে তাই তো মনে হয়—"

'ভুল ভুল, অত্যন্ত ভুল। নিজেদের জন্তে আমাদের কিছু করবার উপায় নেই। লক্ষ জোড়া চোখ আমাদের প্রতিটি কার্য দেখছে। একাধিক মনিবের মন জুগিয়ে চলতে হচ্ছে সর্বদা। সেদিন তোমার বরেন ছোকরাকে ছেড়ে দিয়েছি, তাই নিয়ে নানারকম কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর ভাই আমি অন্তত অত্যন্ত অসহায়। ঋণে মাথার চুলটি পর্যন্ত বিকিয়ে আছে। আমার এ দায়টা তুমি উদ্ধার কর, বিধু। ইচ্ছে করলেই তুমি পার। হ্যালো—হ্যালো—কেটে দিলে না কি—"

॥ দুই ॥

"হ্যালো, হ্যালো, কে বরেন, আমি বিধু, হ্যাঁ খবর সব ভালো তো ?"

"ভালই সার।"

"তোমাকে যে কাজটি করতে মানা করে এসেছিলাম তুমি ঠিক সেইটি করেছ দেখছি।"

'আজ্ঞে না সার! আপনি যেমন যেমন বলে গেছেন সব ঠিক তেমনি তেমনি করে যাচ্ছি।"

"ভূপেশকে আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলে কেন—"

"ও, ভূপেশবাবুকে! তিনি বললেন যে খুব জরুরী খবর দিতে হবে আপনাকে একটা, না দিলে ভয়ানক ক্ষতি হবে। তাই আমি ভাবলাম—"

"কোন কারণেই আর কাউকে তুমি আমার ঠিকানা দেবে না।"

"আচ্ছা সার।

"ফোন নম্বরও নয়।"

"আচ্ছা সার।"

"বিশাখা দেবীর খবর কি ?"

"ভালই।"

"তোমার সঙ্গে কোনও কথা-টথা হয়েছে ?"

"আজ্ঞে হয়েছে। তবে ফোনে। তিনি ওপর থেকে মোটে নামেনই নি।"

"ও। খাবার-টাবার সব ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা ভাল। আমি যে দিল্লী এসেছি একথা বলনি তো ওঁকে।"

"আপনি যখন মানা করে গেলেন তখন কি করে বলব। বলেছি আপনি জামশেদপুর গেছেন।"

"ভ্যাট্‌স্‌ গুড্‌। আর কেউ খোঁজ করতে এসেছিল ?"

"আজ্ঞে না, এখনও পর্যন্ত তো কেউ আসেনি।"

"ফোনে তোমার সঙ্গে ওঁর কি কি কথা হয়েছে ?"

"বিশেষ কিছুই না। তিনি আমাকে এটা ওটা আনতে বলেছেন, আমি আনিয়ে দিয়েছি।"

"কি কি আনতে বলেছেন ?"

"খানকয়েক তাঁতের শাড়ী, একটা লক্ষ্মীবিলাস, এক বাক্স সাবান আর কিছু ফুল। ফুল দু'বেলাই দিতে হচ্ছে।"

"পুজোটুজো করেন নাকি ?"

"ঠিক বলতে পারি না সার।"

"যা যা চান ঠিকমতো দিও, বুঝলে। আর কোন বেয়াদপি যেন কোরো না। গিয়ে যদি শুনি—।"

"আজ্ঞে না, আমি ভদ্রবংশের ছেলে।"

"কথাটা শেষ পর্যন্ত শোন। গিয়ে যদি শুনি যে তুমি ওঁর মনে কোনও আঘাত দিয়েছ, তাহলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে দূর করে দেব। তোমার এম. এ. ডিগ্রি তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আবার গিয়ে পুলিসের খপ্পরে পড়তে হবে। মনে রেখো যে উনি অনাথা এবং আমার অতিথি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে রাখব বই কি। তা ছাড়া ওঁর মনে আঘাত দিতেই বা যাব কেন শুধু শুধু। আপনার ফিরতে কত দেরি হবে সার ?"

"দিন পনরো তো হবেই, বেশীও হতে পারে।"

"তাহলে কিছু টাকার ব্যবস্থা করুন, সার। আমার হাতে আর মাত্র ১০।৭৫ টাকা আছে—।"

"তিনশ' টাকা ফুরিয়ে গেল এর মধ্যে ?"

"প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বিশাখা দেবীর জন্য নানারকম জিনিসপত্র কিনতে হ'ল যে। ওঁর স্যুটকেসটা কি আপনি এনেছিলেন ? সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্যে নানারকম জিনিস কিনতে হচ্ছে। শাড়িতেই তো দেড়শ' টাকা বেরিয়ে গেছে। কয়েকটা রেডিমেড শায়াও কিনে দিতে বলছেন। ওঁর স্যুটকেসটা পেলে এত খরচ হ'ত না। আপনি কি হোটেল থেকে সেটা আনেন নি ?"

"ঠিক মনে পড়ছে না। যাক আমি ফিরে গিয়ে সেটা খুঁজে বের করব। এখন ওঁর যা যা দরকার কিনে দাও সব। কাল শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দেব। চেক পাঠাব। তোমার কি একাউণ্ট আছে কোনও ব্যাঙ্কে ?"

"আজ্ঞে না। বেয়ারার চেক পাঠাবেন। না হয় আপনি আপনার আপিসে যদি বলে দেন সেখান থেকেও নিয়ে নিতে পারি। আপনার আপিসটা কোথায় বলুন তো, সার ! আপনি বলেছিলেন ধর্মতলা স্ট্রীটে, কিন্তু নম্বরটা বলেন নি।"

"থাক, তোমাকে আপিসে যেতে হবে না। আমি তোমার নামে বেয়ারার চেকই পাঠাব। আমার খোঁজে আর কেউ আসেনি তাহলে।"

"ভূপেশবাবু ছাড়া আর কেউ আসেনি।"

"সাবধানে থেকো, বুঝলে। হ্যালো—"

"আচ্ছা।"

'হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন। বিশাখা দেবী কোথাও যদি যেতে চান তুমিও সঙ্গে সঙ্গে থেক, বুঝলে।"

"উনি যদি আমাকে সঙ্গে নিতে না চান, সার। না চাইতেও তো পারেন—"

"চাইবেন না কেন! সেটা তোমাকে একটু কৌশলে ম্যানেজ করতে হবে। উনি বেরুতে চাইলে ট্যাক্সি আনাবে। তুমিও চড়ে বসবে তাতে ড্রাইভারের পাশে। একলা ছেড়ে দিও না, বুঝলে—"

"আচ্ছা সার -"

'উনি কোলকাতা শহরে নূতন এসেছেন কিনা, আর আজকাল পথে-ঘাটে চতুর্দিকে বিপদ, তাই বলছি। হ্যালো—"

"বুঝেছি সার।"

॥ তিন ॥

"হ্যালো, বিশাখা দেবী, আমি কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলাম। আপনার শায়ার মাপ তো ব'লে দেন নি।"

"প্রমাণ সাইজের বললেই হবে।"

"ও। মোটা রোগা সকলেরই এক সাইজের লাগে না কি। আমি ঠিক জানি না—।"

"আপনি প্রমাণ সাইজ বলুন, তাহলেই হবে—।"

"আচ্ছা। সাদা রঙেরই নেব তো?"

"সাদা রং নেবেন না। গোলাপী বা ফিকে নীল।"

"গোলাপী বা ফিকে নীল—ও আচ্ছা।"

'আমার জন্যে ফল আর কিনতে হবে না।"

"কেন বলুন তো। এ বাজারে জবা ছাড়া কিছু পেলামই না। তখনই মনে হয়েছিল রোজ রোজ জবা দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, বলেন তো নিউমার্কেট থেকে পদ্ম এনে দি—"

"না, দরকার নেই—।"

"রাগ করলেন ?"

"না, না, রাগ করব কেন। এমনিতেই আপনাদের খরচ হ'য়ে যাচ্ছে, ফুল কিনে আর বাজে খরচ করতে হবে না।"

"পুজোর জন্যে ফুল তো দরকারই, বাজে খরচ বলছেন কেন।"

"আমি পুজো করি কে বললে আপনাকে।"

"ফুল নিয়ে কি করেন তাহলে--"

"সাজি। ছেলেবেলা থেকে ফুলের গয়না পরা অভ্যাস আমার। আমাদের একটা বড় বাগান ছিল, নানারকম ফুল ফুটত তাতে। তাই আপনাকে কিছু ফুল কিনতে বলেছিলাম। থাক, আর দরকার নেই।"

"দরকার নেই কেন ? কি কি ফুল আপনার পছন্দ, বলুন ন, এনে দিচ্ছি।"

"কি হবে বাজে খরচ ক'রে—।"

"আপনি যাঁর অতিথি তিনি বারবার বলে গেছেন আপনার কোনও প্রকার অসুবিধা যেন না হয়। এসে যদি শোনেন যে তাঁর পয়সা বাঁচাবার জন্যে আপনাকে ফুল কিনে দেওয়া হয় নি, তাহ'লে আমার চাকরিই থাকবে না। কি ফুল আপনার পছন্দ, বলুন, এখনই এনে দিচ্ছি। জবাগুলো আমারও তেমন পছন্দ হয়নি। কি ফুল ভালবাসেন আপনি ?"

"আমি যে ফুল ভালবাসি তা কি এখানে পাওয়া যাবে ?"

"পয়সা ফেললে কোলকাতা শহরে কি না পাওয়া যায় !"

"তাহলে পুটুস ফুল যদি পান আনবেন—"

"পুটুস ? নামই তো শুনিনি কখনও, কি রকম দেখতে বলুন তো—"

"জঙ্গলে ফুল। অনেকে বেড়াতেও লাগায়। ছোট ছোট ফুল এক সঙ্গে থোকায় থোকায় হয়, রং অনেক রকম দেখছি, লালেতে হলদেতে মেশানো, ফিকে গোলাপী, সাদ !

"পুটুস ফুল ! আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে—থোকা থোকা হয় ? ধরুন যদি না পাই। বড্ড শক্ত টাস্‌ক্ দিয়ে দিলেন একটা অলটারনেটিভ দিন।"

"বেশ কুন্দ আনবেন তাহলে।"

"পদ্ম বা গোলাপ আপনার পছন্দ নয় বুঝি।"

"হ্যাঁ। পান তো আনবেন।"

"গোলাপ অনেক রকম পাব।"

"ছোট ছোট গোলাপ একরকম পাওয়া যায়। খোঁপায় বা বাটন-হোলে লাগাবার জন্য।"

'হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি।"

"পান তো তাই আনবেন।"

"আচ্ছা শায়াগুলা এখুনি এনে দিচ্ছি।"

"হ্যালো, কে, হ্যালো বিষ্ণুচরণ ?—"

'আমাকে বিষ্ণুচরণ ব'লে আর ডেকো না। আমি এখন জমিরুদ্দিন। কি বলছ।"

"আমার চিঠি পাওনি ?"

"পেয়েছি।"

"বাড়িগুলো নিয়ে কি করি বলতো।"

"করবে আবার কি। দখল ক'রে ভোগ করগে যাও। চাবি তো তোমায় দিয়ে দিয়েছি।"

"চাবি তো দিয়েছ, কিন্তু দাবি শেষ পর্যন্ত টিকবে কি ?"

"টেকা তো উচিত। ও মেয়ে যে নবেন্দুবাবুর তার কোনও প্রমাণ আছে ?"

"সেই প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্তেই তো দিল্লী এসেছি।"

"পেলে কিছু ?"

"অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি।"

"কি রকম।"

"বেশ ঘাবড়ে গেছি ভাই।"

"শুনিই না ব্যাপারটা কি।"

"এখানে এসে শুনলাম, নবেন্দুবাবু যখন লাহোরে ছিলেন তখন লুকিয়ে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেছিলেন একটি। সে স্ত্রীকে কখনও দেশে নিয়ে যাননি। সেই বিবাহের ফল ওই বিশাখা। উনি দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেন নি, তাই দেশের লোকে জানত যে উনি আজন্ম-ব্রহ্মচারী।"

"মেয়েটির খবর তোমাকে দিলে কে ?"

"শোন তবে, ধরে থাক। আমাদের বাড়ির কাছেই যে ছোট হোটেলটা আছে তার মালিক নকুলেশ্বর আমার খুব পরিচিত লোক। সে একদিন এসে গল্পচ্ছলে আমাকে বললে লাহোর থেকে একটি রেফিউজি মেয়ে এসেছে তার হোটেলে। এসে তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার বাবা নাকি পূর্ববঙ্গের লোক, সেখানে তার প্রকাণ্ড বাড়ি, জমিদারী প্রভৃতি ছিল, রায়টের সময় তিনি নাকি কোলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে কোলকাতাতেই বাস করছিলেন। ভদ্রলোকের নাম নবেন্দু বিশ্বাস। নামটা শুনেই আমার ভুরু কুঁচকে গেল। মনে পড়ল তুমি যে বাড়ি আমাকে বেচেছ সে-ও তো কোন এক নবেন্দু বিশ্বাসের। চুপ করে রইলাম কয়েক মিনিট। কিন্তু মনে হল ব্যাপারটা খোঁজ করা উচিত। নকুলেশ্বরকে আমার আসল মনোভাবটা অবশ্য জানতে দিলাম না। বললাম, আমি এক

নবেন্দু বিশ্বাসকে চিনতাম, চল তো দেখি মেয়েটির যদি উপকার করতে পারি। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম মেয়েটির খোঁজে। হোটেলে গিয়ে শুনলাম সে নাকি একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে কোথায় বেরিয়েছে। ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল। নকুলেশ্বর বলে উঠল—ওই যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। একটা খবরের কাগজের আপিসের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মেয়েটি রূপসী, বয়সও খুব বেশী বলে মনে হল না। নকুলেশ্বরের অন্ত কোথায় কাজ ছিল, সে মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেল। মেয়েটি বললে সে তার নিরুদ্দিষ্ট বাবার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে এসেছিল। আলাপ করে বুঝলাম যে নবেন্দু বিশ্বাসের বাড়ি তিনটি তুমি আমাকে বিক্রি করেছ, এ তারই মেয়ে। শুধু তাই নয়, তার বাবা যে তাদর পূর্ববঙ্গের সম্পত্তির বিনিময়ে কোলকাতায় বাড়ি কিনেছিলেন এ কথাও সে জানে! তবে বাড়ীর ঠিকানা তার জানা নেই। নবেন্দুবাবু মাস ছ'য়েক আগে জানিয়েছিলেন যে বাড়িগুলোর সব ব্যবস্থা করে তারপর ওকে নিয়ে আসবেন। তারপর থেকে কিন্তু আর কোনও চিঠি পায় নি সে। সামনে পরীক্ষা ছিল বলে আসতেও পারে নি। এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে তাই বাপের খোঁজে বেরিয়েছে।"

"মেয়েটির মা বেঁচে আছেন?"

"না। তিনি মারা গেছেন সম্প্রতি। সেইজন্তে মেয়েটিকে আরও চলে আসতে হয়েছে। কারণ মায়ের দিকে যে দু'একজন আত্মীয় ছিল, তারা লাহোর রায়টে মারা গেছে। এরা দু'জনে, মানে, মা আর মেয়ে, দিল্লীতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। মা-টিও মারা গেছে সম্প্রতি। সুতরাং মেয়ে এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। হ্যালো—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি, তুমি বলে যাও না। মেয়েটি এখন কোথায়?"

"তাকে ভুলিয়েভালিয়ে আমার বাড়িতে এনে রেখেছি"—

"এখনও সেইখানেই আছে?"

"হ্যাঁ। আমি বিজনেসের ছুতোয় এখানে চলে এসেছি কিন্তু আসলে আমি এসেছি ওর সম্বন্ধেই খোঁজখবর নিতে। তার কাছ থেকেই কয়েকটা ঠিকানা পেয়েছিলাম। তুমি যে নবেন্দু বিশ্বাসের বাড়ি আমাকে বেচেছ, বিশাখা যে তারই মেয়ে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

"বিশাখা কি তোমার বাড়িতে একাই আছে?"

"হ্যাঁ। আমার দোতলার ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়েছি তাকে। দাই, চাকর আছে। সম্প্রতি আমি একটি প্রাইভেট সেক্রেটারী বাহাল করেছি, সে-ও দেখাশোনা করছে মেয়েটির। না, বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই। আমি তো বিয়ে করিনি আর। এখন কি করা যায় বলত—"

"করবে আবার কি? যা কিনেছ তা ভোগ কর—"

"বাড়ি যদি নবেন্দু বিশ্বাসের হয় আর তার যদি এখন ওয়ারিশ বেরোয়—"

"বেরুলেই বা। নবেন্দু বেঁচে থাকলে বাড়ি তার হত, কিন্তু সে যখন মারা গেছে তখন বাড়ি আমার। কারণ তার সঙ্গে আমার মৌখিক কথা হয়েছিল শুধু। দলিল করে, তাকে আমি বাড়ি লিখে দিইনি। সে বেঁচে থাকলে দিতাম হয়তো, কিন্তু সে যখন বেঁচে নেই তখন ও-বাড়ি আইনত আমার থেকে গেছে। তুমি স্বচ্ছন্দে নিতে পার।"

"কিন্তু তুমি পাকিস্তানে নবেন্দুর বিষয়-সম্পত্তিগুলি ভোগ করছ কোন্ অধিকারে তাহলে—"

"নবেন্দু আমাকে সেগুলো লিখে দিয়ে গিয়েছিল যে। তার দলিল আমার কাছে আছে। আমিও তাকে লিখে দিতুম, কিন্তু সেকেণ্ড রায়টের সময় সে মারা গেল বলে হয়ে উঠল না!"

"আমাকেও তো তুমি দলিল করে দাওনি কিছু।"

"তোমাকে দেব। বীরেনবাবুর কাছে দলিল-পত্র সব ড্রাফট করাই আছে, যেদিন বলবে সেইদিনই রেজেস্ট্রী করে দেব।"

"বীরেন মল্লিক?"

"হ্যাঁ হে, আমার উকিল।"

"তাহলে তুমি বলছ যে বিশাখা তার পূর্ববঙ্গের বিষয়-সম্পত্তিও পাবে না, কোলকাতার বাড়িও পাবে না?"

"সে যদি পূর্ববঙ্গে এসে বাস করতে চায় এখুনি তাকে আমি সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি। তা সে চাইবে কি।"

"ধর সে যদি বিক্রি করে—"

"এখনি বিক্রি করলে সে যে দাম পাবে তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সে দাম দিতে আমার আপত্তিও নেই। এখন এখানে হিন্দুদের সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। ও সম্পত্তির এখন দু'হাজার টাকাও দাম হবে কিনা সন্দেহ। দু'হাজার টাকা নিতে সে যদি রাজি থাকে আমাকে খবর দিও, টাকা পাঠিয়ে দেব।"

"ন্যায়ত ধর্মত এটা কি ঠিক হবে?"

"দেখ ভাই, ন্যায় আর ধর্মে আমার আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। আমার স্ত্রীকে হত্যা করে ওরা যখন আমাকে মুসলমান করে তখন ন্যায় বা ধর্ম আমার কোনও কাজেই লাগে নি। আমার শক্তিশালী প্রতিবেশী জমিদার ওদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফেলে পালিয়েছিলেন, আমার কথা ভাবেন নি। আমার স্ত্রী ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন, আমার মুখের দিকে তাকালেন না অথচ হিন্দুধর্মে স্ত্রী নাকি সহধর্মিণী। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি মুসলমান হতে চাইলাম, তিনি চাইলেন না। তাঁর অহঙ্কারে ঘা লাগল। অহঙ্কারই সকলকে চালায়, ন্যায় বা ধর্ম নয়। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমি বিষ্ণুচরণরূপে তোমাদের সমাজে যে সুখ পাই নি, জমিরুদ্দিনরূপে তা পেয়েছি। সুতরাং আমি জমিরুদ্দিনই থাকব।"

"তুমি করাচি থেকে ফিরবে কবে ?"

"মাসখানেক পরে।"

"তুমি ফিরে তাহলে আমাকে দলিল-পত্র করে দেবে বলছ ?"

"হ্যাঁ, তাই দেব। সব ঠিক করাই আছে—"

"তোমার সেই মাসাজ বারের কি হল ?"

'বাড়ি ঠিক করে এসেছি। ফার্নিচার অর্ডার দিয়েছি। এইবার গিয়ে সেটারও ব্যবস্থা করব—"

"খুব লাভজনক ব্যবসা না কি। আমার কোন ধারণাই নেই। তুমি বলছিলে বটে—'

"যদি চলে খুব লাভজনক। মেয়েরা গা, হাত, পা টিপে স্নান করিয়ে দেবে, বুঝছ না ? খদ্দেরের অভাব হবে না। তবে 'শো' চাই! ভাল বাড়ি, ভাল ফার্নিচার, সুন্দরী মেয়ে, আভিজাত্যের ভড়ং—এ সব দরকার। আমি গিয়ে ব্যবস্থা করব সব। তুমিও এস, আবার পার্টনারশিপে নতুন ব্যবসা শুরু করা যাক—"

"দেখি। অনেক রকম ব্যবসা ফেঁদেছি কি না, তা ছাড়া এ সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই তেমন—"

"জ্ঞান হতে দেরি লাগবে না। আচ্ছা সে ফিরে গিয়ে হবে এখন।"

"আচ্ছা—"

॥ পাঁচ ॥

"কে—"

"আমি, আমি বরেন।"

"ও বরেনবাবু, কি বলছেন ?"

"বলছি, মানে তেমন বিশেষ কিছু না। এই একটু আগে বেরিয়েছিলাম। একটা জিনিস চোখে পড়ল, মনে হল ভুল করেছি, মানে ঠকেছি। তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন সেটা সংশোধনও করা যেতে পারে।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় বেরিয়েছিলেন—"

"কোথাও না, রাস্তায় বেরিয়েছিলাম একটু।"

"রাস্তায় ? কি এমন দেখলেন ?"

'গ্লাসকেসে চমৎকার একটা শাড়ি অথচ দাম মাত্র ছাব্বিশ টাকা। ওই দামেই আজ সাকালে যে শাড়ি আপনার জন্ম এনেছি এটা তার চেয়ে অনেক ভাল। আপনি যদি বলেন বদলে আনতে পারি।"

'তা কি আর এখন সম্ভব ?"

"সম্ভব অসম্ভবের কথা ছেড়ে দিন। আপনি যদি বলেন অসম্ভবকেও সম্ভব করব। যে দোকান থেকে এনেছি তাকে বলেই এসেছিলাম যে পছন্দ না হলে ফেরত দেব।"

'না, থাক!"

"থাক কেন। যে শাড়িগুলো এনে দিয়েছি তার সবগুলোই কি আপনার পছন্দ হয়েছে ?"

"একটাও হয় নি।"

"একটাও হয় নি! বলেন কি! তাহলে সবগুলোই নীচে পাঠিয়ে দিন, বদলে আনছি।"

"না, থাক, আবার কেন মিছে কষ্ট করবেন।"

"কিছু কষ্ট হবে না আমার। দিন, পাঠিয়ে দিন।"

"না, থাক।"

'আপত্তি করছেন কেন ?"

"অনর্থক বলে। আমার পছন্দ না হলেও শাড়িগুলো ভালই। পরতে অসুবিধা হবে না।"

"তবু আপনার যখন পছন্দ হয় নি—"

"বদলে যা আনবেন তা-ও আমার পছন্দ না হতে পারে। আমার পছন্দ অপছন্দ আপনি ঠিক করবেন কি করে ?"

"আপনি যেমন বলে দেবেন তেমনি আনবো। কি রকম রং চাই, কি রকম পাড় চাই, বলুন, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।"

"তা-ও কি বলা যায় সব সময়ে চট্ করে। অনেক সময় এমনও হয় যে দোকানে যেটা পছন্দ করে কিনে আনলাম বড়িতে এসে সেটা পছন্দ হচ্ছে না। দরকার কি হাঙ্গামা করবার। যা এনেছেন থাক। আমার স্যুটকেসটার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না ?"

"না।"

"অত বড় স্যুটকেসটা হারিয়ে গেল না কি। কাপড়-চোপড় ছাড়াও ওতে আমার অনেক দরকারী চিঠিপত্তর আছে, ঠিকানা আছে। নকুলবাবুর হোটেলে কি আপনি গিয়েছিলেন ?"

"গিয়েছিলাম। তিনি বললেন বিধুবাবু পরে এসে আপনার যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেছেন ট্যাক্সি করে। হোটেলে আপনার কোনও জিনিস নেই। আপনার পাওনাও বিধুবাবু মিটিয়ে দিয়ে গেছেন।"

"স্যুটকেসটা রাখলেন কোথা তাহলে। রাখলে এই বাড়িতেই তো রাখবেন কোথাও।"

"এখানে কোথাও নেই আমি খুঁজে দেখেছি ভাল করে। তাছাড়া আমাকে যখন ফোন করে জানিয়েছেন যে আপনার যা যা দরকার—এমন কি শাড়ি, জামাও আমি যেন কিনে দিই, তখন নিশ্চয়ই স্যুটকেসটার গোলমাল করে ফেলেছেন কোথাও।"

"আপনাকে তিনি জামশেদপুর থেকে ফোন করেছিলেন না কি?"

'হ্যাঁ।"

"কবে ফিরবেন সেখান থেকে?'

"তাতো ঠিক বলতে পারি না।"

"তাঁর ঠিকানাটা জানেন?"

"আজ্ঞে না।"

"ফোন নম্বর।"

"তাও জানি না।"

"মহা মুশকিল হল তো দেখছি! স্যুটকেসটা—"

"কিসের মুশকিল। বলুন, আমার দ্বারা যদি কিছু হয়—"

"কিন্তু আপনি তো তাঁর ঠিকানা, ফোন নম্বর কিছুই জানেন না। আপনি কতদিন আছেন বিধুবাবুর কাছে?"

"এই সবে বাহাল হয়েছি। দিন তিনেক হল।"

"মাত্র?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনি হয়তো জানেন না—"

"ব্যাপারটা কি?"

"নবেন্দু বিশ্বাস বলে কাউকে চেনেন কি আপনি?"

'নবেন্দু বিশ্বাস? না, নামই শুনিনি কখনও। তাঁর সঙ্গে কি দরকার?"

"বিশেষ দরকার। তাঁর খোঁজেই আমি এসেছি দিল্লী থেকে।"

"ও, কেউ হন বুঝি আপনার।"

"আমার বাবা—"

"ও। তিনি এখানে ছিলেন, আপনি দিল্লীতে ছিলেন, আপনি এখানে তাঁর খোঁজে এসেছেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি তাঁর ঠিকানা জানেন না?"

'না। পাঞ্জাবে আমার জন্ম, সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি। এদেশের কোনও খবরই আমি রাখি না। বাবা গত রায়টের সময় কোলকাতায় এসেছিলেন, তারপর থেকে তাঁর আর কোন খবর পাইনি। তিনি এসে কোথায় ছিলেন তাও জানি না। মায়ের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে আমরা জানাতে চেষ্টা করেছিলাম খবরের কাগজের মারফত। চার সপ্তাহ ধ'রে খবরটা ছাপা হল কিন্তু বাবার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তাই চিন্তিত হয়ে আমি তাঁর খোঁজে এসেছি।"

"তিনি কোলকাতায় এসেছিলেন কেন ?"

"আমাদের পূর্ববঙ্গে কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তারই ব্যবস্থা করবার জন্ত তিনি এসেছিলেন। দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে যাবার কথা তাঁর, কিন্তু তিনি ফেরেন নি।"

"ও, বুঝেছি। আপনি ওই হোটেলে গেলেন কি করে ?"

"ওই হোটেলেই এসে উঠেছিলাম যে। এখানকার পথঘাট তো আমার জানা নেই মোটে, তাই ট্যাক্সিওয়ালাকেই বলেছিলাম একটা ভাল হোটেলে নিয়ে যেতে। সে আমাকে নকুলেশ্বর বাবুর হোটেলে এনে তুললে। নকুলেশ্বরবাবু লোক খারাপ নন। তিনিই আমাকে বিধুবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন একদিন রাস্তায়। বিধুবাবু আশ্বাস দিলেন যে বাবার খোঁজ ক'রে দেবেন তিনি, কিন্তু খুঁজে বার করতে দেরি হবে। বললেন, আমি যদি তাঁর বাসায় গিয়ে থাকি তাহলে খোঁজার সুবিধে হবে। এসে থাকবার জন্তে নিমন্ত্রণই করলেন। বললেন, মিছিমিছি হোটেল খরচ করে থাকবার দরকার নেই. তাঁর বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটটা খালিই রয়েছে, সেখানে আমি যতদিন খুশী থাকতে পারি।"

"ঠিকই করেছেন। বিধুবাবু সত্যিই খুব মহৎ লোক। আমাকে উনি বাঁচিয়েছেন।"

"এ রকম অভাবনীয় যোগাযোগ আমি প্রত্যাশাই করিনি। বিধুবাবু রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আমাকে তুলে আনলেন এখানে। তারপরই বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন আমার স্যুটকেস আর বিছানা তিনি নিয়ে আসবেন ফেরবার সময়। কিন্তু তারপর থেকে তিনি আর ফেরেন নি। আমাকে শুধু একটা ফোন করেছিলেন যে জরুরি ট্রাঙ্ক 'কল' পেয়ে তাঁকে অবিলম্বে বাইরে যেতে হচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা করে যাবার সময় পেলেন না। আমি যেন কিছু মনে না করি বা কিছু চিন্তা না করি! তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি বরেনবাবু আমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন, আমার যা যা দরকার আমি যেন অসঙ্কোচে তাঁকে জানিয়ে দিই। ওপরের ঘরে ফোন আছে, বরেনবাবু নীচের যে অফিসঘরটায় বসেন সেখানেও ফোন আছে, ফোনে জানিয়ে দিলেই বরেনবাবু সব ব্যবস্থা করে দেবেন—"

"আপনি কিন্তু সঙ্কোচ করেছেন।"

"সঙ্কোচ আবার কোথায় করলাম।"

'দিন তাহলে শাড়িগুলো বদল করে আনি। কি রকম আপনার পছন্দ তার একটু আভাসও দিন।"

"শাড়ি নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না। বাবার খবর না পাওয়া পর্যন্ত কিছু ভাল লাগছে না আমার।"

'তাতো না লাগবারই কথা! আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে তিনি পূর্ববঙ্গেই চলে গেছেন।"

"হতে পারে বই কি। একটা কথা তিনি বলেছিলেন যে পূর্ববঙ্গের কোন এক

মুসলমানের মা কি কোলকাতায় বাড়ি আছে, সেই বাড়ি নিয়ে আমাদের পূর্ববঙ্গের সম্পত্তি তাঁকে দিয়ে দেবেন, কারণ পূর্ববঙ্গে এখন হিন্দুদের সম্পত্তি থাকাও যা, না থাকাও তাই।"

"তা ঠিক। হয়তো সেইজন্যেই পূর্ববঙ্গে চলে গেছেন। আপনাদের সম্পত্তি কোথায় ছিল?"

"ঢাকায়।"

"হয়তো সেখানেই আছেন তিনি।"

"কিন্তু তিন চারখানা ইংরাজি বাংলা কাগজে আমরা বিজ্ঞাপন দিলাম যে মা মারা গেছেন, একটাও কি তাঁর চোখে পড়বে না?"

"পড়া তো উচিত ছিল। যাই হোক ভাববেন না, খবর একটা পাওয়া যাবেই।"

"আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে—"

"কি অস্বস্তি বলুন, আমার দ্বারা যদি কিছু হয়।"

"আপনি আর কি করবেন, আপনি তো যথাসাধ্য করছেনই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে কতদিন থাকব—!"

"আপনি যা বললেন তাতে খানিকটা অনিশ্চয়তা তো থাকবেই। তবে আপনি চিন্তিত হবেন না, বিধুবাবু ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি যখন ভার নিয়েছেন তখন ফিরে এসে নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন।"

"আচ্ছা বিধুবাবু করেন কি?"

"বিজনেস করেন শুনেছি।'

"কিসের বিজনেস।"

"তা ঠিক জানি না।"

"সে কি! আপনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, আপনি জানেন না তিনি কি করেন? আশ্চর্য তো।"

"এখনও আমার জানবার সুযোগ হয় নি। যেদিন আপনি এসেছেন ঠিক তার আগের দিনে বাহাল হয়েছি আমি। তারপর তো বিধুবাবু চলেই গেলেন।"

"আপনাকে বাহাল করলেন অথচ কি করতে হবে বলে গেলেন না?"

"আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলে গেছেন।"

"এ ছাড়া আর কোনও কাজ নেই আপনার?"

"আপাতত নেই।"

"এ বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে আছে?"

"আর আছে পুরোনো চাকর মধু। একটা ঠিকে ঝি-ও আছে।"

"তাদের তো দেখেছি। এত বড় বাড়িতে আর কেউ নেই?"

"বিধুবাবুর পরিবার কোথা?"

"আমি কিছুই জানি না। কোলকাতার আমি আপনারই মতো আগন্তুক।"

"বাড়ি কোথা আপনার?"

"বিহারে। পূর্ণিয়া জেলায়।"

"এখানে চাকরি পেলেন কি করে। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলেন বুঝি? নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করছি, মাপ করবেন।"

"না না, তাতে কি। আমার মতো তুচ্ছ লোকের সম্বন্ধে যে আপনার কৌতূহল জেগেছে তাতে আমি গর্বই অনুভব করছি। বিধুবাবু আমাকে পুলিসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"পুলিসের হাত থেকে! পুলিসের হাতে পড়েছিলেন কি করে?"

"পুলিস আমাকে ডাকাত বলে সন্দেহ করেছিল।"

"সে কি! আপনার চেহারা দেখে তো ডাকাত বলে সন্দেহ হয় না মোটেই।"

"পুলিস চেহারা দেখে সন্দেহ করে না। খবর বা প্রমাণের উপর নির্ভর করে তারা।" "হয়েছিল কি?"

"এক জায়গায় ডাকাতি হয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ হল সেটা পলিটিক্যাল ডাকাতি। সেই বাড়িতে তারা আমার নাম ঠিকানা লেখা একটা চিঠি নাকি পেয়েছিল। তাদের ধারণা হয় যে ডাকাতদের পকেট থেকেই পড়ে গেছে চিঠিখানা, কারণ যে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল সে বাড়ির লোকেরা আমার নামও কখন শোনে নি। সুতরাং পুলিসদের সন্দেহ হল যে ডাকাতরাই ফেলে গেছে চিঠিখানা।"

"বিধুবাবু কি করে উদ্ধার করলেন আপনাকে?"

"যে পুলিশ অফিসারটি আমাকে ধরেছিলেন তাঁর নাম ভূপেশবাবু। সেই ভূপেশবাবু বিধুবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু—"

"ও। বিধুবাবু আপনাকে চিনতেন বুঝি আগে?"

'না। ভূপেশবাবু আমাকে বিধুবাবুর গ্যারেজ থেকে গ্রেপ্তার করেন। সেইখানেই আমি লুকিয়েছিলাম।"

'লুকিয়েছিলেন? কেন?"

"ভয়ে। পুলিস আমার পিছু নিয়েছিল।"

"আপনি সত্যি তাহলে জড়িত ছিলেন ডাকাতদের সঙ্গে?"

'পরিচয় ছিল।"

'তারপর?"

"ভূপেশবাবুর কাছ থেকে বিধুবাবু আমার পরিচয় পেলেন। পেয়ে বললেন, 'দেখ ভূপেশ, একটা এম এ পাশ ছেলে যদি ডাকাতি করেই থাকে তাহলে বাধ্য হয়েই করেছে বুঝতে হবে। তোমরা যদি ওকে জেলে পুরে দাও তাহলে ও পাকা ডাকাত হয়ে যাবে। জেলের অভিজ্ঞতা তো আমার আছে। আর তুমি যদি ওকে ছেড়ে দাও আমি

ওকে কাজে লাগাতে পারি। আমি একটি প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখব ঠিক করেছি, একেই রাখতে পারি যদি তুমি ছেড়ে দাও বেচারিকে।' ভূপেশবাবু কি ভেবে আমাকে ছেড়ে দিলে। তারপর থেকে এখানেই আছি।"

"ও। বিধুবাবু লোকটি কেমন বলুন তো?"

"কেমন দেখতে জিগ্যেস করছেন? আপনি তো দেখেইছেন। মোটা, কালো, বেঁটে, ঠোঁটে ধবল আছে।"

"সে কথা জিগ্যেস করিনি। লোক কেমন?"

"এখনও তো পরিচয় হয়নি ভাল করে। কি করে বলব বলুন। তবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে পুলিসের কবল থেকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন লোক খুব খারাপ বলে মনে হয় না। তবে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে—"

"কি—"

"দেখবেন বিধুবাবু ফিরে এলে কথাটা আবার যেন তাঁর কানে তুলে দেবেন না। তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাব—"

"না না, পাগল নাকি! আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারেন।"

"দেখবেন—"

"না না, বলুন না, যা আপনার মনে হচ্ছে। লোকটির স্বরূপ আমারও তো জানা দরকার।"

"তেমন ভয়ঙ্কর কিছু মনে হয়নি আমার। কেবল মনে হয়েছিল যে খুব নিঃস্বার্থভাবে তিনি যে আমার উপকার করেছিলেন তা নয়। স্বার্থ ছিল।"

"কি স্বার্থ?"

"সস্তায় কিস্তিমাৎ যাকে বলে! পেটভাতায় একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি পাওয়া খুব সোজা নয় এ বাজারে। একজন এম. এ. পাশ ছোকরা মাসে শ' দুই টাকার কম মাইনেতে থাকতে রাজি হত কি?"

"আপনাকে উনি পেটভাতায় রেখেছেন? বলেন কি!"

"খাওয়া, পরা এবং থাকা, আপাততঃ এর বেশী কিছু দেবেন না বলেছেন।"

"আপনি রাজি হলেন কেন।"

"পুলিসের ভয়ে।"

"কিছু মাইনে দেবেন নিশ্চয়ই।"

"আশা করি দেবেন।"

"আমার কিন্তু একা একা এমনভাবে বসে থাকতে কেমন যেন লাগছে। অথচ কি যে করি।"

"সিনেমায় যাবেন? লাইটহাউসে খুব ভাল একটা বই হচ্ছে।"

"এখন আর যাবার সময় আছে কি? সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।"

"ট্যাক্সি করে যেতে আর কত সময় লাগবে ?"

আমার কাছে কিন্তু টাকা নেই।"

"টাকার জন্য ভাবছেন কেন।"

"বেশ, চলুন তবে।"

॥ ছয় ॥

"হ্যালো—কে বীরেনবাবু, আমি জমিরুদ্দিন। করাচি থেকে কথা বলছি।"

"কেন, কি ব্যাপার ?"

"আমার সেই বাড়ি তিনখানার দলিল তৈরি হয়ে গেছে কি ?"

"একটু বাকি আছে। আমার টাইপিস্ট অসুখে পড়েছে। সে এলেই হয়ে যাবে। ড্রাফ্‌টটা তো করাই আছে। আপনি ফিরছেন কবে ?"

"দু'এক দিনের মধ্যে ফিরব। স্ট্যাম্প-কাগজ কিনে ফেলেছেন কি ?'

"না এখনও কিনি নি। সে আর কিনতে কতক্ষণ লাগবে ?"

"এখন কিনবেন না। বিধুকে বাড়ি বেচব কিনা এখনও ঠিক করিনি। গিয়ে যা হয় করব—হ্যালো—হ্যালো—"

"কি বলুন।"

"বিধু যদি আসে তার কাছে কিছু ভাঙবেন না এখন।"

"কিন্তু এলে কিছু একটা বলতে হবে তো। কি বলব বলুন।"

"বলবেন—মানে, যা হয় একটা গোল কথা বলে দেবেন।"

"তাহলে বলব যে আপনি না ফেরা পর্যন্ত কিছুই হবে না। কি বলেন—।"

"বেশ।"

'যদি জিগ্যেস করেন যে আপনি কবে আন্দাজ ফিরবেন।"

"আন্দাজ দেবেন একটা। কেবল আসল কথাটা ফাঁস করবেন না এখন। হ্যালো—"

"বুঝেছি। অন্য কোথাও বেশী অফার পাচ্ছেন না কি ?"

"অফার ঠিক পাই নি। অন্য একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। দেখা হলে সব বলব।"

'আপনি প্লেনেই আসছেন তো ?"

'তা-ও এখনও ঠিক করি নি। সুযোগ পেলে প্লেনেই যাব। সব সময় সীট পাওয়া যায় না, দেখি যত শীগগির পারি গিয়ে পৌঁছাচ্ছি।"

"আচ্ছা—"

।। সাত ।।

"হ্যালো, কে, ও আপনি, মণিকা দেবী ? ভাগ্যিস বাড়িতে আছেন।"

"বরেনবাবু না কি। আপনার খোঁজেই তো রোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই আমরা। কোথা থেকে কথা বলছেন আপনি ?"

"লাইটহাউস থেকে। ফোনে আরও কয়েকবার আপনাদের ধরবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। আপনাদের ঠিকানাতে ইচ্ছে করেই যাই নি, কারণ গেলে আপনারাও পুলিসের খপ্পরে পড়ে যেতেন ! আমি ছাড়া পেয়েছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে একটা লোক, সম্ভবতঃ পুলিসের লোকই, আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে সর্বদা। খুব সম্ভবতঃ এখানেও সে এসেছে আমার সঙ্গে।"

"আমি কি যাব লাইটহাউসে ?"

"এলে দেখা হয়। গোপীনাথ কোথায় ?"

"আপনাকে খুঁজছে। তবে এক্ষুণি আসবে সে। পাঞ্জাব থেকে তার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে।"

'ভার্গব সিং নয় তো ?"

"হ্যাঁ, সরদার ভার্গব সিং নামই তো বলেছিল গোপীনাথ, আপনি চেনেন ?"

"বন্ধুত্ব ছিল এককালে। গোপীনাথ আর ভার্গব যদি এসে পড়ে তাহলে ওদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আর আমার সাদা কোটটাও আনবেন।"

"আপনার সাদা কোট ? ও, হ্যাঁ, বুঝেছি। আচ্ছা আনব।"

"খোকা সঙ্গে আছে নাকি।"

"আছে।"

"সেটাকেও আনবেন !"

"খোকাকে নিয়ে যেতে বলছেন কেন ?"

"সঙ্গে থাকা তো ভাল। নিশ্চিন্ত থাকা যায়। আমরা ? আমরা বক্সে আছি। ঢুকেই দেখতে পাবেন। আমাদের বক্সে কেউ নেই।"

"বহুবচন ব্যবহার করছেন কেন ? আর কেউ আছেন না কি ?"

"হ্যাঁ। একজন মহিলা আছেন।"

"মহিলা ?"

"হ্যাঁ, মহিলা। যেখানে চাকরি করছি তাঁদের বাড়ির লোক। ওঁকে সিনেমা দেখাবার জন্তেই এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। হ্যাঁ, অনুচররূপে বই কি। নিশ্চয়। আসছেন তাহলে ?"

"আসছি। যিনি আপনার পিছু নিয়েছেন, তাঁর চেহারা কি রকম একটু আন্দাজ দিন না।"

"লম্বা, রোগা। চমৎকার গোঁফ, এত চমৎকার যে নকল বলে সন্দেহ হয়। পরনে সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, অন্ততঃ বিকেল পর্যন্ত তাই ছিল। হাতে একটি মলক্কা কেন্ রুপো দিয়ে বাঁধানো।"

"পায়ে নিশ্চয় পাম-শু?"

"বিকেলে কাবুলী চপ্পল ছিল।"

"মোটামুটি ধারণা হল। গোপীনাথ এলেই বেরিয়ে পড়ব। সময়মত যদি না গিয়ে পড়ি, অপেক্ষা করতে পারবেন?'

"অপেক্ষা করার অসুবিধা আছে। মহিলা রয়েছেন যে সঙ্গে—"

"ও বুঝেছি। তাহলে যত শীগগির সম্ভব যাচ্ছি। গোপীনাথ যদি এসে পড়ে সঙ্গে থাকবে আর যদি না আসে আমি একাই যাব।"

"বেশ। আপনাদের নাগাল পাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, দেখুন কেমন অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেল। যাই বলুন আপনারা, ভগবান আছেন এবং তিনি দয়াময়।"

"দেখুন, ভগবান নিয়ে রসিকতা করবেন না।"

"রসিকতা করতেও আপত্তি আপনার!"

"কোন কিছু নিয়ে রসিকতা করা মানেই তার অস্তিত্বে কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করা। ও ধরনের বিশ্বাস যদি একবার মনে শিকড় গাড়ে সব ভেস্তে যাবে!"

"তথাস্তু। আসুন তাহলে।"

"আপনি চাকরি করছেন বললেন?"

"হ্যাঁ।"

"কি চাকরি?"

"তা ঠিক জানি না।"

"তার মানে?

"অর্থাৎ আমাকে ঠিক কি কি করতে হবে তা এখনও জানি না।"

"আপনার মনিব কে?"

"বিধুবাবু বলে একজন ভদ্রলোক।"

"আপনাকে কি করতে হবে তা তিনি বলে দেন নি, হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে।"

'তা শোনাচ্ছে। তিনি আমাকে বাহাল করেই কোলকাতার বাইরে চলে গেছেন। ফিরে এলে বুঝতে পারব।"

"আপাততঃ কি করছেন আপনি?"

"একটি মহিলার তত্ত্বাবধান করছি।"

"মহিলাটি কে?"

"ঠিক জানি না। বিধুবাবু তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন এইটুকু শুধু জানি।

আর—হ্যালো। কেটে দিলেন-নাকি। ও হ্যাঁ, গোপীনাথ এল না কি। ভার্গবও এসেছে? আসুন তাদের নিয়ে। আমি ভিতরে চললুম। আচ্ছা—

॥ আট ॥

"হ্যালো। কে ভূপেশবাবু, আদাব সার, আমি মজিদ।"

"কি বলছ?"

"আপনি যে সেই বরেন বলে ছোকরাকে সেদিন নির্দোষ বলে ছেড়ে দিলেন এখন প্রমাণ পেয়েছি সে মোটেই নির্দোষ নয়। প্লেন-ড্রেসে আমাদের যে লোকটি তাকে ওয়াচ করছিল সে যে-সব রিপোর্ট দিয়েছে তার থেকে মনে হচ্ছে ওকে ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না।"

"কি রকম? কি রিপোর্ট দিয়েছে?"

"বিধুবাবু তো কোলকাতার বাইরে গেছেন। বরেন প্রায় অধিকাংশ সময়েই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। তার চালচলন দেখলে মনে হয় যেন সে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে কাউকে খুঁজছে। দোকানে ঢুকে ঢুকে ফোনও করেছে তিন চার বার।

"ফোন নম্বরটা পেয়েছে!"

"পেয়েছে। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফোন।"

"ফোনে কোনও নামটাম করেছিল?"

"করেছিল নিশ্চয়। সেটা কিন্তু জানতে পারি নি আমরা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফোনেও একজন লোক পাঠান হয়েছে এবার।"

"সে কোনও রিপোর্ট করে নি?"

"না, এখনও পর্যন্ত তো করেনি। সাহেব খুব চটেছেন সার।"

"তাই না কি?"

"মনে হচ্ছে। শালাটাকে এখানে আনবার একটা 'মওকা'ও পেয়ে গেলেন।"

"কি করা যায় বল তো?"

"কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন। আপনার সেই বন্ধুর কাছে গিয়ে লিখিয়ে নিন একটা।"

"সে তো এখানে নেই, দিল্লী গেছে।"

"আপনিও যান না, আপনি প্রস্টেট দেখবার জন্যে দুসপ্তাহের ছুটি চেয়েছিলেন না? আজ আপিসে দেখলাম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে আপনার। ইচ্ছে করলে আপনি আজই দিল্লী রওনা হতে পারেন। বিধুবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া দরকার যে তিনি ওই ছোকরার জন্ত জামিন আছেন।"

"তা বিধুবাবু লিখে দেবে।"

"সেটা লিখিয়ে নিন অবিলম্বে। কারণ দত্তগুপ্তের ভাবভঙ্গী ভাল নয়। তিনি, আচ্ছা সেটা গিয়েই বলব আপনাকে। যাচ্ছি আমি। আজই আপনাকে ক্যালকাটা লিভ করতে হবে।"

"আসুন।"

॥ নয় ॥

"হ্যালো, অ্যাম্বুলেন্স, হ্যালো অ্যাম্বুলেন্স—"

"কি—"

"শীগগির লাইটহাউসের সামনে চলে আসুন। খুন হয়ে গেছে একটা—"

"খুন ?"

"হ্যাঁ। রিভলভারের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে একজন।"

"এক্ষুণি যাচ্ছি।"

"আপনার নামটা জানতে পারি কি ?"

"সনৎ সেন। না, আমি ডাক্তার নই।"

"সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। সবাই লোকটাকে ঘিরে ভিড় করছে, আমার মনে হল আপনাদের খবরটা দিই।"

"ঠিক করেছেন এক্ষুণি যাচ্ছি।"

॥ দশ ॥

"হ্যালো, লালবাজার ?"

"কি বলুন।"

"লাইটহাউসের সামনে একটা খুন হয়ে গেছে খবর পেয়েছেন ?'

"পেয়েছি। আপনি কি চান।"

'খুনীকে আপনারা ধরতে পেরেছেন কিনা জানি না, কিন্তু খুন হবার ঠিক পরেই আমি দু'জন গুণ্ডাগোছের লোককে ট্যাক্সি চড়ে বালীগঞ্জের দিকে যেতে দেখলাম। একজনের হাতে রিভলবার ছিল।"

"কি রকম দেখতে বলুন তো লোকগুলো ?"

"ঝাঁকড়া চুল, জুলফি, গগলস পরা। পরনে হাফপ্যান্ট, হাফসার্ট—"

"ও! আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন।"

"লাইটহাউস থেকে। আমি সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। আমার নাম জানতে চাইছেন ? সনৎ সেন। তা কাল না হয় যাব আপনাদের কাছে। এখন আর দাঁড়াতে পারব না, কাজ আছে একটু। দুটো গুণ্ডাগোছের লোককে ট্যাক্সি চড়ে পালাতে দেখলাম, তাই ভাবলাম আপনাদের খবর দিয়ে দিই একটা। আমার ঠিকানা ২৫এ মেছুয়াবাজার, হ্যাঁ, সকালেই যেতে চেষ্টা করব। নমস্কার—

"নমস্কার।"

পরিচয় পর্ব

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভূপেশ মজুমদারকে অবশেষে কলিকাতা ত্যাগই করিতে হইল। লাইটহাউসের সামনে দুর্ঘটনাটা ঘটিবার পূর্বেই তিনি ট্রেনে চড়িয়া বসিলেন। সিগারেটটি ধরাইবার পরই চিন্তাধারা অব্যাহত প্রবাহে শুরু করিল।

বাল্যবন্ধু বিধুভূষণের অনুরোধে এই ডাকাত ছোঁড়াটাকে ছাড়িয়া দিয়া যে ভুল তিনি করিয়াছিলেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যই বেশ একটি সমস্যা ব্যূহ সৃষ্ট হইয়াছে। ভূপেশ ইহাও অনুভব করিলেন যে মজিদের পরামর্শ টি যুক্তিযুক্ত, কারণ উক্ত ব্যূহ ভেদ করিতে হইলে দিল্লী যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। বরেন নামক ছোকরাটি যে দোষী সে বিষয়ে তিনি এখন নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁহার উপর-ওলা মিস্টার দত্তগুপ্ত সমস্ত শুনিয়া যে সন্দেহটি পোষণ করিতেছেন তাহা তো সাংঘাতিক। তিনি নাকি মজিদকে বলিয়াছেন যে, এত কাণ্ডের পর যে লোকটিকে একটা গ্যারেজ হইতে টানিয়া বাহির করা হইল তাহাকে বিনা জামিনে এমনভাবে ছাড়িয়া দিবার দুইটি অর্থ-ই তাঁহার সহজ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে। হয় ভূপেশ মজুমদার মোটা রকম ঘুষ খাইয়াছেন, অথবা তিনি নিজেই গোপনে গোপনে উক্ত ডাকাতের দলের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। অকাট্য-প্রমাণ ব্যতীত তিনি আর তৃতীয় কোনও সম্ভাবনাকে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। মজিদ নিম্নকণ্ঠে একথাও তাঁহাকে জানাইয়াছে যে তাঁহাকে, (মানে ভূপেশ মজুমদারকে) "ওয়াচ" করিবার জন্য দত্তগুপ্ত নাকি একজন গুপ্তচরও নিযুক্ত করিয়াছেন। ভূপেশ মজুমদার কামরার চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। কোণের দিকে ওই যে ছোকরা সিনেমা-মাসিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছে উহার চালচলন একটু সন্দেহজনক। ছোকরা হাওড়া স্টেশনে পায়চারি করিতেছিল, ট্রেনটি ছাড়িবার ঠিক পরে চলন্ত ট্রেনে আসিয়া ওই কামরাটাতেই উঠিয়া পড়িল। ভূপেশ মজুমদারের মানসপটে দত্তগুপ্তের মুখটা ফুটিয়া উঠিল। তিনি নিজে অবশ্য ভূপেশকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। দেখা হইলে অফিসারী গম্ভীর মুচকি হাসিয়া পূর্বেও যেমন মাথা নাড়িতেন আজও তেমনি নাড়িলেন। কিন্তু মজিদের কথা শোনার পর আজ আপিসে তিনি দত্তগুপ্তের দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা ঝলক মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিলেন যাহা শঙ্কাজনক। দত্তগুপ্ত স্বল্পভাষী রাশভারী লোক। ভিতরে ভিতরে তিনি যে কি করিতেছেন তাহা ভগবানই জানেন। তাঁহার একটি শ্যালক দারোগা হইয়াছে এবং এখন মফঃস্বলের থানায় আছে। মজিদের সন্দেহ কোন ওজুহাতে ভূপেশবাবুকে সরাইয়া তাহাকে কলিকাতায়

আনাই না কি দত্তগুপ্তের আন্তরিক অভিপ্রায়। তাঁহার অভিপ্রায় যাহাই হউক ভূপেশবাবু নিজেই নিজের কাছে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া আত্মবিশ্লেষণ করিতেছিলেন। বরেনকে সেদিন তিনি ছাড়িয়া দিলেন কেন? বিধুর যুক্তিপূর্ণ অনুরোধই কি একমাত্র কারণ? বিধুভূষণ তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু—ছাত্রজীবনে এক-সঙ্গে অনেকদিন কাটাইয়াছেন, এক মেসে ছাত্রজীবনে তাঁহার দুর্দিনে বিধুভূষণ তাঁহাকে অর্থসাহায্যও করিতেন, বিধুর অনুরোধও যুক্তিপূর্ণ—কিন্তু এই সব কারণে কি তিনি একজন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন? বরেন যে অপরাধী তাহা অবশ্য প্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু সে যে নিরপরাধ তাহাও তো প্রমাণিত হয় নাই। তাছাড়া এ সব লইয়া মাথা ঘামাইবার কথাও তো তাঁহার নয়। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করাই তাঁহার কর্তব্য। সে দোষী কি নির্দোষ তাহা অদালত ঠিক করিবে। তিনি আপন কর্তব্য হইতে চ্যুত হইতে গেলেন কেন? অস্বীকার করিবার উপাই নাই যে প্রাক্তন বন্ধু বিধুভূষণকে খুশি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কি করিয়া তাঁহাকে খুশি করিবেন তাহা কয়েকদিন পূর্ব হইতেই তিনি ভাবিতেছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার গারাজ হইতে ডাকাতটা ধরা পড়াতে তাঁহার সুবিধা হইয়া গেল। কিন্তু বিধুভূষণকেই বা তিনি খুশি করিতে চাহিয়াছিলেন কেন? অনাদিনাথও কি তাঁহার বাল্যবন্ধু নহে? তাহার পুরাতন পুস্তকগুলির সাহায্যে তিনি কি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন নাই? তাহার একটা অত্যন্ত ন্যায্য অনুরোধও তিনি সেদিন রক্ষা করিলেন না। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে ভূপেশ পরবর্তী স্তরে উপনীত হইলেন। বিধুভূষণকে খুশি করিবার উদ্দেশ্য পুঁটির (তাঁহার মাসতুতো শালীর) মেয়ে সুলোচনা। ওই বয়স্থা মেয়েটাকে বিপত্নীক বিধুভূষণ বিবাহ করিতে পারে এই সম্ভাবনায় যুগপৎ আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াই তিনি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভূপেশবাবু নির্মমভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিতেছিলেন, সুতরাং আর একটা জটিলতাও তাঁহাকে সরল করিতে হইল। পুঁটির মেয়ে সুলোচনার জন্যই বা তাঁহার অত দরদ কেন? ঘেঁাতার ছেলে কানুর জন্য তো প্রাণ কাঁদে নাই! ঘেঁাতনা তাঁহার আপন মামাতো ভাই এবং কানু তাহার একমাত্র পুত্র। ঘেঁাতনা কাহাকেও কোন নোটিশ না দিয়া কিছুদিন পূর্বে পট করিয়া পটল তুলিয়া ফেলিয়াছে। কানু লিখিয়াছিল, অর্থাভাবে তাহার পড়াশুনা হইতেছে না। তিনি, (মানে ভূপেশ মজুমদার) যদি প্রতি মাসে কিছু করিয়া সাহায্য করেন তাহা হইলে সে অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ করিতে পারে। ভূপেশ মজুমদার কি করিয়াছিলেন? ইনাইয়া বিনাইয়া মিথ্যা সহানুভূতি এবং সত্য-মিথ্যা-পূর্ণ বহুবিধ ওজর দেখাইয়া একখানা পোস্টকার্ড (তাহাও পাশের বাড়ি হইতে ধার করিয়া) লিখিয়াছিলেন। একটি কপর্দক সাহায্য তো করেন নাই, করিবেন বলিয়া আশাও দেন নাই। সুলোচনার জন্তই বা তাঁহার এত মাথাব্যথা হইতে গেল কেন? ভূপেশ কোণে উপবিষ্ট সিনেমা পত্রিকায়-দৃষ্টিলগ্ন যুবকের দিকে চকিতে এক নজর চাহিয়া দেখিলেন,

তাহার পর নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া গুম হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ গুম হইয়াই রহিলেন। ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে বিষবৃক্ষের বীজ ত্রিশ বৎসর পূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল। ষোড়শী পুঁটির মুখখানা তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। মুখ নয়, মুখের স্মৃতি। মুখখানা তো পরে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া তুবড়াইয়া কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ওই স্মৃতিটা—ওই বিশেষ একটা ছবি—হাসিভরা দু'টি চোখ, কানের দুল দু'টি, গালের উপর ছোট্ট একটি তিল—এই ছবিটা এখনও অমর হইয়া আছে এবং তাঁহার সর্বনাশ করিতেছে। ভূপেশ মজুমদার নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, সিগারেট ধরাইলেন, কোণের ছোকরার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন, চোখ দুইটি খুব জোরে বুঁজিয়া আবার খুলিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। হাসি-ভরা মুখখানি মনের উপর স্থিরভাবে ফুটিয়া রহিল।

বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবনটাই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। কি দুঃখেই ছেলেবেলাটা তাঁহার কাটিয়াছিল। অধিকাংশ দিন দুইবেলা ভাত জুটিত না। বাবা কলিকাতা শহরে সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি করিতেন। কলিকাতায় বাড়িভাড়া করিয়া পরিবার রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নিজে একটি সস্তা মেসে থাকিয়া কোনও মাসে পঁচিশ, কোনও মাসে ত্রিশ টাকা তাঁহাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠাইতেন। কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন জুটিত। টাইফয়েডে তাঁহার এক ভাই, এক বোন বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছিল। চিকিৎসা করিবার পয়সা ছিল না। সুবিধার মধ্যে গ্রামে একই হাই-স্কুল ছিল এবং ভূপেশ সেই স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। ভূপেশ মজুমদারের ফুটবল খেলার দক্ষতা ছিল। এই দক্ষতার জন্য তিনি একটি মিশনারি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিনা-বেতনে কলিকাতায় একটি কলেজে পড়িবারও সুবিধা পান। তাহার পর উক্ত সাহেবেরই অনুগ্রহে তিনি পুলিসবিভাগেও প্রবেশ করেন। দারোগা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। সেই বিবাহবাসরেই পুঁটির সঙ্গে তাঁহার প্রথম দেখা। বাসর-ঘরের এক কোণে বসিয়া পুঁটি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল।

"একটা গান করুন।"

"গান আমি জানি না।"

"যা জানেন তাই করুন।"

"যিনি এমন জোর হুকুম করতে পারেন জানতে পারি কি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা কি?"

"সম্পর্ক খুব মধুর। পুঁটি তোমার শালী হয়—" কে একজন হাসিয়া বলিয়াছিল।

ভূপেশ মজুমদারের সঙ্গীতে তেমন দখল ছিল না। কিন্তু পুঁটির অনুরোধে কয়েকটি গানই তিনি গাহিয়াছিলেন। তাহার পর যখনই শ্বশুরবাড়ি গিয়াছেন পুঁটির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। পুঁটি অনাথা ছিল, ভূপেশ মজুমদারের শাশুড়ীই নিজের বোনঝিকে

মানুষ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভূপেশ যখনই যাইতেন পুঁটির সহিত দেখা হইত। পুঁটিকে দেখিতে পাইবেন এই আশাতেই যে ভূপেশ অনেকবার অযাচিতভাবে শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন এ কথাও মিথ্যা নয়। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে পুঁটির সম্বন্ধে তাঁহার একটু দুর্বলতা ছিল। মেয়েটার ভাবভঙ্গিতে কি যেন একটা ছিল যাহা, মানে,—ভূপেশ মজুমদার অবশ্য এমন কিছুই কোনদিন করেন নাই যাহা সমাজের চক্ষে হেয়—কিন্তু এ কথা তাঁহাকে মানিতেই হইবে যে পুঁটিকে ঘিরিয়া তাঁহার কল্পনা একদা বেশ রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল। যে রঙের নেশা তাঁহার মনে লাগিয়াছিল তাহার বাহ্যিক প্রমাণ অবশ্য কিছুই ছিল না। পুঁটিকে তিনি কোন উপহার পর্যন্ত কখনও দেন নাই। শাড়ি, গহনা দিবার সামর্থ্যই তাঁহার ছিল না। সাবান, এসেন্সজাতীয় কিছু দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও দেন নাই। তাঁহার মনে হইত এই ধরনের কিছু দিলে জিনিসটা খেলো হইয়া যাইবে। কেবল একটা আশ্বাস তাহাকে দিয়াছিলেন—"যদি তোমার কখনও কোন বিপদ হয়, খবর দিও, প্রাণপণে সাহায্য করব।" পুঁটি যতদিন বাঁচিয়াছিল কোনও সাহায্য চায় নাই। দুর্গম এক পল্লীগ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। এক শতছিদ্র খোলার ঘরে এক তাড়িখোর চরিত্রহীন স্বামীকে লইয়া সে দিন কাটাইত। তবু ভূপেশের নিকট সে কোনও সাহায্য চায় নাই। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে নাই। যখন বিধবা হইল তখনও কিছু জানায় নাই। মৃত্যুকালে যখন তাহার শ্বাস উঠিয়াছে তখন সে তাহার কন্যা সুলোচনাকে অতি কষ্টে তাহার ঠিকানাটি দিয়া বলিয়া গিয়াছে, বিপদে পড়িলে সে যেন ভূপেশের সাহায্য প্রার্থনা করে। ভূপেশ নিজমুখে বড় গলা করিয়া এ আশ্বাস তাহাকে দিয়াছিল। পুঁটির মুখখানা—ষোড়শী পুঁটির মুখখানা—তাহার মানসপটে আবার ফুটিয়া উঠিল। আবেশময় চক্ষু দুইটি নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

সর্বনাশের মূল কারণ আবিষ্কার করিয়া ভূপেশ মজুমদার অসহায়ভাবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ জট পাকাইয়া গিয়াছে। দিল্লী গিয়া যদি জটটা ছাড়ানো যায়। প্রথমতঃ, বিধুকে দিয়া লিখাইয়া লইতে হইবে যে সে উক্ত বরেনের জন্য জামিন ছিল, এবং তাহাকে সচ্চরিত্র যুবক বলিয়া চিনিত! দ্বিতীয়তঃ, যাইতে হইবে গুহ মহারাজের কাছে। শ্রীশ্রীবাসুকীনাথ গুহ, দত্তগুপ্তের জননী শীতলাক্ষী দেবীর গুরুদেব! ভূপেশকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া দত্তগুপ্তকে একটু ইঙ্গিত যদি করেন অচিরাৎ সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। গুহ মহারাজও এখন দিল্লীতে। গুজব, শাসন-পরিষদের কয়েকজন হোমরাচোমরা সভ্য নাকি গুহ মহারাজের আধ্যাত্মিক কৃপাকণা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া হোম মিনিস্টারের যিনি আসল দক্ষিণ হস্ত (কাগজেকলমে বা নথিপত্রে নহে, অথচ যিনি প্রকৃতই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত) সেই ছিনে মিত্তিরও একজিবিশন দেখিতে দিল্লী গিয়াছেন। ছিনে মিত্তির যদি আশ্বাস দেন যে ভয় নাই, তাহা হইলে সত্যই তিনি নির্ভয় হইতে পারিবেন। দিগ্বিজয়ী সেন্টার

ফরোয়ার্ড ভূপেশ মজুমদারকে ছিনে. মিত্তির এককালে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে তিনি আশা করিতে লাগিলেন যে ছিনে মিত্তিরের সে শ্রদ্ধা ভক্তি এখনও অচলা আছে। তাহার পর হাওড়ায় আসিবার অব্যবহিত পূর্বে যে ঘটনাটা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িবামাত্র আর একবার তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। ছি, ছি, কি কাণ্ড!

গৃহিণীর নিকট দিল্লীগমনের একটা মিথ্যা ওজুহাত তিনি দেখাইয়াছিলেন। সত্য কথা গোপন রাখিয়া বলিয়াছিলেন, আপিসের একটা জরুরী দরকারে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হইতেছে।

"আপিসের আবার কি দরকার পড়ল এখন?"

"দরকারটা আমারই বেশী। একটু তদ্বির করলে হয়তো পট করে উন্নতি হয়ে যেতে পারে। গুহ মহারাজ এখন দিল্লীতে যে।"

'ও—।"

সৌভাগ্যক্রমে গৃহিণী আর বাধাসৃষ্টির প্রয়াস পান নাই। তিনি যদি অসম্মতি প্রকাশ করিতেন, ভূপেশ মজুমদার তাহা হইলে দিল্লী যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ইদানীং তিনি প্রতিটি কার্য গৃহিণীর পরামর্শ অনুযায়ী করিয়া থাকেন। কারণ সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন ভোগ করিয়া তিনি একটি সার সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন—গৃহিণী-রূপ ঘোড়াকে ডিঙাইয়া কোনরূপ ঘাস খাইবার চেষ্টা করা উচিত নয়, করিলেই ঘাসের বদলে চাঁট খাইতে হয়।

যাত্রা করিবার প্রাক্কালে ভূপেশ মজুমদার জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন। নীচে ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"ওগো শুনছ, কোথায় তুমি?"

আবার কি হইল? কণ্ঠস্বরে বেশ একটু ঝাঁজের আভাস পাইয়া ভূপেশ মজুমদার মনে মনে ঈষৎ তটস্থ হইলেও বাহিরের প্রফুল্লভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাও রাখা গেল না। কারণ শ্রীমতী নীলতারা (ভূপেশ-গৃহিণীর নামকরণ করিয়াছিলেন তাঁহার ঠাকুরমা স্বর্গীয়া লাল-পরি দেবী) ঘরে ঢুকিয়া যে নিদারুণ বার্তাটি নিক্ষেপ করিলেন তাহা সত্যই ভয়ঙ্কর!

"কি বলছ, এই যে আমি এ ঘরে বাক্স গোছাচ্ছি।"

"তোমার সুলোচনাকে দূর কর এক্ষুণি। ওকে আর একদণ্ড বাড়িতে রাখা চলবে না।"

"কেন, কি হল?"

"চেহারা দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এখন আর সন্দেহ নেই। ও পোয়াতি। পাপ বিদেয় কর এখনি—"

"বল কি!"

নীলতারা সহসা অপ্রত্যাশিত একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, "বলব আবার কি! যেমন গাই তেমনি তো বকনা হবে। ওর মা পুঁটি যে কি রকম ছিল তা তো তোমার ভাল করেই জানা আছে—।"

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ভূপেশ মজুমদার নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। হেঁটমুণ্ডে তাড়াতাড়ি বাক্স-গোছানো শেষ করিয়া তিনি পাশের ঘরে গিয়া স্যুট পরিতে লাগিলেন! পরিতে পরিতে শুনিলেন নীলতারা নীচে তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন—"দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা এখ্‌খুনি— "

সহধর্মিণীর সহিত আর বাক্যালাপ করা সমীচীন নহে মনে করিয়া ভূপেশ মজুমদার সোজা নীচে নামিয়া ট্যাক্সিতে চড়িলেন। ট্যাক্সিতে চড়িয়া দেখেন সুলোচনা বসিয়া আছে।

"কে সুলি—?"

"হ্যাঁ—।"

সুলোচনা আর কিছু বলিতে পারিল না। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভূপেশ মজুমদার হাতঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। ট্রেন ছাড়িবারও বেশী বিলম্ব ছিল না। সোজা হাওড়া স্টেশনে না গেলে ট্রেন পাওয়া যাইত না। মজিদের স্টেশনে আসিবার কথা, ঠিক করিলেন সে যদি আসে তাহার কাছেই আপাততঃ সুলোচনাকে রাখিয়া যইবেন, যদি না আসে সঙ্গেই লইয়া যাইতে হইবে। উপায় কি। এই সব ভাবিয়া (বেশী ভাবিবারও সময় ছিল না) ভূপেশ ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন "সোজা হাওড়া চল।"

পথে সুলোচনার সহিত একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নাই। স্টেশনে মজিদ ছিল। তাহার কাছেই সে সুলোচনাকে রাখিয়া আসিয়াছে। বলিযা আসিযাছে যে এই অনাথা মেয়েটির একটা ব্যবস্থা সে ফিরিয়া আসিয়া করিবে। তাহার পত্নী ইহাকে বাড়িতে স্থান দিতে চান না, ভূপেশ মজুমদার কলিকাতায় থাকিতে পাইলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চযই করিতে পারিত, কিন্তু তাহাকে দিল্লী যাইতে হইতেছে, সুতরাং—। মজিদ বহুকালের পুরাতন বন্ধু, সে আশ্বাস দিয়াছে যে ভূপেশ ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত যে মেয়েটির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

দিল্লী এক্‌স্‌প্রেস দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইন্‌টার ক্লাস কামরার এক কোণে বসিয়া ভূপেশ মজুমদার আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ একটা কথা তাঁহার মনে হইল। মজিদ মুসলমান। সুলোচনাকে যদি সে নিজের বাড়িতে লইয়া যায়, তাহা হইলে সুলোচনা তাহাদের ছোঁয়া খাইবে কি? যদি না খায় ···! আবার সমস্ত জট পাকাইয়া গেল।

॥ দুই ॥

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মল্লিকের ইতিহাসটা একটু জটিল। কলিকাতায় যাঁহারা তাঁহার পরিচিত তাঁহাদেরও কেহ সে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানেন না। জানেন না, কারণ কলিকাতা শহরে জানিবার প্রয়োজন হয় না। কলিকাতা শহর পৃথিবীর একটি বড় হাট, সে হাটে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্যই মুখ্য কথা, পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় জানাটা গৌণ। মোটামুটি একটা ভদ্র আবরণ, আচরণ ও উপার্জন-দক্ষতা থাকিলে কলিকাতা শহরে কাজ চলিয়া যায় এবং কাজ চলিয়া গেলে, অর্থাৎ অর্থোপার্জন করিতে পারিলে আর কিছুই আটকাইয়া থাকে না। বিধুভূষণ অর্থোপার্জনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য কেহ ব্যগ্র হন নাই, তাঁহার আর্থিক পরিচয়েই তিনি বাজারে বেশ চালু ছিলেন। কিন্তু কলিকাতার বাজারে চালু হইলেই গল্পের বাজারে চালু হওয়া যায় না। রসিক পাঠক-পাঠিকার নিকট বিধুভূষণের চিত্রটি সার্থক করিতে হইলে তাঁহার আসল পরিচয়টি দিতে হয়।

বিধুভূষণ একটু অন্তরঙ্গমহলে নিজের যে পরিচয় জাহির করিয়া প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ যে পরিচয়ের জোরে তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুবিধালাভও করিয়াছিলেন সে পরিচয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা। চিটাগাং বা চিটাগং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। চট্টগ্রামের পর্বতে পলায়িত বীরগণকে তিনি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া খাদ্য সরবরাহ করিতেন এ কথার কোনই ভিত্তি নাই। কিন্তু এই ভিত্তিহীন সংবাদই রাখহরি বিশ্বাস, গোপেন পাল, গগন দাঁ, জিৎরাম চুড়িওয়ালাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই এই প্রাণতুচ্ছকারী স্বদেশসেবককে নানাবিধ ব্যবসায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহায্য করিয়া ঠকেন নাই, কারণ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিধুভূষণ সত্যই এক-জন উঁচুদরের খেলোয়াড় ছিলেন, ইংরেজি ভাষায় যাহাকে বলে স্পোর্টস্‌ম্যান। ব্যবসায়ে কোনরূপ ছুঁচোমি বা ছিঁচকেমিকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই, কখনও কাহাকেও লেংগি মারেন নাই। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে "বিলো দি বেল্‌ট হিট" করা বলে তাহা তিনি কখনও করেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছিলেন বিনিময়ে তাঁহারা বিধুভূষণের নিকটও সাহায্য পাইয়াছেন যথেষ্ট। বিধুভূষণ পারতপক্ষে তাঁহাদের প্রতিযোগী হইবার চেষ্টা করেন নাই, সহযোগী হইবারই চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন অর্থোপার্জন করিতে হইলে সমধর্মী যত অধিক লোকের আনুকূল্য লাভ করা যায় ততই সুবিধা। এতদ্ব্যতীত আর একটি সারসত্যও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সমাজের নানা স্তর হইতে আহরণ করিয়া নিজের স্বপক্ষে যদি একদল লোককে আনিতে পারা যায় তাহা হইলে জীবনের পথে চলা-ফেরা করা সহজ হইয়া

ওঠে, দুর্গম পন্থাও সুগম হইয়া যায়। বিধুভূষণের এই মাত্রা-বোধ অন্তরনিহিত যে প্রবল বাসনা হইতে উদ্ভূত সে বাসনা পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই জীবন-যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে সত্য, কিন্তু তাহা বিধুভূষণের সমস্ত সত্তাকে যতটা একাগ্র করিয়া তুলিয়াছিল সকলকে ততটা করে না। কারণ ছিল। সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিধুভূষণ এত ব্যাকুল ছিলেন তাহার প্রধান কারণ, জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভূমির উপর ভবিষ্যৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সকলে লাভ করেন সে ভূমিটুকুই বিধুভূষণ পান নাই। জীবনের জন্মমুহূর্তে তাঁহাকে শুইতে হইয়াছিল অপরিচয়ের গ্লানি বহন করিয়া পথের ধূলায়, তাঁহার শৈশব ছিল স্নেহমমতাহীন বিভীষিকা।

তাঁহার নিদারুণ জন্মকাহিনী নিজেও তিনি জানিতেন না। কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জন্মকাহিনী জানা সম্ভব নয়, অপরের মাধ্যমেই পিতৃপরিচয়, বংশ-পরিচয় সকলকে জানিতে হয়। বিধুভূষণ জানিয়াছিলেন তাঁহার বিজলী মাসীর কাছে। বিজলী নাম্নী যে প্রৌঢ়া মহিলাটি জমিদার রজতবাবুর বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিত, সেই তাঁহার বিজলী মাসী। তাহার মুখেই একদিন তিনি নিজের রোমাঞ্চকর অবিশ্বাস্য জন্মকাহিনী শোনেন। ওই বিজলীর অবিবাহিতা ভগ্নী দামিনীই নাকি তাহার জননী ছিল। দুই ভগ্নীই রজতবাবুর বাড়িতে কাজ করিত। তাহাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, কি করিয়া তাহারা রজতবাবুর বাড়িতে আসিয়া দাসীত্বে বাহাল হইল এ সব ইতিহাস বিধুভূষণকে বিজলী মাসী বলে নাই। বিজলী মাসী বলিয়াছিল যে কাজ করিতে করিতে দামিনী হঠাৎ নাকি একদিন অন্তর্ধান করে। দুই চারিদিন এদিকে ওদিকে খবর করিয়া বিজলী যখন তার সন্ধান পাইল না, তখন তাহার মনে হইল যে কাহারও সহিত সে কাথাও চলিয়া গিয়াছে বোধ হয়। ছয় সাত মাস কাটিয়া গেল, কোনও খবর পাওয়া গেল না। তাহার পর একদিন গভীর রাত্রে যাহা ঘটিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অবিশ্বাস্য। একদিন গভীর রাত্রে বিজলী মাসীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, তাহার মনে হইল বারান্দার উপর একটি শিশু ক্রন্দন করিতেছে। খুব জোরে কাঁদিতেছে, এত জোরে যে মনে হইতেছে কেহ যেন শিশুটাকে নির্যাতন করিতেছে! বিজলী ধড়মড় করিয়া কপাট খুলিল, দেখিল বারান্দার উপর ন্যাকড়ায় জড়ানো একটি কচি শিশু তারস্বরে চিৎকার করিতেছে। আশেপাশে কেহ নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বিস্ফারিত-নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাবুদের জাগাইল। বাবুরাও কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাহার পর বড়বাবু, অর্থাৎ রজতবাবু বলিলেন, 'আপাততঃ, তুই ওকে ঘরে নিয়ে যা তো, পরে যেমন হয় দেখা যাবে—।" পরদিন সকালে রহস্য ঘনতর হইল। জমিদারবাবুদের পুকুরে দামিনীর মৃতদেহটা ভাসিয়া উঠিল। জমিদারবাবু পুলিসে খবর দিলেন। পুলিস-তদন্তের ফলে জানা গেল যে দামিনীর শরীরে সদ্যপ্রসবের লক্ষণসমূহ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। আইনতঃ ইহাও নির্ধারিত হইল যে সে পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই শিশুই বিধুভূষণ। তাঁহার শৈশবটা বিজলী মাসীর কাছেই অতিবাহিত হইয়াছিল। একটা দুঃস্বপ্নের মতো এই শৈশবের স্মৃতি মাঝে মাঝে তাঁহার এখনও মনে পড়ে। এই শৈশবই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। এই শৈশবে যে দুইটি ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয় তাহাদের প্রভাব কখনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হওয়ামাত্রই প্রথম যে অনুভূতিটি তাঁহার মর্মকে ক্ষতবিক্ষত করিল তাহা এই যে, তিনি অস্পৃশ্য। সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করে। "দূর দূর", "মর মর", "যমের অরুচি"—নিজের সম্বন্ধে এই সব উক্তি ছাড়া তিনি আর কিছু শোনেন নাই। রজতবাবুর স্ত্রী তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন পাঠা।" তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার চোখে মুখে নিষ্ঠুর ঘৃণার যে অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিত তাহা বীভৎস। মনে হইত আইনের বাধা না থাকিলে তাঁহাকে তিনি ছারপোকার মতো পিষিয়া মারিয়া ফেলিতেন। বলিতেন, "আমার সামনে আসিস না। পাপ, পাপ। মানুষ তো নয়, যেন ছাগলছানা। ছাগলীর পেটে পাঠা জন্মেছে।"

আর একটু বড় হইবার পর দ্বিতীয় ধারণাটি তাঁহার মনে শিকড় গাড়িল। তিনি উপলব্ধি করিলেন টাকা থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই আটকায় না। রজতবাবু মদ্যপ চরিত্রহীন কিন্তু সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করে, সেলাম করে, নানাভাবে খোসামোদ করে, কারণ তাঁহার টাকা আছে। রজতবাবুর একমাত্র ছেলে কনক জন্মান্ধ, তাহার মুখ দিয়া সর্বদা লালা ঝরে, হাঁউমাউ করিয়া কি যে কথা বলে বোঝা যায় না, পা দুইটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, উঠিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবার সামর্থ্যটুকু নাই, কিন্তু এই পঙ্গু জড়পিণ্ডটাকে ঘিরিয়াই অহোরাত্র একটা সমারোহ চলিয়াছে। তাহার জন্য দুইটা চাকর, দুইটা চাকরাণী, দুইজন নার্স, একজন ডাক্তার; তাহার জন্য রংবেরঙের কত জামাকাপড়, কত এসেন্স পাউডার, স্নো ক্রীম, কত অদ্ভুত ধরনের খেলনা, কত হরেক রকমের খাবার। তাহাকে বাগানে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য কি চমৎকার গাড়ি। সবই সম্ভব হইয়াছে, কারণ রজতবাবুর টাকা আছে। রজতবাবুর ছোট ভাই হিরণবাবু ক্রোধোন্মত্ত হইয়া একটা চাকরকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন কিন্তু পুলিস তাঁহার কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করিল না, কারণ তাঁহার টাকা আছে। বাল্যকাল হইতেই বিধুভূষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে টাকা থাকিলে পৃথিবীতে অসাধ্যসাধন করা যায়।

বিধুভূষণের পরবর্তী জীবন এই দুইটি ধারণার ফল। তিনি যে জারজ এই সত্যটা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিবার জন্য তিনি না করিয়াছেন কি? বিজলী মাসীর মুখে যেদিন তিনি নিজের জন্মকাহিনী শোনেন সেইদিনই তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কথাটা শুনিবামাত্র তাঁহার পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গেল। পা দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। বিজলী মাসী খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মন্তব্য করিল, "ছোঁড়ার রকম দেখ। ঠিক মায়ের মতই চণ্ডী হয়েছেন!" বিজলী মাসী

কাজে চলিয়া যাইবার পর বিধুভূষণ অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর অনিশ্চিতভাবে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, দুইচক্ষু যেদিকে তাঁহাকে লইয়া চলিল সেইদিকে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন পথে মাল-বোঝাই একটা মোটর-লরী দাঁড়াইয়া আছে! পিছন দিকে লুকাইয়া বসিবার মতো একটু স্থান ছিল, ড্রাইভারের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাতেই তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঘণ্টা বারো তেরো পরে, অর্থাৎ প্রায় তিনশত মাইল পার হইয়া ড্রাইভার বুঝিতে পারিল যে একটা ছোঁড়া পাটের বস্তার ফাঁকে লুকাইয়া বসিয়া আছে। কান মলিয়া গোটা দুই থাপ্পড় লাগাইয়া সে তাহাকে নামাইয়া দিল। যে স্থানে নামাইয়া দিল সে স্থানটা একটা গঞ্জের মতো। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক অনিশ্চিতভাবে ঘুরিয়া বিধুভূষণ অবশেষে একটি চায়ের দোকানের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চায়ের দোকানের মালিক জয়ন্তীবাবুর কিছুই নজর এড়ায় না। একটা ছোঁড়া যে তাঁহার দোকানের বারান্দায় বসিয়া উসখুস করিতেছে ইহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

"কি রে ছোঁড়া, কি চাস তুই ?

"একটা চাকরি খুঁজছি বাবু।"

"চায়ের দোকানে কাজ করতে পারবি ? ফাইফরমাশ খাটতে হবে।"

"পারব।'

"কি নাম তোর ?"

"ভূতো।"

রজতবাবুর বাড়িতে সকলে তাহাকে পাঠা বলিযা ডাকিত। এইখানে পাঁঠার মৃত্যু হইল।

নবজাতক ভূতোর প্রায় সমস্ত কৈশোর এবং যৌবনের কিছুটা কাটিয়া গেল এই চায়ের দোকানেই। বিধুভূষণ জীবনের সত্য পরিচয়ও লাভ করিলেন। কত রকমের লোকই যে চা খাইতে আসে। কতরকম বেশভূষা, কতরকম কথাবার্তা, কতরকম চরিত্র। সচ্চরিত্র, দুশ্চরিত্র, মেকী-ধনী, মেকী-দরিদ্র, আসলবাবু, ফোতোবাবু, মজুর, কেরাণী, ব্যবসায়ী, বহুরকম লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া বিধুভূষণ মানবচরিত্রসম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতা যে উত্তরকালে তাঁহার সাফল্য-সৌধ নির্মাণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়ন্তীবাবু লোকটিও বেশ চাল্লাক-চতুর করিতকর্মা লোক। ভূতো যে কর্মী হিসাবে নিখুঁত, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ভূতোর সহায়তায় যে তিনি তাঁহার আসল ব্যবসাযটি আরও ফলাও করিতে পারিবেন এ আশাও তাঁহার হইয়াছিল। ভূতো পাছে বেহাত হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি আটঘাট বাঁধিয়াই চলিতেছিলেন। ভূতোর সহিত সুমিষ্ট ব্যবহার তো করিতেনই, বেতনও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। খাওয়া-পরা, জলখাবার, প্রত্যহ চার আনা করিয়া হাত-খরচ ছাড়া মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন এবং ভবিষ্যতে বেতনবৃদ্ধির

আশা দিয়া ভূতোকে তিনি বেশ তোয়াজেই রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল প্রতিদ্বন্দী ঝকৃস্থ মিঞা হয়তো ভূতোকে নানাপ্রকার "তুজুং" দিয়া নিজের দলে টানিয়া লইবে। ঝকৃস্থর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। দাসু নামক যে ছোকরাটিকে জয়ন্তীবাবু কিছুকাল পূর্বে তালিম দিয়া চৌকস করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে সহসা একদিন অন্তর্ধান করিল। তাহার পর জয়ন্তীবাবু বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলেন ছোকরা নাকি যোগানন্দ নাম ধারণ করিয়া ঝকৃস্থ মিঞার কলিকাতার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হইয়াছে। লম্বা চুল রাখিয়া কপালের মাঝখানে তান্ত্রিকদের মতো সিন্দুরের টিপ পরিতেছে। সুতরাং ভূতোকে তিনি সর্বতোভাবে সাবধানে আগলাইয়া বেড়াইতেছিলেন। এই অতি-সাবধানতার ফলেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ঝকৃস্থ মিঞা হয়তো ভূতোর প্রতি তেমন মনোযোগ দিতেন না, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে জয়ন্তীবাবু ভূতোকে তাহার দলের লোকের সহিত বাক্যালাপ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন, তখন ভূতোর প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। জয়ন্তীবাবুর সাবধানতার বেড়ার ফাঁকে ভূতোর সহিত তিনি কেবল আলাপই করিলেন না, তাহাকে প্রলুব্ধও করিতে লাগিলেন। ভূতো কিন্তু প্রলোভনসত্ত্বেও রাজী হয় নাই। ঝকৃস্থ মিঞা তাহাকে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, দিল্লী শহরে তিনি ব্যবসায়ের যে শাখাটি আরম্ভ করিতেছেন ভূতোকেই তাহার ম্যানেজার করিযা দিবেন। বিধুভূষণ কিন্তু এ লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন। যে জয়ন্তী মিশ্র তাঁহাকে বিপদের সময় আশ্রয় দিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় পোস্টাফিসে হাজার টাকা জমিয়াছে, তাহার সহিত এরূপ দুর্ব্যবহার করিতে তাহার মন সরে নাই। এই গুণটি বিধুভূষণ-চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। এই গুণের জন্যই কিন্তু তিনি বিপদে পড়িলেন, কুটিল ঝকৃস্থ মিঞার রোষদৃষ্টি তাঁহার জীবনের ধারা বদলাইয়া দিল।

জয়ন্তী মিশ্রের আসল ব্যবসায়ের সঠিক খবর বিধুভূষণ জানিতেন না তবে তাঁহার সন্দেহ হইত যে চায়ের ব্যবসা ছাড়াও তাঁহার অর্থাগমের আর একটা উপায় আছে। কারণ চায়ের দোকান বন্ধ হইয়া যাইবার পর দোকানের পিছনদিকের ঘরগুলিতে তাস, দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলার আসর বসিত। অনেক লোক আসিত, অনেক রাত্রি পর্যন্ত খেলা চলিত। জয়ন্তীবাবুর অন্তঃপুর হইতে বাটা ভরিয়া পান আসিত, প্রত্যেক খেলোয়াড় পান চিবাইতে চিবাইতে খেলিতেন। বিধুভূষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন প্রত্যেক খেলোযাড় খেলা শেষ হইয়া গেলে জয়ন্তীবাবুকে পয়সা দিয়া যাইত। কেন পয়সা দিত, কেনই বা তাহারা প্রত্যহ আসিত, বিধুভূষণ বুঝিতে পারিতেন না। জয়ন্তীবাবু তাঁহার আসল ব্যবসায়টির কথা বিধুভূষণকে বলেন নাই। ইচ্ছা ছিল ধীরে-সুস্থে ক্রমশঃ ব্যাপারটা তাহার নিকট প্রকাশ করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বিধুভূষণকে মাসে দুইবার (কখনও তিনবার) নিকটস্থ শহরে চা আনিবার জন্য যাইতে হইত। একটি বিশেষ দোকানের সহিত জয়ন্তীবাবুর বন্দোবস্ত ছিল,

তাহারা জয়ন্তীবাবুর সমস্ত চা সরবরাহ করিত। চায়ের প্যাকেটগুলি তাহারা ভাল করিয়া বাঁধিয়া একটি কাঠের বাক্সে পুরিয়া রাখিত, বিধুভূষণ মাঝে মাঝে গিয়া সেই বাক্সটি মাথায় করিয়া লইয়া আসিতেন। ইহার মধ্যে যে কোন প্রকার বিপদ থাকিতে পারে ইহা বিধুভূষণের কল্পনাতীত ছিল। বিপদ কিন্তু ঘটিয়া গেল। একদিন চায়ের বাক্সটি মাথায় করিয়া তিনি আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সহসা একদল পুলিস তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। থানায় কাঠের বাক্স খুলিয়া পুলিস চায়ের প্যাকেটগুলি বাহির করিতে লাগিল। তাহার পর চায়ের প্যাকেটগুলিও খুলিল। বিধুভূষণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, প্রত্যেক প্যাকেটের ভিতর ছোট ছোট শিশিতে সাদা সাদা কি যেন রহিয়াছে। পরে তিনি জানিয়াছিলেন উহা কোকেন। বিধুভূষণের জেল হইয়া গেল। ঝকুমু মিঞারই এক চর নাকি পুলিসে খবর দিয়াছিল!

জেলে গিয়া বিধুভূষণ আর একটি নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন। তিনি দেখিলেন, জেলে কেবল চোর বা খুনীরাই আসে না, সাধু মহাপুরুষরাও আসে। যাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করেন তাঁহারাও জেলবাসী। ঠিক কিছুদিন পূর্বেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। জেলের কয়েদীদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়াছিল একটা। এই বাঙ্গালী বীর যুবকবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া যে উত্তেজনা, যে সম্ভ্রম, যে উদ্দীপনা সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল তাহা বিধুভূষণকেও কম অভিভূত করে নাই। বিধুভূষণ অজ্ঞাতকুলশীল, বিধুভূষণ নিরক্ষর, কিন্তু এই ঘটনাটি তাহার কল্পনাকেও নানারঙে রাঙাইয়া দিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত, আহা, আমি যদি উহাদের একজন হইতাম! সুযোগ পাইলে নিশ্চয় হইতে পারিতাম, প্রাণ তুচ্ছ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতাম না। যে কুৎসিত কলঙ্ক জয়ন্তী মিশ্র আমার চরিত্রে মাখাইয়া দিয়াছে, তাহার জন্য আমি তো দায়ী নই। কোকেন যে কী বস্তু তাহাই আমি জানিতাম না, এখনও আমি জানি না। তবু আমি আইনের চক্ষে কোকেনের চোরা ব্যবসায়ী বলিয়া দণ্ডিত। আমার অজ্ঞতাকে পুলিস এবং বিচারক ন্যাকামি আখ্যা দিয়াছে। এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে নিজের জন্মরহস্যের কথাও তাহার মনে জাগিত। তাহার মা দেখিতে কেমন ছিল? বিজলী মাসীর মুখের অনুরূপ একটা মুখচ্ছবি তাহার মানসপটে অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত, আবার মিলাইয়া যাইত। তাহার মনে হইত তিনি যদি সুযোগ পান লেখাপড়া শিখিবেন, অনেক অর্থ উপার্জন করিবেন, অর্থের জোরে নিজের কলঙ্ককালিমা মুছিয়া ফেলিবেন। একটা নিষ্ফল আক্রোশ তাঁহার মনের মধ্যে অহরহ গুমরাইয়া মরিত। অদম্য উৎসাহ, অবাধ কল্পনা, ভবিষ্যতের আশা একদিকে যেমন তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিত, জেলের প্রাচীর, ওয়ার্ডারদের অকথ্য গালাগালি, জীবনের অনিশ্চয়তা, জন্মের কলঙ্কিত কাহিনী আবার তেমনি তাঁহাকে অবসন্নও করিত। উপমার সাহায্য লইলে বলিতে হইবে একটা বেলুনকে কে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, বাঁধন একটু আলগা হইলে উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঁধন বড় কঠিন। চট্টগ্রাম

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনীটা যখন তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে তখন আর একটি ঘটনা ঘটিল। বকু নামে একটি নূতন কয়েদী আসিয়া হাজির হইল।

বকু বিধুভূষণের সমবয়সী। তাহার সহিত বিধুভূষণের ভাব হইতে বিলম্ব হইল না। একদিন গোপনে বকুর কাহিনী শুনিয়া বিধুভূষণ যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত হইয়া গেলেন। বকু না কি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সহিত জড়িত ছিল! পুলিস তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পায় নাই। কিন্তু সন্দিগ্ধ পুলিস তাহার সঙ্গও ছাড়ে নাই। ছায়ার মতো সর্বত্র তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে একটা মিথ্যাচুরির অজুহাতে তাহাকে জেলে পুরিয়াছে। বিধুভূষণ রুদ্ধশ্বাসে বকুর মুখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। শুধু একবার শুনিলেন না, বহুবার শুনিলেন। বকুর সহিত গোপনে দেখা হইলে এই গল্প ছাড়া অন্য গল্প হইত না। সূর্য সেন হইতে শুরু করিয়া প্রতিটি বিদ্রোহীর নাম তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। লুণ্ঠনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এমনভাবে বারবার তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল যেন নিজেই তিনি অকুস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুযোগ পাইলেই বকুকে তিনি ওই বিষয়েই নানা প্রশ্ন করিতেন। এমন একজন উৎসাহী জিজ্ঞাসুকে বকুও নিরাশ করিতে চাহিত না, অকপটে সমস্ত কথাই বলিত। বকু নিজে লুণ্ঠন করে নাই, সে লুণ্ঠনকারীদের ফাইফরমাশ খাটিত। কখন কি ভাবে সে কাহাকে চিঠি দিয়া আসিয়াছে, কি ভাবে খাদ্য সরবরাহ করিয়াছে, দূর হইতে পুলিস দেখিয়া কি উপায়ে সকলকে সাবধান করিয়াছে এই সকল কাহিনী সে নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বিধুভূষণকে শুনাইত। বিধুভূষণ তন্ময় হইয়া শুনিতেন। এইভাবে দিন কাটিতেছিল, এমন সময় জেলে হঠাৎ একটা লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়া গেল। জেলের কতকগুলি কয়েদী জেল-কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জেলারকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ভিতরে ভিতরে যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল তাহা বিধুভূষণ আভাসে টের পাইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাহা যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের মতো এমন ভীষণ আকার ধারণ করিবে তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় যাহা হয় তাহাই হইল। পাগলা ঘণ্টা বাজিল, মিলিটারি আসিল, গুলি চলিল। একশত ছয়জন কয়েদী গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। বকুও মারা গেল সেই সঙ্গে। মিলিটারির সাড়া পাইয়া বিধুভূষণ প্রকাণ্ড একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাই প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। ইহার পরও তাঁহাকে কয়েকদিন আতঙ্কের মধ্যে কাটাইতে হইল। কারণ কাহারা কাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অনুসন্ধানের জালে আবার অনেকে ধরা পড়িল, বিধুভূষণ কিন্তু বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহাকে অন্য জেলে চলিয়া যাইতে হইল। কর্তৃপক্ষ এই জেলের কয়েদীগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দিলেন। হয়তো তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে এক সঙ্গে থাকিলে আবার ইহারা ষড়যন্ত্র পাকাইবে।

আলিপুর জেলে আসিয়া তিনি তৃতীয় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এইখানেই তিনি প্রথম প্রচার করিলেন যে, তাঁহার আসল নাম বিধুভূষণ। বকুর মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে বিদ্রোহীদের যে সব ছোকরারা লুকাইয়া সাহায্য করিত তাহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল বিধুভূষণ। আলিপুর জেলে আসিয়া তাঁহার এক অদ্ভুত সাধ হইল। আলিপুর জেলের অধিবাসীদের নিকট তিনি নিজেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একজন সহকারীরূপে পরিচিত করিলেন। বকু যেভাবে ধীরে ধীরে লুকাইয়া তাঁহাকে সব কথা বলিয়াছিল তিনিও সেইভাবে অপরকে সব কথা বলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন ক্রমশঃ বকুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। তিনি যে মিথ্যাচরণ করিতেছেন ইহা তাঁহার বিবেককে মোটেই পীড়িত করিল না। অশ্বত্থামা যেমন নকল দুগ্ধ পান করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি নকল বীরত্বের অভিনয় করিয়া কেমন যেন একটা উন্মাদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা ভণ্ডামি করেন নাই, বিধুভূষণ করিতেছিলেন। কিন্তু বিবেককে স্তোক দিবার জন্য তিনি একটা অভিনব যুক্তিও খাড়া করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে এতদ্দ্বারা তির্যকপথে তিনি মৃত বকুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনই করিতেছেন। তাঁহার কাহিনী শুনিয়া কয়েদীদের মধ্যে কেহ বিস্ময়ে, কেহ শ্রদ্ধায়, কেহ প্রশংসায় বিহ্বল হইয়া যখন তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত তখন তিনি কল্পনা করিতেন যে, যে সম্মান বকুর প্রাপ্য ছিল অথচ সে পায় নাই, তাহাই আহরণ করিয়া তিনি যেন তাহার স্মৃতি-তর্পণ করিতেছেন। কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে এ ভাবটা কাটিয়া গেল। এই জেলেই রাখহরি বিশ্বাস, গোপেন পাল, গগন দাঁ, জিৎরাম চুড়িওয়ালার সহিত যখন তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল তখন তিনি আর বকুর সম্বন্ধে ততটা সচেতন রহিলেন না। মাঝে মাঝে যখন সচেতন হইতেন তখন তাঁহার মন বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, বিবেক-দংশনে বিক্ষত হইয়া পড়িতেন। বকুর স্মৃতিটা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে না কেন এই ধরনের একটা আজগুবি ক্ষোভও মনের মধ্যে প্রবল হইয়া তাঁহাকে পীড়া দিত। কিন্তু কালই সকল পীড়ার অবসান ঘটায়। কালক্রমে তিনি এ পীড়া হইতেও মুক্ত হইলেন। কালের প্রভাবের সহিত তাহার ইচ্ছাশক্তির যোগাযোগ ঘটাতে ব্যাপারটা আরও সহজ হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে বকুর ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আসিল। পুরাতন বিবেককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নূতন বিবেক তাহাতে আরোহণ করিল। জেল হইতে তিনি যখন মুক্ত হইলেন তখন তিনি একজন পুরাদস্তুর স্বদেশসেবী হইয়া পড়িয়াছেন। চাঁদনীতে রাখহরি বিশ্বাস, শ্যামবাজারে গোপেন পাল, বহুবাজারে গগন দাঁ এবং বড়বাজারে জিৎরাম চুড়িওয়ালাও কখনও নিম্নকণ্ঠে, কখনও সাড়ম্বরে পরিচিত মহলে যখন সেকথা প্রচার করিতে লাগিলেন তখন এই অলীক ইতিহাসের বনিয়াদ ক্রমশ বেশ পাকা হইতে লাগিল এবং অবশেষে সত্য হইয়া উঠিল। এই ভদ্রলোক-চতুষ্টয়ও স্বদেশীর হিড়িকে

জেলে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন একজন বীরের সন্ধান পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কোনও প্রমাণের অপেক্ষা তাঁহারা রাখিলেন না, বিধুভূষণকে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার স্তুতিগান করাটাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া পড়িল। বিধুবাবু যে একজন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী বীর এ কথা সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে মানিয়া লইলেন। বিধুভূষণের ভবিষ্যৎ জীবনের ভূমিকা কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই রচিত হইয়া গেল।

জেল হইতে বাহির হইয়া বিধুভূষণ একটি মেসে আশ্রয় লইয়াছিলেন। উপার্জনের জন্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ গগন দাঁ তাঁহাকে প্রথমে নিজের বিড়ি ফ্যাক্টারিতে ম্যানেজার, পরে অংশীদার করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এই মেসেই ভূপেশ মজুমদারের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ভূপেশ তখনও ছাত্রজীবন অতিক্রম করে নাই। প্রাইভেট ট্যুশনি করিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে কলেজের খরচ চালাইতে হইত। অনেক সময় জলখাবারের পয়সা পর্যন্ত জুটাইতে পারিতেন না। সেই দুর্দিনে বিধুভূষণের মহত্ত্ব তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। বিধুভূষণ অকাতরে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। ভূপেশ প্রথম প্রথম তাহা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিশোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধুভূষণের অমায়িকতার জন্য তাঁহার এ চেষ্টা সফল হয় নাই। বিধুভূষণ একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই ভূপেশ, আমি ব্যবসায়ী লোক। তুমি ভেবো না যে টাকাটা আমি তোমাকে বিনা স্বার্থে দিচ্ছি।"

"কি স্বার্থ?"

বিস্মিত ভূপেশ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে দাও তুমি, ভাই। দেশের কাজে মেতে ছেলেবেলাটা তো ছারখার হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম ফাঁসিকাঠেই ঝুলতে হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ফাঁসিকাঠ এড়িয়ে গেল আমাকে। এখন দেখছি আর পাঁচজনের মতো রোজগার করে খেতে হবে। এ বাজারে ভদ্রভাবে রোজগার করতে হলে লেখাপড়া একটু জানা চাই। বিড়ি ফ্যাক্টারিতেও লেখাপড়া না জানলে চলে না—"

"বেশ, তা দেব।"

ভূপেশ মজুমদারের নিকটই বিধুভূষণ কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

এই কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট বিষ্ণুচরণের সহিত বিধুভূষণের পরিচয় ঘটে ব্যবসায় সম্পর্কে। বিধুভূষণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং অন্যান্য বহুবিধ চারিত্রিক গুণের জন্য অল্পকালমধ্যেই ব্যবসায়ক্ষেত্রে এমন সুনাম ও দক্ষতা অর্জন করিলেন যে তাঁহার কর্মক্ষেত্র আর কলিকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, ঢাকা এমন কি রেঙ্গুন পর্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শুধু বিড়ি নয়, পাট, ধান, কয়লা, ইষ্টকের ব্যবসায় প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া ব্যবসায়-জগতে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধন, মান, প্রতিপত্তির সঙ্গে বয়সও

বাড়িতে লাগিল। বিষ্ণুচরণের সহিত যখন তাঁহার আলাপ হইল তখন তিনি যৌবন-সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছেন। বিষ্ণুচরণ তাঁহার পাটের ব্যাপারী। তিনি বিধুভূষণের জন্য পূর্ববঙ্গে পাট খরিদ করিতেন। যে সম্পর্কের সূত্রপাত ব্যবসায় হইতে, কালক্রমে তাহা এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে, বিষ্ণুচরণ অবশেষে বিধুভূষণের বন্ধু হইয়া পড়িলেন। বিধুভূষণের চরিত্রের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি অতি সহজেই মানুষকে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বাঁধিতে পারিতেন। যাহার সহিত যখনই তাঁহার কোন সম্পর্ক ঘটিয়াছে নানা উপায়ে সে সম্পর্কটিকে মধুর না করা পর্যন্ত তিনি যেন তৃপ্তি পান নাই। ব্যবসায় উপলক্ষে যখনই তাঁহাকে ঢাকায় যাইতে হইত, বিষ্ণুচরণের জন্য কিছু-না-কিছু তিনি লইয়া যাইতেন। হয় মুগের ডাল, না হয় কিছু ভাল সন্দেশ, শীতকালে গলদা চিংড়ি, কখনও দুই একখানা শান্তিপুরী শাড়ি কিংবা বিষ্ণুচরণের শিশু-পুত্রের জন্য কিছু খেলনা—এই ধরনের ছোটখাটো কিছু না লইয়া গেলে তাঁহার যেন তৃপ্তিই হইত না। বিষ্ণুচরণ প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি জানাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে শেষে আর কিছু বলিতেন না। শুধু বিষ্ণুচরণ নয়, বিষ্ণুচরণের স্ত্রীও বিধুভূষণের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণের পত্নী শিবানীকে তিনি 'বোনটি' বলিয়া ডাকিতেন এবং সত্যই তাহাকে ছোট ভগ্নীর মতো স্নেহ করিতেন। তাহাকে কাপড় কিনিয়া দিতেন, গহনা গড়াইয়া দিতেন। প্রতি বৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় বিবিধ প্রকার সওগাত-সহ ভাইফোঁটা লইবার জন্য তিনি কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইতেন। বিষ্ণুচরণ ঢাকা জেলার লোক হইলেও বিবাহ করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। তাহার শ্বশুরবাড়ি ছিল বর্ধমান জেলায়। শিবানীর পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। কোনও এক মহাজনের বাড়িতে খাতালেখার কাজ করিয়া অতিকষ্টে তিনি সংসার চালাইতেন। বিষ্ণুচরণের এক শিক্ষকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। সেই ভদ্রলোকই চেষ্টা করিয়া বিষ্ণুচরণের সঙ্গে শিবানীর বিবাহ দেন।

এই শিবানী একদিন তাহার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীর সহিত বিধুভূষণের বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া বসিল। বলিল, "দাদা, এবার একটি বৌদি না হলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। ভাল একটি মেয়ে আছে, বলেন তো সম্বন্ধ করি।"

বিধুভূষণ আকাশ হইতে পড়িলেন।

'আমাকে মেয়ে দেবে কে! না আছে চাল, না আছে চুলা। একটা আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত নেই।"

"বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব, আপনি শুধু মত করুন।"

"বউ এনে রাখব কোথা?"

"বাড়িভাড়া করুন। টাকার তো অভাব নেই আপনার, কিনুন না একটা বাড়ি—"

"কোথায় টাকা, ব্যবসাতে সব আটকে আছে—"

কথাটা এইভাবে শুরু হইয়াছিল। বিধুভূষণ প্রথমে গা করেন নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবানীর জিদই বজায় রহিল। তাহার পিসতুতো ভগ্নী স্বর্ণলতার সহিত বিধুভূষণের বিবাহ হইয়া গেল। স্বর্ণলতার পিতা প্রমথবাবু দশটি কন্যার পিতা। তিনি বাংলা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। তারকবাবুর "স্বর্ণলতা" পুস্তক যখন পড়িতেছিলেন তখনই তাঁহার এই কন্যাটির জন্ম হয় বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন স্বর্ণলতা। তাহার স্বামীর নামও যে বিধুভূষণ হইবে, ইহা আশা করিতে পারেন নাই। পাত্রের নাম বিধুভূষণ শুনিয়া তিনি পুলকিত হইলেন, আরও পুলকিত হইলেন পণ লাগিবে না শুনিয়া। বস্তুত বিধুভূষণের মতো পাত্র পাইয়া তিনি যেন বর্তাইয়া গেলেন। বিবাহের পূর্বে পাত্রের সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব খোঁজ করা উচিত, দশটি কন্যার জনক প্রমথ রায় তাহা করা প্রয়োজনই মনে করিলেন না। তাঁহার মনে হইল শিবানী যখন বিধুভূষণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন আর কথা কি। বিধুভূষণ বানাইয়া বানাইয়া নিজের কুল ও গোত্রের যে পরিচয় দিলেন তাহা বিশ্বাস করিতে কাহারও বাধিল না, কেহ তাহা যাচাইয়া লওয়াও প্রয়োজন মনে করিলেন না। স্বর্ণলতার সহিত বিধুভূষণের একদিন বিবাহ হইয়া গেল।

এ বিবাহ যে বিধুভূষণের জীবনে বিপর্যয় ঘটাইবে তাহা তিনি ভাবেন নাই। কল্পনা করাই অসম্ভব ছিল। একদিন বিধুভূষণ বাড়িতে ফিরিয়া দেখিলেন স্বর্ণলতা নিবিষ্টচিত্তে একটি পত্র পড়িতেছে।

"কার চিঠি—"

"রজত মেসো লিখেছেন—"

বিধুভূষণের বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল।

স্বর্ণলতা হাসিয়া বলিল, 'আমাদের যেতে লিখেছেন। খবর পেয়েছেন বোধ হয় যে তুমি বড়লোক তাই এখন নিমন্ত্রণ করেছেন। বিয়ের সময় বাবা নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন উত্তর পর্যন্ত আসেনি—।"

বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "কোথায় থাকেন এঁরা—"

"বল্লভগঞ্জে। বেশ বড় জমিদার। কিন্তু কি মাতাল আর কি বদমাশ! একটা ছেলে আছে, দেখলে ঘেন্না করে, মানুষ নয় যেন জন্তু—।"

বিধুভূষণের আর সন্দেহ রহিল না।

"তোমার আপন মেসো—?"

"না, দূরসম্পর্কের! রজতবাবু আমার মায়ের এক দূরসম্পর্কের বোনকে বিয়ে করেছিলেন।"

"ও।'

'যদি যাও তো বল, অনেক করে লিখেছেন, দেখ না—"

বিধুভূষণ পোস্টকার্ডখানা হাতে করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর জোর করিয়া একটু মেকি হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পাগল না কি, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই—"

আবার একবার জোর করিয়া হাসিলেন, তাহার পর পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। কি সর্বনাশ! যে গ্লানিকর অতীতের সহিত তিনি সমস্ত সম্পর্ক নিশ্চিহ্নরূপে মুছিয়া ফেলিতে চান, যে অতীতকে সম্পূর্ণরূপে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিবার জন্য তিনি মিথ্যার পর্বত রচনা করিয়াছেন, সেই অতীতের জীবন্ত সাক্ষী এই স্বর্ণলতা। যে ভিত্তির উপর তাঁহার মানসম্ভ্রম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব দাঁড়াইয়া আছে এই মেয়েটা তো যে-কোন মুহূর্তে সে ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে পারে। এ তো সহধর্মিণী নয়, এ যে শত্রু। অতর্কিতভাবে সুড়ঙ্গপথে আসিয়া হানা দিয়াছে! শিবানীও নিশ্চয় রজতবাবুদের খবর জানে। আত্মীয় যখন, নিশ্চয় জানে! সেই মুহূর্তে তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন আর ঢাকায় যাইবেন না।

"রজত মেসোকে তাহলে লিখে দি আমাদের এখন যাওয়া হবে না, কি বল? তোমার একখানা ফটো চেয়েছেন, আমাদের পেয়ার ফটো তো তোলাব তোলাব করে আর হলই না, চল না তোলাই একদিন—"

বিধুভূষণ পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার কথায় জবাব না দিয়া বলিলেন, "একটা জরুরি কাজে আমাকে বাহিরে যেতে হচ্ছে, বুঝলে, ফিরতে হয়তো দেরি হবে—"

বলিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। স্বর্ণলতার সান্নিধ্যও তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতেছিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথ ধরিয়া তিনি হাঁটিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কলিকাতার পথে পথে হাঁটিয়া অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন সম্মুখেই যে হোটেলটা দেখিতে পাইলেন তাহাতে ঢুকিয়া পড়িলেন। রাত্রেও যখন বিধুভূষণ ফিরিলেন না, তখন স্বর্ণলতা ভাবিল জরুরি কাজের জন্য তিনি কলিকাতার বাহিরেই বোধ হয় চলিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে স্বর্ণলতা বিশেষ চিন্তিত হইল না। বিধুভূষণ মাঝে মাঝে দীর্ঘকালের জন্য বাহিরে চলিয়া যাইতেন। সে পুরাতন ভৃত্য মধুর তত্ত্বাবধানেই দিন কাটাইতে লাগিল। বিধুভূষণ কিন্তু কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই, সেই হোটেলেই তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। একাকী হোটেলের একটা ঘরে বসিয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন কি করা উচিত। ইহা লইয়া হৈ-চৈ করিলে যে সব পণ্ড হইয়া যাইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব? এ সম্বন্ধে অন্য কাহারও সহিত পরামর্শ করাও যায় না। বিধুভূষণ হোটেলের ঘরে একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল এ সমস্যার যদি তিনি সমাধান করিতে না পারেন তাহা হইলে এতদিন এত কষ্ট করিয়া যাহা তিনি

সৃষ্টি করিয়াছেন সব রসাতলে যাইবে। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইতেছিল স্বর্ণলতাকে সমস্ত কথা অকপটে খুলিয়া বলিলে কেমন হয়? তাহারও ভবিষ্যৎ তো ইহার সহিত জড়িত। কিন্তু তখনই মনে হইতেছিল—মেয়েমানুষ, অল্প বয়স, এই ভয়ঙ্কর সত্যের সম্মুখীন হইয়া সে মাথা ঠিক রাখিতে পারিবে কি? না, পারা সম্ভব নয়। পণ্ডিত চাণক্যের সতর্কবাণী মনে পড়িল। স্ত্রী-জাতিকে বিশ্বাস নাই। মনে পড়িল কত লোকের কাছে তিনি সাড়ম্বরে চট্টগ্রাম-সংক্রান্ত বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, মনে পড়িল ইহার জোরে কত বড়লোকের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ফটো তুলাইয়াছেন। স্বর্ণলতা যদি সত্যটা পরিপাক করিতে না পারে, সব মাটি হইয়া যাইবে। যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই স্বর্ণলতাকে একটা ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিবাহ করিয়া এ কি ভীষণ প্যাচে তিনি পড়িয়া গেলেন? কিন্তু যেমন করিয়াই হোক প্যাচ তাঁহাকে খুলিতেই হইবে। স্বর্ণলতার মুখটা কোন উপায়ে বন্ধ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। রজতবাবুরা তাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইবেন না, তাহার কথা হয়তো তাঁহারা এতদিনে ভুলিয়াও গিয়াছেন। বিজলী মাসী নিশ্চয় এতদিন বাঁচিয়া নাই। জয়ন্তীবাবু এবং ঝক্কু মিঞা উভয়েরই জেল হইয়া গিয়াছে। জয়ন্তীবাবু নাকি মারাও গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি কোনদিন তাঁহাকে চিনিয়াও ফেলে তাহাকে ধাপ্পা দেওয়া অসম্ভব হইবে না। তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে ভুল করিয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ একজনের সহিত আর একজনের চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নাম বিধুভূষণ, ভূতো নয়। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সহিত এ সব চালাকি কতদিন চলিবে? রজতবাবুদের সহিত যখন উহার আত্মীয়তা আছে, তখন কোন-না-কোন সূত্রে সমস্ত কথা একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। বিধুভূষণ যে একদিন 'পাঁঠা' নামে অভিহিত হইতেন এ সত্যকে কিছুতেই চাপা দেওয়া যাইবে না। না, ইহার একটা প্রতিকার করিতেই হইবে।

…কয়েকদিন চিন্তা করিয়া অবশেষে বিধুভূষণ বাড়ি ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন স্বর্ণলতা জ্বরে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন। তাহার একটু আশা হইল। ভাবিলেন ভগবান হয়তো দয়া করিবেন। যদি অসুখেই মারা যায় তাহাকে আর বিশেষ কিছু হাঙ্গামা করিতে হইবে না। কিন্তু এ আশা শেষ পর্যন্ত সফল হইল না। স্বর্ণলতা মরিল না, ভুগিতে লাগিল। পুরা এক বৎসর ধরিয়া ভুগিল। স্ত্রী অসুখে পড়িলে একেবারে বিনা চিকিৎসায় রাখা যায় না। বিধুভূষণ পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকিলেন। তাহার ঔষধগুণেই হউক বা স্বাভাবিক নিয়মবশতই হউক স্বর্ণলতা কিছুদিন ভাল থাকিত, তারপর জ্বরে পড়িত। এইভাবে ছয় মাস কাটিল। সংবাদ পাইয়া স্বর্ণলতার পিতা একদিন আসিলেন। বলিলেন, "একজন ভালো কাউকে ডাক না—"

বিধুভূষণ উত্তর দিলেন, "অ্যালোপ্যাথির উপর তেমন বিশ্বাস নেই আমার। যদি বলেন, কবিরাজ ডাকতে পারি।"

"তাই ডাক।"

কবিরাজ আসিলেন। কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। কয়েকদিন থাকিয়া স্বর্ণলতার পিতা দেশে ফিরিয়া গেলেন। সেখান হইতে একটা ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিলেন—"এই ঠিকানায় একজন ভাল অবধূত আছেন শুনেছি, তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল করেছেন। তাঁকে একবার দেখিও—"

তিনি আসিলেন এবং দেখিলেন। জ্বরের কিন্তু উপশম হইল না। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। বাড়ির মালিক বিধুভূষণ কিন্তু পারতপক্ষে বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার ভয় হইত হঠাৎ যদি রজতবাবুদের বাড়ির কেহ আসিয়া পড়ে! ঝি এবং চাকরই স্বর্ণলতার তত্ত্বাবধান করিত। বিধুভূষণ রাত্রে তাহার কাছে পর্যন্ত শুইতেন না। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া তিনি মধুকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেউ এসেছিল?" যদি আশঙ্কাজনক কোন উত্তর পাইতেন তাহা হইলে বাড়িতে শুইতেনও না। কোনও কাজের ছুতায় তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া যাইতেন। ভয়ের কিছু না থাকিলে নীচের ঘরটিতে শুইয়া পড়িতেন। এইভাবেই চলিতেছিল। স্বর্ণলতার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। স্বর্ণলতার পিতা পুনরায় আসিলেন এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে একজন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকিতে হইল। তিনি কিছুদিন ঘটা করিয়া চিকিৎসা করিলেন। বিধুভূষণের ভয় হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত ভালো করিয়া না তোলে! যে রকম রেটে ইনজেকৃশন দিতেছে তাহাতে মরা মানুষের উঠিয়া বসিবার কথা। ডাক্তারবাবু কিন্তু শেষে জবাব দিলেন।

বলিলেন, "কোলকাতায় এ অসুখ সারবে না, আপনি ওঁকে নিয়ে চেঞ্জে যান। পাহাড়ই ভাল হবে ওর পক্ষে। দার্জিলিং গিয়ে থেকে আসুন না কিছুদিন—"

বিধুভূষণ দার্জিলিং গেলেন। উঠিলেন একটা হোটেলে। একটা সঙ্কল্প করিয়াই তিনি গিয়াছিলেন। সুতরাং হোটেলে নিজেকে যোগজীবন নামে পরিচিত করিলেন। সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করিতে হয়তো দুই একদিন বিলম্ব হইত। কিন্তু একটি ঘটনা ঘটাতে তাঁহার আর তর সহিল না। বিধুভূষণ বাজার হইতে ফিরিয়া একদিন দেখিলেন স্বর্ণলতা চিঠি লিখিতেছে।

"কাকে চিঠি লিখছ?"

"রজত মেসোকে।"

বিধুভূষণের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। "রজত মেসোকে? হঠাৎ!"

"কনকদার একবার এইরকম জ্বর হয়েছিল। কিছুতেই সারছিল না, শেষকালে ইউনান সাহেবের ওষুধে ফল হল। আজ কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ। কোলকাতায় মনে পড়লে হয়তো সেরেই যেতাম এতদিন। রজত মেসোকে তাই লিখছি যদি ওষুধের নামটা লিখে পাঠান, কিংবা ইউনান সাহেবের ঠিকানা দেন। এই হোটেলের ঠিকানাটা কি বলতো—"

"তুমি লেখা শেষ কর। একটু জায়গা রেখ, ঠিকানা আমি লিখে দেব।"

স্বর্ণলতার লেখা শেষ হইতেই বিধুভূষণ চিঠি হস্তগত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হোটেলে আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছিল। ঘটনাটির গুরুত্ব বিধুভূষণ তখন উপলব্ধি করেন নাই, পরে করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই। বিধুভূষণের হোটেলে আর একটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোকও আসিয়া উঠিয়াছিলেন। লোকটির চাল-চলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ বড়লোকের মতো। চোখে রঙীন চশমা, মুখে হাভানা সিগার, অনামিকায় হীরার আংটি, অঙ্গে দামী স্যুট। ইনি বিধুভূষণের অন্তরে প্রথম প্রথম বেশসম্ভ্রমও সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না, একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অদ্ভুত মুদ্রাদোষও ছিল একটা। আপনমনেই হাসিতেন, আপনমনেই মাথা নাড়িতেন। কেহ কাছাকাছি আসিলেই গম্ভীর হইয়া যাইতেন সঙ্গে সঙ্গে। এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিতেন, যাহার অর্থ—তুমি এখানে কি করছ, সরে যাও। লোকটিকে দেখিলেই বিধুভূষণের একটা অস্বস্তি হইত। সুতরাং একদিনও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করেন নাই। লোকটিও আলাপী ছিলেন না, হোটেলে কমই থাকিতেন। সমস্তক্ষণ বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তিনি। বাহিরেই মাঝে মাঝে বিধুভূষণের সহিত হঠাৎ তাঁহার দেখা হইয়া যাইত। বিধুভূষণ কখনও দেখিতে পাইতেন চলাচলের পথ হইতে একটু দূরে তিনি একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া সঞ্চরমাণ মেঘের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে তুড়ি দিতেছেন। মুখ গম্ভীর। মনে হইত মুখ নয়, যেন মুখোশ। দুই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ঝোপের অন্তরালে তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। ভদ্রলোকের চাল-চলন, ধরনধারণ, মতিগতি, উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যাইত না। মাঝে মাঝে বিধুভূষণের এ সন্দেহও হইত যে, ভদ্রলোক হয়তো তাঁহারই গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন। কারণ যখনই তিনি স্বর্ণলতাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন কোথাও-না কোথাও ইঁহার সহিত দেখা হইয়া যাইত। মনে হইত লোকটা যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। বিধুভূষণ শঙ্কিত হইয়া পড়িতেন, কারণ তাঁহার বিবেকে গলদ ছিল। মাঝে মাঝে অযৌক্তিকভাবে এ কথাও তাঁহার মনে হইত—বকুর কোনও আত্মীয় নয় তো! যথাসাধ্য তিনি ভদ্রলোককে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন।

স্বর্ণলতা তাহার রজত মেসোকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিল সেটি ডাকে ফেলিয়া দিবার ছুতায় বিধুভূষণ যখন বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তখন কেহ তাঁহার মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখিত যে তাঁহার সমস্ত সত্তাকে ঘিরিয়া উনপঞ্চাশ পবন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। সেই তাণ্ডবনর্তনে তাঁহার বিবেক বিপর্যস্ত, পাপপুণ্যবোধ অন্তর্হিত। যে ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প তাঁহার মনে বাসা বাঁধিয়াছিল তাহাই যেন এ বিপদে তাঁহাকে কেবল আশ্বাস দিতেছে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া স্বর্ণলতাকে তিনি বলিলেন,

"আজ অতি চমৎকার জিনিস দেখে এলাম একটা"—

"কি—"

স্বর্ণলতা সোৎসুকে প্রশ্ন করিল।

"পাহাড়ী স্থলপদ্ম।"

"কোথায় ?"

"ওই যে দিক দিয়ে আমরা বেড়াতে যাই, রাস্তার বাঁকে সেই যে প্রকাণ্ড গর্তটা আছে, সেই গর্তের তলায় ফুটেছে ফুলগুলো। চমৎকার ফুল—"

"গর্তের তলায় ফুটেছে ? সে তো অনেক নিচুতে, আমি কি পারব ?"

"নামা যাবে না, উঁকি মেরে দেখতে হবে।"

"অত নীচু গর্তের ভিতর ফুল তুমি দেখতে পেলে কি করে ? আমার চোখে তো একদিনও পড়ে নি। রোজই তো যাচ্ছি।"

বিধুভূষণ মনে মনে ক্ষণকালের জন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সামলাইয়া লইতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না।

"আমি দেখতে পাই নি। একজন পাহাড়ী আমাকে দেখিয়ে দিলে। আজ দেখাব তোমাকে। চল না একটু পরেই বেরোন যাক।"

"বেশ।"

একটু পরেই স্বর্ণলতাকে লইয়া বিধুভূষণ বেড়াইতে বাহির হইলেন। ফিরিলেন একা। দ্রুতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিলেন। এ রকমটা যে ঘটিতে পারে তাহা তো তিনি কল্পনাও করেন নাই। কি সর্বনাশ! লোকটা দেখিয়াছে কি ? নিশ্চয়ই দেখিয়াছে তাহা না হইলে ও কথা বলিয়া উঠিল কেন ? স্বর্ণলতাকে যখন তিনি সেই অতলস্পর্শ গহ্বরটায় ঠেলিয়া দিতেছিলেন তখন কে যেন বলিয়া উঠিল—"আরে!" বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ বিধুভূষণ ঘাড় ফিরাইয়াছিলেন। যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষণিকের জন্ত তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গিয়াছিল। দেখিয়াছিলেন দূরের একটা ঝোপের ভিতর হইতে সেই রঙীন চশমা-পরা ভদ্রলোক মুণ্ড বাড়াইয়া রহিয়াছেন। বিধুভূষণ ওরফে যোগজীবন আর ফিরিয়া চাহেন নাই।

দ্রুতগতিতে ফিরিয়া নিজের জিনিসপত্র গুছাইয়া হোটেলের হিসাব চুকাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দার্জিলিং ত্যাগ করিলেন।

দার্জিলিং ত্যাগ করিয়া বিধুভূষণ কলিকাতা যান নাই। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের পর পরিচিত পরিবেশে ফিরিয়া যাইবার সাহস ছিল না তাঁহার। তিনি নেপালের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। শোনা যায় এই সময়ে তিনি কস্তুরী ও চামরের ব্যবসায়ে নিজেকে লিপ্ত করিয়াছিলেন। নেপালী ব্যবসায়ীদের সহিত ভাব করিয়া তিনি নাকি কস্তুরী ও চামর খরিদ-বিক্রি করিতেন। সে যাই হোক, অবশেষে কলিকাতায় তাঁহাকে ফিরিতেই হইল, কারণ কলিকাতাই তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। ফিরিলেন মাসতিনেক পরে।

ফিরিয়া সকলের কাছে প্রচার করিলেন যে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রিয়তমা পত্নী স্বর্ণলতাকে তিনি বাঁচাইতে পারেন নাই। তাঁহার জন্ত নেপালে গিয়া তিনি বাবা পশুপতিনাথের নিকট ধর্না পর্যন্ত দিয়াছিলেন কিন্তু বাবা দয়া করেন নাই। এ বার্তায় কেহ বিস্ময়বোধ করিলেন না। স্বর্ণলতা যে অনেক দিন হইতেই অসুস্থ এ সংবাদ অনেকেই জানিতেন। বিষ্ণুচরণের পত্নী শিবানী প্রশ্ন করিয়া হয়তো বিধুভূষণকে বিব্রত করিতে পারিতেন কিন্তু সে সুযোগই মিলিল না। কারণ ঠিক সেই সময় রাজনৈতিক দাবাখেলার চালে বাঙালীরা মাৎ হইয়া গেলেন। বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল, মুসলমান গুণ্ডাদের হস্তে শিবানী নিহত হইলেন। শিবানী বাঁচিয়া থাকিলেও স্বর্ণলতার মৃত্যুর প্রকৃত খবরটা জানিতে পারিতেন না, কারণ বিধুভূষণ তাঁহাকে সে সুযোগ দিতেন কি না সন্দেহ।

শিবানীর মৃত্যুসংবাদ বিধুভূষণ অনেকদিন পান নাই। কারণ কলিকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শন শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বর্ণলতার মৃত্যু লইয়া তাঁহার বিবেক তাঁহাকে হয়তো কিছুকাল বিরক্ত করিত; কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বীভৎসতায় বিবেক হতভম্ব হইয়া গেল। প্রতিদিন নৃশংস মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার স্বকৃত নৃশংসতাটা তাঁহার কাছে সামান্ত একটা ছেলে-খেলা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তিনি মজঃফরপুরে জগৎরাম ভেড়িওয়ালার নিকট চলিয়া গেলেন। জগৎরাম তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু জিৎরামের আত্মীয়। সেই সূত্রেও বটে, ব্যবসার সূত্রেও বটে, জগৎরামের সহিত বিধুভূষণের বেশ একটা হৃদ্যতা ছিল। দার্জিলিং যাইবার কিছুপূর্বে তিনি তাঁহার সহিত মজঃফরপুরে এবং কলিকাতায় উভয় স্থানেই গোলদারি ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার আকাশে মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ দেখিয়া তিনি কংগ্রেস-শাসিত হিন্দুপ্রধান মজঃফরপুরে চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি শুধু সেখানে গেলেন না, বেশ কিছুদিন বসবাসও করিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তখন পাশবিকতার যে ঝঞ্ঝা বহিতেছিল, বিহারেও যে তাহার ঝাপটা লাগে নাই তাহা নয়, কিন্তু হিন্দু বিধুভূষণের পক্ষে ভয়ের কিছু ছিল না। আর একটা কাণ্ড করিয়া তিনি নিজের নিরাপত্তা দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার পূর্বপরিচিতদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে পত্নীর অকালমৃত্যুতে হয়তো বিধুভূষণের অন্তরে বৈরাগ্য সঞ্চারিত হইয়াছে। মাথায় কদমছাঁট চুল, গলায় তুলসীর মালা, পরিধানে খদ্দরের গেরুয়া ফতুয়া, খদ্দরের গেরুয়া কাপড়, চোখে-মুখে একটা বিনীত আত্মসমাহিত ভাব—এ মূর্তি দেখিলে উক্ত ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পত্নীর কথা উল্লেখ করিলে তাহার নয়নপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিত, পারতপক্ষে সেইজন্ত কেহ তাহা উল্লেখ করিতেন না। মোট কথা, সেই সময় বিধুভূষণ পরিচিতমহলে সকলের মনে বেশ একটা সম্ভ্রম উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমানদলনের জন্ত গোপনে গোপনে উৎসাহী হিন্দু যুবকদের অর্থসাহায্য করাতে সে সম্ভ্রম অচিরে শ্রদ্ধায় পরিণত

হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—"বিন্দুবাবু তো মোহন্তজী হ্যায়। স্বয়ং রামদাস হ্যায়।" প্রত্যুত্তরে বিধুভূষণ কেবল বিনীত হাসি হাসিতেন। এই দুই তিন বৎসরে (মানে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে) তিনি কেবল শ্রদ্ধাই নয়, অর্থোপার্জনও করিয়াছিলেন। বিপুল অর্থ। চাল, ডাল, নুন, তেলের কারবারে জগৎরামজির সহায়তায় সাদাবাজারে এবং কালোবাজারে এই সময়ে যে পরিমাণ অর্থ তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন তাহার অঙ্ক না কি লক্ষের কোঠায়।

জনশ্রুতি যে এই সময়েই নাকি তিনি কলিকাতার বৃহৎ বাড়িখানি কিনিয়াছিলেন। এই সময় দিল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটে। কালোবাজারে ফলাও ব্যবসায় করিতে গেলে অনেক পদস্থ অফিসারের মনোরঞ্জন করিতে হয়, না করিলে ব্যবসায় অচল হইয়া পড়ে। ব্যবসায় চালু রাখিবার দক্ষতা বিধুভূষণের ছিল।

খুন, জখম, লুঠতরাজের ডামাডোল কমিবার পর বিধুভূষণ পুনরায় সাবেক স্বাভাবিকবেশে কলিকাতায় ফিরিলেন। যে বাড়িটি কিনিয়াছিলেন তাহা আসবাবপত্র কিনিয়া সাজাইলেন, টেলিফোন লইলেন, রেডিও কিনিলেন। অর্থাৎ বেশ গুছাইয়া বসিলেন।

মজঃফরপুরে থাকিতেই তিনি খবর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাক্তন ব্যবসায়ী বন্ধুদের মধ্যে জিংরাম চুড়িওয়ালার ব্যবসাটাই চালু আছে। বাঙালী তিনজনের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে। দেখিলেন রাখহরি বিশ্বাসের চাঁদনীর দোকানটি জনৈক কচ্ছির কবলে। ঋণে জর্জরিত রাখহরি বর্ধমান জিলাস্থ পৈতৃক ভিটায় পালাইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশানে গোপেন পাল মারা গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবসাও উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহার নাবালক পুত্র এবং বিধবা তাঁহাদের প্রাক্তন গৃহশিক্ষক পরেশ মল্লিকের রক্ষণাবেক্ষণে কোনক্রমে দিনপাত করিতেছে। অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে গগন দাঁর! তিনি তাঁহার সাবেক ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া রিফিউজি-সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মন্ত্রীদের সহিত দেখা করিতেছেন, কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখাইতেছেন, মাঝে মাঝে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেছেন, পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিতেছেন, দুই তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে প্রায় হস্তামলকবৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বড় বড় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। স্বদেশী ব্যাপারে মাতিয়া গগন দাঁ একবার জেল খাটিয়াছিলেন এই ঘটনাটিকে মূলধন করিয়া তিনি চতুর্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন যে বাস্তুহারাদের জন্য প্রয়োজন হইলে পুনরায় তিনি জেলে যাইতে প্রস্তুত আছেন। গভর্নমেণ্ট যতক্ষণ না বাস্তুহারাদের জন্য সুব্যবস্থা করিতেছেন ততক্ষণ তিনি আন্দোলন চালাইতে থাকিবেন। বিধুভূষণ তাঁহার রকম-সকম দেখিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। এ জাতীয় ব্যাপারে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। গগন দাঁর সহিত যুক্ত হইয়া যে বিড়ি ব্যবসায়টিতে তিনি লিপ্ত ছিলেন তাহা লুপ্ত হওয়াতে তিনি একটু ম্রিয়মাণই হইয়া পড়িলেন, কারণ ব্যবসায়টি সত্যই বেশ লাভজনক ছিল। অবোধ লোকেরা যে পয়সাগুলি

বিড়ি ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিত তাহারা গিয়া নীড় বাঁধিত দাঁ মল্লিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টের খাতায়! গগন দাঁ হঠাৎ এ কি কাণ্ড করিয়া বসিল!

বিধুভূষণ গগন দাঁর সহিত একদিন গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন রাত্রি দশটার পর। দিনের বেলায় গগনের নাগাল পাওয়া কঠিন। নাগাল যদি পাওয়া যায়, আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে না। বিধুভূষণ একদিন গিয়া দেখিলেন কয়েকজন ফটোগ্রাফার লইয়া গগন রেফিউজিদের ফটো তুলাইতেছে। এত ব্যস্ত যে ভিড়ের মধ্যে বিধুভূষণকে দেখিতে পর্যন্ত পাইল না। দ্বিতীয় দিন আর এক কাণ্ড! একদল যুবক-যুবতী গগনকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং রেফিউজিদের সম্বন্ধে সংগৃহীত কাহিনী শুনাইতেছে। নিকটে একজন বসিয়া শর্টহ্যাণ্ডে সেগুলি টুকিয়া লইতেছে। দ্বিতীয় দিন অবশ্য গগন বিধুভূষণকে দেখিতে পাইল এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"আরে, আপনি কবে ফিরলেন! আপনার মতো লোকেরই যে দরকার এখন। আপনাকেই খুঁজছি আমি। ঠিকানাটাও রেখে যান নি যে একটা চিঠি লিখি। বসুন, বসুন—। কবে ফিরলেন?"

উপবেশন করিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "ফিরেছি কিছুদিন হল।"

"এইবার লেগে পড়ুন আবার আমার সঙ্গে। বাঙালী জাতটা যে মরে গেল মশাই।"

বিধুভূষণ এতদুত্তরে কি বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া একটা গোল উত্তর দিলেন। তাতো দেখতেই পাচ্ছি।"

"ভিড়ে যান আমার সঙ্গে। সরে থাকলে চলবে না।"

মুখে একটা গদগদ অথচ সলজ্জ হাসি ফুটাইয়া বিধু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনার সঙ্গে তো বরাবর ভিড়েই আছি। যা বলবেন করব। কখন আসব বলুন"

গগন দাঁ পট করিয়া পকেট হইতে একটি ডায়েরি বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। একটি পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল, কিছুক্ষণ সে পাতাটি ভ্রূকুঞ্চনসহকারে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল, "পরশু রাত দশটায় আসুন। রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ রইল। খাবেন আমার বাড়িতে। সেই সময়েই আলোচনা হবে।"

খবরটি ডায়েরিতে লিখিয়া লইল। বিধুভূষণ লক্ষ্য করিলেন গগনের চালচলন আগে ঢিলা-ঢালা ছিল, এখন বেশ আঁটসাট হইয়াছে। একটু বিস্মিত হইলেন, মজাও লাগিল।

নির্দিষ্ট তারিখে রাত্রি দশটার পর বিধুভূষণ হাজির হইলেন। খাইতে বসিয়া লক্ষ্য করিলেন যে আহারের ব্যাপারেও গগন যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। পূর্বেও তিনি গগনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইয়াছেন। কিন্তু বড়ি, পোস্ত, কলাইয়ের ডাল, মৌরলা মাছের ঝাল বা অম্বল, দুই একটা ভাজাভুজি, একটু দই বা রাবড়ি—এই ধরনের খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু

খাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না। পোলাও, পাকা মাছের কালিয়া, মটন, ভেটকি মাছের ফ্রাই, উৎকৃষ্ট শামি কাবাব, ফ্রেঞ্চ কাটলেট, পুডিং, ক্রুটস, তা ছাড়া শ্রদ্ধেয় ভীম নাগ, দ্বারিক, সেন মহাশয় প্রভৃতি মিষ্টান্ন-মনীষিগণের সমাবেশ – বিধুভূষণ রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেলেন। সহসা কোন থার্মোমিটারকে গরম জলে ডুবাইয়া দিলে তাহার পারাটা যেমন দ্রুতগতিতে উপরের দিকে উঠিতে থাকে, বিধুভূষণের অন্তরে গগন দাঁর প্রতি সম্ভ্রমও তেমনি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া গেল। আহারাদির পর সুগন্ধি তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে গগন আসল প্রসঙ্গটির অবতারণা করিল।

"দেখুন বিধুবাবু, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, যে স্বাধীনতার জন্য আপনি আমি প্রাণ তুচ্ছ করেছিলাম সেই স্বাধীনতা এখন আমরা পেয়েছি। এখন আমাদের কি বিড়ির ব্যবসা করা সাজে? এখন এমন একটা কিছু করতে হবে যা দেশহিতকর—"

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী বিধুভূষণকে বলিতেই হইল, "সে তো নিশ্চয়ই। বিড়িটা স্বদেশী বলেই—"

গগন দাঁ বিধুভূষণের বাক্য সম্পূর্ণ হইতে দিল না। বলিল, "অনিষ্টকর স্বদেশী জিনিসের সংস্রবও ত্যাগ করতে হবে আমাদের। বিড়িতে ফুসফুস নষ্ট করে। দেশের ফুসফুস জখম করা কি আমাদের সাজে? আদর্শ স্থাপন করবার দায়িত্ব যে আমাদের।"

বড় বড় সাধকেরা যেমন অন্যমনস্ককারী পরিস্থিতির মধ্যেও ধ্রুব সত্যটাকে বিস্মৃত হন না, বিধুভূষণও তেমনি সত্যটি বিস্মৃত হইলেন না। সেইদিকেই গগন দাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ঈষৎ কাসিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু রোজগারও তো করতে হবে—"

"নিশ্চয়। কিন্তু ভাল কাজ করেও ভাল রোজগার করা যায়। আসুন, আপনাকে সব খুলে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তলিয়ে বুঝুন ব্যাপারটা—"

ইহার পর গগন দাঁ হঠাৎ নিম্নকণ্ঠ হইয়া গেল এবং তাকিয়াটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বিধুভূষণের কর্ণকুহরে চুপি চুপি তাহাই বলিল যাহা বিধুভূষণ বুঝিতে চাহিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট কাঁচের মতো স্বচ্ছ হইয়া গেল। গগন দাঁর সম্বন্ধে সম্ভ্রম আরও বাড়িল। বস্তুত তিনি মুগ্ধই হইয়া গেলেন। দেশহিতের সহিত অর্থাগমের যে এমন একটা রাজযোটক সম্বন্ধ হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না।

একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভিতরে ভিতরে যে এত ব্যাপার আছে তা বুঝি নি।"

গগন দাঁ উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "আপনি সরল মানুষ, তাই বোঝেন নি। এটা তো সোজা কথা যে এতগুলি রিফিউজিকে এদেশে ভদ্রভাবে বসবাস করাতে গেলে গভর্নমেণ্টকে অনেক রুধিরপাত করতে হবে। তাদের জমি দিতে হবে, বাড়ি দিতে হবে, রোজগারের সুযোগ দিতে হবে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে এতে। গভর্নমেণ্ট যাদের

উপর এ সবের ভার দেবেন তাদের হাত দিয়েই খরচ হবে টাকাগুলো। হবে কি না বলুন—"

বিধুভূষণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটিও হাসিতেছিল। তিনি ঘাড় কাৎ করিয়া স্বীকার করিলেন, "হবে।"

আমরাই চেষ্টাচরিত্র করে সে ভার নিই, আসুন না। একটা সৎকাজ করাও হবে, রোজগারও হবে। এ রোজগারের তুলনায় বিড়ির ব্যবসা একটা ছেলেখেলামাত্র। আপনি নামুন এতে—"

"আমাকে কি করতে হবে বলুন! এ সবের ঘাঁতঘোঁৎ তো আমার একেবারেই জানা নেই।"

"আপনার জানবার দরকারও তো নেই, আমি যখন আছি। আপনি নেপথ্যে থাকুন, যা করবার আমিই করব। বক্তৃতা করে হোক, কাগজে লিখে হোক, ঘুষ দিয়ে হোক, ধমক দিয়ে হোক, খোশামোদ করে হোক, যেমন করে হোক, আমি আপনাকে কনট্রাক্ট পাইয়ে দেব, আপনি কাজ করে যাবেন। আপনার সঙ্গে আমার আধাআধি বখরা থাকবে শুধু—"

"এ কাজে তো অনেক টাকা চাই।"

"খুব বেশী নয়। হাজার পঁচিশেক নিয়ে আরম্ভ করুন, তারপর মাছের তেলেই মাছ ভাজবেন। আপনি পাকা লোক, আপনাকে আর বেশী কি বলব—"

গগন মুচকি হাসিয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ নাচাইল। বিধুভূষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যাপারটি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেন এবং অবশেষে ইহার সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনা উপলব্ধিও করিলেন।

বলিলেন, "বেশ, তা হলে তাই হোক। দাঁ-মল্লিকের অ্যাকাউণ্টে আমার অংশে যে টাকাটা জমেছে এতেই খাটুক তাহলে সেটা—"

পুলকিত গগন দাঁ সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "বেশ বেশ।"

ইহার পর গগন পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

"আপনি সেই যে দার্জিলিং চলে গেলেন, তারপর থেকে আপনার সঙ্গে আর দেখাই হয়নি। বৌদির শরীরটা বেশ সেরেছে তো?"

"সে মারা গেছে।"

"বলেন কি! দার্জিলিংয়েই?"

গগন দাঁও আর এ শোকাবহ ঘটনা লইয়া অধিক আলোচনা করা সমীচীন মনে করিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বিধুভূষণ বলিলেন, 'ওই কথা রইল তা হলে। উঠি এবার, রাত অনেক হল।..."

গগন দাঁর সহিত নিজেকে পুনরায় যুক্ত করিয়াই বিধুভূষণ নিরস্ত হইলেন না, রাখহরি বিশ্বাস এবং গোপেন পালের নাবালক পুত্রের অভিভাবক পরেশ মল্লিকের

সহিতও তিনি যোগস্থাপন করিলেন। রাখহরি বিশ্বাসের সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া রাখহরিকে চাঁদনীর দোকানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতঃ তাহাকে বলিলেন, "নিজের দোকানটিতে আবার আগের মতো বস তুমি। আমার সঙ্গে তোমার আধাআধি বখরা থাক। টাকা যা লাগে আমার, মেহনত তোমার। তুমি আগের মতো হালটি ধরে বসে থাক খালি। শরীরটাও সারিয়ে নাও, ম্যালেরিয়াতে একেবারে জরাজীর্ণ করে দিয়েছে তোমাকে।" বিধুভূষণ নিজেই একদিন একজন ডাক্তার ডাকাইয়া আনিয়া রাখহরির চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন।

গোপেন পালের ছিল বাসনের ব্যবসায়। দোকান উঠিয়া যাওয়াতে সে ঘরটি বেদখল হইয়া গিয়াছিল। বিধুভূষণের প্রথম কাজ হইল ঐ ঘরটি পুনরায় দখল করা। বাড়িওয়ালাকে বেশী ভাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া, পাড়ার লোকদের উস্কাইয়া দিয়া, নূতন ভাড়াটের নামে দুইটি মিথ্যা মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়া, বিধুভূষণ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিলেন যে নূতন ভাড়াটেকে বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইল। অর্থাৎ কেবলমাত্র টাকার জোরে যুগপৎ ছল, বল এবং কৌশল প্রয়োগ করিয়া বিধুভূষণ স্বর্গীয় গোপেন পালের পুরাতন দোকানঘরটি পুনরধিকার করিলেন। ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইল তাহাতে অন্য পাড়ায় ইহার অপেক্ষা ভাল ঘর পাওয়া অসম্ভব হইত না। কিন্তু পুরাতনের প্রতি বিধুভূষণের অদ্ভুত একটা মমতা ছিল। বিশেষতঃ যাহা পয়মন্ত বলিয়া একবার তাঁহার ধারণা হইত—তাহা মানুষই হোক, বা বাড়িই হোক—তাহা নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কারাগারের বন্ধু জিৎরাম, গগন, রাখহরি এবং গোপেন তাঁহাকে সমাজে এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে একদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এ কথা তিনি ভোলেন নাই। জীবনের দুইটি কাম্য স্বপ্ন—ধনী হওয়া এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করা—যে বন্ধু-চতুষ্টয়ের সংস্রবে আসিয়া সফল হইয়াছিল তাহাদের এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকে আঁকড়াইয়া থাকিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে এই ধরনের একটা ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। একটা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদাই যেন তাঁহার গা ছমছম করিত। স্বর্ণলতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যখন দেশব্যাপী দাঙ্গা বাধিয়া গেল, তাঁহার পুরাতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যখন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহার মানসিক জগতেও একটা প্রলয় চলিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইবার বুঝি আরম্ভ হইয়া গেল। এইবার কোনও মুসলমান গুণ্ডার হস্তে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিবে। ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনি হিন্দু-প্রধান বিহারে পলায়ন করিলেন এবং সেখানেও গিয়া আশ্রয় পাইলেন তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু জিৎরামের আত্মীয় জগৎরামের কাছে। শুধু তাহাই নয়, সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পুনরায় তাঁহার ভাগ্যোদয় হইল। পুরাতন বন্ধুদের সংস্রবে থাকিলে তিনি নিরাপদে থাকিবেন এই ধারণাটা তাঁহার মনে আরও বদ্ধমূল হইয়া গেল। সুতরাং প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া গোপেন পালের পুত্রকে তাহাদের পুরাতন দোকানটিতে পুনঃ-

প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি শুধু যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন তাহা নয়, একটু নিরাপত্তাও বোধ করিলেন। তাঁহার মনে হইল প্রাক্তন বন্ধুগণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে স্বর্ণলতার ব্যাপারটা ভগবানের দপ্তরেও সম্ভবত চাপা পড়িয়া যাইবে। বিবেকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে বিভীষিকাটা অহরহ তাঁহাকে শঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল এই সব সৎকার্য-প্রাচীর তুলিয়া সেটাকে তিনি মনশ্চক্ষুর আড়াল করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং সত্যসত্যই অনেকটা নির্ভয় হইলেন।

কিছুদিন পরেই কিন্তু তাঁহাকে আর একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। যে মুহূর্তে তিনি শুনিয়াছিলেন যে স্বর্ণলতা ও শিবানীর সহিত রজতবাবুর সম্পর্ক আছে সেই মুহূর্তেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন ইহাদের বর্জন করিতে হইবে। নিরাপত্তার জন্য নিজের দেহের অবাঞ্ছিত অংশ যেমন কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, ইহাদেরও তেমনি অপসারণ করিতে হইবে। স্বর্ণলতা অপসারিত হইয়াছে, ভয় ছিল শিবানীর সম্বন্ধে। কিন্তু মজঃফরপুর হইতে ফিরিয়া তাঁহার পাটের দালালদের মুখে যখন খবর পাইলেন যে উন্মত্ত পাকিস্তানীরা বিষ্ণুচরণকে সপরিবারে নিঃশেষ করিয়াছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। একদিন গিয়া ঠনঠনিয়ার জাগ্রত কালীমাতাকে প্রণামও করিয়া আসিলেন, মায়ের পূজা দিবারও ব্যবস্থা করিলেন। তথাপি কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। গগন দাঁ একদিন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, "পাকিস্তান থেকে বিষ্ণুচরণ বলে এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি যে নতুন বাড়ি কিনেছেন তার ঠিকানা তিনি জানেন না। আপনার পুরানো বাসায় গিয়ে আপনার খোঁজ পান নি। শেষকালে একজন রেফিউজির সঙ্গে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন আজ সকালে। আমি এই বাড়ির নতুন ঠিকানাটা তাঁকে বলে দিয়েছি, তিনি আজ সন্ধ্যা আটটায় আপনার কাছে আসবেন সম্ভবতঃ।"

বিধুভূষণ ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হইয়া গেলেন।

"বিষ্ণুচরণ! সে তো রায়টে মারা গেছে শুনেছি।"

"না মরেনি। তার মুখেই শুনবেন সব খবর। আমি এখন উঠি। পুনর্বাসন-মন্ত্রীর সঙ্গে একটা এনগেজমেণ্ট আছে—"

রিস্টওয়াচটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া গগন দাঁ চলিয়া গেল! বিধুভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সংবাদটি পাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। একবার মনে হইল পুনরায় কিছুদিনের জন্য অন্তর্ধান করিলে কেমন হয়। ব্যবসার সম্পর্কে মজঃফরপুর যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল এমনভাবে পলাইয়া গেলে বিষ্ণুচরণ এবং গগন দাঁ উভয়ের মনে সন্দেহ জাগিবে। তা ছাড়া এমনভাবে পলাইয়া কতদিন তিনি আত্মরক্ষা করিবেন! সত্যের সম্মুখীন একদিন হইতেই হইবে। এখন হইলেই বা ক্ষতি কি। শোনাই যাক না বিষ্ণুচরণ কি বলে।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটার সময় একটি চামড়ার ব্যাগ হস্তে বিষ্ণুচরণ আসিয়া

উপস্থিত হইল। তাহার বেশভূষায় যদিও বিধুভূষণ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি এবং মুখের হাসি দেখিয়া তাঁহার কেমন যেন অস্বস্তি হইতে লাগিল। মনে হইল তাঁহার মুখে যেন একটা মুচকি হাসি চিরকালের মতো স্থির হইয়া গিয়াছে। যেন জীবন্ত হাসি নয়, মুখোশের হাসি। সেই মুখোশের চোখ দুইটি কিন্তু স্থির নয়, বরং যেন একটু বেশী চঞ্চল। বিধুভূষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিষ্ণুচরণ কথা কহিল কিন্তু ধীরভাবেই।

"তারপর দাদা, ভাল আছ তো? অনেকদিন পরে দেখা হল—"

বিধুভূষণ হঠাৎ হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শিবানীর মুখটা সহসা তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। যদিও শিবানীকে তিনি শত্রুপক্ষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি একটা বিরূপতা পোষণ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুচরণকে সম্মুখে দেখিয়া কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল। তিনি অঝোরঝরে কাঁদিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচরণই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল।

"কাঁদছ কেন দাদা, পুরুষমানুষের কান্না শোভা পায় না। যা হবার তা হয়ে গেছে। তা নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ কি। যতক্ষণ বেঁচে আছি, পুরুষমানুষের মত যুঝতে হবে।"

কোঁচায় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিধুভূষণ বলিলেন, "তোমাকে যে দেখতে পাব এ আশাই আমি করিনি ভাই। কি করে রক্ষে পেলে তুমি?"

"আমি মুসলমান হয়েছি।"

"বল কি!"

"অন্য উপায় ছিল না। শিবানী যদি হত তাহলে সেও বাঁচত, ছেলেটাও বাঁচত। কিন্তু সে রাজী হল না! প্রাণের চেয়ে ধর্মই বড় হল তার কাছে—"

বিধুভূষণ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নির্বাক হইয়া বিষ্ণুচরণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বাক্যস্ফুরিত হইলে দুইটি কথা মাত্র বলিলেন, "মুসলমান হয়েছ?"

বিষ্ণুচরণ ইহা প্রত্যাশাই করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিবেন তাহাও ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন।

"হ্যাঁ। মৃত্যু আর ইসলামধর্ম ছাড়া আর তৃতীয় পথ ছিল না। আমি ইসলামকেই বেছে নিয়েছি। এতে আশ্চর্য হচ্ছ কেন দাদা। আমরা তো প্রাণের দায়ে এ রকম অনেক কিছুই করে থাকি। গ্রীষ্মকালে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে আরাম পাই, কিন্তু শীত পড়লে প্রাণের দায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি ত্যাগ করে গরম জামা পরতে আমাদের দ্বিধা বা দেরি হয় না। আমাদের মতো সাধারণ লোকের কাছে ধর্মটাও বাইরের পোশাক ছাড়া আর কি বল। প্রাণে বেঁচে থাকাটাই হল আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা—"

বিধুভূষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বিষ্ণুচরণের উক্তিটা তাঁহার মর্মস্পর্শ করিয়াছিল।

আত্মরক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, চাচা আপন বাঁচা প্রভৃতি প্রবচনগুলি যে জ্ঞানগর্ভ একথা ঠিক, বিষ্ণুচরণের যুক্তিও অকাট্য, তথাপি তাঁহার মন তাহার কথায় ঠিক সায় দিতে পারিল না। আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিজে যদিও পাশবিকতার অতি নিম্নস্তরে নামিয়াছিলেন, কিন্তু এজন্য মুসলমান হওয়াটা তাঁহার নিকট কেমন যেন ঘৃণ্য বলিয়া মনে হইল। কেন হইল সে আত্মবিশ্লেষণে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন না, বিষ্ণুচরণের যুক্তিকে খণ্ডন করিবার মতো যুক্তিও তাঁহার মাথায় আসিল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

বিষ্ণুচরণ স্মিতমুখে ক্ষণকাল বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে আসল কথাটি ব্যক্ত করিলেন।

"আমি একটা কথা বলবার জন্যে তোমার কাছে এসেছি দাদা—"

"কি কথা?"

"তোমার সঙ্গে আমার যে ব্যবসার সম্পর্ক ছিল তা আমি বজায় রাখতে চাই। আমার পূর্বজীবনের সমস্ত স্মৃতি এই সম্পর্কটুকুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—"

বিধুভূষণের মনে হইল ভাবাধিক্যবশতঃ বিষ্ণুচরণ বোধ হয় থামিয়া গেল। তাহার মুখমণ্ডলে অবশ্য কোন ভাবান্তর তিনি দেখিতে পাইলেন না, বরং তাঁহার মনে হইল চঞ্চল চক্ষু দুইটিতে একটা ধূর্তভাব প্রকটিত হইয়াছে।

"কি করে সম্পর্ক বজায় রাখবে বল—"

"বলছি। সেই কথা বলতেই এসেছি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে পাকিস্তান থেকে পাটের ব্যবসা বজায় রাখা আর সম্ভবপর নয়। এই কোলকাতাতেই বেনামে আমি অন্য একটা ব্যবসা করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এখানে তো আমি সব সময়ে থাকতে পারব না, তুমি যদি ভার নাও নিশ্চিন্ত হই।"

"কিসের ব্যবসায়?"

বিষ্ণুচরণ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "ওদেশে অনেক ধর্ষিতা মেয়ে বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের আত্মীয়-স্বজন হয় মরে গেছে, না হয় পালিয়ে গেছে। যারা তাদের ধর্ষণ করে-ছিল তারাও আর এখন তাদের আমল দিচ্ছে না বিশেষ। মুশকিলে পড়েছে বেচারারা। তাদের যদি এখানে এনে কোন কাজে লাগানো যায় তাহলে তারা স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পারে, আমাদেরও দু'পয়সা হয়—"

"আমাদের দু'পয়সা হবে কি করে? রোজগার করবে তারা আর আমরা পয়সা কেমন করে পাব—"

"কমিশন হিসাবে। সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"ব্যাপারটাই শুনি না আগে। অতগুলো মেয়ে এনে করবে কি?"

"করবার অনেক কিছু আছে। আপাততঃ 'মাসাজ বাথ' খোলা যেতে পারে। ওটাই ফ্যাশান দেখছি আজকাল—"

ব্যাপারটা বিধুভূষণের ঠিক বোধগম্য হইল না। ভূপেশ মজুমদারের নিকট তিনি কিছু কিছু ইংরেজী শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'মাসাজ বাথ' কথাটার মর্মগ্রহণ করিবার মতো বিদ্যা তাঁহার হয় নাই। গগন দাঁর কথাটা মনে পড়িল। কিছুদিন হইতে সে তাঁহাকে একজন ভালো প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিতে অনুরোধ করিতেছে। বলিতেছে, ভালো ইংরেজি-জানা চালাকচতুর, সুদর্শন কোনও ছোকরাকে না রাখিলে আজকাল ব্যবসায় চালানো কঠিন। উদাহরণস্বরূপ গগন দাঁ দুই একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছিল। বলিয়াছিল প্রাইভেট সেক্রেটারির বিদ্যার জোরেই তাঁহারা নাকি বাজার মাৎ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের পেটে কোন বিদ্যা নাই। গগন দাঁ প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিয়াছে। তাহার সব প্রবন্ধ, বক্তৃতা নাকি প্রাইভেট সেক্রেটারিই লিখিয়া দেয়। বিধুভূষণ একটি এম-এ পাস ছোকরার সহিত কথাও বলিয়াছেন, সে তাহার বাড়িতে আসিয়া থাকিতেও রাজি হইয়াছিল। কিন্তু ছোকরার খাঁই দেখিয়া বিধুভূষণ চমকাইয়া গিয়াছেন, খোরাক, পোশাক ছাড়া মাসিক আড়াইশত টাকা বেতন চায়, প্রতি বৎসর বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি চায়! ইহার উপর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অথবা ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্সেরও দাবি আছে। এ কি সাধারণ লোকে দিতে পারে?

"গোটা দুই 'মাসাজ বাথ' যদি খোলা যায়, মাসে অন্ততঃ হাজারখানেক টাকা লাভ থাকবে।"

বিধুভূষণ প্রাইভেট সেক্রেটারির চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় বিষ্ণুচরণের দিকে মন দিলেন। বিষ্ণুচরণের কাছে মাসাজ বাথ সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কিন্তু তাহার বাধিল। ব্যাপারটা কলিকাতায় তখনও তেমন প্রচলিত হয় নাই। এ কি এক উদ্ভট ব্যাপার বিষ্ণুচরণ আমদানি করিল! এ অবস্থায় কথার সাহায্যেই কথা বাহির করিযা লওয়া ছাড়া উপায় নাই। তাহাই করিবার প্রয়াস পাইলেন।

বলিলেন, "তাতো থাকবে বুঝলাম। কিন্তু ব্যবসাতে নামবার আগে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখা দরকার।"

"সে কি আর আমি ভাবি নি?"

"মেয়েমানুষের ব্যাপার—"

"মেয়েমানুষের ব্যাপার বলেই এতে লাভ প্রচুর।"

তাই না কি?"

বিধুভূষণের ক্ষুদ্র চক্ষুদুইটি ক্ষণকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

'অনেক লাভ?

"অথৈ।"

"আমাকে কি করতে হবে?"

"কিছুই করতে হবে না। টাকা দাও, আমি সব ব্যবস্থা করব। এতে দেশের কাজও হবে, উপার্জনও হবে।"

গগন দাঁও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল।

"কত টাকা?"

"অন্তত হাজার দশেক তো এখুনি চাই।"

"ও বাবা! অত টাকা!"

বিধুভূষণ দ্বিধাগ্রস্ত হইলেই নির্নিমেষ হইয়া যাইতেন। বিষ্ণুচরণের মুখের উপর তিনি নির্নিমেষদৃষ্টি স্থাপন করিলেন। বিষ্ণুচরণের চোখের পাতা ঘন ঘন উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিধুভূষণ ভাবিতেছিলেন লোকটা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে আড্ডা গাড়িয়াছে, টাকাটি হস্তগত করিয়া একবার ঢাকা মেলে চড়িলে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে কি? বিষ্ণুচরণও ঠিক ওই একই কথা ভাবিতেছিল। তাহারও মনে হইতেছিল অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমিও কি বিধুকে দশ হাজার টাকা দিতাম? সুতরাং জটিলতাকে সরল করিয়া সে বলিল, "দশ হাজার টাকা আমার অবিলম্বে দরকার। তুমি এমনিতে যদি না দাও কোলকাতায় আমার যে তিনখানা বাড়ি আছে তার বদলে দাও। কোলকাতায় বাড়ি রেখে আমার লাভই বা কি?"

বিধুর নির্নিমেষচক্ষু একটু বিস্ফারিত হইল। দুই একবার পলক পড়িল। কলিকাতায় যে বিষ্ণুচরণ সস্তায় তিনখানি বাড়ি খরিদ করিয়াছিল তাহা বিধুভূষণ জানিতেন। যখন তাহার সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল তখন বিষ্ণুচরণ বিধুভূষণকেও এই তিনখানি বাড়ির মধ্যে একটি কিনতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু বিধুর টাকা তখন অন্যত্র আটকাইয়াছিল বলিয়া এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হইতে পারেন নাই। এজন্য মনে মনে তিনি ক্ষুব্ধও ছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা সেই পলাতক মৎস্য পুনরায় বঁড়শির নিকট ঘুরঘুর করিতেছে দেখিয়া শিকারী বিধুভূষণ লোলুপ হইয়া উঠিলেন। আজ তাঁহার টাকার অভাব নাই।

বিধুভূষণ প্রশ্ন করিলেন, "তোমার বাড়িগুলো তো বেলেঘাটায়?"

"হ্যাঁ। তুমি তো দেখেছ।"

"বাড়িগুলো কি বিক্রি করতে চাও?"

"এখানে বাড়ি রেখে তো আমার লাভ নেই। ওসব বাড়ি মাসাজ বাথের কাজেও লাগবে না। তার জন্যে বড় রাস্তায় বাড়ি চাই। সুতরাং ওসব বাড়ি আমার আর কোন্ কাজে লাগবে বল। হয়তো কোনদিন রেফিউজিরা এসে দখল করে বসবে, তখন বিপদে পড়ে যাব।"

যদিও প্রশ্নটা নিজের কাছেই হাস্যকর ঠেকিতেছিল তবু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দশ হাজার টাকার বদলে তিনখানা বাড়িই দেবে নাকি?"

"তোমার সঙ্গে দরদস্তুর আমি করব না। তুমি যা ন্যায্য মনে কর তাই দিও।"

"তুমি কিনেছিলে কততে ?"

"তা আমার প্রায় হাজার পঁয়ত্রিশ পড়েছিল।"

বিধুভূষণ খবরটা জানিতেন। বুঝিলেন বিষ্ণুচরণ সত্যকথাই বলিতেছে। মস্তকে দুই একবার হাত বুলাইয়া কয়েকমুহূর্ত ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ির আমার এখন দরকার নেই। তবে তুমি বন্ধুলোক, বিপদে পড়েছ, যদি কিছু কমসম করে দাও তো নিয়েনি।"

'বলেছি তো তোমার কাছে লাভ করব না। পঁয়ত্রিশ হাজারই তুমি দিও।"

"অত টাকা নেই আমার কাছে এখন। সব ঝেড়েঝুড়ে হাজার পঁচিশেক দিতে পারি।"

"বাকী দশ হাজার পরে দিও না হয়। মাসখানেক পরে এসে না হয় নিয়ে যাব।"

"মাসখানেক পরে পারব না। মাসতিনেক পরে পারব। তবে দশ হাজার নয়, পাঁচ হাজার দেব।"

বিষ্ণুচরণ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার মুখের মুচকি হাসিটা যেন আরও স্থির হইয়া গেল। তাহার চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য সেই জাতীয় একটা ঝলক খেলিয়া গেল যাহা শাণিত ছোরার উপর মাঝে মাঝে খেলিয়া যায়।

বলিল, 'আমি তো আগেই বলেছি, তোমার সঙ্গে দরদস্তুর করব না। বেশ, পাঁচ হাজারই দিও। তাহলে আমি এখন কাঁচা রসিদ লিখে দিচ্ছি। বাড়িগুলোর চাবিও দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। আমার উকিল বীরেনবাবুকে বলে যাচ্ছি দলিলপত্র তৈরি করতে। তৈরি হয়ে গেলে আমি এসে রীতিমত রেজেস্ট্রি করে দেব তোমাকে—"

"তুমি এখন যাবে কোথা ?"

"এখানেই থাকব। নানা জায়গায় ঘুরতে হবে এখন। মাসাজ বাথের চারটে বাড়ি ঠিক করেছি। চারটে বাড়ির জন্য সেলামীই দিতে হবে দশ হাজার। তারপর আসবাব-পত্র দিয়ে সাজাতে হবে, তাতেও বিস্তর খরচ। ভালভাবে করতে গেলে কৃপণতা করলে তো চলবে না, টাকা ঢালতে হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, আমি খুশীও হই, নিশ্চিন্তও হই।

"আচ্ছা, তুমি আগে আরম্ভ করতো, তারপর দেখা যাবে।"

"দেখা না, আসতেই হবে তোমাকে। হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে তো খিটিমিটি চলছেই, কখন কি হুজ্জৎ বেধে যায় ঠিক কি, হয়তো আমাকে গা ঢাকা দিতে হবে, কিংবা সরে পড়তে হবে পাকিস্তানে। তখন তুমি যদি ব্যবসাটার হাল ধরে থাক ভরাডুবি অন্তত হবে না। দাও চেকটা দাও, আমি উঠি এবার। বেয়ারার চেক দিও। কারণ এখানকার ব্যাংক থেকে আমি অ্যাকাউণ্ট তুলে নিয়েছি। ব্যাংকের লোকেরা আমাকে চেনে অবশ্য, বেয়ারার চেক দিলে টাকাটা পেয়ে যাব। আর যদি গোলমাল করে, তুমি তো আছই। কাঁচা রসিদটা লিখে দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে—"

"এখনই চেকটা নেবে ?"

"এখনই। বাড়িগুলো তা না হলে বেহাত হয়ে যাবে—"

ব্যাগ হইতে কাগজ, কলম বাহির করিয়া বিষ্ণুচরণ কাঁচা রসিদ লিখিতে লাগিল। তাহার মুখের স্থির মুচকি হাসিটার দিকে বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন কেবল। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি যাহা বলিতে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতেছিল তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। চক্ষুলজ্জা তাঁহাকে রুদ্ধবাক করিয়া রাখিল। একদিন যাহার সহিত হাজার হাজার টাকা লেন-দেন করিয়াছেন, যাহার মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন, শুধু ব্যবসাক্ষেত্রে নহে, হৃদয়ের ক্ষেত্রেও যাহার সহিত একদিন নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছিল, যাহার বাড়িতে তিনি বহুবার অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, যাহার স্ত্রীর হস্তে ভাইফোঁটার তিলক পরিয়াছেন, আজ দৈব-দুর্বিপাকে সে ধর্মান্তরগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া তাহাকে কি বলা যায় তোমাকে অবিশ্বাস করি ? শিবানীর মুখখানাও মনের উপর ভাসিযা উঠিতে লাগিল। সুতরাং যদিও ব্যবসায়ী বিধুভূষণের বুদ্ধি তাহাকে বলিতেছিল—আগে পাকাপাকি দলিলটা হইয়া যাক, তাহার পর টাকাটা দিও—কিন্তু বন্ধু-বৎসল মানুষ বিধুভূষণ তাহা পারিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—বিষ্ণুচরণ কি কখনও আমাকে ঠকাতে পারে ? কখনও না।

কাঁচা রসিদ লইয়াই তিনি বিষ্ণুচরণকে চেকটা লিখিয়া দিলেন।

ব্যবসায়ী বিধুভূষণ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। টাকাটি হস্তগত করিবার পর তাঁহার সহিত আর বিষ্ণুচরণের দেখা হইল না। নবেন্দু বিশ্বাসের সহিত যে উক্ত বাড়ি তিনটির সম্পর্ক আছে তাহা তিনি জানিতে পারিলেন বেলেঘাটার কয়েকটি লোকের মুখে। তবে তিনি একাধিক লোকের মুখে এ কথা শুনিলেন যে, পূর্ববঙ্গের এক মুসলমানের সহিত সম্পত্তি-বিনিময করিয়া পাঞ্জাব-প্রবাসী যে বাঙালী ভদ্রলোকটি এই বাড়ি তিনটি খরিদ করিয়াছিলেন তিনি নাকি দ্বিতীয় রায়টে মারা গিয়াছেন। ইহাদেরই মধ্যে দুই একজন ভদ্রলোকের নামটাও বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঠিকভাবে বলিতে পারিল না। একজন বলিল, 'নবকুমার দাস' আর একজন বলিল, 'নবকিশোর বিশ্বাস'। বিধুভূষণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাড়ি ফিরিয়া গিয়া বিষ্ণুচরণের প্রাক্তন ঠিকানায় একটি পত্র লিখিলেন। দশ দিন কাটিয়া গেল, কোন উত্তর আসিল না। টেলিগ্রাম করিলেন, উত্তর আসিল না। বিষ্ণুচরণ যে জমিরুদ্দিন হইয়াছেন এ খবর তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। এ খবরটিও পাইলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। নেপথ্যবর্তী বিধুভূষণের টাকার উপর নির্ভর করিয়া গগন দাঁ যে কলোনি নির্মাণ করিতেছিল, সেই কলোনিতে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া একদিন ঢাকা হইতে একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যবসায়সূত্রে বহুবার তিনি ঢাকায় গিয়াছেন, ভদ্রলোকটিকে তিনি চিনিতেন।

"রমণীবাবু না কি, কি খবর—"

বিষ্ণুচরণই একদিন রমণীরঞ্জন গুহকে বিধুভূষণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। রমণীবাবুর মুখেই বিধুভূষণ খাঁটি খবরটি আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিলেন, বিষ্ণুচরণ এখন নাকি জমিরুদ্দিন আলি নামে পরিচিত হইয়া পাঞ্জাব-প্রবাসী জনৈক নবেন্দু বিশ্বাসের বিশাল বিষয় এবং প্রকাণ্ড বাড়ি ভোগ করিতেছে। বিনিময়ে উক্ত নবেন্দুকে সে কলিকাতার বাড়ি তিনখানি নাকি লিখিয়া দিয়াছে। এ খবরটা সত্য কি মিথ্যা তাহা রমণীবাবু বলিতে পারিলেন না। তবে ইহাই গুজব। রমণীরঞ্জন আরও বলিলেন যে, বিষ্ণুচরণ একজন মুসলমানীকে বিবাহ করিয়াছে, করাচীতে ঘনঘন যাওয়া-আসা করিতেছে। তিনি অনুমান করিলেন যে, পাকিস্তান সরকারের নিকট সে বড় একটা কিছু বাগাইবার তালে আছে। পাকিস্তান সরকার তাহাকে হয়তো ভাল একটা কিছু দিবেও. কারণ যে মুসলমানীকে বিষ্ণুচরণ বিবাহ করিয়াছে সে সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া। বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া গলার সম্মুখদিকের চামড়াটা অকারণে টানিতে লাগিলেন।

"বিষ্ণুচরণের ঠিকানাটা কি বলতে পারেন?"

"পারি বই কি। ঠিকানা, ফোন নম্বর সব টোকা আছে আমার। টুকে রেখেছি, কখন কি দরকার লাগে বলা যায় না তো"।

রমণীরঞ্জনের নিকট বিধুভূষণ জমিরুদ্দিন আলির ঠিকানা, ফোন নম্বর প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া অনেকবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া টেলিফোনযোগে তিনি বিষ্ণুচরণের নাগাল পাইলেন বটে, কিন্তু টাকাটার বা বাড়িগুলির কোনও সুব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিষ্ণুচরণ কেবলই বলেন, বাড়ি তুমি ভোগ কর।

গগন দাঁ পরামর্শ দিল পাকিস্তানের হাই কমিশনারের সহায়তা ভিন্ন এ ব্যাপারের সুরাহা হওয়া শক্ত।

বিধুভূষণ চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, 'আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি অত কাণ্ড করতে পারি?"

গগন দাঁ হাসিয়া উত্তর দিল, আমি তো আগেই বলেছি, ভাল দেখে একটা 'প্রাইভেট' রাখুন। সে সব সামলে দেবে। আজকালকার দিনে 'প্রাইভেট' না রাখলে চলে না। গগন দাঁ প্রাইভেট সেক্রেটারী কথাটাকে মাঝে মাঝে সংক্ষেপ করিয়া 'প্রাইভেট' বলিত। বিধুভূষণ কেন যে 'প্রাইভেট' রাখিতেছিলেন না তাহা আর গগন দাঁকে খুলিয়া বলিলেন না। মাথায় একবার হাত বুলাইয়া কেবল বলিলেন, "দেখি—", মনে মনে কিন্তু অনুভব করিতে লাগিলেন যে টাকার মায়া করিলে আর চলিবে না, একটা লোক রাখিতেই হইবে।

ঠিক এই সময়েই যোগাযোগটা ঘটিয়া গেল। কয়েকদিন পরে ভূপেশ মজুমদার তাঁহারই গারাজ হইতে বরেনকে টানিয়া বাহির করিলেন। বিধুভূষণের গৃহসংলগ্ন গারাজটি খালিই পড়িয়াছিল। হাতে আরও কিছু টাকা হইলে মোটর কিনিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বলিয়া গারাজটা তিনি ভাড়া দেন নাই। সেই শূন্য গারাজই তাঁহার

মনস্কামনা পূর্ণ করিল। খুবই সস্তায় একটা প্রাইভেট সেক্রেটারি জুটিয়া গেল। ভূপেশ তাঁহার অনুরোধটি রক্ষা করাতে তিনি মনে মনে খুবই হৃষ্ট হইলেন। ঠিক এই সময়ই ভূপেশ যদি তাঁহার নিকট পূর্বোক্ত বিবাহের প্রস্তাবটি করিত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু বিশাখা দেবীর আকস্মিক আবির্ভাবে সব গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু নবলব্ধ প্রাইভেট সেক্রেটারির যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় করিবার সময়ও তিনি পাইলেন না। পরিস্থিতি এমন জটিল হইয়া উঠিল যে তাঁহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিল্লী ছুটিতে হইল। এক আধ পয়সা নয়, পঁচিশ হাজার টাকা! বিশাখা সত্যই নবেন্দু বিশ্বাসের কন্যা কি না, সত্যই নবেন্দু বিশ্বাস নামে কোনও রেফিউজি জমিরুদ্দিনের সহিত সম্পত্তি-বিনিময় করিয়াছিল কিনা এ সব সত্য নির্ণয় করিতে হইলে দিল্লী যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। বিশাখার সুটকেশ হইতে তিনি কয়েকটা ঠিকানাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রাইভেট সেক্রেটারির সাহায্যে হাই কমিশনারের দ্বারস্থ হওয়ায় পূর্বে ব্যাপারটার স্বরূপ জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। শুধু যে টাকাটা উদ্ধার করিবার জন্য অথবা বাড়ি তিনটি পাকাপাকিভাবে দখল করিবার জন্যই তিনি ব্যগ্র হইলেন তাহা নয়, একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহলও তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। বিষ্ণুচরণ যে সত্যই এত বড় জুয়াচোর একথা কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না। সত্যটা যাচাই করিয়া লইবার জন্যই আরও বিশেষ করিয়া তিনি দিল্লী ছুটিয়াছিলেন। দিল্লীতে গিয়া খোঁজখবর করিয়া তিনি অবশেষে সেই সত্যের সম্মুখীন হইলেন যে সত্যের সাক্ষাৎ দার্শনিক বা কবিরাই মাঝে মাঝে পান। তিনি নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, একই মানুষের মধ্যে বহু রূপ প্রচ্ছন্ন থাকা সম্ভব। একই লোকের পক্ষে কখনও দেবতা, কখনও পিশাচ, কখনও সৎ, কখনও অসৎ, কখনও কোমল, কখনও কঠিন হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়। নিজের কথা চিন্তা করিয়া এই বিষয়ে তিনি আরও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন। কিছুদিন পূর্বে বিষ্ণুচরণ যে উপমাটা ব্যবহার করিয়াছিল সেইটাই তাঁহার পুনরায় মনে পড়িল। মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস, শীত পড়িলে সে কি খালি গায়ে থাকিতে পারে? তাহাকে জামা পরিতেই হইবে। জামার ছিটটা বা কাপড়টা তাহার নিজের পছন্দমতো বা সামর্থ্য অনুযায়ী সে কিনিতে পারে, কিন্তু জামা তাহাকে পরিতেই হইবে। এই উপমাটা নানাভাবে প্রণিধান করিবার পর বিষ্ণুচরণ সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে গ্লানি জমিয়াছিল তাহা কতকটা কাটিয়া গেল। কিন্তু জীবন-সমরাঙ্গনে বিষ্ণুচরণ যে তাঁহার ধূর্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, এই সত্যটা ভালভাবে অনুভব করিয়া তিনি ধীরভাবে কর্তব্যচিন্তা করিতে লাগিলেন। "ব্যাপারটা তো বোঝা গেল। এইবার টাকাটা কি করে উদ্ধার করা যায়···"

অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোন সদুপায় তাঁহার মাথায় আসিল না। পরিচিত মহলে পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের সম্বন্ধে যাহা তিনি শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে হাই কমিশনারের দ্বারস্থ হইলেও বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না।

সহসা একটা কথা তাঁহার মনে হইল। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই এ কথাটা আবছাভাবে তাঁহার মনে হইয়াছিল। টেলিফোন করিয়া ভূপেশ ব্যাপারটাকে স্পষ্টতর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার মনে হইল ইহাই একমাত্র উপায়। ওই মেয়েটাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেই তো সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁহার ব্যবসায়ী বিবেক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, মনে মনে অনেক সমস্যাই সমাধান করা সহজ, কার্যক্ষেত্রে অনেক বিঘ্ন আসিয়া জোটে। প্রথমত—বিশাখা তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে কি? অমন সুন্দরী লেখা-পড়াজানা মেয়ে, সে কি—? কিন্তু তাঁহার নিজের মনই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও জোগাইল। কেন হইবে না? কত সুন্দরী লেখাপড়া-জানা মেয়ে আজকাল পথে পথে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঘুরিতেছে, সিনেমায় নামিবার জন্য, রেডিওতে গান গাহিবার জন্য, আপিসে চাকরি করিবার জন্য, বড়লোকের টাইপিস্ট হইবার জন্য—কি না করিতেছে তাহারা। তাঁহার মতো একজন নির্ভরযোগ্য পাত্র কি এ বাজারে অবহেলা করিবার মতো? তাঁহার টাকা আছে, বাড়ি আছে, প্রতিষ্ঠাও কিছু আছে, একাধিকবার কাগজে তাঁহার ফটো ছাপা হইয়াছে, কিছুদিন পরে তিনি মোটর কিনিবেন। পাত্র হিসাবে কি তিনি নিন্দনীয়? তিন আইনের জোরে জাতি, কুলের বাধাও ডিঙ্গাইয়া যাওয়া সম্ভব আজকাল। বিশাখার নিজেরই বা আছে কি! বাপ নাই, মা নাই, সহায়সম্বল কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে আছে রূপ এবং একটা ডিগ্রী হয়তো। সে আমাকে বিবাহ করিবে না কেন? তাহার যদি এতটুকু সাধারণ বুদ্ধি থাকে আমার প্রস্তাবে সে সানন্দে রাজি হইবে। এসব কথা নানাভাবে চিন্তা করিবার পরও কিন্তু জটিলতাটা সরল হইল না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা পরাইলে হয়তো মূষিককুলের সুবিধা হয়, কিন্তু ঘণ্টাটি পরাইবে কে? বিশাখাকে এ প্রস্তাবটা করাই যে শক্ত। তাঁহার পক্ষে সামনাসামনি এ প্রস্তাব করা অত্যন্ত অশোভন। তাঁহার পক্ষে অসম্ভবও। কারণ তিনি অত্যন্ত মুখচোরা লোক, কোনও অপ্রিয় বা অশোভন কার্য সামনাসামনি তিনি করিতে পারেন না। পারিলে হয়তো স্বর্ণলতাকে পিছনদিক হইতে অমনভাবে ঠেলিয়া দিতেন না। কাহাকে দিয়া এই প্রস্তাবটা করানো যায়? এই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই এই ধারণা তাঁহার মনে দৃঢ় হইতে লাগিল প্রস্তাবটি করিয়া ফেলিতে পারিলে বিশাখা সানন্দে রাজি হইয়া যাইবে। মেয়েটিকে বুদ্ধিমতী বলিয়াই মনে হয়। ভূপেশের মারফত প্রস্তাবটা করানো চলিত, কিন্তু ভূপেশ তাহার শালীর মেয়েকে গছাইবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং ভূপেশের নিকট হইতে ব্যাপারটা গোপনই রাখিতে হইবে। গগন দাঁকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলে সে হয়তো রাজি হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও একটা "কিন্তু" আছে। গগন দাঁ, জিৎরাম, জগৎরাম, রাখহরি ইহারা সকলেই তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় সাধু-পুরুষ বলিয়া মনে করেন এবং সেইজন্য যথেষ্ট খাতিরও করেন। স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিবার সময় তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত

ভদ্রলোককে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইতেছে, ম্যালেরিয়া হইলে লোকে যেমন কুইনাইন খায়, অনেকটা সেইরকম। স্বর্ণলতার মৃত্যুর পর তিনি অনেকবার অনেককে বলিয়াছেন যে ভগবান তাঁহাকে দয়া করিয়া মুক্তি দিয়াছেন। এখন আবার কোন্ যুক্তি অনুসারে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ? যে শ্রদ্ধার উপর উপরোক্ত বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রদ্ধার ভিত্তি কি ইহাতে টলিয়া যাইবে না ? বিধুভূষণ বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। ভাবিতে ভাবিতে একটা কথা তাঁহার মনে হইল। প্রস্তাবটা সামনাসামনি করিবার পূর্বে বিশাখাকে একটু ভাবিবার সময় দেওয়া উচিত। আচমকা কথাটা শুনিলে সে হয়তো ঘাবড়াইয়া যাইবে। এখান হইতে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয় ! গুছাইয়া লিখিতে পারিলে খুব অশোভন হয়তো হইবে না। চিঠি লিখিতে বসিয়া কিন্তু তিনি আবার থামিয়া গেলেন, চিঠিটা লইয়া মেয়েটা যদি হৈ-চৈ করিয়া বসে, যদি পুলিসের দ্বারস্থ হয়, যদি বলে যে আমাকে ঘরে আটকাইয়া রাখিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে তিনি আর একটা ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবেন। বসিয়া বসিয়া মাথায় অনেকক্ষণ হাত বুলাইলেন, তাহার পর ভাবিয়াচিন্তিয়া অবশেষে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছ এই পত্রটি লিখিলেন।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আমি আপনার বিষয়ে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। সংবাদ যে শুভ নয় তাহা আপনিও নিশ্চয় আশঙ্কা করিতেছেন। সব কথা চিঠিতে লেখা সম্ভব নয়। একটি কথা শুধু আপনাকে সসঙ্কোচে জানাইতেছি। আপনি যে জটিল প্যাঁচে পড়িয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে। আমি যদি আপনাকে বিবাহ করি তাহা হইলেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারি। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি না জানি না, যদি না হন আপনি নিজের ইচ্ছামত যাহা খুশী করিতে পারেন। আমার দিক হইতে বলিতে পারি, এ বিবাহে আমার আপত্তি হইবে না। কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। সমস্ত কথা শুনিলে আশা করি আপনার আপত্তি হইবে না। আমি দুই একদিনের মধ্যেই পৌছিতে চেষ্টা করিব। আশা করি কুশলেই আছেন। ইতি—

বিধুভূষণ

চিঠির উপরে কোনও নাম না লিখিয়া চিঠিটি একটি সাদা খামে পুরিলেন। খামের উপরেও কোন নাম বা ঠিকানা লিখিলেন না। ভিন্ন একটি কাগজের টুকরায় লিখিলেন—

প্রিয় বরেন,

জরুরি দরকারে সেই মেয়েটিকে এই পত্র লিখিতেছি। নামটা ঠিক স্মরণে আসিতেছে না বলিয়া খামে ঠিকানা লিখিতে পারিলাম না। তুমি চিঠিটা তাহাকে হাতে হাতে

দিয়া দিও। তুমি নিজে যেন চিঠি খুলিও না। দুই একদিনের মধ্যেই যাইতেছি। ইতি— বিধুভূষণ

সাদা খামটি এবং বরেনের নামে লিখিত চিঠিখানা আর একটি খামে পুরিয়া সেটি বরেনের নামে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল পত্রে কাহারও কোন নামোল্লেখ না থাকাতে আইনের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া সহজ হইবে। স্থির করিলেন পত্রটি কলিকাতায় পৌছিবার তিন চারদিন পরে তিনি কলিকাতায় পৌছিবেন। ইতিমধ্যে বিশাখা দেবী নিশ্চয় মনস্থির করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

ভবিষ্যতের চিন্তায় ও স্বপ্নে মশগুল হইয়া বিধুভূষণ দিল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন বিশাখার জন্য কোনও উপহার লইয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে? কিছু জুয়েলারি গহনা, দুই একটা শাড়ি লইয়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল, খুবই অশোভন হয়। দর করিয়া দেখিলেন এখানে জিনিসপত্রের দামও খুব চড়া। অনর্থক এতগুলো টাকা ব্যয় করার কি দরকার এখন? সত্যই যদি বিবাহটা হইয়া যায় তখন উপহার দেওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাইবে। বিশাখারা দিল্লীতে আসিয়া যে বাসায় ছিল সেই বাসার নিকটে নীহারবাবু নামক যে লোকটি থাকিতেন তিনিই বিশাখার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ বিধুভূষণকে সরবরাহ করিয়াছিলেন। বিধুভূষণের মনে হইল, তাঁহার নিকট গিয়া বিশাখার সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিলে মন্দ হয় না। যাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে যতটা খবর সংগ্রহ করা যায় ততই ভালো। স্বর্ণলতার ব্যাপারে তিনি যে ঘা খাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে খাইতে হইত না যদি তিনি বিবাহের পূর্বে তাহার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর করিতেন। বিশাখার সম্বন্ধে খোঁজখবর করিবার উদ্দেশ্যে তাই তিনি নীহারবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন নীহারবাবু নাই, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক বসিয়া রহিয়াছে। লোকটির পরিধানে বুশসার্ট এবং পায়জামা, পায়ে কাবুলী চপ্পল, চোখে কালো চশমা, নাকের নীচে বাটারফ্লাই গোঁফ। হাতে একটি বাংলা দৈনিক কাগজ। বিধুভূষণ নিকটে আসিতেই লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নমস্কারান্তে বলিল, "আপনিই কি নীহারবাবু?"

"না—। নীহারবাবু বাড়িতে নেই না কি?"

"না। তাঁর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি। আপনি নীহারবাবুকে চেনেন মনে হচ্ছে, হয়তো আপনিও আমাকে খবরটা দিতে পারবেন।"

"কি খবর—"

ভদ্রলোক তখন বাংলা সংবাদপত্রটি খুলিয়া একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি বিধুভূষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিধুভূষণ দেখিলেন বিজ্ঞাপনটির চতুর্দিকে লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া আছে। বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া বিধুভূষণের পায়ের তলা হইতে সহসা মাটি সরিয়া গেল যেন। বিশাখা তাহার নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানের জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল এটি

সেই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি বিধুভূষণের চোখে পড়ে নাই, কারণ তিনি দিল্লী চলিয়া আসিয়াছিলেন। দেখিলেন বিজ্ঞাপনে বিশাখার দিল্লীর ঠিকানা এবং কলিকাতার হোটেলের ঠিকানা দেওয়া আছে। ভদ্রলোকটি বলিল—"এখানে এসে দেখছি বিশাখা দেবী নেই। বলতে পারেন তিনি কোথায় গেছেন ?"

"শুনছি কোলকাতায় গেছেন।"

"কিন্তু কোলকাতায় হোটেলের যে ঠিকানা তিনি দিয়েছেন সে ঠিকানায় তিনি নেই। এখানেই নেই দেখছি। গেলেন কোথায় তিনি। বিজ্ঞাপন যখন দিয়েছেন তখন এর কোন একটা ঠিকানায় তাঁর থাকা উচিত ছিল না ?"

"তাতো ছিল—"

"ব্যাপারটা বেশ যেন ঘোরাল মনে হচ্ছে—"

বিধুভূষণ আড়চোখে একবার লোকটির দিকে চাহিলেন। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ লোকটির চোখ-মুখের হাব-ভাবও বিশেষ কমনীয় নয়। বিধুভূষণ প্রশ্ন করিলেন।

"আপনি কি বিশাখার কোনও আত্মীয় ?"

"না।"

"তবে ? তার বাবার কোনও খবর পেয়েছেন না কি ?"

"পেয়েছি। তিনি মারা গেছেন।"

"এই খবরটা দিতে এসেছেন ?"

"না। আমি এসেছি তাঁকে সাহায্য করতে। কারণ কোলকাতায় সেই হোটেলে গিয়ে খবর পেলাম যে বিধুভূষণ বলে একজন লোক মেয়েটিকে হোটেল থেকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। হোটেল থেকে সেই বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করলাম, দেখি সে বাড়িতেও কেউ নেই।"

"কেউ নেই ?"

"কারও সাড়াশব্দ অন্তত পেলাম না। একটা চাকর শুধু বেরিয়ে এল। সে বললে বাড়িতে কেউ নেই।"

বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আপনি তাকে সাহায্য করতে চান কেন হঠাৎ ?"

"বিপন্ন রিফিউজি মেয়েদের সাহায্য করবার জন্য আমরা একটা সমিতি করেছি। আমি সেই সমিতির লোক—"

"ও। কিন্তু আমি তো এর বেশী কোনও খবর দিতে পারব না। আমি জানি বিশাখা কোলকাতায় গেছেন—"

"নীহারবাবুর জন্যে অপেক্ষা করি একটু তাহলে। তিনি হয়তো আরও বেশী কিছু জানতে পারেন।"

"বেশ, বসুন তাহলে।"

বিধুভূষণ আর সেখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ মনে করিলেন না। তাঁহার মনে হইল ভাগ্যে তিনি নীহারবাবুকে নিজের নাম, ঠিকানাটা দেন নাই!

নীহারবাবুর বাসা হইতে রীতিমত ভীত হইয়া বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন। অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন একটা অদৃশ্য জাল যেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু জালে পড়িয়া মৎস্য যেমন ছটফট করে ঠিক সে অবস্থাটা তাঁহার হইল না। জালটা অদৃশ্য ছিল বলিয়াই ভয়টাও অনিশ্চিত ছিল, অন্তবিধ চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ ছিল। সেই সব চিন্তা ও কল্পনায় মগ্ন হইয়া তিনি দিল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশাখার জন্য কোনও উপহার লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না এই চিন্তাটা তাঁহার চিত্তকে বেশ খানিকক্ষণ অধিকার করিয়া রাখিল। একবার মনে হইল বিবাহ করিয়া আবার ফাঁদে পড়িয়া যাইবেন না তো, বিবেক উপদেশ দিল ওসব পাকিস্তানী ব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ হইবে! কিন্তু যে অর্থ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র সেই অর্থ ই বিবেকের মুখ চপিয়া ধরিল। এক আধ টাকা নয়, পঁচিশ হাজার টাকা। বিশাখাকে যেমন করিয়া হোক বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ হইয়া গেলে বিষ্ণুচরণের নিকট হইতে বাড়িগুলো পাকাপাকি দখল করিবার জন্য বরেনকে দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। ছোকরাকে বেশ চালাকচতুর বলিয়াই তো মনে হয়। এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার পূর্বজীবনের কাহিনীও মনে পড়িল। বকুর কথা, স্বর্ণলতার কথা, শিবানীর কথা··· । দিল্লীর রাজপথের বিচিত্র ভিড়ের মতোই নানা চিন্তাও তাঁহার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। কখনও সংলগ্ন, কখনও অসংলগ্ন। এমন সময় হঠাৎ যেন সেই অদৃশ্য জালটা অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িল। কে যেন বলিয়া উঠিল—"আরে!"—বিধুভূষণ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন দার্জিলিং হোটেলের সেই চশমা-পরা অদ্ভুত লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। চোখোচোখি হইবামাত্র সে হনহন করিয়া আগাইয়া আসিল এবং তাঁহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"এতদিনে ধরেছি।"

"ধরেছেন মানে?"

"মানে ধরেছি। কট ইউ।"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না।"

"খুনীরা ধরা পড়লে ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবেন না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি দার্জিলিঙে আপনি আপনার স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে গভীর খাদে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন থেকে আপনার সন্ধানে ঘুরছি আমি, আজ ধরেছি। আমাকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়—"

বিধুভূষণ ভীত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন নাই। বিপদে পড়িলে তিনি বিচলিত হইতেন না। তিনি একটু ধমকের সুরেই প্রশ্ন করিলেন, "কে আপনি—"

"আমি বিখ্যাত ডিটেকটিভ ও. সি. কুণ্ডু।"

বিধুভূষণ বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আমার নাম নিশ্চয় শুনেছেন?"

ও. সি. কুণ্ডুর নাম বিধুভূষণ শোনেন নাই! কিন্তু সে কথা বলিলেন না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"কথা বলছেন না কেন? আপনি যোগজীবন দাস নন?"

বিধুভূষণ আশার আলো দেখিতে পাইলেন। মনে পড়িল দার্জিলিং হোটেলে তিনি নিজেকে যোগজীবন নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। কথাটা মনে পড়িবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে বলসঞ্চার হইল।

'হাত ছাড়ুন—"

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইলেন।

ও. সি. কুণ্ডু কালো চশমার ভিতর দিয়া বিধুভূষণের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "হাতটা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু সঙ্গ ছাড়ছি না।"

"কেন—"

"আপনি যে যোগজীবন নন এর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আপনি হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার ঠিক পরেই আমি ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু আপনাকে ধরতে পারলাম না। আপনাকে পেলাম না বটে, কিন্তু খুব দামী জিনিস পেলাম একটা। যে কাপটিতে আপনি চা খেয়েছিলেন দেখলাম সেটি তখনও ধোয়া হয় নি। তৎক্ষণাৎ কিনে নিলাম কাপটা। তাতে আপনার ঠোঁটের দাগ ছিল। চলুন, আপনার ঠোঁটের ইম্‌প্রেশন নেব—"

'ইম্‌প্রেশন' কথাটা ঠিক তাঁহার বোধগম্য হইল না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

বলিলেন, "যদি না দিই—"

হঠাৎ ও. সি. কুণ্ডু তাঁহার রঙীন চশমাটা খুলিয়া ফেলিতেই বিধুভূষণ শিহরিয়া উঠিলেন। ও. সি. কুণ্ডুর চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর, যেন মানুষের চোখ নয়, বাঘের চোখ। জলজল করিতেছে। ও সি. কুণ্ডু কিন্তু চোখ দেখাইবার জন্য চশমা খোলেন নাই, খুলিয়াছিলেন কপালের ঘাম মুছিবার জন্য। বিধুভূষণের অন্তরাত্মা কিন্তু শিহরিয়া উঠিল। ও. সি. কুণ্ডু ঘাম মুছিয়া চশমাটি পুনরায় পরিধান করিলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন—"দেখুন, বেশী চালাকি করবেন না আমার সঙ্গে। আমি ও. সি. কুণ্ডু—পকেট থেকে হুইস্‌ল্‌টি বার করে যদি একটিবার ফুঁ দি অলি-গলি থেকে আর্মড পুলিশ ছুটে আসবে পিল পিল করে—তখন মহা মুশকিলে পড়ে যাবেন বলে দিচ্ছি।"

পকেট হইতে সত্যই একটা হুইস্‌ল্‌ বাহির করিয়া তিনি সেটা বিধুভূষণের নাকের সামনে নাড়িতে লাগিলেন। বিধুভূষণ সত্যই এবার বেশ ঘাবড়াইয়া গেলেন। কিন্তু

সপ্রতিভতার ভান করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস করুন, আমি যোগজীবন নই, বিধুভূষণ।"

"প্রমাণ চাই।"

"চলুন তাহলে আপনাকে আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে নিয়ে যাই—"

"আগে নাম বলুন তাদের—"

"শেঠ রূপচাঁদ, ভূতু পালিত, নীরেনবাবু—"

"ওসব চলবে না। দুটি লোককে বিশ্বাস করতে পারি। প্রাইম মিনিস্টার নেহরু আর হোম মিনিস্টার। এঁরা কেউ চেনেন আপনাকে ?"

"না।"

"তবে ?"

একটা কথা বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ বিধুভূষণের মাথায় খেলিয়া গেল।

"আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি যে আমার স্ত্রী বেঁচে আছেন ? আমার স্ত্রীকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন কি ?"

"দূর থেকে দেখেছি, তবু মনে হয় পারব। কোথায় আছেন তিনি ?"

"কোলকাতায়।"

ও. সি. কুণ্ডু কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন।

"বেশ, যাব আপনার সঙ্গে কোলকাতায়। ও. সি. কুণ্ডু নিরীহ লোককে কখনও পীড়ন করে না। কবে যাবেন আপনি কোলকাতায়—"

"কাল।"

"বেশ আমিও যাব আপনার সঙ্গে।"

বিধুভূষণ বিব্রতবোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সত্যই দোষী, তাঁহার বিবেক নিখুঁত নয়, তিনি বেশী আপত্তি করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন লোকটাকে যদি কিছুতেই এড়াইতে না পারেন, সত্যই যদি ও শেষ পর্যন্ত কলিকাতায় গিয়া হাজির হয়, বিশাখাকেই স্ত্রী বলিয়া চালাইয়া দিবেন। বিশাখা এতদিনে হয়তো তাঁহার চিঠি পাইয়াছে। সে যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে না-ও চায়, তাঁহাকে পুলিসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করিতে সে হয়তো আপত্তি করিবে না। যদি করে তাহার পায়ে ধরিবেন তিনি।

ও. সি. কুণ্ডু বিধুভূষণের সঙ্গ ছাড়িলেন না।

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিধুভূষণ পরদিন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবেন ঠিক করিলেন।

॥ তিন ॥

বিষ্ণুচরণ ওরফে জমিরুদ্দিনকে নির্জলা পিশাচ বলিয়া মনে না করিলে যাঁহাদের তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটিবে তাঁহারা তাহাকে পিশাচ বলিয়াই মনে করুন। কেবল তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা যদি তাঁহারা পোষণ করেন তাহা হইলে ব্যাপারটা একটু ভদ্র হয়। কারণ নিক্তির ওজনে বিচার করিলে পক্ষপাতহীন বিচারকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে সকল দোষ বিষ্ণুচরণকে পিশাচ করিয়াছে তাহা আমাদেরও অনেকের চরিত্রে অল্পবিস্তর বর্তমান। ঘটনাচক্রে পড়িলে আমরাও অনেকে ঠিক ওইরূপ পিশাচ হইয়া পড়িতাম। শান্ত অনুকূল পরিবেশে থাকিয়া আমরা প্রায়ই এই সত্যটা বিস্মৃত হই। সুখসুবিধাপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থাকিয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে আমরা ভিতরে ভিতরে পশু, বিপদে পড়িলে আমাদেরও পশুত্ব প্রকট হইয়া পড়ে। শুধু তাই নয়, এই আত্মবিস্মৃতির সময় আমরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণও প্রত্যাশা করি যাহা স্বাভাবিকভাবে তাহার চরিত্রে বর্তমান নাই, যাহা আমাদের কল্পনারই সৃষ্টি। সুখের দিনে অধিকাংশ মানুষই ছদ্ম আচরণ দ্বারা আমাদের এই কল্পনাকে হৃষ্ট করে। দুঃখের সংঘাতে সেই ছদ্মবেশটা যখন খুলিয়া যায়, আসল পশুটা যখন নখদন্ত বিস্তার করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তখন আমরা শিহরিয়া মন্তব্য করি—উঃ, লোকটা কি ভয়ানক পিশাচ! পিশাচ আমরা অল্পবিস্তর সকলেই। কিন্তু মজা এই যে, যখনই কাহারও পিশাচত্ব প্রকট হইয়া পড়ে, অমনি আমরা সাধু বিচারক সাজিয়া তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হই। তখন আমাদের মনে থাকে না যে বিচারক সাজিবার প্রচেষ্টার মধ্যেই খানিকটা পশুত্ব লুক্কায়িত আছে।

বিষ্ণুচরণের পরিচয় মোটেই অসাধারণ নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সে। তাহার পিতা ভবনাথের ছোট মিষ্টান্নের দোকান ছিল একটি। সামান্য কিছু জমিও ছিল। আর ছিল বংশপ্রদীপের একমাত্র সলিতাটি—মাতৃহীন পুত্র বিষ্ণুচরণ। প্রথমত তিনি বিষ্ণুচরণকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তিনি কোনও দিন আশা করেন নাই, যে তাঁহার পুত্র জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া তাঁহার দুঃখ-মোচন করিবে। আমড়াগাছে আমড়াই ফলিবে ইহাই তিনি জানিতেন, আম বা আঙুরের প্রত্যাশা তাঁহার ছিল না। সেইজন্য বাল্যকাল হইতেই তিনি বিষ্ণুচরণকে দোকানেও বসাইতেন, জমিতেও পাঠাইতেন। তিনি জানিতেন যে অ্যালজ্যাব্রার অঙ্ক ঠিকমতো কষিতে না পারিলে তেমন কিছু ক্ষতি হইবে না, হনলুলু কোথায় অথবা পানিপথের যুদ্ধ কোন্ তারিখে হইয়াছিল এসব তথ্য সঠিক না জানিলেও তাঁহার দোকানও চলিবে, জমিতে ফসলও ফলিবে, যদি দোকানে এবং জমিতে যথোচিত মনোনিবেশ করা যায়। তাই বাল্যকাল হইতেই তিনি বিষ্ণুচরণকে এই দুইটি বিষয়ে

অবহিত হইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণের দিক হইতেও উৎসাহের অভাব হয় নাই। সে নামেমাত্র স্কুলে যাইত, প্রায়ই ক্লাশ-প্রমোশন পাইত না। কিন্তু এ যুগে (যে যুগকে পণ্ডিতগণ কলিযুগ আখ্যা দিয়াছেন) ন্যায়ের বিধান অনুসারে কয়টা লোকই বা চলে? ঘড়ির মতো সূক্ষ্ম যন্ত্রও স্লো-ফাস্ট হয়, নিক্তির কাঁটাও মাঝে মাঝে ভুল ওজন দেখায়। ভবনাথও লেখাপড়ায় অমনোযোগী পুত্রটির ক্লাশ-প্রমোশনের একটা অবৈধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুবিধাও হইয়াছিল। স্কুলের হেডমাস্টারমহাশয় নানা-কারণে ভবনাথের উপর প্রীত ছিলেন। ভবনাথ যে একজন উঁচুদরের মিষ্টান্নশিল্পী এ ধারণা তো তাঁহার ছিলই, ব্যক্তিহিসাবেও তাঁহাকে তিনি খাতির করিতেন। প্রায়ই বলিতেন, ভবনাথ লোকটি ভারী অমায়িক, ভারী সরল। তাহার বিনীত ভব্য আচরণ হেডমাস্টারকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিষ্ণুচরণ সম্পর্কে যে সকল কথা তিনি ভবনাথের মুখে শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়াও মনে হইয়াছিল। ভবনাথ হাতজোড় করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখুন হেডমাস্টারবাবু, বিষ্টুকে স্কুলে দিয়েছি বিয়ের সুবিধে হবে বলে। এটা আমি জানি চাষবাস করে আর দোকান চালিয়েই ওকে খেতে হবে। ডাক্তার, উকিল, হাকিম এসব হবার যোগ্যতা ওর নেই। তবে কি জানেন, ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে গোমূর্খ হলে দেখতে শুনতেও খারাপ দেখায়, ভদ্রঘরে বিয়ে দেওয়াও শক্ত হয়। কারণ সব মেয়েরই বাপের আকাঙ্ক্ষা জামাইটি একটু লেখাপড়া-জানা হোক। তাই আমার প্রার্থনা প্রমোশনটা ওকে দিয়ে দেবেন মাঝে মাঝে। আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক, আপনাকে অকপটেই সব নিবেদন করলাম। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ পর্যন্ত ঠেলেঠুলে তুলে দিন ওকে। তারপর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ওই ক্লাশেই থাক। বিয়ের সম্বন্ধ এলে বলতে পারব ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ছে। বুঝলেন না—"

হেডমাস্টারমহাশয় বুঝিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি জানিতেন যে শিক্ষাপ্রসারের হুজুকটা আধুনিক যুগের একটা বাতিকমাত্র। তাঁহার দৃঢ়ধারণা ছিল যে শত চেষ্টা করিয়াও সকলকে শিক্ষিত করা যায় না। আবার চেষ্টা না করিলেও, এমন কি বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করিয়াও, কতকগুলি লোক শিক্ষিত হয়। তাঁহার এই ধারণার স্বপক্ষে উদাহরণও তিনি দেখাইতেন। বলিতেন যে সব জ্ঞান-তপস্বীর সাধনা যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্রের অথবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের লেখাপড়া করিবার সুযোগসুবিধা ছিল না। অনেকে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পর্যন্ত পাইতেন না, তবু তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আর ধনীর ঘরের আদুরে নন্দদুলালেরা, যাহাদের সুখসুবিধার অন্ত নাই, তাহারা কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাহারা নানারকম পোশাক ও বুলির নকল পেখম আস্ফালন করিয়া প্রকৃত ময়ূরদের বিব্রত করিতেছে মাত্র। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি মনে করিতেন যে যাহার সত্যিই বিদ্যালাভ হইবে তাহার আগ্রহকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না, আর যাহার সে আগ্রহ নাই তাহাকে

বিদ্যা গিলাইয়াও বিদ্বান করা যাইবে না, বড় জোর সে একটা বুলি-কপচানো তোতাপাখী হইতে পারে। বহু বাধা সত্ত্বেও পাখী আকাশে ডানা মেলিবে, শত শিক্ষা দিলেও কেঁচো তাহা পারিবে না। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহাই যখন নিয়ম যে সাপ, ব্যাং, কেঁচো, শামুক সকলকে এক গোয়ালে পুরিয়া একই শিক্ষা দিয়া পাখী করিবার চেষ্টা করা হোক এবং সে নিয়ম পরিবর্তন করিবার সাধ্যও যখন তাঁহার নাই তখন চুপ করিয়া দশটা পাঁচটা চাকরি করিয়া যাওয়া ছাড়া আর তিনি কি করিতে পারেন? ভবনাথের অতি সঙ্গত অনুরোধটি পালন না করারই বা কি হেতু থাকিতে পারে?

সুতরাং তিনি বিষ্ণুচরণকে "পুশ" করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষ্ণুচরণের যোগ্যতা এমনই অসাধারণ ছিল যে, প্রায় কোন বিষয়েই সে পাশ নম্বর সংগ্রহ করিতে পারিত না। হেডমাস্টারমহাশয়ের অনুরোধে পরীক্ষকরা তাহাকে "গ্রেস"ও দিতেন, তবু সব সময় কুলাইত না! তাই কোনও কোনও ক্লাশে তাহাকে একাধিক বৎসর আটকাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে বিষ্ণুচরণের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, কিন্তু ভবনাথ চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। আশেপাশের গ্রাম ইহতে দুই চারিটি বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল, কিন্তু বিষ্ণুচরণের বিদ্যার বহর দেখিয়া তাহারা পিছাইয়া গেল। এই সব দেখিয়া ভবনাথ মাঝে মাঝে দমিয়া যাইতেন। ভাবিতেন ছেলেটার কি তাহা হইলে বিবাহ হইবে না? যার তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যায় না। একমাত্র ছেলে, ভদ্রবংশের কন্যা চাই। কিন্তু ভদ্রবংশীয় কন্যার পিতারা মূর্খ জামাই চান না। শিক্ষিত জামাই লাভ করিবার জন্য তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইতে প্রস্তুত কিন্তু বিনা পণেও মূর্খ জামাই তাঁহারা পছন্দ করেন না। ভবনাথ সেইজন্য মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া গিয়া পুত্রকে তাড়না করিতেন, হেডমাস্টারের বাড়ি নানাবিধ উপঢৌকন পাঠাইতেন। বিষ্ণুচরণও দুই চারিদিন বই খাতা লইয়া সাড়ম্বরে পাড়া মাতাইয়া পড়াশোনা করিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ ফল ফলিত না।

এই সব করিতে করিতে বিষ্ণুচরণের গোঁফ উঠিয়া গেল। আর একটা কাণ্ডও ঘটিল। বিষ্ণুচরণদের চাষের চাকর জামালুদ্দিন ইসলাম বিধান অনুসারে একসঙ্গে একাধিক বিবাহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অনেকগুলি পুত্র-কন্যা ছিল তাহার। তাহারাও বিষ্ণুচরণদের জমিতে মজুর খাটিত। জামালুদ্দিনের চতুর্থী কন্যা ফতিমার বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন হইতেই সে বাপের সঙ্গে মাঠে যাইত। ভবনাথের নির্দেশে বিষ্ণুকেও প্রত্যহ চাষের তদারক করিতে যাইতে হইত। নিয়তির অমোঘ চক্রান্তে এই ফতিমাকে বিষ্ণুচরণের একদিন ভাল লাগিয়া গেল। মেয়েটার চোখেমুখে কি যে মায়া মাখানো ছিল, তাহার হাসিতে, চাহনিতে, হাব-ভাবে, চলন-বলনে কি যে মাধুরী উচ্ছলিত হইত তাহার বিশদ বর্ণনা বিষ্ণুচরণই করিতে পারিত যদি সে কবি হইত। কিন্তু কাব্যরচনা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, সে কেবল মুগ্ধ হইয়া গেল। একটা জিনিস ভাবিয়া সে বিস্মিত হইয়া যাইত। ফতিমাকে সে ছেলেবেলা হইতেই চেনে, কিন্তু একটি বিশেষ দিনে, বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ পটভূমিকায় হঠাৎ যেন সে অনুভব

করিল ফতিমা তাহার অত্যন্ত আপন। পটভূমিকাটাও নূতন নয়, দিগন্তবিস্তৃত মাঠে এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজের পর সবুজ, কচি কচি ধানের চারার উপর পদ্মার হাওয়া ঢেউ তুলিতেছে, কয়েকটা গাংচিল চক্রাকারে উড়িতেছে, একটা বাঁশের ডগায় নীলকণ্ঠ বসিয়া আছে, সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত, সহসা ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বিষ্ণুচরণ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল একটা কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। একটা কোমল স্নিগ্ধতায় চারিদিক ঢাকিয়া গেল, সবুজ ধানক্ষেতের রূপ বদলাইয়া যাইতেছে...আলের উপর দাঁড়াইয়া আছে ফতিমা, পরণে লাল ডুরে শাড়ী, মাথায় ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়িতেছে, সুন্দর মুখখানি ফুলের মত কোমল, বিষ্ণুচরণের মনে হইল—কি যে মনে হইল তাহা বিষ্ণুচরণও বলিতে পারিবে না—কিন্তু ফতিমা যে মুসলমানী একথা তাহার মনে একবারও জাগিল না। সে মুগ্ধ-নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধমকাইয়া উঠিল।

"এই ফতি, কাজে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, আমি বুঝি দেখতে পাচ্ছি না কিছু—"

ফতিমা একছুটে চলিয়া গেল।

সেইদিনই মাঠ হইতে ফিরিবার সময়, বিষ্ণু ফতিমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যের পর দোকানে আসিস—"

"কেন?"

"আসিস না, এলে বলব।"

ফতিমার কালো চোখদুটি হাসিতে নাচিয়া উঠিল। সে যেন সব বুঝিতে পারিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুচরণ ফতিমাকে প্রথম যে প্রণয় উপহার দিল তাহা ফুল নয়, আতর নয়, কবিতা নয়, চুম্বনও নয়, দিল দুইটি রসগোল্লা, তাহাও দোকান হইতে চুরি করিয়া!

এইভাবেই শুরু হইল। সামাজিক বাধা না থাকিলে হয়তো সমাপ্তিটাও সুন্দর হইত। সামাজিক বাধা কিন্তু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। সকলের সুখসুবিধার জন্য সমাজ। ব্যক্তিগত সুখদুঃখে বিচলিত হইয়া সমাজ আইন পরিবর্তন করে না। আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবার জন্য সমাজপতিরা সততই সশস্ত্র হইয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা উৎকোচের দ্বারা বশীভূতও হন। দেখা যায় যাঁহারা দরিদ্র অথবা প্রতিপত্তিহীন তাঁহারা গোপনতার আশ্রয় লইয়া থাকেন। ইহাই চিরাচরিত প্রথা। দরিদ্র বিষ্ণুচরণ সেই চিরাচরিত প্রথাই অনুসরণ করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর কথা, প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী, পার্বতী-দেবদাসের গল্প আমাদের চিত্তকে বহুদিন হইতে বিগলিত করিতেছে, কিন্তু বিষ্ণুচরণ-ফতিমার ব্যাপারে যে আমাদের অন্তরে ক্রোধ ছাড়া আর কিছু উদ্রিক্ত হইবে না তাহা আমি জানি। কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে ঘটনাটা বলিতেই হইবে। কারণ বিষবৃক্ষের মূলই ওইখানে।

গোপনে গোপনে বিষ্ণুচরণের সহিত ফতিমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। ঘনিষ্ঠতা বাড়িলেও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বাধা পাইল না। ফতিমার বাবা যথাকালে ফতিমার বিবাহ দিল, যথাকালে ফতিমা বিধবা হইল, যথাকালে সে আবার আর একজনের ঘরণী হইয়া চলিয়া গেল। ফতিমার দ্বিতীয় ভর্তা হামিদুল্লা মিঞা একটু বেশীরকম পুরুষ-প্রকৃতির লোক ছিলেন। ফতিমা ছাড়া আরও তিনটি নারীর পাণি-পীড়ন তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌরুষ এমনই উগ্র ছিল যে তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনে থানা-পুলিশ, উকিল-আদালত প্রভৃতির অভ্যাগম মাঝে মাঝে নাকি অনিবার্য হইয়া উঠিত। ফতিমাকে প্রায়ই ক্ষতবিক্ষতদেহে পিতৃগৃহে পলাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত। শোনা যায় পত্নীদের শাসন করিবার জন্য হামিদুল্লা বিশেষ ফরমাশ দিয়া একটি হাণ্টার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চামড়া এবং লোহার তারের সম্মিলনে প্রস্তুত হাণ্টারটি একবার অঙ্গ-স্পর্শ করিলে খানিকটা মাংস না লইয়া উঠিত না। উক্ত অস্ত্র দ্বারা কিন্তু হামিদুল্লা তাঁহার তৃতীয়া পত্নী হাসিনাকে সম্যকরূপে শাসন করিতে পারেন নাই। ক্রোধান্ধ হইয়া একদিন তাহাকে রামদা দিয়া কাটিয়াই ফেলিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার ফাঁসি হইয়া গেল। হামিদুল্লার যেদিন ফাঁসি হয় বিষ্ণুচরণ সেদিন নাকি গোপনে স্থানীয় পীরের নিকট পাঁচ পয়সার সিন্নি দিয়া আসিয়াছিল। কারণ এত সত্ত্বেও ফতিমার প্রতি তাহার প্রেম এতটুকু মলিন হয় নাই। ফতিমা যখন দ্বিতীয়বার বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন তাহার বয়স কুড়ি বছর। বিষ্ণুচরণের পঁচিশ। এই সময়েই পার্শ্ববর্তী হিন্দু জমিদারটির সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হইয়া উঠিল। একটু রাগ আগে হইতেই ছিল। কারণ উক্ত জমিদার-কন্যা চন্দ্রলেখার সহিত ভবনাথ তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। মূর্খ বিষ্ণুচরণের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে জমিদারবাবু রাজি তো হনই নাই, উপরন্তু তিনি (এবং তাঁহার কন্যাও) বিষ্ণুকে চন্দ্র-লোলুপ উদ্বাহু বামন বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। এই অপমানজনিত ক্রোধটা তাহার অন্তরে তুষাগ্নির মতো ধোঁয়াইতেছিল, ফতিমার মুখে সব কথা শুনিয়া তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উক্ত জমিদারবাবুই নাকি হাসিনার মৃত্যুর আসল কারণ, গহনার লোভ দেখাইয়া সত্যই নাকি লোকটা হাসিনাকে সৎপথ-ভ্রষ্টা করিয়াছিল! ফতিমাকেও সে প্রলুব্ধ করিতে ছাড়ে নাই। সমস্ত শুনিয়া বিষ্ণুচরণ গুম হইয়া রহিল। শপথ করিল যেমন করিয়া হোক সে একদিন প্রতিশোধ লইবেই।

ফতিমাকে তৃতীয়বার ঘরণী করিলেন মুন্সীগঞ্জের নিয়ামত আলী। বৃদ্ধ নিয়ামত সজ্জন ছিলেন। সঙ্গতিসম্পন্নও ছিলেন। একটিমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত দুইটি পুত্রও তাঁহার ছিল। সুখেই দিন কাটিতেছিল, কিন্তু সহসা জীবন-সন্ধ্যায় জীবন-সঙ্গিনীকে হারাইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই বিব্রত ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই ফতিমাকে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পুত্ররা বাধা দিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র রহমনের বাধা দিবার সুযোগই ছিল না, কারণ সে ছিল জেলে। কনিষ্ঠপুত্র রমজান

আপত্তি করিল না, কারণ তাহার বিবি পত্নীহীন নিয়ামতকে একা সামলাইতে পারিতেছিল না। তাঁহার বদনা, পিকদানী আগাইয়া দেওয়া, লুঙ্গী, গামছা ঠিক রাখা, পাচ ওক্ত নমাজের জন্ম সতরঞ্জি বিছাইয়া দেওয়া, তাঁহার জন্ম ঘন ঘন তামাক সাজা, তাঁহার শয়ন-ভোজনের সর্ববিধ তদারক-তদ্বির করা অর্থাৎ যে সকল কর্তব্য নিয়ামত-গৃহিণী করিতেন তাহার সবটাই স্ত্রী জেবউন্নিসার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার অল্প বয়স, ষোল বৎসরও পুরা হয় নাই, তবু বেচারি যথাসাধ্য সব কাজই হাসিমুখে করিত, কিন্তু নিয়ামত আলীকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। নিয়ামত সর্বদাই হা-হুতাশ করিয়া বলিতেন, আহা, রহমনের যদি জেল না হইত তাহা হইলে আসগর মিঞার ভগ্নীর সহিত তাহার বিবাহ দিতেন, মেয়েটি রূপে, গুণে অসামান্যা, সে পুত্রবধূ হইয়া আসিলে এত কষ্ট পাইতে হইত না। জেবউন্নিসার অপটুতাকে কেন্দ্র করিয়া বাড়িতে অহোরাত্র একটা অশান্তির ঝড় বহিত। সুতরাং পিতা পুনরায় বিবাহ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন জানিয়া রমজান স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিল। ফতিমার সহিত নিয়ামতের বিবাহ হইয়া গেলে কিছুদিন পরে সে আলাদা ঘরও বাঁধিল।

বিষ্ণুচরণের জীবনধারাও এই সময় গতিপরিবর্তন করিল। স্কুলের হেডমাস্টার-মহাশয় নিজের কথা রাখিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণকে ম্যাট্রিকুলেশনের দ্বার পর্যন্ত তিনি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণ বার দুই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার সুযোগও পাইয়াছিল। আরও কয়েকবার হইতে পাইত কিন্তু হেডমাস্টারমহাশয় হঠাৎ একদিন অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার স্থানে বর্ধমান হইতে বেঁটে-গোছের যে ভদ্রলোকটি নিযুক্ত হইলেন, তিনি অন্য ভাবের ভাবুক। স্বল্পভাষী, কড়া-প্রকৃতি। তিনি একদিন ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার ছেলেকে আর মিছিমিছি স্কুলে রেখেছেন কেন? ও আর ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে না।"

ভবনাথ হাত কচলাইতে কচলাইতে সবিনয়ে বলিলেন,

"তাতো বুঝতেই পারছি, কিন্তু কি করি বলুন।"

"পুরোপুরি ব্যবসাতেই ওকে লাগিয়ে দিন।"

"তাই দেব, বিয়েটা যতদিন না হয় ততদিন স্কুলের খাতায় নামটা থাক, আমি চেষ্টা করছি খুব। বিয়েটা হয়ে গেলেই ওকে ছাড়িয়ে নেব। ছেলে পড়ছে জানলে বিয়ের সুবিধা হবে, এইটুকু দয়া আপনি করুন।"

স্বল্পভাষী হেডমাস্টার তখন আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখভাব দেখিয়া ভবনাথ বুঝিলেন সুবিধা হইবে না। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় প্রচুর মিষ্টান্ন উপঢৌকন লইয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কড়াপ্রকৃতির সুশীল নাগ এবার ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আমি কি দারোগা, না রেলের বাবু যে আপনি ঘুস দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে এসেছেন?"

ভবনাথ মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তাহার পর সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আগের হেডমাস্টারবাবু আমার হাতের তৈরি মিষ্টি পছন্দ করতেন কি না, তাই—"

"না, আমি ওসব পছন্দ করি না। আপনার ছেলেকেও আমি আর স্কুলে রাখতে পারব না। শুনছি স্কুলের প্রতিটি ছাত্রকে ও সিগারেট খাওয়াতে শিখিয়েছে—" ভবনাথ সবই জানিতেন। করজোড়ে বলিলেন, "ওকে আমি স্কুলে যেতে দেব না, খাতায় নামটা কেবল রাখুন। আদেশ করেন তো একবছরের মাইনে আমি অগ্রিম জমা করে দিচ্ছি। ওর বিয়েটা কোনরকমে দিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

ইহা শুনিয়া সুশীল নাগের হঠাৎ প্রমথ ঘোষের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার বাল্যবন্ধু প্রমথ ঘোষ অনেকগুলি কন্যা লইয়া বিব্রত। তাহার একটা মেয়ের সহিত বিষ্ণুর সম্বন্ধ করিলে কেমন হয়। পাত্র হিসাবে ছোকরা নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। ঘরে খাইবার, পরিবার সঙ্গতি আছে, স্বাস্থ্যও ভাল। লেখাপড়ায় ভাল নয় অবশ্য, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি। উপার্জন করিবার জন্যই তো লেখাপড়া। প্রমথকে পত্র লিখলে হয়তো সে রাজি হইয়া যাইবে। ভবনাথ করজোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া সুশীল নাগের হাসি পাইল, একটু দুঃখও হইল। শ্রদ্ধাও হইল একটু। পুত্র ভাল নয়, কিন্তু পিতাটি কর্তব্যপরায়ণ।

"পশ্চিমবঙ্গে যদি বিয়ে দেন, আপনার ছেলের সম্বন্ধ করি একটা। আমারই এক বন্ধুর মেয়ে আছে অনেকগুলি, আপনাদের পালটি ঘরও।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনও আপত্তি নেই আমার। সদ্বংশের মেয়ে হলেই হল। আর আপনার বন্ধু যখন—তখন আর কথা কি। নিশ্চয়ই ভাল লোক হবেন। দূরের মেয়েই আনতে হবে। কারণ এখানে সবাই ভাংচি দিচ্ছে—"

"বেশ, তা হলে চেষ্টা করি ?"

"করুন।"

ভবনাথ নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। সুশীল নাগ ডাকিয়া বলিলেন, "মিষ্টিগুলো নিয়ে যান। বিয়েটা যদি লাগাতে পারি তখন মিষ্টি খাওয়া যাবে—"

সুশীল নাগের চোখের দিকে চাহিয়া ভবনাথ আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বলিলেন, "বেশ, আপনার আদেশই শিরোধার্য করছি। বিয়ের কথাটা কিন্তু গোপন রাখবেন।"

"রাখব।"

পরদিনই নাগমহাশয় বন্ধু প্রমথ ঘোষকে পত্র দিলেন।

এদিকে বিষ্ণুচরণ আর এক কাণ্ড করিয়াছিল। সে মুন্সীগঞ্জে গিয়া নিয়ামত আলীর সহিত ভাব জমাইয়া আসিয়াছিল। অজুহাতের অভাব হয় নাই। বলিয়াছিল তাহাদের গ্রামের মেয়ে ফতিমা যখন নিয়ামত আলীর ঘরণী, তখন নিয়ামত আলী তো আপন লোক। প্রয়োজন হইলে সে নিয়ামত আলীকে পাটের কারবারে সাহায্য করিবে, কারণ

অনেক পাট-চাষীর সহিত তাহার আলাপ আছে, নিজেরও জমিতে কিছু কিছু পাট হয়। সস্তায় পাট কিনিয়া দিবার ব্যবস্থা সে অনায়াসেই করিয়া দিতে পারে। বলা বাহুল্য, নিয়ামত আলীকে পাটের ব্যবসায়ে সাহায্য করিবার জন্য সে যায় নাই, গিয়াছিল কোন ছুতায় ফতিমাকে দেখিবে বলিয়া। বৃদ্ধ নিয়ামত কিন্তু পাটের ব্যবসাটার উপরই জোর দিলেন বেশী এবং বিষ্ণুচরণের এই সহৃদয় মনোবৃত্তিকে খোদার একটা বিশেষ করুণা বলিয়া গণ্য করিলেন। কারণ কনিষ্ঠপুত্র রমজান পৃথক হইয়া যাওয়াতে তিনি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বার্ধক্যনিবন্ধন ব্যবসার জন্য দৌড়ঝাঁপ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, রমজানই সব কিছু করিত। কিন্তু সে পৃথক হইয়া অন্য ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল। একটি মনোহারী দোকান খুলিয়া তাহাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছিল। পত্নীর প্ররোচনাতেই যে সে এভাবে নাচিয়া বেড়াইতেছে বৃদ্ধ নিয়ামত তাহা বুঝিতেছিলেন। কিছুদিন পরেই যে তাহার চৈতন্য হইবে তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু ব্যাপারটার আকস্মিকতায় তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণের আত্মীয়সুলভ মনোভাবে তাই তিনি প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, "বেশ, তুমি পাট যোগাড় কর, আমি টাকা দেব। তোমার যাতে দু'পয়সা থাকে তা-ও দেখব। ঘরের ছেলের মতো তুমি যখন খুশী এস—"

বিষ্ণুচরণ ইহাই চাহিয়াছিলেন। নিয়ামত আলীর সহিত সে পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া পড়িল। ভবনাথও পুত্রের উপার্জনপ্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া সুযুক্তি মনে করিলেন না। তিনি ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে ছেলেকে আর স্কুলে রাখা যাইবে না। হেডমাস্টার যেরূপ কড়া লোক, নামটাও হয়তো তিনি কাটিয়া দিবেন। পাটের ব্যবসা করিয়া সে যদি কিছু রোজকার করিতে পারে ভালই।

এইভাবেই মাস দুই কাটিয়া গেল। ফতিমার সান্নিধ্যে আসিয়া বিষ্ণুচরণের স্বপ্ন যখন রঙীন হইতে রঙীনতর হইয়া উঠিতেছিল, তখন হঠাৎ ভবনাথের একরঙা স্বপ্নটা সফল হইয়া গেল। নাগমহাশয়ের বন্ধু প্রমথবাবু একদিন সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়া গেলেন। বিষ্ণুচরণকে দেখিয়া এবং ভবনাথের সহিত আলাপ করিয়া তিনি আনন্দলাভও করিলেন। ভবনাথকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন তাঁহার কন্যা শিবানীকে দেখিয়া আসিবার জন্য। অর্থাৎ বিবাহ-ব্যাপারে যাহা যাহা ঘটা উচিত তাহা তাহা ঘটিয়া অবশেষে বিষ্ণুর সহিত শিবানীর একদিন বিবাহ হইয়া গেল। রোমান্টিক উপন্যাসের নায়করা সাধারণতঃ যাহা করিয়া থাকে, বিষ্ণুচরণ তাহার কিছুই করিল না। পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়-বিদারক বক্তৃতাও দিল না, আত্মহত্যা করিবারও চেষ্টা করিল না। ভালো ছেলের মতো টোপরটা মাথায় দিয়া বিবাহ করিয়া আসিল।

বিষ্ণুচরণের জীবনের আদর্শটা বাল্যকাল হইতেই বাস্তবধর্মী। যাহা অনিবার্য, তাহার বিরুদ্ধে অনর্থক বিদ্রোহ করিয়া সে শক্তি বা কাল-ক্ষয় করিত না। ফতিমা যে কিছুতেই তাহার পত্নীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, এ সহজবুদ্ধি তাহার ছিল।

পিতার পছন্দ অনুসারে আর একটি বালিকার পাণিপীড়ন করিয়া তাহাকে আর পাঁচজনের মতো সংসার করিতে হইবে ইহাও সে জানিত। সুতরাং অসম্ভবকে আয়ত্তাধীন করিবার হাস্যকর প্রয়াস না করিয়া সে নির্বিবাদে বিবাহটি করিয়া আসিল। শিবানীকে তাহার মন্দও লাগিল না। ডাগরডোগর লাজুক কিশোরীটিকে ভালই লাগিল তাহার। ফতিমা অবশ্য গোপনে মাঝে মাঝে তাহাকে পরিহাস করিত, তাহার দুই একটা শ্লেষোক্তির মধ্যে ঈষৎ খোঁচাও যে না থাকিত তাহা নয়, কিন্তু মোটের উপর সে-ও অসন্তুষ্ট হয় নাই। সেও একদিন ঘটা করিয়া আসিয়া শিবানীকে শাড়ী, সিন্দুর উপহার দিয়া গেল। সর্বদিক দিয়াই ব্যাপারটা বেশ সুসম্পন্ন হইল। কোথাও কোন বেসুর বাজিল না। সর্বাপেক্ষা খুশী হইয়াছিলেন ভবনাথ। পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি যেন চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে যাহা ঘটিল তাহাতে মনে হয় এই সাংসারিক কর্তব্যটুকু অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া ভবনাথ সংসারত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে বিষ্ণুচরণকে বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝাইয়া দিয়া, শিবানীর হস্তে ভাণ্ডারের চাবিটি সমর্পণ করিয়া তিনি তীর্থে চলিয়া গেলেন! সঙ্গে লইলেন মাত্র একশ'টি টাকা। কিছুকাল পরে কাশী হইতে তাঁহার একটি পত্র আসিয়াছিল, তিনি আরও পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। মাস ছয়েক পরে বৃন্দাবন হইতে আর একটি পত্র আসে, তাহাতে টাকা পাঠাইবার কথা ছিল না। শিবানীর অনুরোধে বিষ্ণুচরণ তবু একশত টাকা পাঠাইয়াছিল। কিন্তু মনিঅর্ডার ফিরিয়া আসিল। চিন্তিত বিষ্ণুচরণ চিঠি লিখিল, টেলিগ্রাফ করিল, কিন্তু কোন জবাব আর আসিল না।

বিষ্ণুচরণ কুপুত্র হইতে পারে কিন্তু পিতার অন্তর্ধানে সে অবিচলিত থাকিতে পারিল না। কর্তব্যনির্ধারণ করিবার জন্য সে হেডমাস্টারমহাশয়ের নিকটে গেল। নাগ-মহাশয় পরামর্শ দিলেন চিঠিপত্র লিখিয়া যখন কোন ফল হইতেছে না তখন নিজে গিয়া খোঁজখবর করা উচিত। বিষ্ণুচরণ অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িল। কাশী গেল, বৃন্দাবনেও গেল। বৃন্দাবনে যে ঠিকানায় সে পিতাকে শেষবার টাকা পাঠাইয়াছিল এবং যে যে টাকা তিনি লইয়াছিলেন সেই ঠিকানায় গিয়া সে শুনিল যে ভবনাথ নাকি একদল তীর্থযাত্রীদের সহিত কেদারবদরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার বেশী কোনও খবর কেহ বলিতে পারিল না। দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতির দ্রষ্টব্য দৃশ্য ও হর্ম্যগুলি দেখিয়া বিষ্ণুচরণ কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিল। নাগমহাশয় পুনরায় পরামর্শ দিলেন, "খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, পুলিসেও একটা খবর জানিয়ে রাখ।" বিষ্ণুচরণ তাহাই করিল। দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট ভবনাথ আর কাহারও নাগালের মধ্যে ধরা দিলেন না। তখন স্বভাবতঃই সকলে অনুমান করিতে লাগিলেন, ভবনাথ সম্ভবতঃ ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। হিতৈষীর দল প্রথামতো তাহাকে উপদেশ দিলেন যে, দশ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তবে যেন সে শ্রাদ্ধাদি করে। বিষ্ণুচরণ হয়তো হিতৈষীদের উপদেশ অমান্য করিত না। কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক

রথচক্র এত দ্রুতবেগে আব তত হইয়া এমন অতর্কিতভাবে বিষ্ণুচরণের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল যে, শ্রাদ্ধ করিবার অবকাশই সে পাইল না। যখন পাইল তখন ব্যাপারটা বেশ জটিল হইয়া গিয়াছে। মুসলমান পুত্র কি হিন্দুমতে হিন্দু পিতার শ্রাদ্ধ করিতে পারে? মুসলমানীমতে করিলে হিন্দু পিতার আত্মা কি তৃপ্ত হইবে? জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত বিষ্ণুচরণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে ও চিন্তাই ছাড়িয়া দিল। নাগমহাশয় বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো একটা সৎপরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি বাঁচিয়া ছিলেন না, রায়টে মারা গিয়েছিলেন।

বিষ্ণুচরণের জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইবার কাহিনী আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইবে। না বলিলে শুধু যে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে তাহা নহে, গল্পটাই ভাল করিয়া বলা হইবে না।

শিবানীকে বিবাহ করিয়া বিষ্ণুচরণ অসুখী হয় নাই। ফতিমার স্মৃতি যে তাহার দাম্পত্য-জীবনকে ম্লান করিয়াছিল এ কথাও সত্য নহে। তবে এ কথাও সত্য যে শিবানীকে পাইয়া সে ফতিমাকে ভোলে নাই। মোটেই না। নিয়ামত আলীর সহিত হৃদ্যতা এবং ব্যবসায়-সম্পর্ক উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছিল। ফতিমাকে সে প্রায়ই দেখিতে পাইত। ফতিমাকে দেখিলে তাহার সমস্ত হৃদয় এমন একটা মধুর রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত যাহা অবর্ণনীয়। একটু ক্ষোভও হইত। মনে হইত যে জীবনটা ব্যর্থই হইযা গিয়াছে, আনন্দলোকের দ্বার আর খুলিবে না। শিবানীকে লইয়া সে যে সংসার পাতিয়াছে তাহাতে কোন অশান্তি নাই, পাঁচজনের দৃষ্টিতে তাহা সুখের সংসার, কিন্তু তাহাতে কিসের যেন একটু অভাব আছে। সেটা ঠিক যে কি তাহাও বিষ্ণুচরণ বুঝিতে পারিত না। তাহার কেবল মাঝে মাঝে মনে হইত শিবানীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার গৃহস্থালী হয়তো আরও শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে, মিষ্টান্নের দোকান হয়তো আরও উন্নত করিবে, পাটের ব্যবসায় আরও ফালাও হইবে কিন্তু প্রথম যৌবনে ফতিমাকে দেখিয়া যে রং তাহার কল্পনাকে রঞ্জিত করিয়াছিল, সে রং আর তাহার জীবনে লাগিবে না। আকাশের রামধনুর মতো আকাশে ফুটিয়া তাহা আকাশেই মিলাইয়া গিয়াছে। দূর হইতে যে অমৃতলোকের আভাস সে পাইয়াছিল—সমাজ প্রতিকূল না হইলে যেখানে সে অনায়াসে পৌঁছিতে পারিত—সে অমৃতলোক চিরকালের মতো অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন প্রত্যহ দোকানে বসা, চাষের ব্যবস্থা করা, পাট কিনিতে যাওয়া, হাটবাজারে ঘোরা, শিবানীকে লইয়া সংসারধর্ম করা—এই বৈচিত্র্যহীন একরঙা জীবনের চক্রাকার আবর্তনই আমরণ চলিতে থাকিবে। অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কল্পনাকে আর আবিষ্ট করিবে না। ফতিমাকে যখনই দেখিত, এই সব কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনে হইত, জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা যুক্তিও তাহার মনে জাগিত, কিন্তু তাহাও অস্পষ্টভাবে। স্পষ্টভাবে জাগিবার মতো শিক্ষা তাহার ছিল না।

ঠিক এই সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত আলোর ঝলক তাহার একঘেয়ে জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল কয়েকদিনের জন্ত। পার্শ্ববর্তী গ্রামের চন্দ্রলেখা নাম্নী ধনী জমিদার-কন্যাটি কলিকাতায় হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনা করিত। সে সহসা একদিন গ্রামে হাজির হইল। তাহার টাইট-করিয়া পরা জামা-কাপড়, তাহার লীলায়িত গতিভঙ্গী, তাহার চঞ্চল নয়নের চটুল চাহনি, তাহার নিটোল যৌবন, সমস্ত গ্রামের আবহাওয়াকে মদির করিয়া তুলিল। অনেক যুবকই মুগ্ধ হইল, বিষ্ণুচরণও হইল। তাহার মোহের সহিত একটু ক্ষোভও মিশিল। মনে পড়িল এই চন্দ্রলেখার সহিতই ভবনাথ তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। উত্তরে চন্দ্রলেখার পিতা—ওই দাম্ভিক জমিদারটা—পারিষদদের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও বিষ্ণুচরণের মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন, বামন উদ্বাহু হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা করে এটা কবিদের অলীক কল্পনা বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ভবনাথের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার সে ভ্রম ভাঙিয়া গিয়াছে। এই উক্তি বিষ্ণুচরণের মর্মে যে ক্ষতসৃজন করিয়াছিল তাহা যেন সহসা আবার জ্বালা করিয়া উঠিল। চন্দ্রলেখাকে দেখিতে পাইলেই সে তাহার দিকে প্রলুব্ধনয়নে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর বেশীদূর অগ্রসর হইবার সাহস তাহার ছিল না, সে-কল্পনাও সে করে নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক, এই সময়ে নবোদ্ভিন্নযৌবনা চন্দ্রলেখা যদি তাহার নয়ন-পথ-বর্তিনী না হইত তাহা হইলে বিষ্ণুচরণ জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইত কি না সন্দেহ।

ইহার কিছুদিন পরে আর একটি ঘটনাও ঘটিল। নিয়ামত আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র রহমন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া ফিরিয়া আসিল। সে ছিল আলিপুর জেলে। এই আলিপুর জেলে বিধুভূষণের সহিত তাহার আলাপ হয়। শুধু মৌখিক আলাপ নয়, অন্তরের যোগাযোগও ঘটিয়াছিল। পুলিশের খাতায় রহমনকে গুণ্ডা বলিয়া অভিহিত করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন বীর। সে অন্যায় সহ্য করিতে পারিত না, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই একাধিকবার সে আইনের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়াছিল। সুতরাং চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী একজন বীরকে স্বচক্ষে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল এবং তাহার সান্নিধ্য-লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল। বিধুভূষণ যেদিন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসেন সেদিন রহমন অশ্রু-বিসর্জন পর্যন্ত করিয়াছিল। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রহমন পিতার পাটের ব্যবসায়ে যোগদান করিল। নিয়ামত আলী বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পুত্রের হস্তে ব্যবসায় সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সূত্রে বিষ্ণুচরণের সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠতা হইল। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হইয়া এই সময় রমজানও মারা গেল হঠাৎ। বৃদ্ধ নিয়ামত আলী পুত্রশোক সহ্য করিতে পারিলেন না, একদিন সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত হইয়া তিনিও মর্তলোক ত্যাগ করিলেন। রহমন রমজানের বিধবাপত্নী জেবউন্নিসাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। এই সব নানা ঝঞ্ঝাটে বিধুভূষণের কথাটা তাহার মনে তত স্পষ্টভাবে জাগরূক থাকিতে পাইল না। কিন্তু বিধুভূষণকে সে

যে ভুলিয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ঢাকার পথে সহসা তাহাকে একদিন সে দেখিতে পাইল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল সে। বিধুভূষণ পাটের ব্যবসা উপলক্ষেই ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেনও না যে রহমন একজন পাটের কারবারী। আকস্মিকভাবে যোগাযোগ ঘটিল এবং ক্রমশ তাহা মণিকাঞ্চন-জাতীয় হইয়া উঠিল। এই রহমনই বিধুভূষণের সহিত বিষ্ণুচরণের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। এই পরিচয় কালক্রমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতে পরিণতিলাভ করিল। পাটের ব্যবসায় জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না। বিধুভূষণ এইসময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলেন। বিষ্ণুচরণও করিল।

ঠিক সেইসময়েই বিষ্ণুচরণ-চরিত্রে আর একটি জিনিসও মাথা চাড়া দিতেছিল ক্রমশঃ। লোভ। অর্থলোভ। অগ্নি যখন ভস্মাচ্ছাদিত থাকিয়া ম্রিয়মাণ থাকেন তখন তাঁহার জ্যোতির্ময় রূপটা লোকের চোখে পড়ে না। কিন্তু একবার যদি তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া ঘৃতাহুতি দেওয়া যায়, অমনি তাঁহার শিখা লেলিহান হইয়া ওঠে, সাধারণ লোকের চোখ ধাঁধিয়া যায়। অনেকের জীবনেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে, বিষ্ণুচরণের জীবনেও ঘটিল। অগ্নির জ্যোতির্ময় রূপে মুগ্ধ হইয়া সে ক্রমাগত ঘৃতসংগ্রহে মন দিল। সে যখন সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলে ছিল, যখন সামান্য একটা ছিটের জামা বা নূতন জুতা তাহার মনে স্বর্গসুখ আনয়ন করিত, তখন লোভের প্রচণ্ড প্রভাব তাহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে নাই। অর্থের প্রয়োজন সে অনুভব করিত, অর্থাভাবে কষ্ট পাইত, অর্থলাভ করিতে পারিলে আনন্দিতও হইত, কিন্তু অর্থের লোভে ক্লিষ্ট হইয়া সে কখনও বিনিদ্র রজনী যাপন করে নাই, অপরের বিপুল বিভব দেখিয়া তাহার চিত্ত কখনও পীড়িত হয় নাই। এ সব হইতে শুরু করিল যখন প্রয়োজনের অধিক অর্থ তাহার হাতে আসিয়া জমিতে লাগিল। চন্দ্রলেখার বাবার প্রচুর অর্থই যে তাহাদের মধ্যে ব্যবধানসৃষ্টি করিযাছে, এই অর্থের জোরেই যে তিনি অতবড় একটা ব্যঙ্গোক্তি করিতে সাহস করিয়াছেন, এই ধারণা তাহার মনে দৃঢ় হওয়াতে সে আরও অর্থ উপার্জনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। সে যে বামন নয়, চন্দ্রলেখাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার যোগ্যতা যে তাহার থাকিতে পারে এ কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য সে যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল—যেমন করিয়া হোক ধনী হইতে হইবে।

নূর মহম্মদের মৃত ভ্রাতা আলিজানের জমিটা বাকী খাজনার দায়ে নীলামে উঠিয়াছিল, নূর মহম্মদের সহিত পাল্লা দিয়া বিষ্ণুচরণ টাকার জোরে সে জমিটা ডাকিয়া লইল। বহু জেলেকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বিষ্ণুচরণ সুদের টাকায় শুধু যে বিনা-মূল্যে মাছ খাইতে লাগিল তাহা নয়, অনেকগুলি ধীবর পরিবারকে দাসানুদাস করিয়া ফেলিল। অনেক মজুরকেও অসময়ে সে টাকা ধার দিত, কিন্তু তাহা তাহাদের উপকারার্থে নয়, তাহাদের ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য। মজুরেরা বিনা মজুরিতে কিংবা কম মজুরিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খাটিয়া চক্রবৃদ্ধি-হারে-

বর্ধিত-ঋণ শোধ করিত পারিত না। পাটের ব্যবসাতেও টাকার জোরে সে অনেক ছোটখাটো ব্যবসায়ীর মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইতে লাগিল। তবু তাহার শান্তি ছিল না, রাত্রে নিদ্রাও হইত না। কারণ সে সর্বদাই অনুভব করিত চন্দ্রলেখার পিতার মতো ঐশ্বর্য তাহার হয় নাই। শুধু চন্দ্রলেখার পিতা কেন, অনেকেই তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ধনী, বেশী মানী। অনেকেরই কলিকাতায় বাড়ি আছে, রাঁচিতে বাড়ি আছে, কাশীতে বাড়ি আছে, অনেকে রায়বাহাদুর খেতাব পাইয়াছে, বিলাতের বড় বড় ব্যবসায়ীর সহিত লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করিয়া অনেকেই হু হু করিয়া কোটিপতি, অর্বুদপতি হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাহার একটা মোটরগাড়ি পর্যন্ত নাই, এখানেই এখনও পর্যন্ত একটা পাকা ইমারত সে বানাইতে পারিল না। চন্দ্রলেখার বাবা সব দিক দিয়াই লক্ষ্মীমন্ত। যেমন বাড়ি, তেমন গাড়ি, তেমনি ছেলেমেয়েগুলি, তেমনি বউ। বিষ্ণুচরণের বুক ফাটিয়া যাইত।

এই অবস্থায় বিধুভূষণের সহিত তাহার আলাপ হইল। কিছুদিন আলাপের পরই বুঝিল যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া বিধুভূষণ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিধুভূষণের বৈষয়িক কৃতিত্ব আরও প্রশংসনীয়। ফতুয়া-গায়ে আধময়লা-কাপড় পরা লোকটি বহু লক্ষ টাকার মালিক। বিষ্ণুচরণ শ্রদ্ধায় বিগলিত হইল। সবিনয়ে তাঁহাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিল এবং ক্রমশঃ "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। ইহাতে ফলও হইল। বিধুভূষণের অর্থানুকূল্যে ক্রমশঃ বিষ্ণুচরণ পাটের ব্যবসায়ে যেরকম লাভ করিতে লাগিল তাহা সত্যই আশাতীত। কলিকাতায় বাড়ি কিনিল। একটা মোটরগাড়িও হয়ত কিনিয়া ফেলিত কিন্তু বিধুভূষণ বাধা দিলেন। বলিলেন, "দেখ ভাই, বেশী বাহ্যাড়ম্বর ভালো নয়! ওতে লোকের চোখ টাটায়, ব্যবসার সুবিধা হয় না। পাচজনকে তুষ্ট রাখলে পরেই লক্ষ্মী ঘরে আসেন। তাও আসেন চুপি চুপি, হৈ-হল্লা ভালবাসেন না তিনি। মোটর কিনে কি হবে এখন? কোলকাতায় আরও খানকয়েক বাড়ি কেন, তারপর ও সব কথা ভেব। এখন নয়। মোটর কিনলে মাসে দু'শ টাকা খরচ। ও সব বাবুয়ানি করবার সময় এখন নয়।"

বিধুভূষণকে চটাইবার সাহস বিষ্ণুচরণের ছিল না। মোটর কেনা হইল না।

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পৈশাচিক লীলা শুরু হইয়া গেল ঠিক ইহার কিছুদিন পরেই। কিছু যে একটা ঘটিবে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে 'কিছু'টার চেহারা যে এমন ভয়ঙ্কর হইবে তাহা বিষ্ণুচরণ অনুমান করিতে পারে নাই। কেহই পারে নাই। ঝটিকার মতো দ্রুতবেগে এবং ব্যাপকভাবে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। সহসা বিষ্ণুচরণকে আবিষ্কার করিতে হইল যে সে হিন্দু বলিয়াই সকলের শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। আশ-পাশের গ্রামে মৌলভীরা মীটিং করিয়া 'জিগির' দিতে লাগিল যে ইসলামকে রক্ষা করিতে হইলে কাফেরকে বধ করিতে হইবে। কয়েকজন পরিচিত হিন্দুর বাড়িতে আগুন লাগিয়া গেল, প্রকাশ্যে গো-বধ হইতে লাগিল, শোনা গেল কয়েকটি হিন্দু পরিবার সম্পূর্ণরূপে

নিহত হইয়াছে। বিষ্ণুচরণের পরিচিত যে সব মুসলমান ছোকরা পূর্বে তাহার সামনে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিত না, দেখা গেল তাহারাই নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারাই একদিন সদলবলে আসিয়া বিষ্ণুচরণের বাড়িতে হাজির হইল। বিষ্ণুচরণকে প্রথমে আশ্বাস দিল তাহারা। বলিল বিষ্ণুচরণকে বা কোন ভাল লোককে বিব্রত করা তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাহারা কেবল অত্যাচারী হিন্দুদের দমন করিতে চায়! পাশের গাঁয়ের জমিদারটি অতিশয় দর্পী এবং অত্যাচারী। এই লোকটিকে শিক্ষা দিবে বলিয়া তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তাহাকে সবংশে নিধন করা এবং তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করা। এই মহৎ কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য তাহারা বিষ্ণুচরণের সাহায্য প্রার্থনা করিল।

"কোন্ জমিদার ?"

"চন্দ্রলেখার বাবা।"

বিষ্ণুচরণ নির্বাক হইয়া রহিল। তাহার অন্তরের পুরাতন ক্ষতটা সহসা রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

"চন্দ্রলেখাকেও মেরে ফেলবে ?"

"ওকে ধরে বিয়ে করব, মারব কেন ?"

"কে বিয়ে করবে ?"

"যদি চাও তুমিই করতে পার। তুমি না চাও আর কেউ করবে। ওকে মারব না।"

বিষ্ণুচরণ আবার নির্বাক হইয়া গেল। লোকটার ঐশ্বর্য-আস্ফালন অনেকদিন হইতেই তাহার চিত্তকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দ্রুত ধাবমান মোটরগাড়িটা বহুদিন তাহার গায়ে কাদার ছিটা দিয়া গিয়াছে। বামন-চাঁদের উপমাটাও মনে পড়িল। লোকটার উদ্ধত মাথাটাকে পায়ের তলায় গুঁড়াইয়া দিবার সুযোগ যখন মিলিয়াছে তখন সেটা ছাড়া উচিত কি ? তা ছাড়া আর একটা কথা। সে যদি ইহাদের সহায়তা করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে সে নিজেই যে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাদের ভাবভঙ্গী ভাল নয়। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে অবশেষে প্রতিশ্রুতি দিল যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। দুষ্টের দমন তো করাই উচিত।

"আমাকে কি করতে হবে বল—"

"লোকটার বন্দুক আছে, তাই আমরা ভয় পাচ্ছি। তুমি এক কাজ কর। তুমি ভয়ের ভান করে তার বাড়িতে গিয়ে সপরিবারে আশ্রয় নাও। এমন একটা ভান কর যেন আমাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তুমি তার আশ্রয় চাইছ। তুমি ওখানে গিয়ে আড্ডা গাড়বার পর আমরা একদিন গিয়ে হাজির হব। পারো তো বন্দুকটা সরিয়ে ফেলো। আর তা যদি না পার বাড়ির গেটটা তো খুলে দিতে পারবে। আমরা যদি পিল পিল করে একসঙ্গে ঢুকে পড়তে পারি তখন একটা বন্দুক দিয়ে ও আর কি করবে—"

শিবানী কিন্তু বাঁকিয়া বসিল। বিষ্ণুচরণ শিবানীকে সব কথা খুলিয়াও বলে নাই, তবু সে যাইতে আপত্তি করিল।

বলিল, "নিজেদের বাড়ি ছেড়ে তাদের বাড়িতে যাব কেন? ওদের সঙ্গে তোমার মনের মিল নেই, আমি ওদের বাড়ির কাউকে চিনি না, ওখানে কি যাওয়া যায়? যদি পালাতেই চাও কোলকাতায় চল—"

"সেখানে ভীষণ কাণ্ড চলছে।"

"তা হলে আমাদের বাড়ি বর্ধমানে চল।"

বিষ্ণুচরণ চটিয়া উঠিল।

"যাবে কোন্ দিক দিয়ে? যাওয়ার সব পথ যে বন্ধ। সব ঘাঁটি আগলে বসে আছে ওরা। একটি হিন্দুকে বেরুতে দেবে না।"

"তা হলে নিজের ভিটে আঁকড়েই মরব। কোথাও যাব না।"

শিবানীর আপত্তি কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকিল না। ইহার কারণ বিষ্ণুচরণ স্বামী এবং শিবানী তাহার সতী স্ত্রী। শিবানী যখন বুঝিল যে বিষ্ণুচরণকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাইবে না, তখন সে হিন্দু স্ত্রীর চিরন্তন আদর্শ অনুসারে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করিল। গত্যন্তর ছিল না।

…গভীর রাত্রে গরুর গাড়িতে নিজেদের জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া তাহারা জমিদারবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। চতুর্দিকে জনমানবের কোন সাড়া নেই, ঝিল্লী পর্যন্ত ডাকিতেছে না। শিশুপুত্রটিকে কোলে লইয়া শিবানী পাষাণ-প্রতিমার মতো বসিয়াছিল। কোথায় চলিয়াছে সে! এটা গ্রামের পথ, না শ্মশান!

কিছুক্ষণ পরে তাহারা জমিদারবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটা যেন দৈত্যের মত্যে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। জনপ্রাণীর সাড়া নাই। গেটটা ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু তালা-বন্ধ নয়। গাড়োয়ান পাঁচিলে চড়িয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল এবং অনায়াসেই গেটটা খুলিয়া দিল। কেহ কোনও প্রতিবাদ করিল না, একটা সাড়াশব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

গাড়োয়ান হাসিয়া বলিল, "সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আপনারা বারান্দায় উঠে বসুন। কাল সকালে দেখা হবে—"

শিবানী সভয়ে বলিল, "ওদের শুনেছিলাম বড় বড় বিলিতি কুকুর আছে। একটাও তো দেখছি না—"

গাড়োয়ান আর একটু হাসিয়া জবাব দিল,—"বড়লোকের কুকুরও বড়লোক মা-ঠান। তারা কি পাহারা দেয়! তারাও রাত্তিরে গদীতে শুয়ে ঘুমোয়।"

গাড়োয়ানের নির্দেশ-অনুসারে বিষ্ণুচরণকে অবশেষে সপরিবারে বারান্দাতেই আশ্রয় লইতে হইল। জমিদারবাড়ির কাহাকেও জাগাইতে তাহাদের সাহস হইল না, নিজেরাই সারারাত জাগিয়া রহিল। কল্পনাতীত বলিয়া একটা জিনিস তাহারা লক্ষ্য

করিতে পারে নাই। গাড়োয়ান জাফর যাইবার সময় গেটটি বাহির হইতে তালা-বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল! এই জাফরকে বিষ্ণুচরণ অল্প সুদে টাকা দিয়া অনেক সাহায্য করিয়াছিল একদিন। সে যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এ আশঙ্কা তাহার মনে একবারও জাগে নাই। প্রভাতে উঠিয়া তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। খবর পাইল জমিদারবাবু নিজের সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া সপরিবারে অনেক আগেই পলায়ন করিয়াছেন। বাড়িতে একটি লোকও নাই। কাকাতুয়াটা পর্যন্ত লইয়া গিয়াছেন তাঁহারা। তাঁহারই এক মুসলমান চাকর আসিয়া সংবাদটি দিল। অনেকদিন আগেই তিনি দাঙ্গার আভাস পাইয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে মালপত্র সরাইয়া ফেলিতেছিলেন। তাঁহার অনুগত মুসলমান প্রজারাই তাঁহাকে এ বিষয়ে নাকি সাহায্য করিয়াছিল। দাঙ্গার অব্যবহিত পূর্বে তিনি মোটরযোগে সরিয়া পড়িয়াছেন।

কিছুক্ষণ পরেই বিষ্ণুচরণের স্থির-চক্ষু কপালে উঠিল যখন ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতা আসিয়া বাড়ি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। তাহাদের কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে রামদাও, কাহারও হাতে ছোরা। জনতার নেতা গেটের সামনে আসিয়া পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই যে, তাহাদের ধারণা হইয়াছে বিষ্ণুচরণই বিশ্বাসঘাতক। সে-ই নিশ্চয় গোপনে গোপনে সংবাদ দিয়াছিল তাই হিন্দু জমিদারবাবু পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন, নতুবা ইহা সম্ভব হইত না। সুতরাং বিষ্ণুচরণের উপরই তাহারা প্রতিশোধ লইবে। গেট খুলিয়া দলে দলে লোক ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বিষ্ণুচরণ লক্ষ্য করিল—অধিকাংশই তাহার খাতক।

সে কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "ভগবান সাক্ষী, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি তোমাদেরই দলের লোক।"

"বিশ্বাস করি না সে কথা।"

"জবাই কর হালাকে" জনতার ভিতর হইতে একজন চিৎকার করিয়া উঠিল। লোকটা একজন মৎস্যব্যবসায়ী, কিছুদিন পূর্বেই সে বিষ্ণুর নিকট টাকা ধার লইয়াছিল। এখনও একটি পয়সা শোধ দেয় নাই।

"তোমরা কি আমাকে প্রাণে মারতে চাও?"

প্রশ্নটা শুনিয়া জনতা স্তব্ধ হইয়া গেল সহসা। যে লোকটা আপদেবিপদে এতকাল টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছে তাহাকে হত্যা করা হইবে কি না এই প্রশ্নটা তাহাদেরও যেন ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিল। দলের নেতাটি ক্ষণকাল পরে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তোমাকে প্রাণে মারার ইচ্ছে নেই দাদা। কিন্তু তুমি যে আমাদের আপন লোক সেটাই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে কেবল।"

"কি করতে হবে বল।"

"মুসলমান হতে হবে। যদি মুসলমান হও, তোমাকেই দলপতি করব আমরা। আর তা যদি না হও তাহলে—"

শিবানী অপ্রত্যাশিতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল সহসা।

"আমি কিছুতেই মুসলমান হব না।"

জনতা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। অশ্লীল ইঙ্গিতও করিল কে একজন। শিবানী কানে আঙুল দিল।

বিষ্ণুচরণ নীরব হইয়া গিয়াছিল। ভাবিতেছিল কি করা উচিত। সহসা ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে সহসা-প্রক্ষিপ্ত একটা আলোকরেখা তাহাকে যেন পথনির্দেশ করিতেছিল। যে শত্রুকে উচ্ছেদ করিতে আসিয়াছিল সে শত্রু ফাঁকি দিয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সহসা মনে হইল ওই লোকটাকে জব্দ করিবার জন্যই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তা ছাড়া বাঁচিয়া থাকাটাই কি সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়? আগে জীবন, তাহার পর ধর্ম। তা ছাড়া এই যে লোকগুলো আজ তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে ইহাদের প্রত্যেকেই কি তাহার কাছে উপকৃত নয়? ইহাদের স্বরূপ তো চেনা গেল। ইহাদের শাস্তিবিধান করিবার জন্যও বাঁচিতে হইবে। মরিয়া গেলে তো সব ফুরাইয়া গেল, তাহাতে লাভটা কি?

বিষ্ণুচরণ নিজের মনকে শক্ত করিবার জন্য বারম্বার নিজেকে বুঝাইতে লাগিল এই জীবন-মরণ-সমস্যায় দুর্বল হইলে চলিবে না। বাঁচাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

শিবানীকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গেল, তাহার যুক্তিটা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অবুঝ শিবানী কোনও যুক্তিই শুনিল না। একটি কথাই সে বারম্বার বলিতে লাগিল, "প্রাণের চেয়ে মান বড়, ধর্ম বড়। এ কথা তুমি উচ্চারণও কোরো না—"।

শিবানীর কথায় বিষ্ণুচরণের মন টলিয়া গেল একটু। দ্বিধায় পড়িয়া গেল সে। শিবানীর সহায়তা পাইয়া তাহার বিবেকও তাহাকে বলিতে লাগিল, "ছি, ছি, পিতৃপুরুষের ধর্মটা বিসর্জন দিবে? উহাদের একটু বুঝাইয়া বলিলে হয়তো শুনিবে।"

দোলায়মানচিত্তে পুনরায় সে জনতার সম্মুখীন হইল।

"কি ঠিক করলে—"

দলপতি আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল।

"এখনও ঠিক করতে পারিনি কিছু। আমার বউ রাজি হচ্ছে না।"

"তাকে জবরদস্তি রাজি করতে হবে। গোবিন্দ পুরুতের বউও প্রথমে রাজি হয়নি। এখন দিব্যি গোস্ত, রুটি খাচ্ছে। তোমার বউও খাবে।"

"আরো একটু সময় দাও আমাকে।"

"সময় দিতে পারব না। অনেক জায়গায় যেতে হবে আমাদের।"

বিষ্ণুচরণ সত্যই কয়েকমুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নির্বাক হইয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার নীচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চোখ তুলিয়া

চাহিতে পারিল না। কিন্তু যখন চাহিল নজরে পড়িল গেটের বাহিরে নিয়ামত আলীর বিধবা ফতিমা দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন কাতর মিনতি-পূর্ণ একটা মৌন প্রত্যাশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছে—যে সব দুস্তর বাধা-বিঘ্ন আমাদের সুখের পথে এতকাল অন্তরায় হইয়াছিল তাহা তো এইবার অপসারিত হইতে চলিয়াছে, তবে তুমি ইতস্তত করিতেছ কেন ?

বিষ্ণুচরণ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। আর তাহার কোন দ্বিধা রহিল না।

বলিল, 'আমি মুসলমান হব। তোমরা সব ব্যবস্থা করে ফেল—"

শিবানী একটু দূরে শিশুপুত্রটিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কথাটা তাহার কানে গেল।

'অ্যাঁ, বল কি, মুসলমান হবে তুমি—"

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল সে এবং পরমুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া যে কাণ্ড করিল তাহা অপ্রত্যাশিত। নিকটে একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা ছিল, ছুটিয়া গিয়া তাহার ভিতর লাফ দিয়া পড়িল সে।

একটু পরে যখন তাহাকে তোলা হইল তখন বোঝা গেল জোর করিয়া তাহাকে কিম্বা তাহার শিশুপুত্রটিকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা যাইবে না। দুইজনেই মারা গিয়াছে। বিষ্ণুচরণ নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইতেছিল না। সমস্ত মুখটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। নির্নিমেষে সে শিবানীর মৃত-দেহটার দিকে চাহিয়াছিল। মরিবার সময়ও নিজের সন্তানকে সে ছাড়ে নাই, প্রাণপণে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

কয়েকদিন পরেই বিষ্ণুচরণ জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইল।

জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ণুচরণ কিন্তু শান্তি পাইল না। অনেক লোকের স্বাভাবিক রূপ থাকে—প্রসাধনের প্রয়োজন হয় না, অনেকের গান গাহিবার স্বাভাবিক গলা থাকে—সাধিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি অনেকের যে-কোন অবস্থায় শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, শান্তির সন্ধানে তাহাদের ছটফট করিয়া বেড়াইতে হয় না। বিষ্ণুচরণের এরূপ স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল না। সে শান্তির সন্ধানে ধর্মত্যাগ করিল, কিন্তু শান্তি পাইল না। ঐহিক সুখ-সুবিধা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সে পাইল বটে, তাহার বসতবাটি, বিষয়-সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইল না, তাহার দোকান অটুট রহিল, পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মৌলভীগণ তাহাকে অভিনন্দিতও করিলেন, কিন্তু শান্তি সে পাইল না। ফতিমাকেও পাইল না। জনৈক খাঁটি মুসলমান ভদ্রলোকই নিয়ামত আলির রূপসী বিধবাটিকেও নিকা করিলেন। এ বিষয়ে ফতিমার বা জমিরুদ্দিনের অভিমতকে বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ কেহ দিল না। কারণ ফতিমা অথবা জমিরুদ্দিন কেহই নিজের দুর্বলতা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতেই পারিল না। বলিতে পারিলেই যে সুফল ফলিত তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কারণ একটা

জিনিস বিষ্ণুচরণ অনুভব করিতেছিল, মুসলমান হইয়াও সে মুসলমান সমাজের অন্তর-লোকে স্থান পায় নাই। সে যে প্রাণের ভয়ে বিষয়সম্পত্তি বাঁচাইবার জন্ত ইসলামধর্ম বরণ করিয়াছে, এই সত্যটার আলোক তাহাকে যে মূর্তিতে সকলের নিকট প্রকটিত করিয়া দিল তাহা সম্মানার্হ নহে, শান্তিজনক তো নহেই। পরিচিত মুসলমানেরা তাহাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া হাসিত। ফতিমার এক ভাই তাহাকে একদিন বলিল, "দাদা-ঠাকুর, আপনি নূর রাখুন, তা নাহলে ঠিক মানাচ্ছে না।"—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বিষ্ণুচরণের কিছু করিবার উপায় ছিল না! একটু শুধু মুচকি হাসিত। তাহার মুচকি হাসিটা মুখোশের হাসির মতো অবশেষে তাহার মুখের উপর কায়েমী আসন পাতিয়া বসিয়া গেল।

বিষ্ণুচরণ রাত্রে নানারূপ বিকট স্বপ্নও দেখিতে লাগিল প্রায় প্রত্যহ। একদিন দেখিল প্রকাণ্ড একটা রক্তের সমুদ্রে পিতা ভবনাথ হাবুডুবু খাইতেছেন, আশেপাশে অসংখ্য শব ভাসিতেছে। শিবানী এবং তাহার শিশুপুত্রটিও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। শিবানীর চোখদুইটা যেন আতঙ্কে, বিস্ময়ে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। আর একটা ব্যাপারও ক্রমশ তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গভীর রাত্রে তাহার বাড়ীর উঠানে কে যেন কাঁদে, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে, সে কতদিন রাত্রে উঠিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। ঘরের ভিতর ঢুকিলেই কিন্তু কান্নাটা আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে। লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িলেই কান্নাটা থামিয়া যায়, ঘরে ঢুকিলেই শোনা যায়। কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে, আবার শুরু হয়। বিষ্ণুচরণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। ইহা ছাড়া আর একটা ঘটনা ঘটিল যাহা তাহাকে গ্রামত্যাগ করিতে বাধ্য করিল।

গভীর রাত্রে প্রায়ই সে উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া থাকিত। বোধ হয় কান্নাটা শুনিবার জন্তই। একদিন রাত্রে খিড়কির দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনিয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল দ্বারে কে যেন করাঘাতও করিতেছে। তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালিয়া উঠানে বাহির হইল। বাহির হইয়া উঠানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে খানিকক্ষণ। পুনরায় কড়ানাড়ার শব্দ হইল। তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া গেল। এতরাত্রে কড়া নাড়িতেছে কে? পুনরায় শব্দ হইল। আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। আগাইয়া গিয়া কপাট খুলিয়া দিল। দেখিল আপাদমস্তক বোরখাঢাকা এক মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। বোরখার মুখের ঢাকনাটা খুলিয়া গেল। বিষ্ণুচরণ সবিস্ময়ে দেখিল—ফতিমা!

ফতিমা এদিক ওদিক চাহিয়া চুপিচুপি বলিল, "বিষ্ণুদা, তুমি পালাও এখান থেকে। তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। অনেকে বলছে তুমি বিশ্বাসঘাতক, মুসলমানদের বিপদে ফেলবার জন্তেই মুসলমান হয়েছ। অনেকগুলো গুণ্ডাও আছে সে

দলে। খবরটা তাই লুকিয়ে তোমাকে বলে গেলাম। ওরা কখন যে কি করবে তা বলা যায় না। তুমি গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে যাও।"

"কি হয়েছে ? কে ষড়যন্ত্র করছে—"

"অতকথা বলবার সময় নেই। মোটকথা, তুমি এখন এখানে থেক না, চলে যাও।"

"যাব কোথা ?"

"ঢাকায় যাও। সেখানে রহমন আছে। কোলকাতায় যাও না, সেখানে তুমি তিনখানা বাড়ি কিনেছিলে, সেগুলো আছে তো।"

"আছে। সেখানে বিষ্ণুচরণ গিয়ে বাস করতে পারত, কিন্তু জমিরুদ্দিন পারবে না। কোলকাতায় যে কাণ্ড হচ্ছে শুনেছি—"

"তাহলে ঢাকায় যাও। রহমনের কাছে আশ্রয় নাও গিয়ে, সে ঠিক তোমাকে সাহায্য করবে। আমি লুকিয়ে এসেছি, আর দাঁড়াব না, যাই—"

ফতিমা চলিয়া গেল। বিষ্ণুচরণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। লণ্ঠনটায় তেল ছিল না, সেটাও নিবিয়া গেল। সেই অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া বিষ্ণুচরণ সহসা অনুভব করিল সে সর্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেহ নাই, ধর্ম গিয়াছে, বিষয়সম্পত্তিও নিরাপদ নহে। ফতিমাও তাহার হইল না, চিরকালের মতো সে নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর হয়ত তাহার সহিত দেখাও হইবে না!

রহমন সত্যই বিষ্ণুচরণের সহিত সদ্ব্যবহার করিল। তাহাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল, নানারূপ সৎপরামর্শও দিল। তাহাকে পাকাপাকিভাবে মুসলমান সমাজভুক্ত করিয়া ফেলিবার জন্য তার বিবাহের বন্দোবস্ত সে-ই করিল। একদিন আসিয়া বলিল, পশ্চিম হইতে কতকগুলি অনাথা মুসলমান মেয়ে ঢাকায় পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারা সকলে গভর্নমেণ্টের খরচায় রেফিউজি ক্যাম্পে রহিয়াছে, গভর্নমেণ্ট তাহাদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বিষ্ণুচরণ যদি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইবেন এবং একটু তদ্বির করিলে বিষ্ণুচরণ ওরফে জমিরুদ্দিন পাকিস্তান সরকারে একটি ভাল চাকুরিও হয়তো পাইয়া যাইবে। রহমন নিম্নকণ্ঠে একথাও তাহাকে জানাইল সে খবর লইয়াছে, জুবেদা-নাম্নী মেয়েটি ভদ্রবংশীয়া। মেয়েটি যে সুন্দরী তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, কারণ এ বিষয়ে সে প্রত্যক্ষদর্শী। মাত্র এক লহমার জন্য সে জুবেদাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল; তাহার ধারণা জুবেদা সত্যই জমিরুদ্দিনের অর্ধাঙ্গিনী হইবার যোগ্যা। রহমনকে অসন্তুষ্ট করিবার সাহস বিষ্ণুচরণ সংগ্রহ করিতে পারিল না—রাজি হইল। রহমনও উৎসাহিত হইয়া জুবেদার সম্বন্ধে আরও খবর সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং বিবাহের প্রস্তাবটা যথাস্থানে পেশ করিয়া দিল।

রহমনই একদিন নবেন্দু বিশ্বাসকেও আনিয়া হাজির করিল। বলিল, এ ভদ্রলোকের এখানে বাড়ি আছে, জমিদারী আছে। ইনি সেগুলো এক্সচেঞ্জ করতে চান। আপনার কোলকাতায় তিনখানা বাড়ি আছে তো। বদলা-বদলি করে ফেলুন এঁর সঙ্গে। ইনিও ক্যালকাটা প্রপার্টি খুঁজছেন। আপনি যদি রাজি থাকেন আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। দু'জনেরই সুবিধে হবে এতে—"

বিষ্ণুচরণের গত্যন্তর ছিল না। তাহাকে বিবাহও করিতে হইল, সম্পত্তিও বদল করিতে হইল। রহমন সত্যসত্যই তাহার সুবিধাও করিয়া দিল অনেক। সে খবর সংগ্রহ করিল যে জুবেদা অনাথিনী বটে, কিন্তু বিধবা নয়, কুমারী। দাঙ্গায় সে পিতৃহীনা হইয়াছে। তাহার পিতা মেহের আলি আধুনিকরুচিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাটিকে বাল্যকালেই হারেমে পুরিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। মেয়েটি কলেজে পড়িতেছিল। কিন্তু সর্বনাশা দাঙ্গার ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া মেহের আলি প্রাণ হারাইয়াছিলেন। জুবেদাকে পলায়ন করিয়া প্রাণ ও মানরক্ষা করিতে হইল। তাহার পলায়নের ইতিহাস মর্মান্তিক।

জুবেদা মেয়েটি সত্যই খুব ভাল। স্বভাব অতি শান্ত, অতি মৃদু, অতি মিষ্ট। আকস্মিক এই পরিস্থিতিতে বেচারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্নমেণ্টও তাহাকে লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ তাহার আত্মীয়স্বজনের কোন খবর তাঁহারা পাইতেছিলেন না। তাহার নিকট-আত্মীয় কেহ ছিলও না। আবদুল গফ্ফর খাঁর একজন ভক্ত ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হোসেন খাঁর সহিত তাহার আলাপ ছিল, মেহের আলির ইচ্ছা ছিল হোসেন খাঁর সহিত জুবেদার বিবাহও দিবেন—কিন্তু দাঙ্গার জন্য সব গোলমাল হইয়া গেল। হোসেন খাঁ হয়তো বাঁচিয়া আছে, হয়তো নাই। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে জুবেদা হোসেন খাঁর নাম বলিল না, তাহার লজ্জা হইল।

জমিরুদ্দিনের সহিত বিবাহের প্রস্তাবটা জুবেদার নিকট আসিবার পূর্বে আরও গোটাতিনেক বিবাহের প্রস্তাব তাহার নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু জুবেদা সেগুলি গ্রাহ্য করে নাই। কারণ তিনজনেরই একাধিক পত্নী বর্তমান ছিল, তিনজনেই প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাছাড়া আধুনিক যুগের কলেজী শিক্ষা কাহারও ছিল না। কর্তৃপক্ষও জুবেদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জমিরুদ্দিনের সহিত বিবাহের প্রস্তাবটি যখন আসিল তখনও জুবেদা একটু বিব্রতবোধ করিতে লাগিল। জমিরুদ্দিনকেও তাহার পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহার মনে হইল, এভাবে গভর্নমেণ্টের স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকা অপেক্ষা বিবাহ করা ভাল। জমিরুদ্দিনের প্রতি তাহার অনুকম্পাও হইল। সে অনুভব করিল—ও বেচারাও আমারই মতো বিপন্ন। দাঙ্গায় যথাসর্বস্ব গিয়াছে, প্রাণটি বাঁচাইবার জন্য বিবাহ করিতে চাহিতেছে। বিবাহ করিলে গভর্নমেণ্টের সাহায্য পাইবে, গভর্নমেণ্ট সে প্রতিশ্রুতিও নাকি তাহাকে দিয়াছে। অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া জুবেদা শেষে রাজি হইয়া গেল। গভর্নমেণ্টকে একটি

অনুরোধ সে কেবল করিল। বিবাহের পর গভর্নমেণ্ট জমিরুদ্দিনকে যদি পশ্চিম পাকিস্তানে কোন চাকুরিতে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে জুবেদার সুবিধা হয়। কারণ বাল্যকাল হইতে পশ্চিম ভারতেই সে মানুষ হইয়াছে। মেহের আলি করাচী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায় করিতেন। শেষ বয়সে দিল্লীতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। গভর্নমেণ্ট এ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। একদিন জুবেদা খাতুনের সহিত জমিরুদ্দিনের বিবাহ হইয়া গেল।

কর্তৃপক্ষ জমিরুদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার অনেক সুবিধাও করিয়া দিলেন। চাকুরি তো দিলেনই, নবেন্দু বিশ্বাসের ব্যাপারেও এমন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যাহাতে জমিরুদ্দিনেরই ষোল আনা সুবিধা হইল। তাঁহারা নবেন্দু বিশ্বাসকে বলিলেন যে তাহার বাড়ি ও বিষয়সম্পত্তি জুবেদা খাতুনকে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহার নামেই দলিল-পত্রাদি রচিত হইবে। মূল্যস্বরূপ তিনি বিষ্ণুচরণের কলিকাতার যে বাড়ি তিনখানি পাইবেন তাহার জন্য বিষ্ণুচরণ কলিকাতায় গিয়া পৃথক একটি বিক্রয়-দলিল লিখিয়া দিবেন। নবেন্দু বিশ্বাসের ইহাতে আপত্তি হইল না। বস্তুত, আপত্তি করিবার উপায়ও ছিল না। আপত্তি করিলে তাঁহার বিষয় বেদখল হইয়া যাইত। সুতরাং তিনি তাঁহার বাড়ি ও সম্পত্তি জুবেদা খাতুনকে নগদ মূল্য পাইয়া বিক্রয় করিতেছেন এই মর্মে দলিল লিখিয়া দিলেন। বিষ্ণুচরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিল যে সেও কলিকাতায় গিয়া উক্ত মূল্যে বাড়ি তিন-খানি নবেন্দু বিশ্বাসকে বিক্রয় করিতেছে এই মর্মে দলিলপত্র রেজেস্টারী করিয়া দিবে।

বিষ্ণুচরণের মৌখিক আশ্বাসটুকুমাত্র সম্বল করিয়া নবেন্দু বিশ্বাস কলিকাতায় ফিরিলেন এবং অবিলম্বে নিহত হইলেন।

চাকরির জন্য বিষ্ণুচরণ কখনও কলিকাতা, কখনও বোম্বাই, কখনও করাচী, কখনও দিল্লী যাতায়াত করিতে লাগিল। নবেন্দু বিশ্বাসের মৃত্যু-সংবাদটা যথাসময়ে তাহার কর্ণগোচর হইল। শোনা যায় সংবাদটা পাইয়া সে না কি বলিয়া উঠিয়াছিল—"খোদা মেহেরবান!"

কিন্তু এই নূতন জীবনের সহিত সে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারিল না। পারিলে হয়তো সে শান্তি পাইত। কিন্তু পারিল না। অতীতকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে না। অতীতের স্মৃতি, অতীতের সংস্কার, অতীতের বিবিধ বিচিত্র অনুভূতি মানুষের বর্তমানকে অমোঘভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। বিষ্ণুচরণ এ নিয়মের ব্যতি-ক্রম হইতে পারিল না। অতীতের স্মৃতি কিন্তু মধুর বা করুণরসে তাহার চিত্তকে নিষিক্ত করিল না। অতীতের যে সকল অনুভূতি তাহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা মধুর নহে, তিক্ত; তাহা বঞ্চিত, অপমানিত, বিধ্বস্ত মনুষ্যত্বের অসহায়, ভাষাহীন ক্ষোভের হলাহলে বিষাক্ত। মহত্ত্ব, প্রেম বা অনুকম্পার লেশমাত্র ছিল না তাহাতে। হিন্দু বা মুসলমান জাতির উপরও তাহার রাগ হয় নাই, রাগ হইয়াছিল নারীজাতির উপর।

সে ভাবিয়া দেখিল নারীরাই তাহাকে দাগা দিয়াছে। যে ফতিমাকে সে বাল্যকাল হইতে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে শেষ পর্যন্ত সে পাইল না কেন? যখন হিন্দু ছিল তখন সে আরও দূরে সরিয়া গেল। ফতিমা যদি ঠিক সেই মুহূর্তটিতে গেটের সামনে আসিয়া না দাঁড়াইত, তাহার চোখে-মুখে তখন সে যদি একটা আকুল উৎকণ্ঠা লক্ষ্য না করিত, তাহা হইলে বিষ্ণুচরণ হয়তো মুসলমানই হইত না। তাহারই জন্ত সে নিজের সমস্ত অতীতকে রসাতলে পাঠাইতে ইতস্তত করে নাই, অথচ সে আসিল না। সে ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিত না? বিষ্ণুচরণের বিশ্বাস, নিশ্চয় পারিত। সে বরণ করে নাই, সে বরণ করিবার সামান্ত ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করে নাই, তাহার কারণ যে ব্যক্তিকে সে বিবাহ করিয়াছে সে ধনে, মানে, মর্যাদায় বিষ্ণুচরণ অপেক্ষা অনেক বড়। স্ত্রীলোকমাত্রেই স্বার্থপর। তাহার পর ওই চন্দ্রলেখা। ও মেয়েটাও কি কম নাকি? তাহার সহিত যখন বিবাহের কথা হইয়াছিল তখন সে-ও নাকি বলিয়াছিল, "আমার তেল আর সাবানের খরচসংগ্রহ করতেই হিমসিম খেয়ে যাবেন, উনি চাইছেন আমাকে বিয়ে করতে!" বিশেষ করিয়া ওইকথা শোনার পর হইতেই তাহার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়াছিল। তাহাদের ওই সদম্ভ উক্তির জন্যই তো সে তাহাদের ষড়যন্ত্র করিয়া মুসলমান জনতার কবলে ফেলিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। সব পাজি, সব পাজি! শিবানীও কি কম স্বার্থপর? সেও তাহার দিকে তাকায় নাই। ধর্মটাই বড় হইল তাহার কাছে। স্বামীর চেয়ে কি ধর্ম বড়? হিন্দুশাস্ত্রে অন্তত এ কথা লেখে না।

কাহারও নিকট অর্থ বড়, কাহারও নিকট মর্যাদা বড়, কাহারও নিকট ধর্ম বড়। তাহার কোনই মূল্য নাই। জুবেদা-নাম্নী যে নারীটিকে সে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছে সে-ও অবশেষে আর এক ধরনের পেজোমির পরিচয় দিল। বেশ একটা জটিলতার সৃষ্টি করিল সে। যদিও বাঙালিনী (মেহের আলি নাকি বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাংলাদেশে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন) কিন্তু উত্তরপ্রদেশে মানুষ হওয়াতে তাহার চালচলন, কথাবার্তা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। উর্দু চমৎকার বলিতে পারে। বাংলাও বলে, কিন্তু মনে হয় যেন কেতাবী বুলি বলিতেছে। পূর্ববঙ্গের ভাষা বুঝিতেও পারে না, বলিতেও পারে না। অত্যন্ত আদব-কায়দা-দুরস্ত, অতিশয় ভদ্র, অতিশয় মৃদু-স্বভাব, তাহার উপর রূপসী এবং শিক্ষিতা, বিষ্ণুচরণ ইহাকে লইয়া যে কি করিয়া ঘর করিবে প্রথম প্রথম তাহা ভাবিয়া পায় নাই। তাহার সহধর্মিণীরূপে সে যে বেমানান, ইহা উপলব্ধি করিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। ইহা সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়াছিল যে বেগম-সদৃশা এই নিরুপমা নারীটিকে ঘরোয়া আটপৌরে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাহার অন্তত নাই। সুতরাং তাহাকে ঘিরিয়া প্রথম প্রথম যে মনোভাব তাহার অজ্ঞাতসারেই গড়িয়া উঠিল তাহা সম্ভ্রমাত্মক। জুবেদা যেন একজন মাননীয়া অতিথি, অথবা কোন মূল্যবান আসবাব, এই ধরনের ভাবভঙ্গী তাহার আচরণে প্রকাশ পাইতে

লাগিল। যে সমাজে বিষ্ণুচরণ (অথবা আমিরুদ্দিন) স্বাভাবিক, সে সমাজও জুবেদাকে ঠিকমতো গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার অতিমার্জিত [illegible] কাহারও ব্যঙ্গের, কাহারও বা ঈর্ষার খোরাক জোগাইতে লাগিল। কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইল, কেহ কেহ ইশারায়, ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে লাগিল যে বানরের গলায় মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া কর্তৃপক্ষ তো রসবোধের পরিচয় দেনই নাই, সুবুদ্ধিরও পরিচয় দেন নাই। বিষ্ণুচরণ কি এ "চিড়িয়া"কে পুষিতে পারিবে? উহার জন্যই না আবার তাহার প্রাণ-সংশয় হয়! মোট কথা বিষ্ণুচরণ বেশ একটু বিপদে পড়িয়া গেল। কিন্তু ফতিমা, চন্দ্রলেখা, শিবানীর মতো জুবেদাও যে "পাজি" একথাটা প্রথমে সে ভাবিতেই পারে নাই। সহসা অপ্রত্যাশিত-ভাবে একদিন তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইল যে জুবেদাও শুধু পাজি নয়, খুব উঁচু-দরের পাজি। জুবেদা একদিনও তাহার সহিত একশয্যায় শয়ন করে নাই। বিষ্ণুচরণ মনে করিয়াছিল স্বাভাবিক লজ্জাই বোধ হয় ইহার কারণ। কালক্রমে উহা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু একদিন জুবেদা তাহাকে বলিল, "দেখুন, আমরা দুজনেই বিপদে পড়ে বাধ্য হয়ে পরস্পরকে বিয়ে করেছি। আপনি ধর্মত্যাগ করেছেন বাধ্য হয়ে, আমি দেশত্যাগ করেছি বাধ্য হয়ে। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে পড়ে সমস্ত দেশটাই উলটে পালটে গেছে। কিন্তু এখন অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। এখন ইচ্ছে করলে আমরা এই অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। আপনি অনায়াসে আমাকে তালাক দিয়ে মনোমত বিয়ে করতে পারেন, আমিও নিজের দেশে ফিরে যেতে পারি।"

"দেশে গিয়ে তুমি থাকবে কোথা?"

"তার ব্যবস্থা একটা করেছি। এই দেখুন।"

জুবেদা যে বি. এ. পাস বিষ্ণুচরণ তাহা জনিত না। জুবেদা যাহা দেখাইল তাহা একটি নিয়োগ-পত্র। তাহাতে লেখা রহিয়াছে যে করাচীর কাছাকাছি একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে জুবেদা খাতুন বি. এ. মাসিক দুইশত টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। নিয়োগপত্রটির দিকে চাহিয়া বিষ্ণুচরণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

"কবে তুমি এ দরখাস্ত করেছিলে?"

"মাসখানেক আগে।"

"সত্যিই তুমি চাকরি করতে চাও?"

"স্বাধীনভাবে উপার্জন করাই তো ভাল। আপনি যে কাজ পেয়েছেন তাতে করাচীতে মাঝে মাঝে আপনাকে যেতেই হবে, আমিও যদি ওই অঞ্চলে চাকরি করি, আপনার সঙ্গে দেখা-শোনা হবে। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। এখানে কারও সঙ্গে খাপ খাবে না আমাদের। আপনার তো খাবেই না।"

বিষ্ণুচরণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অধরপ্রান্ত ক্ষণিকের জন্য একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র।

"তুমি আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে চাও না?"

"আমাকে যদি ছেড়ে দেন, আমি খুশী হব। যদি না দেন আমার কিছু বলবার নেই অবশ্য, কারণ আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে বিয়ে করেছি। কেন সে ইচ্ছা করেছিলাম তাও আপনাকে জানিয়েছি। গভর্নমেন্টের অনুগৃহীত হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে। আমি ভেবেছিলাম বিয়ে করলে আমরা দু'জনেই মুক্তি পাব। মুক্তি পেয়েওছি। এখন আর বিয়েটাকে আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জুবেদা বলিল, "এই চাকরি আমি যদি আগে পেতাম তাহলে বিয়ে করতাম না।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিষ্ণুচরণ বলিল, "কিন্তু তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে চাই না"—কথাগুলি বলিয়াই সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল। কেন করিল তাহা সে নিজেও হয়ত বলিতে পারিত না। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে চাহিয়া জুবেদা মৃদুহাস্য করিল।

বলিল, "আপনার মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে কথাগুলো আপনি আনন্দের সঙ্গে বলছেন না!"

বিষ্ণুচরণের মুখে যে মুচকি হাসিটা স্থির হইয়া গিয়াছিল সেইটাকেই আর একটু প্রসারিত করিয়া সে বলিল, "আনন্দের সঙ্গে বলছি না, ভেবেচিন্তে বলছি। তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয় এখন। অন্য কোন পথ নেই। হিন্দু-সমাজে আর আমি ফিরতে পারব না, সে পথ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে—"

"কেন, শুদ্ধি করে' শুনেছি—"

"শুদ্ধি করে' আইনত হয়তো আমি হিন্দু হতে পারি কিন্তু সমাজের যে জায়গাটি ছেড়ে এসেছি, কোনও আইনই সেখানে আমাকে আর পৌঁছে দিতে পারবে না। মুসলমান হয়েও দেখছি আমার পরিচিত মুসলমান বন্ধুরা আমাকে ঠিক আপন করে নিতে পারে নি। আমি যে প্রাণের ভয়ে মুসলমান হয়েছি, আমি যে খাঁটি মুসলমান নই, একথাটা তারা ভুলতে পারছে না। তাদের কথাবার্তায়, তাদের চোখের দৃষ্টিতে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে। তুমি যা বলেছ তা ঠিকই। নূতন দেশে গিয়েই নূতন জীবন আরম্ভ করা ঠিক। কিন্তু তোমাকে যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে আমার করাচীর চাকরিও হয়তো থাকবে না। কারণ তোমার জন্যেই চাকরি। তাই তোমাকে এখন ছাড়তে পারব না।"

বলিয়া পুনরায় সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

জুবেদা বলিল, "বেশ, তাহলে একটা শর্ত থাকুক। আপনি যতদিন না স্বাধীনভাবে কোথাও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন, ততদিন আইনত আমি আপনার স্ত্রী থাকব। আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন—"

"বেশ, সে তখন দেখা যাবে।"

একসপ্তাহ পরে বিষ্ণুচরণ জুবেদাকে লইয়া করাচী চলিয়া গেল। জুবেদার কর্মস্থলে গিয়া দেখিল বন্দোবস্ত ভালই। জুবেদার জন্য কর্তৃপক্ষ যে কোয়ার্টার্স দিয়াছেন তাহা

মনোরম। পরিবেশও নূতন জীবন আরম্ভ করিবার উপযোগী। কিন্তু ইহা সে বুঝিয়াছিল যে এই পরিবেশে তাহার স্থান হইবে না। তাই জুবেদাকে সেখানে রাখিয়া ভাগ্য-অন্বেষণ-মানসে সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। নবেন্দু বিশ্বাসের মৃত্যুর খবরটা সে পাইয়াছিল, পাইয়া উল্লসিতও হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল। মনে হইল এত বড় একটা মিথ্যা আচরণের পাপ কি তাহার সহিবে? নবেন্দু বিশ্বাস সত্যই মরিয়াছে কি না তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার জন্য সে সংবাদসংগ্রহ করিতে লাগিল। নিঃসংশয় হইতে বিলম্বও হইল না। যে ভদ্রলোক ছুরিকাহত নবেন্দু বিশ্বাসকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার সহিতই বিষ্ণুচরণের দেখা হইয়া গেল। হাসপাতাল হইতেও সে সংবাদটার যাথার্থ যাচাই করিয়া লইল। হাসপাতাল হইতে ফিরিবার সময় ট্রামে বসিয়া এ চিন্তাও তাহার মনে উদিত হইল যে নবেন্দু বিশ্বাসের যদি কোনও উত্তরাধিকারী থাকে খোঁজ করিয়া তাঁহাকেই সে বাড়িগুলি লিখিয়া দিবে। ইহার জন্য পরদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দিবে ইহাও সে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া গেল। ট্রামের পিছন-দিকের কোণে সে বসিয়াছিল, সামনের দিকে নজর করে নাই। হঠাৎ সামনের একটা সিটে তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। চন্দ্রলেখা না? সেই পলাতক জমিদারবাবুর জোয়ান মেয়েটা! হ্যাঁ, সেই তো! আরও দুই তিনটি মেয়ের সহিত হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে! ধর্মতলা স্ট্রীটে সকলে নামিয়া পড়িল। বিষ্ণুচরণও নামিল। বিষ্ণুচরণের একটা সুবিধা ছিল, চন্দ্রলেখা তাহাকে চিনিত না। তাহার নাম শুনিয়াছিল কিন্তু তাহাকে চাক্ষুষ করিবার সুযোগ কখনও পায় নাই।

কিছুদূর অনুসরণ করিয়া বিষ্ণুচরণ দেখিল, গলির মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে মেয়েগুলি ঢুকিয়া পড়িল। বাড়ির সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে—"মাসাজ অ্যাণ্ড বাথ।" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। অবাক হইয়া গেল। তাহার পর বাড়িটার আশেপাশে ঘুরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ব্যাপারটা কি।

পাশের দোকানে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেখিলেই মনে হয় লোকটি রসিক। পাকা গোঁফগুলি তামাকের ধোঁয়ায় লালচে, গালদুটিও লালচে। বিষ্ণুচরণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দৃষ্টি কৌতূহলান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিষ্ণুচরণের সহিত চোখাচোখি হইতেই মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কোন্ নম্বরটা খুঁজছেন?"

"ওই বাড়িটা কার, কি হয় ওখানে?"

ইহা শুনিয়া ভদ্রলোকের চক্ষু হইতে খানিকটা কৌতুক যেন উপচাইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কোলকাতার বাইরে থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"তাই জানেন না। কোথা থাকা হয় ?"

বিষ্ণুচরণ মিথ্যাকথা বলিল।

"বিহারে।"

"বিহারে। ও বাড়িও বিহারেরই একটা আধুনিক আড্ডা। ঢুকে দেখে আসুন না—"

রসিকতাটা বিষ্ণুচরণ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই।

"বিহারের আড্ডা ? তার মানে বিহারীরা ওখানে থাকে—?"

"কেউ থাকে না। যাতায়াত করে। বিহারী, বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী সবাই।"

"ও।"

"বসুন, বসুন। আপনি একেবারে আনকোরা দেখছি।"

বিষ্ণুচরণ উপবেশন করিল। তাহার চোখে পড়িল দোকানে নানা মাপের, নানা রঙের গামছা এবং তোয়ালে টাঙানো রহিয়াছে।

"এ সব গামছা কি বিক্রির ?"

"হ্যাঁ।"

একটা গামছা দেখাইয়া বিষ্ণুচরণ বলিল, "এটার দাম কত ?"

"আমি জানি না, আমি পাহারাদারমাত্র, দোকানদার একটু পরে আসবেন।"

"আপনি এখানে পাহারা দেন বুঝি ?"

"শখের চাকরি। মাইনে পাই না। মনিবটি অতি পাজি" বলিয়াই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন, 'নাতির দোকান। তিনি আমাকে দোকানে বসিয়ে সেলুনে চুল ছাঁটতে গেছেন। বসুন, ভাল করে বসুন --"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিই বিষ্ণুচরণকে 'মাসাজ বাথ' সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিলেন। কিছুটা কথায়, কিছুটা আকার, ইঙ্গিতে। পরিশেষে বলিলেন, পাকিস্তান থেকে যে-সব বেওয়ারিশ মাল এসে জমেছে, তাদের একটা গতি হওয়া চাই তো! সবরকম অগতির গতি এই কোলকাতা শহর। গতি এখানে প্রগতি হয়। আমরা হু হু করে সভ্য হচ্ছি, বুঝলেন না। এখানকার অনেক ভদ্রলোকও মোটা টাকার লোভে ওখানে মেয়ে পাঠাচ্ছে এ খবরও শুনেছি "

সংবাদটা বিষ্ণুচরণের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিল। সহসা তাহারও মতিগতি বদলাইয়া গেল। তাহার মনে এতদিন যে ঘৃণা, ঈর্ষা, যে ক্ষোভ নারীজাতিকে কেন্দ্র করিয়া একটা পঙ্কিল আবর্তে আবর্তিত হইতেছিল সহসা তাহা যেন পথ দেখিতে পাইল। প্রতিশোধের পথ। 'মাসাজ এণ্ড বাথ'—! সাইনবোর্ডটার দিকে সে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল। মনে হইল এক ঢিলেই তো দুই পক্ষী নিহত হইবে।

প্রায় ঘন্টা দুই সে ওই অঞ্চলে নানাছুতায় ঘুরিয়া বেড়াইল। দুইঘন্টা পরে চন্দ্রলেখা

একাই বাহির হইয়া আসিল সেই গলির ভিতর হইতে। বাহির হইয়া ট্রামে চড়িল। বিষ্ণুচরণও চড়িল। চন্দ্রলেখার ঠিকানা সংগ্রহ করিতে বেশি বিলম্ব হইল না তাহার। সে সানন্দে লক্ষ্য করিল চন্দ্রলেখারা একটা নোংরা পল্লীতে খোলার ঘরে থাকে। তাহার পুলক আরও বর্ধিতহইলযখন সে শুনিল যে চন্দ্রলেখার বাবা প্রাণ ও মানমাত্র লইয়া পলাইয়া আসিতে পারিয়াছেন, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু আনিতে পারেন নাই। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে খবরগুলি সংগ্রহ করিতে হইল। লোকটার বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই পাকিস্তানে আটকাইয়া পড়িয়াছে, তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিখারী, চন্দ্রলেখাই নাকি 'মাসাজ এণ্ড বাথে' চাকুরি করিয়া কোনক্রমে সংসার চালাইতেছে—এই সব সংবাদ বিষ্ণুচরণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিল। একটা দোকানে ঢুকিয়া দুইটি কাটলেট ও দুই পেয়ালা চাসহযোগে সে সংবাদগুলিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোমন্থন করিল। চাকা তাহা হইলে ঘুরিয়াছে! মনে পড়িল, এই মেয়েটাকে কেন্দ্র করিয়াই মুসলমান গুণ্ডাদের পাশবিক কামনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারও কি উঠে নাই? উঠিয়াছিল বই কি! কিন্তু তাহার সাহস ছিল না। তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবার সাহস পর্যন্ত ছিল না। এই সাহসের অভাবই তাহাকে ওই গুণ্ডাদের দলে ঠেলিয়া দিয়াছিল এ কথা কি সত্য নয়? ওই গুণ্ডাদের দলে যোগ দিয়াছিল বলিয়াই কি তাহাকে মুসলমান হইতে হয় নাই? আর পাঁচজনের মতো সে-ও অনায়াসে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত না কি? নিশ্চয় পারিত। পারে নাই, কারণ ওই মেয়েটা তাহাকে চুম্বকের মতো টানিয়া রাখিয়াছিল। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া বিষ্ণুচরণ শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে তাহার ইসলাম-ধর্মগ্রহণের মূল কারণ নেপথ্য-বর্তিনী ওই চন্দ্রলেখা। ফতিমার মুখটা একবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে সে আমল দিল না। ওই চার-হাত-ফেরতা মেয়েটার উপর তাহার কোনওদিনই আস্থা ছিল না, এই ধরনের একটা স্তোকবাক্যে সে বিবেকের মৃদু প্রতিবাদকে থামাইয়া দিল।...সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল কলিকাতার বাড়ি তিনখানা যখন ভাগ্যবলে তাহারই থাকিয়া গিয়াছে, তখন সেগুলিকে সে আর হস্তান্তর করিবে না। কল্পনা করিল ওই তিনখানি বাড়ির সহায়তায় 'মাসাজ এণ্ড বাথ'-এর ব্যবসায় ফাঁদিয়া চন্দ্রলেখাকে সেই ব্যবসায়ের ফাঁদে আবদ্ধ করিবে। তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া বিবাহের প্রস্তাবও করিবে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহার পর আত্মপরিচয় দিবে সে। তাহার বাবাকে ডাকিয়া বলিবে,—দেখ হে, আমিই সেই উদ্বাহু বামন, তোমার চন্দ্রলেখাকে বুকে জাপটাইয়া ধরিয়াছি। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। উত্তেজনা-ভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দামটা চুকাইয়া দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ফুটপাথে ফুটপাথে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার মনে হইয়াছিল নবেন্দু বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী যদি কেহ থাকে তাহার সন্ধান করিয়া বাড়ীগুলি তাহাকেই সে লিখিয়া দিবে। এই সদিচ্ছাটা তাহার মনে সন্তর্পণে আর

একবার উঁকি দিল। দিয়াই কিন্তু অন্তর্ধান করিল। লগুড়হস্তে সম্প্রতি যে যুক্তিটা তাহার মনের সদরে নিজেকে স্থাপিত করিয়াছিল সে তারস্বরে ধমকাইয়া উঠিল,—আমার প্রতি কেহই যখন সুবিচার করে নাই, আমিই বা করিব কেন। মুসলমান হইয়া যাহাকে বিবাহ করিলাম সেই জুবেদা পর্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছে। আমাকে বাঁচিতে হইবে তো ?

বিষ্ণুচরণ সাত আটদিন ধরিয়া কলিকাতার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল। 'মাসাজ এণ্ড বাথ' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিয়া বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড একটি বাড়িও সে দেখিয়া রাখিল। তাহার পর দেখা করিল বিধুভূষণের সঙ্গে। কিন্তু দেখা করিবার পূর্বে আর একটি কার্যও সে করিয়াছিল যাহা বিধুভূষণকে সে জানায় নাই। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটরকার সে সস্তায় কিনিয়া ফেলিয়াছিল। স্থির করিয়াছিল ভবিষ্যতে যখন সে চন্দ্রলেখার বাবার সহিত দেখা করিতে যাইবে, তখন মোটর চড়িয়াই যাইবে আর তাহার পাশে বসিয়া থাকিবে চন্দ্রলেখা। মোটরটা কিনিয়া একটা গারাজ ভাড়া করিয়া তাহাতেই সেটাকে সে আপাতত বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। কলিকাতায় পাকা-পাকি একটা আস্তানা ঠিক হইলে তখন বাহির করা যাইবে, তখন হয়তো বিধুবাবুও আর আপত্তি করিবেন না। বিধুভূষণকে চটাইবার সাহস তাহার ছিল না। কারণ ইহা সে বুঝিয়াছিল যে এখন প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে এ ব্যাপারের সহিত যুক্ত করা উচিত হইবে না। বিধুভূষণকেই সদরে খাড়া করিয়া রাখিতে হইবে। সে থাকিবে নেপথ্যে। নূতনরকম একটা পুতুল-নাচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যাপারটা যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার কল্পনা রঙীন হইয়া উঠিল।

বিধুভূষণের নিকট হইতে টাকা সহজেই পাওয়া গেল। এত সহজে পাওয়া যাইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া বড় রাস্তার উপর যে বাড়িটা সে নির্বাচন করিয়াছিল মাসিক পাঁচশত টাকা ভাড়ায় সেটা সে ঠিক করিয়া ফেলিল। কিছু ফার্নিচারও ভাড়া করিল। তাহার পর চলিয়া গেল করাচী। ব্যবসায়টা চালু করিতে হইলে কিছুদিন ছুটি লইতে হইবে। জুবেদাকে বলিতে হইবে জুবেদার অভিপ্রায় অনুসারেই সে কলিকাতা শহরে নিজের নূতন ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টা করিতেছে, তাই ফিরিতে দেরি হইল। জুবেদার সাহায্যেই তাহাকে ছুটিও যোগাড় করিতে হইবে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ জুবেদাকে যে খাতির করিয়া চলেন তাহা সে লক্ষ্য করিয়া-ছিল। চাকরিটা এখন সে ছাড়িবে না। এখন ছুটিই লইতে হইবে।

নূতনভাবে নূতন জীবন আরম্ভ করিবার জন্ম সে যেন ছটফট করিতেছিল। কারণ তাহার জীবনটা রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের স্বাদ চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে এতদিন সে যাহা যাহা করিয়াছে—জুবেদাকে বিবাহ, চাকরি, কয়েকবার করাচীতে যাতায়াত —সবই যেন যন্ত্রচালিতবৎ করিয়াছে। না করিয়া উপায় ছিল না বলিয়া করিয়াছে। এইবার নিজের মনের মতো একটা কাজ পাইয়া তাহার কল্পনা

উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, কর্মশক্তি সজীব হইল। বহুকাল পরে নিজের অন্তরের ভিতর হইতে সে একটা কর্মপ্রেরণা অনুভব করিতে লাগিল। কল্পনায় সে ব্যবসাটাকে বাড়াইয়া একটা প্রতিষ্ঠানেই পরিণত করিয়া তুলিল। বিধুভূষণের অর্থবলের উপর তাহার আস্থা ছিল, ব্যবসায়ী হিসাবেও তাহাকে সে শ্রদ্ধা করিত। সুতরাং তাহাকে হালে বসাইয়া দিলে নব-কল্পিত ব্যবসায়-তরণীটি যে কালক্রমে ঈপ্সিত বন্দরে পৌছিয়া যাইবে এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। কল্পনা সুতরাং উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল। বিধুভূষণ যদি টাকার গন্ধ পায়, আরও টাকা ছাড়িতে আপত্তি করিবে না। বাড়ি তিনটির জন্য আরও কিছু টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করিতেই হইবে। আরও অন্তত দশহাজার টাকা না দিলে সে পাকা দলিল লিখিয়াই দিবে না। বিধুভূষণ দিবেও, লোক সে খারাপ নয়। ব্যবসায়ে বিধুভূষণকে যদি অর্ধেক লাভও দেওয়া যায় (আধাআধি বখরা না দিলে লোকটা ভিজিবে না) তাহা হইলেও ফেলিয়া ছড়াইয়া মাসে হাজারখানেক টাকা যে তাহার অংশে থাকিয়া যাইবে তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। এই ব্যবসায়ে যাহারা নামিয়াছে তাহাদের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়া বিষ্ণুচরণ যে অঙ্কের আভাস পাইয়াছে তাহা লক্ষের কোঠায়। তেমন তেমন ধনী খরিদ্দার যদি জোটে এবং কোনও ভাল মেয়ে যদি তাহার নজরে পড়িয়া যায় তাহা হইলে একটা মেয়েই তাহাকে "লাল" করিয়া দিবে। লাভ যদি কমই থাকে তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি। তাহার এ ব্যবসায়ের লক্ষ্য তো ঠিক অর্থ নয়, আসল লক্ষ্য চন্দ্রলেখা এবং চন্দ্রলেখার বাবা। তাহারা আসিয়া যদি তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে, তাহাদের উন্নাসিক স্পর্ধাকে সে যদি দুই পায়ে পিষিয়া দিতে পারে তাহা হইলেই সে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিবে। ইহার বেশী আর সে কিছু চায়ও না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা আপাতত পাকিস্তান গভর্নমেন্ট তো করিয়াই দিয়াছেন। ব্যবসায়ের লাভের উপর সুতরাং সে ততটা জোর এখন দিবে না। যে বহ্নিতে তাহার সমস্ত বুকটা পুড়িয়া যাইতেছে সেই বহ্নিটাকে নির্বাপিত করিবার ব্যবস্থা তাহাকে আগে করিতে হইবে। অবশ্য বহ্নিটা যে কিসের, তাহার উৎস যে কোথায়, তাহা সে বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। ফতিমাকে সে যদি পাইত, শিবানী যদি তাহাকে ছাড়িয়া মৃত্যুবরণ না করিত, বাধ্য হইয়া তাহাকে যদি মুসলমান না হইতে হইত, চন্দ্রলেখার পিতা যদি তাহাকে অমন ব্যঙ্গোক্তি করিয়া অপমান না করিতেন, জুবেদা যদি তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে—তাহা হইলে...ইহার পর বিষ্ণুচরণ আর ভাবিতে পারে নাই। একটা তীব্র গ্লানির পঙ্কে সে ধীরে ধীরে ডুবিতেছিল, অনির্বাণ তুষানল তাহার সমস্ত বুকটা পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতেছিল, এমন সময় চন্দ্রলেখাকে সে দেখিতে পাইল। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন খড় দেখিলে সেটাকেই চাপিয়া ধরিয়া বাঁচিতে চায়, বিষ্ণুচরণও তেমনি ভাবিল চন্দ্রলেখাকে আয়ত্তাধীন করিতে পারিলেই বুঝি শান্তি ফিরিয়া পাইবে। অহোরাত্র যে তুষানল তাহার সারা বুক জুড়িয়া জ্বলিতেছে হয়তো তাহা নিবিয়া যাইবে।

করাচীতে পৌঁছিয়া কিন্তু আবার সব গোলমাল হইয়া গেল। জুবেদা তাহার প্রত্যাগমনের আশায় যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঢাকার বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি যে ভদ্রলোক আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম কি নবেন্দু বিশ্বাস ?"

প্রশ্নটা শুনিয়া বিষ্ণুচরণ থতমত খাইয়া গেল। প্রথমেই তাহার মনে হইল আইনত ঢাকার বাড়ি এবং বিষয়-সম্পত্তি তাহার নয়, জুবেদার। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, কেন—"

"তাঁকে আপনি কোলকাতার যে বাড়ি তিনখানা দেবেন বলেছিলেন তা দেওয়া হয়েছে কি ?"

"না, এখনও হয়নি। কোলকাতায় ভদ্রলোককে খুঁজেই পেলাম না। শুনলাম সেকেণ্ড রায়টে তিনি মারা গেছেন। তাই বাড়ি তিনখানা বেচে দেব ভাবছি।"

"বেচবেন কেন ? তাঁর মেয়ে আছে—"

"মেয়ে আছে ! তুমি জানলে কি করে—"

"বিশাখা আমার সঙ্গে লাহোরে পড়ত যে। সে আমাকে চিঠি লিখেছে ! লিখেছে অনেকদিন আগে। ঘুরতে ঘুরতে চিঠিখানা এসে এতদিনে পৌঁছেছে। ভাগ্যে মারা যায়নি। এই দেখুন —"

চিঠিখানা সে ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া দিল। বিষ্ণুচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িল,—

ভাই জুবেদা,

তুমি এখন কোথায়, জানি না। তুমি আমার চিঠি পাবে কি না তা-ও অনিশ্চিত। তবু তোমাকে লিখছি। আমরা ভাই, মহাবিপদে পড়েছি। বাবা কোলকাতায় গিয়েছিলেন তাঁর ঢাকার বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে ; কিন্তু এখনও তিনি ফেরেন নি, চিঠি লিখে তাঁর কোনও জবাব পাচ্ছি না। কোলকাতায় আবার নাকি ভীষণ রায়ট হয়ে গেছে শুনছি ! আমার ভাই, বড় ভাবনা হয়েছে। আমি মিসেস দাসের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ঢাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছ। তাঁর কাছ থেকেই আমি তোমার ঢাকার ঠিকানাটা পেলাম। যদি তাঁর কোন খোঁজ পাও আমাকে দয়া করে একটু জানিও ভাই। আমার বাবার নাম নবেন্দু বিশ্বাস। এ নামের কোনও লোকের যদি খোঁজ পাও আমাকে দয়া করে নীচের ঠিকানায় জানিও। মা-ও অসুস্থ, শয্যাশায়ী। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না, মাকে ছেড়ে নড়বারও উপায় নেই। পারো তো আমার এই উপকারটি কোরো ভাই। তোমাকে আর বেশী কি লিখব। আশা করি ভাল আছ। নীচে আমার দিল্লীর ঠিকানাটা দিলাম। আমার ভালবাসা নাও।

ইতি— বিশাখা।

বিষ্ণুচরণ পত্রপাঠ শেষ করিয়াও পত্রখানার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি তো এ খবর জানতাম না। চিঠির কোনও উত্তর দিয়েছ নাকি—"

"দিয়েছি। লিখেছি যে এক নবেন্দু বিশ্বাসের বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি আমি কিনেছি, কিন্তু তিনি তোমার বাবা কি না জানি না—"

বিষ্ণুচরণের পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গেল। তথাপি সে স্থিরকণ্ঠেই বলিল, "খোঁজ না নিয়ে কিছুই বলা যায় না। অনেক নবেন্দু বিশ্বাস এখন পঞ্জাবে—"

"বিশাখা খুব ভাল মেয়ে, সে প্রতারণা করবে না।"

"খোঁজ করে দেখি—"

জুবেদার সহিত বিষ্ণুচরণ এ বিষয়ে আর আলোচনা করা নিরাপদ মনে করিল না। তাড়াতাড়ি আপিসে চলিয়া গেল।

আপিসে যাইবার নাম করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু আপিস তখন খোলেই নাই। জুবেদার সান্নিধ্যত্যাগ করিবার নিমিত্তই সে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। জুবেদার নিকট বিষ্ণুচরণ থাকিতেই পারিত না। জুবেদা রূপসী, শিক্ষিতা; তাহার গাম্ভীর্য, আদব-কায়দা এমন একটা মার্জিতরুচির পরিচয় বহন করে যে বিষ্ণুচরণ কিছুতেই তাহার নিকট স্বস্তি পায় না, কেমন যেন ভয়ভয় করে। মনে হয় উপন্যাসের কোনও নবাবজাদীর শয়নকক্ষে সে না বলিয়া অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে।

আপিস খুলিতেই সে আপিসে গিয়া হাজির হইল। একটু পরেই একজন কেরানী আসিয়া তাহাকে খবর দিল যে দিল্লী হইতে বিধুভূষণ নামে কে একজন তাহাকে ফোনে ডাকিতেছে। ফোনে কি কি কথা হইয়াছিল পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। বিষ্ণুচরণ হঠাৎ চিন্তিত হইল। মেয়েটা তাহা হইলে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। বিধুভূষণও দিল্লীতে আসিয়া তাহার সম্বন্ধে সংবাদসংগ্রহ করিতেছে। সহসা সে অনুভব করিল, অবিলম্বে অকুস্থলে উপস্থিত না হইলে সমস্তই বানচাল হইয়া যাইবে। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর কলিকাতায় তাহার এটর্নিকে 'ফোন' করিল।

মনিব জমিরুদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং একমাসের ছুটি পাইতে তাহার বিলম্ব হইল না। আপিস হইতে বাহির হইয়া তাহার মনে হইল, এবার কি করা যায়! জুবেদার কাছে যাওয়া যাইবে না। রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। একটা এলোমেলো হাওয়া বহিতেছিল। বিষ্ণুচরণের পূর্বকল্পিত কর্মসূচীও কেমন যেন এলো-মেলো হইয়া গেল। সমস্ত বুদ্ধিবিবেচনা বিকল হইয়া পড়িল। কি করিবে সে? কিছুই ঠিক করিতে পারিল না খানিকক্ষণ। দোদুল্যমান-মানসপটে ফতিমা, শিবানী, চন্দ্রলেখা এবং জুবেদার ছবি বারম্বার নানারূপে ফুটিয়া উঠিল ও মুছিয়া গেল। বিধুভূষণের সহিত তাহার সম্পর্কের কথা মনে পড়িল। বিধুভূষণ তাহাকে বিশ্বাস করিয়া অতগুলো টাকা যে সম্পর্কের জোরে দিয়াছিল, সে সম্পর্কের সম্মানরক্ষা করিবার সামর্থ কি তাহার আছে? মনে হইল জুবেদা আজ যদি তাহার সহিত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে, সে নিঃস্ব হইয়া যাইবে। ঢাকার সমস্ত সম্পত্তি তাহার নামে। নবেন্দু বিশ্বাস তাহাকেই সম্পত্তি

বিক্রয় করিয়াছিল। ন্যায়তঃ বিষ্ণুচরণের তাহাতে কোনও অধিকার নাই। কলিকাতার বাড়ি তিনখানাও যদি হাতছাড়া হইয়া যায়—ন্যায়ত ধর্মত হইবারই কথা—তাহা হইলে তাহার থাকিবে কি! সে তো পথের ভিখারী হইয়া যাইবে। তাহার নিজস্ব যে জমিজমা ছিল তাহা নাকি মুসলমানেরা ভোগদখল করিতেছে। যে বাড়িখানায় আগে মিষ্টান্নের দোকান ছিল সেটা নাকি ভস্মীভূত হইয়াছে। তাহার পৈতৃক ভিটায় গোহত্যা হইতেছে, রমজানের এক শালা নাকি সেখানে ব্যবসাও করিতেছে। বিষ্ণুচরণ জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইয়া জুবেদা নাম্নী রূপসী ধনীকন্যাকে বিবাহ করত অনেক সম্পত্তির মালিক হইয়াছে, নবেন্দু বিশ্বাসের বিশাল বাড়ি ও বিস্তর ভূসম্পত্তি পাইয়াছে, তাহার তো কোনও অভাব নেই, সে আবার পৈতৃক বিষয় লইয়া কি করিবে? এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহার গ্রামের মুসলমান বন্ধুগণ তাহার সম্পত্তি দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। তাহাদের উৎখাত করা প্রায় অসম্ভব।

অনেক ভাবিয়া বিষ্ণুচরণ শেষে ঠিক করিয়া ফেলিল কলিকাতার বাড়িতিনটি বাঁচাইতেই হইবে। বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া জুবেদাকে বলিল জরুরি কার্যব্যপদেশে তাহাকে কলিকাতা ফিরিতে হইতেছে। নবেন্দু বিশ্বাসের দিল্লী ঠিকানাটাও সে জুবেদারের নিকট হইতে টুকিয়া লইল। বলিল কলিকাতার পথে সে দিল্লীতে নামিয়া বিশাখার সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিবে।

সেইদিনই দিল্লীগ্রামী একটা প্লেনে সে দৈবাৎ "সিট" পাইয়া গেল এবং তাহাতে চড়িয়া বসিল। দিল্লীতে পৌছিয়া প্রথমেই সে গেল নবেন্দু বিশ্বাসের ঠিকানায়। কাহারও দেখা পাইল না। সে আশা করিয়াছিল বিশাখার কোন আত্মীয়কে অন্তত সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে এবং যে মতলবটা মনে মনে ভাঁজিয়া রাখিয়াছিল তাহা তাহারই মারফত বিশাখার নিকট ব্যক্ত করিবে। কিন্তু তাহাকে হতাশ হইতে হইল। এমন কি নীহারবাবুর দেখাও সে পাইল না। বিধুভূষণ দিল্লীতে আছেন কি নাই ইহা খোঁজ করার সে প্রয়োজন মনে করিল না। বিধুভূষণকে এখন কিছুদিন এড়াইয়া চলাটাই বুদ্ধিমানের কার্য ইহাই তাহার মনে হইল।

অনেক চিন্তার পর বিধুভূষণের মত সে-ও স্থির করিয়াছিল যে বিশাখাকে বিবাহ করিতে হইবে। হিন্দু বা মুসলমান কোনও ধর্মেই একাধিক বিবাহ বে-আইনী নয়। হিন্দুরূপে হউক, মুসলমানরূপে হউক, ছলে, বলে, কৌশলে যেমন করিয়া হউক, বিশাখাকে বিবাহ করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে তাহার বাঁচিবার উপায় নাই। সারাজীবন ওই জুবেদার অনুগ্রহপ্রার্থী ক্রীতদাস হইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে। তাহা অসম্ভব।

সে জানিত বিশাখা কলিকাতায় বিধুভূষণের আশ্রয়ে আছে। তাহার নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বিবাহের প্রস্তাবটা পৌছাইয়া দিতে হইবে। পৌছাইয়া দিবার মতো লোক নিশ্চয়ই সে যোগাড় করিতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণীর একটি বার্থে চক্ষু বুঁজিয়া বিষ্ণুচরণ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল। ফজিলা, শিবানী, চন্দ্রলেখা, জুবেদা—বিশাখা। বিশাখা মেয়েটা কেমন, কে জানে! গাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক কেহ ছিল না। অবাধে সে চিন্তা করিতেছিল। পরের স্টেশনে কিন্তু একটি যাত্রী উঠিলেন। লোকটির পরিধানে বুশশার্ট এবং পায়জামা, পায়ে কাবলী চপ্‌পল, চোখে কালো চশমা, নাকের নীচে কাটারফ্লাই গোঁফ। লোকটি বিষ্ণুচরণের দিকে একনজর চাহিয়া পাশের বেঞ্চে নিজের বিছানা পাতিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুচরণের পুনরায় মনে হইল, বিশাখা মেয়েটি কেমন, কে জানে।

॥ চার ॥

বরেনের কিছু পরিচয় আপনারা পাইয়াছেন। বাকীটা গোপীনাথ, মণিকা, শিবাজী (ওরফে সনৎ, ওরফে অনেক কিছু) এবং ভার্গবের পরিপ্রেক্ষিতে দিলে মানাইবে ভাল। গোপীনাথ, মণিকা এবং ভার্গবেরও আসল নাম অন্য। এগুলি তাহাদের ছদ্মনাম। গোপীনাথের আসল নাম মলয়কুমার এবং মণিকার আসল নাম আন্নাকালী একথা হয়তো আপনাদের হাস্যোদ্রেক করিবে, কিন্তু ইহা সত্য। ভার্গব একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। বিস্ময়কর মনে হইবে, কিন্তু ইহাও সত্য।

আর একটা কথা বলাও প্রয়োজন। ইহারা আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়, ইহাদের সকলকেই আপনারা অল্প-বিস্তর চেনেন। অবশ্য ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়, নেতাদের বক্তৃতায়, প্রতিবেশীদের বৈঠকখানায়, উপন্যাসের চরিত্রে, সিনেমার ছবিতে, নাটকের দৃশ্যে—ইহাদেরই নানারূপ আপনারা দেখিয়াছেন, ইহাদেরই নানা সমালোচনা আপনারা করিয়াছেন। ইহাদের আপনারা ভয় করেন, ভক্তি করেন। ইহাদের নিন্দাও করেন, প্রশংসাও করেন, বিশ্বাসও করেন, অবিশ্বাসও করেন।

আলাদা আলাদা ইহাদের প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা একটা সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই সুবিধাজনক; আমরা মণিকার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি।

শ্রীমতী মণিকা সদাগরী আপিসের নিম্নশ্রেণীর জনৈক কেরানী জিতেন্দ্রনাথ গুড়গুড়ি মহাশয়ের সপ্তমা কন্যা। জিতুবাবু যে বেতন পাইতেন তাহাতে এ বাজারে ভদ্রভাবে সংসারচালানো শক্ত। বিশেষ করিয়া মা-ষষ্ঠী যখন তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। ভগবান কিন্তু তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন। নানা উৎস হইতে জলধারা আনিয়া তিনি তাঁহার সংসারমরুকে সরস করিয়া রাখিতেন। তাঁহার মেয়েদের হালফ্যাশানের শাড়ি, গহনার অভাব হইত না, নূতনতম স্নো-ক্রীম-পাউডারের অনটন ছিল না, ঘন ঘন সিনেমাদেখার

পয়সাও জুটিত। নৃত্য-শিক্ষক এবং সঙ্গীতশিক্ষকেরা আসিয়া তাহাদের বাড়িতে কোন পারিশ্রমিক না লইয়া নৃত্য-গীতের আসর পাতিতেন। জিতেন্দ্র গুড়গুড়ি কন্যাভাগ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

মণিকার বয়স যখন মাত্র বারো বৎসর তখনই সে এমন নৃত্য-গীত-পটীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল যে, অধিকাংশদিনই সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকিতে পাইত না। কোন-না-কোন জলসায় আহূত হইয়া তাহাকে হয় নাচিয়া, না হয় গাহিয়া সমাগত সজ্জনবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে হইত। সাহিত্য-সভা, বিবাহ-সভা, মহাপুরুষদের জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আনন্দ-সভা, মৃত্যুতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোক-সভা, ঝঞ্ঝা-বন্যা-ভূমিকম্পবিধ্বস্ত মানবতাকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য-সভা—বস্তুত যে কোনও কারণে অনুষ্ঠিত যে-কোন সভা বা 'চ্যারিটি শো' মণিকা-হীন হইবার জো ছিল না। এ সবের পরিবর্তে মণিকা প্রকাশ্যে প্রচুর প্রশংসা ও হাততালি পাইত, গোপনে অন্য কিছু পাইত কি না তাহা আমাদের জানা নাই।

এই গানের আসরের মাধ্যমেই মণিকার সহিত মলয়কুমারের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। যথানিয়মে সেই পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠও হইয়াছিল। মণিকার বয়স তখন ষোল, মলয়কুমারের সাতাশ।

এই ঘনিষ্ঠতার মর্মোদ্ভেদ করিতে হইলে আর একটু ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

টৌপিরাম নামক জনৈক ধনী মাড়োয়ারি বণিক যখন কলিকাতা হইতে তাঁহার মূল্যবান মোটরকারটি খরিদ করিয়া আনেন, তখন সেইসঙ্গে শ্রীমান্ মলয়কুমারকেও সপরিবারে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মলয়কুমারের পরিবার অবশ্য বৃহৎ ছিল না। বিধবা মা এবং অবিবাহিতা ভগ্নী শেফালী—এই দুইটি প্রাণী লইয়াই তাহার পরিবার। মলয়কুমারের বসবাসের জন্য টৌপিরাম নিজের একটি বাড়ি তাহাকে দিয়াছিলেন। অন্যান্য নানা সুবিধাও করিয়া দিয়াছিলেন। এবম্বিধ সহৃদয়তার কারণ নিশ্চয় একটা ছিল। শোনা যায় মলয়কুমারের স্বর্গীয় পিতাঠাকুর নাকি টৌপিরামের কলিকাতার গদীতে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী বিশ্বস্ততার জন্যই নাকি টৌপিরাম তাঁহার পরিবারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাও শোনা যায় টৌপিরামের খরচেই নাকি মলয়কুমার নামজাদা এক বিলাতী মোটরব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া মোটরচালক ও মোটর-মেকানিক হইতে পারিয়াছিল। আরও শোনা যায় স্বর্গীয় বিশ্বস্ত কর্মচারীর পুত্রকে কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্যই নাকি টৌপিরাম মূল্যবান মোটর-কারটি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত জনশ্রুতিটির কিছু ভিত্তিও ছিল। কারণ, প্রায়ই দেখা যাইত, মোটর থাকা সত্ত্বেও টৌপিরাম নিজের পুরাতন ল্যাণ্ডোটিতেই চড়িয়া বেড়াইতেছেন। বস্তুত মোটরে তিনি কচিৎ চড়িতেন। মোটরটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত আর পাঁচজনের কর্মে। গভর্নমেন্ট অফিসাররা তো বটেনই, শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরাও একরকম অবাধেই টৌপিরামের মোটরটি ব্যবহার করিবার

সুযোগ পাইতেন। কোনও হোমরা-চোমরা বা পদস্থ ব্যক্তির বিরাগভাজন হওয়া টৌপিরামের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। কাহারও মনে তিনি আঘাত দিতে চাহিতেন না। কে কখন, কিভাবে প্রত্যাঘাত করিয়া বসে ঠিক কি! মোটরটি আসাতে আর একটি সমস্যারও সমাধান হইয়া গিয়াছিল। পূর্বে নানা-ব্যপদেশে-অনুষ্ঠিত সভায় বা জলসায় তরুণী আর্টিস্টদের লইয়া যাওয়া এবং সেখান হইতে রাত্রে তাহাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যয়সাধ্য তো ছিলই, অতিশয় ঝঞ্ঝাটজনক ব্যাপারও ছিল। টৌপিরামের মোটরটি আসার পর হইতে সে ঝামেলা মিটিয়া গিয়াছিল। তরুণীদের বহন করিতে টৌপিরাম, টৌপিরামের মোটর বা মোটরচালক কোনদিনই আপত্তি করে নাই।

এই মোটরেই মলয়কুমারের সহিত আন্নাকালীর একদিন পরিচয় ঘটিল এবং মোটরকারের মতোই দ্রুতগতিতে সে ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত 'অজানা'র উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইতে লাগিল। কতকাল প্রধাবিত হইত বলা যায় না—হয়তো অনন্তকাল—কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বোম্বাইমার্কা একটা আলোর ঝলক আসিয়া পড়াতে আন্নাকালীকে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

শহর হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে জনৈক জমিদারের বাগান-বাড়িতে একদা বোম্বাই শহরের এক বিখ্যাত গায়ক আহূত হইয়া-আসিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম স্থানীয় সঙ্গীত-শিল্পীদের লইয়া একটি জলসার আয়োজন হওয়াতে স্বভাবতই আন্নুকে (সংক্ষিপ্ত আন্নাকালী) তাহাতে একটি বিশেষ অংশগ্রহণ করিতে হইল। নৃত্য এবং গীত উভয়-প্রকার কলার দ্বারা আন্নাকালী বোম্বাইশিল্পীকে সংবর্ধিত করিল। গায়কমহাশয় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষপর্যন্ত এত মুগ্ধ হইলেন যে আন্নুকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "খুব ভাল লাগল আপনার নাচ, গান। অতি চমৎকার। আপনার জায়গা ছোট শহর নয়, কোলকাতা কিংবা বোম্বাই আপনার উপযুক্ত স্থান। অনেক বড় বড় সিনেমা-কোম্পানীর সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। আপনি যদি সিনেমায় আসেন ত' খুব ভাল হয়। আমাকে একটু খবর দিলেই আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। আমার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনার ঠিকানাটাও আমাকে দেবেন। আপনি সিনেমায় এলে সিনেমা-শিল্প উন্নত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আন্নু সহসা যে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার বুকের ভিতরটা কেবল টিপ টিপ করিতে লাগিল।

"কি বলেন, নামবেন সিনেমায়? আপনার যদি মত থাকে এখান থেকেই আমি একটা চিঠি লিখে দিতে পারি—"

আনতচক্ষে আন্নু উত্তর দিল বটে,—"বাবাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব"—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিতেন্দ্রনাথ গুড়গুড়ির মতামতের সহিত শ্রীমতী আন্নাকালীর বা তাহার ভগ্নীদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাহারা যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইত, যাহা খুশী করিত। পিতার মতামতের বেড়ি তাহাদের সবুজ স্বপ্নকে বাধাগ্রস্ত করিতে পারে

নাই। যে পিতা অসমর্থ, যে পিতা ভালভাবে ভরণপোষণ করিতেও অপারগ, কেবলমাত্র কর্তব্যের দাবিতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হইলে যে সুশিক্ষার দরকার, তাহাও জিতুবাবু বা তাঁহার পত্নী পুত্রকন্যাদের দিতে পারেন নাই। তাহারা বাল্যকাল হইতেই জানিয়াছিল 'বাবা' নামক ব্যক্তিটি কোনও কর্মের নয়। মানুষই না, রাস্তার 'ডাস্টবিন' যেন। সকলের অশ্রদ্ধা, সকলের কটূক্তি, সর্বপ্রকার গঞ্জনা, লাঞ্ছনা নীরবে মাথায় পাতিয়া লইয়া অন্তরে সঞ্চয় করাই যেন তাঁহার একমাত্র কর্তব্য। মা তাঁহাকে সকালে, সন্ধ্যায় (ছুটির দিন, দুপুরেও) সকলের সম্মুখে যে ভাষায় অপমান করেন এবং তিনি নীরবে, বিনা প্রতিবাদে তাহা যেভাবে হজম করেন, তাহাতে তাঁহাকে অপদার্থ, জড়ভরত ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা শক্ত। পাওনাদাররাও বাড়িচড়াও হইয়া প্রায়ই অকথ্যভাষায় গালাগালি দিয়া যাইত। গুড়গুড়ি মহাশয় টুঁশব্দটি করিতেন না। এ হেন লোকের মতামতের উপর কেহ আস্থাস্থাপন করে না তাহার পুত্রকন্যারাও করিত না। আন্নাকালী পিতার দোহাই দিল জিনিসটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য।

সিনেমার প্রস্তাব আন্নুর ভালই লাগিয়াছিল, কিন্তু সে সময় লইল আর একটা কারণে। কিছুদিন হইতে মলয়কুমারের আচরণে সে একটু রোমান্সের গন্ধ পাইতেছিল। তাহাকে দেখিলেই মলয়কুমারের আচরণ কেমন যেন একটু বেসামালগোছের হইয়া যাইত, অকারণে মুচকি হাসিত, অকারণে গলা-খাঁকারি দিত, কাছাকাছি হইলে সন্ত্রস্ত-শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, চোখে মুখে সম্ভ্রম, মিনতি ও আকুলতার একটা মিশ্রভাব ফুটিয়া উঠিত, মনে হইত প্রভুর সান্নিধ্যলাভ করিয়া প্রভুভক্ত কোনও কুকুর যেন কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। কোনও বাক্য আরম্ভ করিয়া সে শেষ করিতে পারিত না, কয়েকবার 'মানে', 'মানে' বলিয়া বক্তব্যটাকে আরও জটিল করিয়া শেষ পর্যন্ত থামিয়া যাইত। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন লক্ষণ দেখিয়া রোগনির্ণয় করে, অভিজ্ঞ আন্নাকালীও তেমনি ব্যাপারটা ঠিক ধরিয়াছিল। বলিষ্ঠ, প্রিয়দর্শন মলয়কুমারকে তাহার ভালও লাগিয়াছিল। কিছুদিন ঘনিষ্ঠতার পর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র একটি আশার অঙ্কুরও তাহার ঊষর মানসক্ষেত্রে উদ্গত হইয়াছিল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছল্যময়, ক্ষুদ্র একটি সংসারের স্বপ্ন অন্ধকারের উষালোকের মতো তাহার দুঃখময় জীবনে ধীরে ধীরে যে মোহিনীমায়া বিস্তার করিতেছিল তাহা সত্যই মনোরম!

গুড়গুড়ি মহাশয় যে কন্যার বিবাহ দিবেন, এমন আশা ছিল না। তিনি বড়মেয়ে কালীর বিবাহ দিয়াছিলেন একটি তেজবরে পাত্রের সঙ্গে। একমাস পরে কালী উলঙ্গিনী হইয়া শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিল। সহসা কেন যে সে বদ্ধ উন্মাদ হইয়া গেল তাহা নির্ণয় করিতে হইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পাঁক ঘাঁটিতে হয়। তাহা করিবার সামর্থ গুড়গুড়ি মহাশয়ের ছিল না, তিনি স্থানীয় সিভিল সার্জনের শরণাপন্ন হইয়া কালীকে একটা পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ, পাগলা-গারদ ছাড়া আর কোথাও

তাহার স্থান হওয়া সম্ভব ছিল না। ইহার পর গুড়গুড়ি মহাশয় কন্যাদের বিবাহপ্রসঙ্গে আর মাথা ঘামান নাই। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা তারা প্রতিবেশী এক ধনীর সুনজরে পড়িয়াছিল। ধনীর পক্ষাঘাতগ্রস্তা পত্নীর সেবা করিবার ছুতায় সে প্রত্যহ সেখানে যাইত এবং দিনরাত সেখানেই পড়িয়া থাকিত। তৃতীয়া কন্যা মহাবিদ্যা পাড়ায় এক সিনেমা-রসিক স্বর্ণকার-পুত্রের সহিত মাখামাখি করিয়াছিল, তাহার পর আত্মহত্যা করিয়াছে। চতুর্থ ষোড়শী, ধর্মপরায়ণা। জনৈক শৌখীন, সুদর্শন, ধনী সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা দিয়াছেন। সন্ন্যাসী শহরে আসিলে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিদিনই যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই উৎসবে ষোড়শী সুললিতকণ্ঠে কীর্তনগান করিয়া সন্ন্যাসীর (এবং সম্ভবত ভগবানেরও) মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। বিনিময়ে সন্ন্যাসী-প্রবর শিষ্যাকে আশীর্বাদ তো করেনই, খাইতেপরিতে দেন, শোনা যায় গহনা, এসেন্সও নাকি সরবরাহ করেন। জিতুবাবুর পঞ্চমা কন্যা ভুবনেশ্বরী ট্যারা এবং একটু খোঁড়া, জন্মাবধিই এইরূপ। সে নাচিতেও পারে না, গাহিতেও পারে না। কোনও ধনী যুবক বা সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয় নাই। সে বেচারী রান্না করিত, কাপড় কাচিত, ঘুঁটে দিত আর মায়ের গঞ্জনা সহ্য করিত। তাহার দুর্দশায় অবশেষে যে সদাশয় ব্যক্তিটির মনে সহানুভূতি জাগিয়াছিল—তিনি ভাদুড়ি-কাকা। বলভদ্র ভাদুড়ি গুড়গুড়িমহাশয়ের সহকর্মী ও সমবয়সী। গাঁট্টাগোঁট্টা, আঁটসাঁট চেহারা! মাথার চুল, গোঁপের চুল, বুকের চুল—অর্থাৎ দৃশ্যমান অঙ্গের সর্বপ্রকার চুল, পাকা। বাঁধানো দাঁতগুলিও ধপধপে সাদা, চোখেই কেবল রঙীন চশমা। তিনি আদর করিয়া ভুবনেশ্বরীকে 'লেংড়ি' বলিয়া ডাকেন। তিনি মাঝে মাঝে তাহার জন্য কিছু কিনিয়া আনেন। কখনও একখানা রঙীন শাড়ি, কখনও বা টফি, কখনও চুল বাঁধিবার রঙীন ফিতা, কখনও বা 'ক্লিপ'। সকলের সম্মুখেই তিনি ডাক দেন—ওলো লেংড়ি, কোথায় তুই, দেখ তোর জন্যে কি এনেছি। বিগলিতা লেংড়ি ছুটিয়া আসে, লেংড়ির মা-ও আসেন। ভাদুড়িমহাশয় সকলের সম্মুখেই তাহাকে উপহারটি দিয়া কখনও থুতনি নাড়িয়া, কখনও বা গাল টিপিয়া তাহাকে আদর করেন। পিতৃবন্ধুর এবম্বিধ স্নেহ-প্রবণতায় কেহই অশোভন কিছু দেখিতে পায় না। ষষ্ঠকন্যা বগলাসুন্দরী সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পাড়ার কয়েকটি বখাটে ছোঁড়ার সহিত প্রায়ই সে শহরের বাহিরে যাইত একটা পোড়ো বাগানে আম-জাম-কাঁটাল-কুল-বৈচি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে, সেইখানেই এক বৈশাখের রুদ্র দ্বিপ্রহরে এক গোক্ষুর তাহাকে দংশন করে।

সপ্তমা কন্যা আন্নাকালীর পক্ষে সুতরাং আশা করা সম্ভব ছিল না যে অন্যান্য পিতার মতো গুড়গুড়িমহাশয়ও তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিবেন। সে বুঝিয়াছিল নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করিতে হইবে, নিজের মতে, নিজের পথে চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই! সম্বল রূপ-যৌবন, সম্বল নাচ-গান। নৃত্যবিশারদ স্বর্গীয় ভ্যাপা বোসের সাকরেদ হেমন্ত আইচ (বর্তমানে রিটায়ার্ড টিকিট কালেক্টার, কাঁচাপাকা গোঁফের বাটারফ্লাই,

একটু হাঁপানি আছে) তাহাকে যত্ন করিয়া নাচগান শিখাইয়াছিলেন। আন্নাকালী তাহাকে ভক্তিও করিত। হেমন্তবাবুর বয়স ষাট না হইয়া যদি চল্লিশও হইত, আন্নাকালী তাহাকেই হয়তো বিবাহ করিতে চাহিত। কিন্তু হেমন্তবাবুকে বিবাহ করা যায় না। বিবাহ করিয়া ছোট একটি সুখের সংসার পাতিবে ইহাই আন্নাকালীর স্বপ্ন। সভায় সভায় নাচিয়া বেড়াইতে তাহার ভাল লাগে না। পোস্টমাস্টারবাবুর স্ত্রী উষাকে তাহার হিংসা হয়। কি সুন্দর তাহার খোকাটি!

মলয়কুমারকে সত্যই তাহার পছন্দ হইয়াছিল। সিনেমাবিষয়ে পাকাপাকি কিছু একটা ঠিক করিবার পূর্বে মলয়কুমারের মতটা জানিবার তাহার ইচ্ছা হইল। এইজন্যই সে সময় চাহিয়াছিল।

গভীর রাত্রি। অনেকক্ষণ পূর্বেই দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্র চোরের মতো পূর্বাকাশে উঁকি দিতেছে। টোপিরামের নূতন মোটরখানা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ড্রাইভ করিতেছে মলয়কুমার, পাশে বসিয়া আছে আন্নাকালী।

"মলয়দা, কি বল তুমি, সিনেমায় নামব ?"

মলয়কুমার কোনও উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে গাড়ীর গতি-বেগ কমিতে লাগিল এবং অবশেষে তাহা একটা মাঠের ধারে থামিয়া গেল।

"মোটর থামালে কেন ?"

"এ আলোচনা মোটর চালাতে চালাতে করা যায় না। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে—"

আন্নাকালীর অধরে মুচকি হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি মলয়কুমার দেখিতে পাইল না।

"রাত হয়ে গেছে, কি বলবে তাড়াতাড়ি বল—"

"সংক্ষেপেই বলছি তাহলে। আমাকে ফেলে কোথাও তুমি যেতে পাবে না, কারণ তোমাকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারব না।"

ভ্রূলতা উৎক্ষিপ্ত করিয়া আন্নাকালী বলিল, "তার মানে ?—"

"মানে আবার কি। তুমি এখান থেকে চলে যাবে এ কথা আমি ভাবতেই পারি না। তোমাকে যেতে দেব না—"

আন্নাকালী মনে মনে খুশী হইল।

মুখে কিন্তু বলিল, "ওসব মৌখিক কবিত্ব অনেক শুনেছি। সিনেমায় ঢুকলে আরও অনেক শুনব। আমাকে যেতে দেবে না মানে ? আমাকে নিয়ে করবে কি তুমি !"

"সিনেমাই করব—"

"সিনেমা ?"

"হ্যাঁ, সিনেমা। আমি তোমাকে নিয়ে একটা নাটক লিখেছি জান ?"

"আমাকে নিয়ে ?—"

"হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে, তুমিই তার হিরোয়িন। বইটা কোলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ সব জায়গায় পাঠিয়েছি, কিন্তু কোনও ব্যাটা উত্তর পর্যন্ত দেয় নি। হয়তো আমার গল্পটাই মেরে অন্য নামে বের করবে শালারা। তাই ঠিক করেছি নিজেই প্রডিউস করব, আর আমার ধারণা বইটা শিওর 'হিট' করবে।"

"তুমি প্রডিউস করবে! টাকা পাবে কোথা ?"

"টোপিরাম দেবে।"

"তোমার মনিব টোপিরাম ? দেবে সে অত টাকা!"

"আলবৎ দেবে। মনিব টোপিরাম হয়তো দিত না, কিন্তু ভগ্নীপতি টোপিরাম দেবে। বাপ বাপ করে দেবে—"

"ভগ্নীপতি টোপিরাম মানে ? শেফালীদিদিকে উনি বিয়ে করেছেন নাকি ?"

"করেছেন। তবে আন্অফিসিয়ালি—"

"তার মানে কি ?"

"নেপথ্যে।"

আন্নাকালী ক্ষণকাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"হেসো না অনু, যখনই ও কথা ভাবি, আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। আমাকে ভোলাবার জন্যই এতবড় মোটরখানা ও আমাকে কিনে দিয়েছে। কিন্তু আমি ভোলবার ছেলে নই। ছারপোকার মতো ওকে পিষে মারব আমি একদিন, কিন্তু তার আগে আমাদের যতটা রক্ত ও শোষণ করেছে তার সবটা 'পাম্প' করে বের করে নেব। টাকা দিয়েই যদি সম্মানের দাম দিতে হয়, অনেক টাকা দিতে হবে ওকে। সিনেমার টাকার কথা কাল শেফুকে দিয়ে বলিয়েছিলাম, শালা রাজি হয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যেই হাজার দশেক দোব বলেছে। বলেছে কোলকাতায় একটি হাউসও খুলে দেবে শেফুর নামে, আর আমি হব সে হাউসের হর্তাকর্তা। তখন প্রডিউস করব আমার নাটকটা, আর তুমি হবে তার হিরোইন। প্রডিউস করবই। আর আমার বিশ্বাস নাটকটা জমবেও খুব—"

নাটক কিন্তু পরমুহূর্তে জমিয়া গেল অন্যভাবে।

"হ্যাণ্ডস্ আপ—"

মলয়কুমার আন্নাকালী দুইজনেই চমকাইয়া উঠিল। দেখিল, মোটরের দুইদিকে দুইজন পিস্তল উঠাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দৈত্যের মতো দুইটি মূর্তি। আন্নাকালী চিৎকার করিয়া উঠিতেই একজন আগাইয়া আসিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল।

"যদি প্রাণে বাঁচতে চাও টুঁ শব্দটি কোরো না। পিছনের সিটে গিয়ে চুপটি করে বস।"

তাহার পর মলয়কুমারকে বলিল, "ষ্টিয়ারিং হুইলটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমিও গিয়ে বস। মোটরটা আমাদের চাই! চেঁচামেচি, চিৎকার করলে বাধ্য হয়ে 'স্যুট' করতে হবে। চুপ করে থাকলে কিছু বলব না—"

মলয় এবং আন্নাকালী বিনা বাক্যব্যয়ে পিছনের সিটে গিয়া বসিল। বসিবার সঙ্গে সঙ্গে একজন আসিয়া তাহাদের হাত, পা, মুখ বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "চুপ করে থাক। কিছুপরেই তোমাদের ছেড়ে দেবো—"

মিলিটারী পোশাক, চোখে গগল্‌স, হাতে রিভলভার—কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহাদের হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি ঘুরিয়া ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে কোন্‌দিকে যে প্রধাবিত হইতে লাগিল তাহা মলয়কুমার বুঝিতে পারিল না।

ষ্টিয়ারিং ধরিয়াছিল বরেন আর তাহার পাশে বসিয়াছিল শিবাজী ওরফে সনৎ সেন। বরেন এবং শিবাজী ভবানী পাঠক, রবিনহুডের আদর্শে অনুপ্রাণিত। উভয়েই স্বকীয় বুদ্ধিবলে এবং বাহুবলে অন্যায়ের প্রতিকার করিতে চান। তাঁহাদের বিশ্বাস অন্য কোন উপায় আশুফলপ্রদ নয়। আইনসঙ্গত-পদ্ধতিতে নাকে কাঁদিয়া আবেদন, নিবেদন করিলে সময় ও শক্তির অপচয় হয় মাত্র, কোন ফল হয় না। বুদ্ধিমান পাপীরা আইনের সাহায্য লইয়াই প্রকাশ্য দিবালোকে পাপাচরণ করে। যখন অধিকাংশ লোকই ধর্ম-বুদ্ধি-বিবর্জিত হয় তখন আইনের কোন মূল্য থাকে না। অর্থলোভে বুদ্ধিমান আইন-ব্যবসায়ীরা অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন, ঘুষ খাইয়া পুলিস কর্মচারীরা অপরাধীকে ছাড়িয়া দেন, বিচারক পর্যন্ত সুবিচার করেন না। দেশের যাঁহারা শিরোমণি তাঁহারা যখন পাপাসক্ত হন, তখন অধর্মই মুখোশ পরিয়া বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতা করে, রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া অভিনন্দিত হয়, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিতে সাহস করে। ধার্মিক, দরিদ্র জনসাধারণ তখন নিষ্পিষ্ট হয়, অধার্মিক, ধনী-সম্প্রদায় রক্ষা পায়। জুতাইয়া যাহাদের পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলা উচিত, আইন গণ্ডার-চর্ম-নির্মিত ঢালরূপে অথবা লৌহনির্মিত বর্মরূপে তাহাদের রক্ষা করে। দেশের এরূপ অবস্থায় দেশের সুস্থ যৌবন যদি নিজের পৌরুষে দুষ্টের দমন করিয়া প্রকৃত শিষ্টের পালন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে দেশ রক্ষা পায়, দুর্দিনের মেঘ কাটিয়া গিয়া সুদিনের আলো দেখা দেয়। ইহা করিতে গিয়া যদি দুই একটা খুনজখম করিতে হয়, করিতে হইবে। যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হয়, ঝুলিতে হইবে।

এই মনোভাবদ্বারা চালিত হইয়া বরেন্দ্র এবং শিবাজী কলেজজীবন ত্যাগ করিবার পর হইতে যে-সব কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা রোমাঞ্চকর।

বর্তমানে তাঁহারা কালোবাজারীদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া দুঃস্থ বাস্তহারাদের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা যে বাঙালী তাহা তাঁহাদের পোশাক দেখিয়া বা কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিবার উপায় নাই। চার, পাঁচটা ভাষা অনর্গল বলিতে পারেন, পরিধানে মিলিটারি পোশাক। তাঁহারা বাঙালী না বিহারী, মারহাট্টি না

গুজরাটি, চেহারা দেখিয়া বোঝা শক্ত। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, আমরা ভারতবাসী, ইহার বেশী আমাদের আর কোন পরিচয় দিবার আপাতত প্রয়োজন নাই।

বরেনের নাম বরেনই, কারণ এইনামে সে স্বাভাবিক, সামাজিক জীবনও যাপন করে। শিবাজী এবং দলের অন্যান্য সকলের কিন্তু বহু নাম। পুলিসের খাতায় ইহারা জনসন, মুরাঠা, হাবসি, ছুট্টু, রামদেও, ছক্কন, ঘোশী, জাগুয়ার, কারেলাল, ঘেট্টা, কাংড়া প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়া আছে। পুলিসকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই ইহারা নিজেদের উদ্ভট নামকরণ করিয়া তাহা পুলিসের কর্ণগোচর করিয়া দেয়। শিবাজীর আসল নাম অমৃত চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এ নামে তাহাকে কেহ আর ডাকে না, দলের মধ্যে সে শিবাজী বলিয়া পরিচিত।

প্রায় ঘণ্টা দুই চলিবার পর মোটরটি যেস্থানে আসিয়া থামিল সেস্থান জনমানব-হীন। চাঁদ উঠিয়াছিল, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মলয়কুমার দেখিতে পাইল রাস্তা হইতে বেশ কিছু দূরে একটা বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের মতো রহিয়াছে। ধ্বংসস্তূপের পিছন-দিকেও খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাইতেছে। শিবাজী সেইদিকেই মোটরটা লইয়া যাইতে নির্দেশ দিল।

আরও এক ঘণ্টা পরে।

চাঁদ একটা বিরাট বৃক্ষের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছিল। সেই ফাঁকা জায়গার মোটরের আড়ালে যেস্থানে তাহারা বসিয়াছিল তাহা আলো-আঁধারির কারুকার্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদের মনে কোন কোমলতা সঞ্চার করিতে পারে নাই। শিবাজী পিস্তল উঁচাইয়া বসিয়াছিল। মলয়কুমার নিজের এবং আন্নাকালীর জীবন-কাহিনী অকপটে বর্ণনা করিতেছিল। বর্ণনা শেষ হইলে শিবাজী প্রশ্ন করিল।

"যা বললে সমস্ত সত্যি ?

"সমস্ত।"

"আমরা খোঁজ করে দেখব। যদি সত্যি হয় তোমাদের কিছু বলব না, কিন্তু যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমাদের কেটে কুচিয়ে কাবাব করে খেয়ে ফেলব।"

বলিয়া সে কোমর হইতে প্রকাণ্ড একটা ছোরা বাহির করিয়া মলয়কুমারের হাতে দিল।

"ধারটা পরীক্ষা করে দেখতে পার।"

মলয়কুমার নীরবে পরীক্ষা করিয়া সেটা ফিরাইয়া দিতেছিল।

শিবাজী বলিল, "ওঁকেও দাও। উনিও পরীক্ষা করে দেখুন।"

আন্নাকালীও পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

"আমরা এখন চললুম। তোমরা এখানেই থাক। কাল রাত্রে এসে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।"

মলয়কুমার ও আন্নাকালীকে সঙ্গে লইয়া শিবাজী সেই ধ্বংসস্তুপের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইতে ধ্বংসস্তূপ কিন্তু ভিতরে ঘর ছিল। একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া শিবাজী টর্চ জ্বালিয়ে তাহাদের আহ্বান করিল। মলয়কুমার একটি কথাও বলে নাই। আন্নাকালীর ভয় করিতেছিল। শিবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার বড় ভয় করছে। আপনার পায়ে পড়ি, দয়া করে ছেড়ে দিন আমাদের।"

"বেশী বকবক করলে মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করে দেব। আমার দয়ামায়া নেই, তোমার নাকি-কান্না শোনবার সময়ও নেই। এস—"

গত্যন্তর ছিল না।

বরেন পূর্বেই আসিয়াছিল। ঘরের মেজেতে স্তূপীকৃত ইঁট পাটকেল সরাইতেছিল সে। একটা ছোট লণ্ঠনও যোগাড় করিয়াছিল।

"কতদূর?" শিবাজী প্রশ্ন করিল।

"প্রায় হয়ে এসেছে। তোমরাও হাত লাগাও না—"

শিবাজী মেজেতে টর্চ ফেলিয়া হঠাৎ পিছাইয়া আসিল।

"এ কি—"

"গোখরো সাপ একটা। আর একটু হলে কামড়াত আমাকে—"

"এখনও মরেনি দেখছি।"

শিবাজী ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। সাপের ল্যাজটা কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল।

"না মরুক, খুলিটা উড়ে গেছে।"

"গুলি করেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"একটা গুলি বাজে খরচ হয়ে গেল। টোটা যোগাড় করাই মুশকিল। অনেকদিন এখানে আসা হয়নি কিনা, তাই সাপ ঢুকেছে। কিছু কার্বলিক এসিড আনতে হবে আবার।"

মলয়কুমার ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি এই ঘরে থাকতে হবে?"

"না। চটপট মেজেটা পরিষ্কার করলেই সেটা বুঝতে পারবে। নাও, হাত লাগাও।"

সকলে মিলিয়া মেজেটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। দেখা গেল, মেজেতে একটি লৌহকপাট রহিয়াছে, কপাটে বিরাট একটা তালা লাগানো!

শিবাজী তালা খুলিয়া কপাটটা টানিয়া তুলিল। নীচে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

"মই দাও—"

বরেন তাহার কাঁধে-ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ হইতে দড়ির মইটি বাহির করিয়া দিল। মলয়কুমার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, মেজেতে দুইটি লোহার হুকও শক্ত করিয়া

পোঁতা আছে। মইটি অনায়াসেই ঝুলাইয়া দেওয়া গেল। বয়েন নামিল সর্বাগ্রে। তাহার পর শিবাজী লণ্ঠনটি দড়ি বাঁধিয়া নামাইয়া দিল।

"এইবার তোমরা নাব একে একে।"

"ওই গর্তের ভিতর থাকতে হবে আমাদের?"

আন্নাকালীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

শিবাজী স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "গর্ত নয়, ঘর আছে নিচে। নাবলেই দেখতে পাবে।"

আন্নাকালী করুণদৃষ্টিতে একবার মলয়কুমারের মুখের দিকে চাহিল, তারপর ঝুলিয়া পড়িল।

মলয়কুমারকেও অনুসরণ করিতে হইল। সকলের শেষে নামিল শিবাজী।

নীচে সত্যই ঘর ছিল। মলয়কুমার ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কৌতূহলও উদ্রিক্ত হইয়াছিল। তাহার বলিষ্ঠ যৌবন এই লোক দুইটির দুঃসাহসিক কার্যকলাপ সবিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "মাটির নিচে ঘর আপনারাই বানিয়েছেন?"

শিবাজী উত্তর দিল।

"বানিয়েছিলেন আমার এক পূর্ব-পুরুষ জমিদার। তিনিও ডাকাত ছিলেন শুনেছি। লুঠকরা ধনরত্ন এইখানে রাখতেন। এখন আমার কাজে লাগছে!"

"এত নিচে ঘর বানিয়েছিলেন, আশ্চর্য তো!"

"এত নিচে ছিল না। ভূমিকম্প হওয়াতে আরও নিচে নেমে গেছে। পাশে আরও দুখানা ঘর আছে। তোমরা দু'জনে দুটো ঘরে আলাদা থাকবে। সমস্ত বন্দোবস্ত আছে, এমন কি আলাদা বাথরুম পর্যন্ত। কোনও কষ্ট হবে না। দিন দুইয়ের মত খাবারও আছে। অবশ্য ভাতটাত পাবে না, ছাতু আছে এক হাঁড়ি। দু'জায়গায় ভাগ করে নাও সেটা। কাল যদি পাই, পাউরুটি আনব। ওসব প্রেম-ট্রেম, সিনেমা-টিনেমা এখন চলবে না, বুঝলে? দেশের এখন অত্যন্ত দুরবস্থা, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন এই এখন আমাদের প্রধান কাজ, দেশকে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং কোনরকম ন্যাকামি ছিঁচকেমি চলবে না এখন। আমাদের সঙ্গে যদি আসতে চাও ওসব ত্যাগ করে আসতে হবে। এ পথে পুরস্কার কিছুই নেই, একটু অসাবধান হলেই মৃত্যু। কংসরাজার চরেরা চারদিকে ঘুরছে। তোমাদের সব কথা বলেছি, চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও দিচ্ছি, নির্জনে ভাল করে ভেবে দেখ কি করবে। তোমরা যদি আমাদের দলে যোগ দাও খুশী হব। দেশের যত যুবক-যুবতী আমাদের দলে আসে ততই মঙ্গল। পঙ্কোদ্ধার করতে অনেক লোক চাই।"

শিবাজীর এই সব কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ এখনকার কথাবার্তার ধরনধারণে একটা কোমলতার আভাস পাইয়া আন্নাকালীর মনে একটু সাহস সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সে ঘাড় বাঁকাইয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "আমাদের তো আপনারা চেনেন না, আমরা যদি আপনাদের দলে ঢুকে বিশ্বাসঘাতকতা করি।"

"করে দেখই না একবার।"

সহসা শিবাজীর কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া গেল।

"বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের হাত থেকে আজ পর্যন্ত নিস্তার পায়নি কেউ। অনেক বিশ্বাসঘাতককে কেটে কুচিয়ে কাবাব করে খেয়েছি। তোমরা যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা কর তোমাদেরও খাব। বরেন—"

বরেন পাশের ঘরে ঢুকিয়াছিল। সে একটা টিন হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"ওটা কি—"

"এতে দেখছি কিছু লাড্ডু আছে।"

"ভাগ করে দিয়ে যাও এদের। আর সেই 'জারটা' নিয়ে এস তো—"

বরেন চলিয়া গেল এবং একটা কাঁচের 'জার' লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার উপর টর্চের আলো নিক্ষেপ করিয়া শিবাজী বলিল, "ভাল করে দেখে নাও—"

আন্নাকালী দেখিল, জারের ভিতর জলের মতো কি যেন রহিয়াছে এবং তাহাতে ছোট ছোট কি সব ডোবানো আছে। দেখিতে অনেকটা আমসির মতো।

"কি ওগুলো?"

"বিশ্বাসঘাতকদের জিব। কেটে নিয়ে ফর্মালিনে ডুবিয়ে রেখেছি—"

"ফর্মালিন কি?"

"একরকম ওষুধ।"

বরেন 'জার'টি পুনরায় পাশের ঘরে রাখিয়া আসিল। হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল, "এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে—"

"এদের সব ব্যবস্থা করে দাও আগে।"

"দিয়েছি। একটা ঘরে বালতিটা দিলাম, আর একটা ঘরে কুঁজো, গেলাসও দিয়েছি—"

"এস।"

একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া শিবাজী মলয়কুমারকে বলিল, "তুমি এই ঘরে থাক—। তোমার নাম কি?"

"মলয়কুমার।"

"মলয়কুমার টলয়কুমার চলবে না। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, নাম বদলাও।"

আন্নাকালীর দিকে ফিরিয়া শিবাজী প্রশ্ন করিল, "তোমার নাম?"

"আন্নাকালী।"

"এ নামও চলবে না।"

মলয়কুমার লজ্জিতকণ্ঠে বলিল, 'আমি ঠিক করেছিলাম ওকে মণিকা বলে ডাকব।"

"ঠিক করবার সময় দ্রৌপদী, গান্ধারী, বিহুলা, লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতী এসব নাম মনে আসে নি? এই ঘুঁটকো কালো মেয়ের মণিকা নাম মানাবে?"

মলয়কুমার চুপ করিয়া রহিল। আন্নাকালী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।"

বরেন মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বলিল।

"হ্যাঁ, চল—"

দুইজনকেই দুই ঘরে তালা বন্ধ করিয়া বরেন ও শিবাজী চলিয়া গেল।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে শিবাজী একা ফিরিল। তাহার অদ্ভুত পোশাক দেখিয়া মলয়কুমার চমৎকৃত হইয়া গেল, আন্নাকালী হাসিয়া ফেলিল। শিবাজী কাবুলীওলার পোশাক পরিয়া আসিয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টা একা থাকিয়া মলয়কুমার এবং আন্নাকালীর চরিত্রেরও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাহারা দুইজনেই মর্মে মর্মে যাহা অনুভব করিতেছিল ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলা কঠিন।

কাবুলীর চাঁপদাড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া শিবাজী বলিল, "বেশীক্ষণ বসবার সময় নেই আজ। তোমরা কে কি ঠিক করলে বল—"

মলয়কুমার বলিল, "আমি কি আর ঠিক করব। আপনি যা বলবেন তাই করব।

আন্নাকালীর উত্তর শুনিয়া শিবাজী একটু বিস্মিত হইল। এ উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই।

আন্নাকালী বলিল, "এমনভাবে বন্দী করে রাখলে কি কিছু ঠিক করা যায়? প্রাণের ভয়ে আপনি যা বলবেন তাতেই সায় দিতে হবে। আমাদের স্বাধীন মতামত জানতে হলে আমাদের স্বাধীন করে দিতে হবে।"

শিবাজী কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল।

"বেশ, তাই হবে। তোমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা যদি আমাদের দলে যোগ দিতে চাও, তাহলে যে মাঠে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই মাঠে সাতদিন পরে রাত একটার সময় এস। আমি থাকব সেখানে। সাতদিনে আশা করি যা হয় একটা ঠিক করে ফেলতে পারবে। যদি আমাদের দলে যোগ দেওয়াই ঠিক কর, তাহলে টোপিরাম যে দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল সেটাও হাতিয়ে নিয়ে এস। রেফিউজিদের জন্যে অনেক টাকা লাগছে। আর আমাদের দলে যোগ না দিতে চাও, দিও না, কিন্তু আমাদের কথা কাউকে বোলো না। যদি বল তাহলে তোমাদের জিবও ওই জ্বারে গিয়ে হাজির হবে। ওঠ তাহলে, তোমাদের রেখে আসি—"

মোটর পুনরায় সেই মাঠের ধারে আসিয়া থামিল।

"মোটরটা দেখবেন না?"

"না।"

"টোপিরামকে কি বলব ?"

"বোলো বর্ধমানে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম, মোটরটা সেখানে খারাপ হয়ে যাওয়াতে একটা ওয়ার্কশপে রেখে এসেছি। কিম্বা যা খুশী বানিয়ে বোলো। আসল খবরটা কেবল বোলো না। আমি চললাম তাহলে—"

শিবাজী চলিয়া গেল।

সপ্তম দিন রাত্রি সাড়ে এগারোটা হইতে মলয়কুমার এবং আন্নাকালী সেই মাঠে শিবাজীর প্রতীক্ষায় একটি গাছের তলায় বসিয়াছিল। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সাড়ে বারোটার সময় আন্নাকালী বলিল, "একটা মোটরের শব্দ হচ্ছে—"

মলয়কুমারও শব্দটা শুনিয়াছিল।

বলিল, "মোটরকার নয়, মোটর বাইক।"

বাইকটা মাঠের ধারেই থামিল। বাইক হইতে নামিলেন একজন দীর্ঘকায় পুরুষ। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে তিনি মাঠের দিকে আগাইয়া আসিলেন এবং মাঠের ভিতর দাঁড়াইয়া চারিদিকে টর্চের আলো ফেলিতে লাগিলেন। বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান মলয়কুমার এবং আন্নাকালীর গায়েও টর্চের আলো পড়িল। দীর্ঘকায় পুরুষটি তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আন্নাকালী চুপিচুপি বলিল, "এ তো অন্যলোক দেখছি। শিবাজীও নয়, বরেনও নয়। পোশাক দেখে পুলিসের লোক মনে হচ্ছে।"

"দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।"

"দীর্ঘকায় পুরুষটি তাহাদের নিকটে আসিয়া থামিয়া গেলেন।

"আপনারা কে, এতরাত্রে এখানে কি করছেন ?"

"মাঠে বেড়াতে এসেছি।"

"এত রাত্রে বেড়াতে আসাটা অস্বাভাবিক নয় কি ?"

"আমরা একটু বেশী রাত করেই বেড়াই। সন্ধ্যাবেলা সুবিধা হয় না।"

মলয়কুমার আড়চোখে আন্নাকালীর দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। আন্নাকালীও মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া মস্তক নত করিল।

"বুঝেছি। আপনাদের বাড়ী কি এখানেই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পরিচয়টি জানতে পারি কি ?"

"আমি পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টর। শিবাজী নামে একটা ডাকাতের আজ এখানে আসবার কথা, তারই সন্ধানে এসেছি।"

"ও বাবা! তাহলে আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, কি বলেন ?"

"না, নিরাপদ নয়। অবস্থা বুঝে আমি না হয় আপনাদের ছেড়ে দিলাম, কিন্তু অন্য অফিসার এত রাত্রে আপনাদের এখানে দেখলে ছেড়ে নাও দিতে পারেন।"

"অন্য অফিসারও আছে না কি ?"

"সমস্ত মাঠটাকে ঘিরে আছি আমরা।"

"কি সর্বনাশ !"

'আপনারা বাড়ি যান।"

টর্চ ফেলিতে ফেলিতে পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্‌টর চলিয়া গেলেন। একটু পরেই একটা হুইস্‌ল বাজিয়া উঠিল। মাঠের অন্ধকার বিদীর্ণ হইয়া গেল যেন। তাহার পর মোটর-বাইকটা গর্জন করিয়া উঠিল এবং গর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল। নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল খানিকক্ষণের জন্য।

আন্নাকালী ছোট্ট একটি হাই তুলিয়া বলিল, "আর কি আমাদের অপেক্ষা করা উচিত ?"

মলয়কুমারের পকেটে ছোট একটি টর্চ ছিল। তাহারই সাহায্যে সে হাতঘড়িটা দেখিল।

"ঠিক একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর পাঁচ মিনিট বাকী আছে।"

"পুলিসে ধরে যদি।"

"ধরুক। শিবাজী যদি না আসেন তাহলে বাড়িতেও পুলিস গিয়ে হাজির হবে শীগ্‌গির। অতবড় মোটরকারটা হজম করা শক্ত হবে। টোপিরাম আজই বলছিল, তুমি বর্ধমান থেকে গাড়িটা নিয়ে এস।"

"আমার মাও জিজ্ঞেস করছিল মলয়ের সঙ্গে বর্ধমানে গিয়ে কোথায় ছিলি, হোটেলে নাকি ?"

"আমার ভয় ছিল রাগারাগি করবেন হয় তো—"

"রাগারাগি করবেন ! খুশীই হয়েছেন বরং। ছেলের চাকরি হলে যেমন খুশী হতেন তেমনি—"

আন্নাকালীর কথার উষ্মায় মলয়কুমার অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চারিদিকের অন্ধকার যেন থমথম করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আন্নাকালী পুনরায় বলিল, "এ নরক থেকে উদ্ধার যে কবে পাব জানি না। নমিতাদি কি সাধে আত্মহত্যা করেছেন—"

"নমিতাদি কে—"

"সেজদির একজন বন্ধু। তার বাপ নিজে লোক জুটিয়ে আনত ! এতদিন ছিল একটা বুড়ো এস. ডি. ও. তারপর এসে জুটেছিল নিমাই ডাক্তার, তারপর—"

আন্নাকালীর কথা শেষ হইল না। শিবাজীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"এই যে তোমরা এসেছ দেখছি—"

আন্নাকালী তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল,

"আপনাকে ধরবার জন্তে একজন পুলিস অফিসার ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে এসেছিল একটু আগে—"

শিবাজী এ সংবাদে বিশেষ বিচলিত হইল না।

প্রশ্ন করিল, "তোমরা কি ঠিক করলে ?"

"আপনার সঙ্গে যোগ দেব।"

"দুজনেই ?"

"দুজনেই।"

মলয়কুমার বলিল, "টাকাটাও এনেছি—"

"বাঃ। নগদ তো ?"

"নগদ। টোপিরাম নিজে উইথড্র করে দিয়েছে।"

"বেশ, চল তাহলে। নাম বদলেছ ?"

"বদলেছি। আমি আজ থেকে গোপীনাথ। শহীদ গোপীনাথের পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল এককালে—"

"বেশ। আর তুমি ?"

আন্নাকালী বলিল, "বাপমায়ের দেওয়া নাম বদলাবার আমার ইচ্ছে নেই। নাম বদলে কি হবে। যদি বদলাতেই হয় মণিকাই হোক, মলয়দা যখন অত পছন্দ ক'রে রেখেছেন—"

"বেশ মণিকাই থাক। আমি কিন্তু তোমাকে লক্ষ্মীবাই বলে ডাকব। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই যেমন বলেছিল—মেরী ঝান্সী নেহি দেউঙ্গী, তোমাকেও তেমনি বলতে হবে, মেরা ইমান নেহি দেউঙ্গী, মেরী ইজ্জত নেহি দেউঙ্গী—"

"বেশ। এখানে কিন্তু থাকা নিরাপদ নয়। পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরটা হয়তো আবার এসে পড়বে—"

শিবাজী হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম দেখতে যে, তোমরা যদি এসে থাক, তোমাদের ভাবগতিক কি রকম। তোমরাও তো পুলিস সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতে।"

"পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে ভাব আছে নাকি আপনার—"

"আছে বই কি দু'একজনের সঙ্গে। কিন্তু এখন যে পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছিল সে নকল পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর।"

"তাই না কি !"

আন্নাকালী সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

"চমৎকার 'মেক্ আপ' করেছিল তো।"

"আমাদের দলের লোক। আলাপ হবে ক্রমশঃ—"

তাহারা মাঠ ছাড়াইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। গাছের অন্ধকারে যে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে তাহা প্রথমে মলয়কুমারের নজরে পড়ে নাই।

"চল, ওঠ—"

"সে মোটরটা কোথায় গেল ?"

"সেইটেই। রংটা কালো করে দিয়েছি—"

"কোথা করলেন ? স্প্রে পেন্টিং করিয়েছেন তো ?"

"হ্যাঁ। কোলকাতায় আমাদের নিজেদেরই ওয়ার্কশপ আছে ; সেখানেই করিয়েছি।"

"ও।"

"চল এবার। দু'দিন ঘুম হয়নি। একটু ঘুমুতে হবে—। তোমাদের কি এখনও আলদা আলাদা ঘরে বন্ধ করে রাখতে হবে নাকি ?"

মণিকা উত্তর দিল—"আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন—"

"তোমাকে ?"

শিবাজী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গোপীনাথের দিকে চাহিল।

ঈষৎ ইতস্তত করিয়া গোপীনাথও বলিল, "আমাকেও ?"

"বেশ, চল।"

সাতদিনের মধ্যেই নবজাতক গোপীনাথ ও মণিকা শিবাজীর দলের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল। তাহারা লক্ষ্য করিল, বরেন দলের সঙ্গে থাকে না। মাঝে মাঝে আসে, আবার যায়।

"বরেনবাবু থাকেন কোথা—"

মণিকাই একদিন প্রশ্ন করিল। গোপীনাথের মনেও এ প্রশ্ন আসিয়াছিল কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। শিবাজীকে অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া তাহার সহিত তাহার আচরণ স্বচ্ছন্দ হয় নাই। মণিকার কিন্তু হইয়াছিল।

শিবাজী উত্তর দিতে আপত্তি করিল না।

"বরেন নিজের বাড়ীতে থাকে। শিকারের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে আসে কেবল। তোমাদের খবর ওই এনেছিল।"

"ও! কি করেন উনি ?"

"লাইফ ইনসিওরেন্সের দালালী। মাঝে মাঝে টিউশনিও করে। এম-এ পাশ, মুখ্যু নয়—"

"আপনাদের দলে আর কে কে আছে ?"

"অনেকে আছে। প্রত্যেক প্রদেশেই লোক আছে আমাদের। বিহারে গণপৎ পাণ্ডে, পাঞ্জাবে ভার্গব, উত্তরপ্রদেশে কুকি, মহারাষ্ট্রে শঙ্কর শাস্ত্রী, গুজরাটে কানহাইয়া —আরও অনেক আছে। যদি টিকে থাকতে পার সকলের সঙ্গেই পরিচয় হবে ক্রমশ। এখন তোমাদের কাজ বলে দি শোন। তোমরা ছদ্মবেশে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াবে,

আর কালোবাজারীদের সন্ধান রাখবে, আর ঘুষখোর অফিসারদের নামসংগ্রহ করবে। আপাতত এই তোমাদের কাজ—"

গোপীনাথ হাসিয়া বলিল, "আজকাল শুনছি সব অফিসারই ঘুষখোর—"

"অকাট্য প্রমাণ পেলে সব কটাকেই শেষ করতে হবে তাহলে। স্লেট মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।"

মণিকা প্রশ্ন করিল—'আমাকে কি ছদ্মবেশে মানাবে বলুন তো—"

"তোমাকে ব্যাটাছেলে সেজে থাকতে হবে। আজই চুল ছেঁটে ফেল। কাবুলী, ইরানী বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বেশে মানাবে তোমাকে, আর একটা কথা, দুজনে কখনো একসঙ্গে থেকো না।"

গোপীনাথ মনের কথাটি চাপিয়া রাখিয়াছিল। এইবার ব্যক্ত করিল।

"আমি মনে মনে শপথ করেছি টোপীরামকে হত্যা করব।"

"ওকে বাঁচিয়ে রাখাই ভাল। মাঝে মাঝে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা যাবে। টাকার খুব দরকার যে। ওকে মেরে ফেলতে চাইছ কেন?"

গোপীনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, "ও আমার মা আর বোন দুজনকেই নষ্ট করেছে।"

"তা যদি হয় তাহলে তোমার মা আর বোনকেও শেষ করতে হয়। তারাও পাপীয়সী।"

"দারিদ্র্যের জন্যে বাধ্য হয়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে।"

"গলায় দড়ি দিতেও পারত। পুড়ে মরতে পারত। খুব দরিদ্র অথচ খুব ভাল মেয়ের অভাব নেই এদেশে। পাকিস্তানের গুণ্ডারা সত্যিকারের ভালো মেয়েদের নষ্ট করতে পারে নি। তারা সবাই আত্মসম্মান বাঁচিয়েছে। এদেশেই জহরব্রত করেছিল একদিন মেয়েরা—"

শিবাজীর চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো লাল হইয়া উঠিল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শিবাজী বলিল, "দারিদ্র্য! দারিদ্র্যের পঙ্কেই সতীত্বের কমল ফুটতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। টোপীরামকে মারতে হলে ওদের রেহাই দেওয়া চলবে না।"

গোপীনাথ নির্বাক হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ গোপীনাথের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া শিবাজী অবশেষে বলিল, "সে ব্যবস্থা যথাকালে করব আমি। তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আজই ওদের নাম লিস্টে চড়িয়ে নেব আমি। তোমরা আগে লক্ষ্যভেদ করতে শেখ, টারগেট প্র্যাকটিস কর, তারপর ওসব কথা ভেব।…"

এইভাবেই চলিতে লাগিল।

গোপীনাথ এবং মণিকা ভূগর্ভস্থ সেই ঘরে বসিয়া মোমবাতি জ্বালাইয়া লক্ষ্যভেদের সাধনা করিতে করিতে ক্রমশ যে যোগ্যতা অর্জন করিল তাহা সুলভ নহে। শিবাজী সমস্ত দিন থাকিত না। রাত্রে আসিত। নানা যানে, নানা বেশে। কখনও পদব্রজে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখন মোটরযোগে, কখনও বাঙালীবাবুর পোশাকে, কখনও মিলিটারি বেশে, কখনও মাড়োয়ারীর পাগড়ি মাথায় দিয়া। কখনও চোখে চশমা, কখনও সূচ্যগ্র ফরাসী-দাড়ি, কখনও জমকালো জুলফি। গোঁফ কখনও পতঙ্গী হিটলারি, কখনও শৃঙ্গী কাইজারি, কখনও বাবরি চুল, কখনও আবক্ষ দাড়ি—নানা ছদ্মবেশে সে যে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইত, গোপীনাথ বা মণিকার জানিবার উপায় ছিল না। তাহারা শুধু জানিত শিবাজী রাত্রে আসিবে, সঙ্গে করিয়া আনিবে কিছু খাবার এবং টাকা। প্রত্যহই সে টাকা লইয়া আসিত এবং ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যেই কোথাও লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু কোথায় রাখিত তাহা গোপীনাথ বা মণিকা জানিতে পারে নাই, জানিবার চেষ্টাও তাহারা করিত না। আর একটা ব্যাপারও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। শিবাজী যে গোপনে তাহাদের দুইজনের আচরণ লক্ষ্য করিতেছে, এ খবরও তাহারা জানিত না। একদিনের ঘটনায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

শিবাজীর সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীমতী মণিকার চরিত্রে যে পরিবর্তন দেখা দিল তাহা বিস্ময়কর। সে যেন শিখার মতো জ্বলিতে লাগিল। একখণ্ড মূল্যবান হীরকখণ্ড অনাদরে ধূলায় মলিন হইয়া যেন পড়িয়াছিল, পরিষ্কৃত হইবামাত্র তাহার স্বাভাবিক দ্যুতি ফিরিয়া আসিল। লক্ষ্যভেদের ব্যাপারেও অল্পসময়ের মধ্যে যে দক্ষতা সে অর্জন করিল তাহা অসাধারণ। গোপীনাথের মধ্যে কিন্তু কিঞ্চিৎ গলদ থাকিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্যভেদ ব্যাপারে সে-ও অবশ্য কম কৃতিত্বলাভ করে নাই, শাখায় দোদুল্যমান আমকে সে এক গুলিতেই ভূশায়ী করিতে পারিত, কিন্তু দেখা গেল চরিত্রে তাহার রন্ধ্র আছে। সহসা একদিন আবেগকম্পিত-কণ্ঠে সে বলিয়া বসিল, "মণিকা, আমার স্বপ্ন কি কখনও সফল হবে না—"

"কি স্বপ্ন?"

"তোমাকে পাবার স্বপ্ন।"

বলিয়া তাহার হাত ধরিল।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া মণিকা সঙ্গে সঙ্গে তর্জন করিয়া উঠিল, তাহার নয়নদ্বয় হইতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। হঠাৎ কোমরে-গোঁজা রিভলভারটা তুলিয়া বলিল, "খবরদার, ওকথা দ্বিতীয়বার যদি উচ্চারণ করেছ, মাথার খুলি উড়িয়ে দেব তোমার।"

গোপীনাথ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কথাটা বলিবার পূর্বে তাহার নিজের মানসিক ভারসাম্যটাও বিচলিত ছিল, মণিকার ধমক খাইয়া সে একেবারে হাঁটু গাড়িয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, করজোড়ে বলিল, "আমাকে মাপ কর, আর কখনও বলব না—"

"আমার পা ছুঁয়ে বল, মা আমাকে মাপ কর। তাহলে করব।"

গোপীনাথ অপ্রস্তুতমুখে তাহাই বলিল।

ঠিক ইহার পরই যাহা ঘটিল তাহা আরও অপ্রত্যাশিত। কপাট ঠেলিয়া শিবাজী প্রবেশ করিল এবং মণিকার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "বাঃ খুশী হলাম। বকশিশ দেব তোমাকে—"

গোপীনাথের দিকে শিবাজী যখন তাকাইল তখন কিন্তু তাহার দৃষ্টি অগ্নিগর্ভ।

"তোমার যা ব্যাপার দেখছি তাতে তোমাকে কেটে কুচিয়ে কাবাবই করে ফেলতে হবে—"

তাহার পর বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—"হ্যাণ্ডস্ আপ—" ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, 'ভগবানের নাম করতে চাও তো কর—"

মণিকা হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল।

বলিল, "আমাকে বকশিশ দেবেন বললেন, ওর প্রাণটাই আমাকে দিন।"

"কি করবে তুমি ছাগলটাকে নিয়ে? বোকা পাঁঠা একটা—"

"না, ও মানুষ। মানুষ বলেই একটু-আধটু দুর্বলতা আছে। সব শুধরে যাবে। একটু সময় দিন ওকে। আমাকে ও মা বলেছে, আমি ওকে মাপ করেছি।"

"এখানে কিন্তু ওকে আর রাখব না।"

"তা যেখানে খুশী রাখুন প্রাণে মারবেন না।"

"বেশ।"

সেইদিনই শিবাজী গোপীনাথকে লইয়া চলিয়া গেল। গোপীনাথ কোনও প্রতিবাদ করিল না। শিবাজী তাহাকে লইয়া গিয়া সমর্পণ করিল ভার্গবের হস্তে। ভার্গবের সহিত তাহাদের দেখা হইল গঙ্গা-তীরের একটা পোড়ো নীল-কুঠির ধারে। শিবাজী ভার্গবকে বলিল, "একে এবং একটি মেয়েকে নূতন ভর্তি করেছি। একে তুমি তোমার হেফাজতে রাখ। এক নম্বর ক্যাম্পে রেখেছিলাম, একটু বদচাল লক্ষ্য করেছি, তাই তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি। তেমন যদি কিছু লক্ষ্য কর, দয়া-মায়া করবার দরকার নাই।"

"বেশ।"

ভার্গবকে দেখিয়া গোপীনাথ আশ্চর্য হইয়া গেল। ভার্গব নামটা মনে যে ধরনের জমকালো ছবি আঁকে, ভার্গব মোটেই সেরকম নয়। ছিপছিপে, পাতলা, লম্বা লোক। শরীরের উপরার্ধ সামনের দিকে সর্বদা ঝুঁকিয়া আছে। যখন দাঁড়াইয়া থাকে মনে হয় যেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন মূর্ত হইয়াছে, কিম্বা যেন একটা প্রকাণ্ড কাস্তে হাতলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইবার এই বিশেষ ভঙ্গী যে লোকের চোখে ধুলা দিবার একটা কায়দামাত্র তাহা গোপীনাথ অনেকদিন বুঝিতে পারে নাই। আর একটা জিনিসও সে লক্ষ্য করিল, ভার্গব অত্যন্ত স্বল্পভাষী। যে মোটরবাইকে চড়িয়া সে আসিয়াছিল, তাহার সহিত সংযুক্ত একটি সাইড-কার ছিল। গোপীনাথ তাহাতেই চড়িয়া ভার্গবের সহিত চলিয়া গেল।

পরদিন বরেন আসিয়া মণিকাকেও লইয়া গেল। বরেন তাহাকে লইয়া গিয়া রাখিল নিজের বাড়িতে, পরিচয় দিল তাহার এক পাকিস্তানী বন্ধুর ভগ্নী বলিয়া। পাকিস্তান হইতে বহু অপরিচিতা নারী এদেশে আসিতেছে. সুতরাং কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিল না। বরেনের বাড়িতে পরিজন বেশী ছিল না। বরেনের দাদা, বৌদিদি এবং দুইটি শিশু সন্তান। বরেনের দাদা হরেনবাবু অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক। সমস্ত সকাল পূজাপাঠ লইয়া থাকিতেন, দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত অপিস করিতেন, সন্ধ্যার আহারাদি করিয়া ভাগবতপাঠ শুনিতে যাইতেন, রাত্রে আসিয়া কয়েকবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়া শুইয়া পড়িতেন। বাজার পর্যন্ত করিতেন না। বরেন যখন বাড়িতে থাকিত বরেনকেই সে কাজ করিতে হইত। যখন থাকিত না তখন বাড়ির ছোঁড়া চাকরটা করিত। মণিকার আগমনে নিরীহপ্রকৃতির হরেনবাবু প্রথম প্রথম একটু বিব্রতবোধ করিতেছিলেন। দুর্দশাগ্রস্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি যথেষ্ট ছিল, প্রত্যহ তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনাও জানাইতেন, কিন্তু একটি যুবতী মেয়ে তাঁহার পরিবারে আসিয়া বাস করিবে, এই জটিল পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, এই দুর্মূল্যের বাজারে ইহার ভরণপোষণ করিবার মতো আর্থিক সঙ্গতিও তাঁহার ছিল না। বরেন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল। বলিল, মেয়েটি একেবারে নিঃস্ব নহে, পলাইয়া আসিবার সময় কিছু টাকা সে সঙ্গে আনিয়াছে, নিজের ব্যয়ভার সে নিজেই বহন করিবে, এমন কি তাহাদের সংসারেও কিছু অর্থসাহায্য করিতে ইচ্ছুক। মাসিক একশত করিয়া টাকা সে দিবে। তাহার আত্মীয়স্বজনকে গুণ্ডারা মারিয়া ফেলিয়াছে, এখন সে কিছুদিনের জন্য অন্তত কোনও ভদ্রপরিবারে আশ্রয় চায়। ইহার পর অবস্থা অনুসারে সে নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। কয়েকদিন পরে বরেন সত্যিই নগদ একশত টাকা হরেনবাবুর হাতে দিয়া বলিল, "মণিকা এই টাকাটা দিয়েছে। ওর ইচ্ছে পাঁচজনের কাছে আমরা যেন ওকে নিজের লোক বলে পরিচয় দিই—"

হরেনবাবু নোটগুলির দিকে কয়েকমুহূর্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "নিজের লোক! কি জাত তার ঠিক নেই।"

"আমাদেরই স্বজাতি।"

হরেনবাবুর স্ত্রী কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বরেনের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "পালটি ঘর নাকি—"

"হ্যাঁ—"

"তাহলে আর ভাবনা কি—"

মুচকি হাসিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। হরেনবাবু নোটগুলির দিকে চাহিয়াছিলেন, হঠাৎ মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। নোটগুলি ফতুয়ার পকেটে পুরিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হবে—"

পরকে আপন করিয়া লইবার দক্ষতা মণিকার ছিল, সুতরাং দেখিতে দেখিতে সে ইহাদের ঘরের লোকই হইয়া গেল।

মাসখানেক বেশ নির্বিঘ্নে কাটিল। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটিল না। একটি খবর কেবল মণিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে বিচলিত করিয়া দিল। খবরটি সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। খবরটি এই—

"টোপিরাম নামক জনৈক মাড়োয়ারী দুইটি স্ত্রীলোকসহ প্রথম শ্রেণীর কামরায় দিল্লী এক্স্প্রেসে কলিকাতা যাইতেছিলেন। তাঁহাদের তিনজনেরই রক্তাক্ত মৃতদেহ গাড়ির কামরায় পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় টোপিরামের যে ভৃত্যটি ছিল সে বলিতেছে যে, তাহার মালিকের সহিত প্রচুর অলঙ্কার ও বেশ কিছু নগদ টাকাও ছিল। অলঙ্কার এবং টাকাগুলিও অপহৃত হইয়াছে। পুলিস ভৃত্যটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, জোর তদন্ত চলিতেছে ··"

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটিল মাসখানেক পরে। স্কুলের ছুটি হইয়াছিল, বরেন সাতদিনের জন্য কলিকাতা বেড়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু তিন সপ্তাহ কাটিয়া যাইবার পরও যখন সে ফিরিল না তখন সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। উদ্বেগের মাত্রা আরও বাড়িল যখন দারোগাসাহেব আসিয়া হরেনবাবুকে একটি পোস্টকার্ড দেখাইয়া জনিতে চাহিলেন যে, বরেনের নামে এই পত্রটি যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল তাহার ঠিকানা তিনি বলিতে পারেন কি না। নিরীহ হরেনবাবু কিছুই বলিতে পারিলেন না। পত্রে কলিকাতার একটি ঠিকানা ছিল, পুলিস সেইখানেই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জানা গেল একটি কালোবাজারী ধনীর বাড়িতে সম্প্রতি যে ভয়ঙ্কর সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহারই তদন্ত করিতে গিয়া পুলিস উক্ত পোস্টকার্ডটি তাহাদের বাড়িতে কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহাদের ঘোর সন্দেহ, বরেন উক্ত দলে ছিল।

বরেন আর ফিরিল না। মণিকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস ছিল শিবাজী নিশ্চয়ই কিছু একটা বন্দোবস্ত করিবে, তাহাকে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে না। হইলও তাহাই। তাহার নামে একদিন একটি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল—'তোমার পূর্ববঙ্গের একজন আত্মীয় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। আগামীকল্য বৈকালের ট্রেনে তিনি পৌছিবেন। তুমি তাঁহাকে লইবার জন্য স্টেশনে আসিও। কারণ তিনি তোমাদের শহরের পথঘাট চেনেন না, তোমাদের বাড়ি চিনিয়া বাহির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে। তাছাড়া তিনি বৃদ্ধ, চোখে ভাল দেখিতে পান না। তুমি নিশ্চয় আসিবে।" নীচে নাম লেখা ছিল বংশীবদন দাস।

স্টেশনে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অঙ্গে নিখুঁত সাহেবী পরিচ্ছদ, মুখে পাইপ। স্টেশনের বাহিরে একটা 'জিপ' দাঁড়াইয়াছিল।

"চল—"

উভয়ে জিপে চড়িয়া বসিল।

কিছুদূর গিয়া শিবাজী বলিল, "বরেনকে উদ্ধার করতে হবে, পুলিস তার পিছন নিয়েছে।"

"তিনি কোথায় এখন—"

"খবর পেলাম কোলকাতার দিকে গেছে।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি ?"

"কোলকাতায়। কোলকাতায় তোমাকে নাবিয়ে দিয়ে আমাকে খুব জরুরি দরকারে দিল্লী যেতে হবে।"

"মোটরেই যাবেন ?"

"প্লেন পেলে প্লেনেই যাব—"

"কোলকাতায় আমি কি করব ?"

"বরেনকে খুঁজবে।"

"কোথায় খুঁজব আমি ?"

"রাস্তায় রাস্তায়—"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শিবাজী বলিল, "গোপীনাথও আসবে—"

"আবার তাকে আমার কাছে আনছেন কেন—"

"অনেকক্ষণ উনুনে চড়ানো আছে, সিদ্ধ হল কিনা দেখা যাক—"

"উনুন মানে ?"

"ভার্গব।"

মণিকা কোন উত্তর দিল না।

ঝড়ের বেগে 'জিপ' ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে নক্ষত্রমালা জ্বলিতেছে। পথপার্শ্বের তরুশ্রেণী দ্রুতবেগে আসিয়াই আবার দ্রুতবেগে অন্তর্ধান করিতেছে।

সহসা শিবাজী প্রশ্ন করিল— অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' পড়েছ ?"

"না।"

"নাম শুনেছ ?"

"না।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ?"

"না।"

"তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা উচিত।"

মণিকা অপ্রতিভমুখে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। হাওয়ায় তাহার চুলগুলো উড়িয়া উড়িয়া চোখের উপর পড়িতেছিল, তাহাই সে কেবল হাত দিয়া সরাইতে লাগিল।

"কোলকাতায় পৌঁছেই বই দু'খানা কিনে পড়ে ফেলবে। পড়তে জানো তো ?"

"জানি। কোলকাতায় কোথায় থাকব ?"

"গ্র্যাণ্ড হোটেলে। ওইখানেই আমরা উঠি। বরেন এ কথা জানে। গোপীনাথেরও ওইখানে আসবার কথা আছে।"

"গোপীনাথের সঙ্গে ভার্গবও আসবেন নাকি ?"

"ভার্গব পরে আসবে। আমি তাড়াতাড়ি এখন পোঁছতে পারলে বাঁচি—

জিপের গতি দ্রুততর হইল।

বরেন কলিকাতা আসিয়াছিল বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লইয়া। যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পকেট হইতে একটি ঠিকানা-লেখা চিঠি পড়িয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইল যে যিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন পুলিস নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হানা দিবে এবং ভদ্রলোককে বিব্রত করিয়া তুলিবে। এই ভদ্রলোকটিকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই সে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোজাসুজি সে ভদ্রলোকের বাসায় যায় নাই, ভয় ছিল গেলে হয়তো একেবারে পুলিসের কবলে পড়িয়া যাইবে। দূর হইতে খবর লইয়া তাহার পর তাহাদের সহিত দেখা করিবে এই মতলবে দূর হইতে সে বাড়িটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল। সকালে দুপুরে, সন্ধ্যায় বাড়িটির কাছাকাছি গলিতে গিয়া সে নজর রাখিত বাড়িটি হইতে পরিচিত কেহ বাহির হয় কি না। প্রায়ই দেখিত দরজা-জানালা বন্ধ, সম্মুখের দ্বারে প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে। কলিকাতায় আসিয়া অর্থাভাবের জন্য প্রথমে সে একটা সস্তা হোটেলে উঠিয়াছিল। গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠিতে পারে নাই। দৈবক্রমে বিশাখাও ঠিক সেই হোটেলেই আসিয়া উঠিয়াছিল তাহার পিতার খোঁজে। বরেন ত্রিতলে থাকিত, বিশাখা দ্বিতলে। বরেন হোটেলে বেশীক্ষণ থাকিত না, সুতরাং বিশাখাকে সে একদিনও দেখে নাই। বিশাখাও হোটেলে বেশীদিন থাকিতে পায় নাই। একটা খবর কিন্তু বরেনের কানে আসিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল একটি রেফিউজি মেয়ে নাকি এখানে আসিয়া তাহার পিতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং বিধুভূষণ নামে হোটেলওলার এক সহৃদয় বন্ধু নাকি মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়া সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যে ব্যক্তি খবরটি দিয়াছিলেন তিনি একদিন বিধুভূষণকে দূর হইতে দেখাইয়াও দিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বরেন তাঁহাকে রাস্তাতেও দেখিতে পাইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিধুভূষণের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল সে। "রেফিউজি মেয়ে" কথাটি শুনিয়াই সে কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ওই ভদ্রলোক একটি যুবতী রেফিউজি মেয়েকে আশ্রয় দিয়াছেন ? আসলে লোকটি কেমন লোক ? সহৃদয়তার অন্তরালে অন্য কোনও মতলব নাই তো ! কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিলেই বোঝা যাইবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বরেন দূর হইতে বিধুভূষণকে অনুসরণ করিতে লাগিল। আজকাল রেফিউজি মেয়েদের লইয়া অনেক মহাপুরুষ অনেক কাণ্ড করিতেছেন ! তাহাদের শাস্তিবিধান করাই বরেনদের দলের একটা প্রধান কাজ।

সুতরাং কর্তব্যবোধেই সে বিধুভূষণের পিছু লইল। কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে দেখিল বিধুভূষণ প্রকাণ্ড একটি বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বাড়ির গেটে পিত্তল-ফলকে বি. মল্লিক এই নাম খোদিত রহিয়াছে। বরেন ঠিকই অনুমান করিল, বাড়িটি ভদ্রলোকের নিজেরই। দেখিল পাশে একটি খালি গারাজও রহিয়াছে। বাড়িটির আনাচেকানাচে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করিবার পর বরেনের মস্তিষ্কে একটি নূতন বুদ্ধি সঞ্চারিত হইল। সে ভাবিল, একটা সস্তা হোটেলে বহু লোকের দৃষ্টিপথবর্তী হইয়া থাকা নিরাপদ নয়। গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকিবার পয়সা নাই। বিধুভূষণের গারাজটির পিছনদিকে বেশ বড় একটা ফাঁক আছে। নাতি-উচ্চ দেওয়ালও একটি রহিয়াছে ঠিক নীচেই অনায়াসেই গারাজের ভিতর প্রবেশ করা সম্ভব। যত্রতত্র ভোজন করিয়া গারাজেই রাত্রিবাস করিলে মন্দ কি! লোকের দৃষ্টিও এড়ানো যাইবে, পয়সাও বাঁচিবে। তাছাড়া বিধুভূষণ ব্যক্তিটিকেও পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হইবে। বরেন সেইদিনই হোটেল ত্যাগ করিল। প্রথমে গেল তাহার সেই পরিচিত লোকটির উদ্দেশে যাহাকে সে সাবধান করিতে আসিয়াছিল। গিয়া দেখিল সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বরেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। তাহার মনে হইল ভদ্রলোক সম্ভবত বাসা বদলাইয়াছেন, নূতন ভাড়াটে আসিয়াছে। সঠিক সংবাদটি জানিবার জন্য সে আগাইয়া গেল এবং তালা উন্মোচনকারী ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিল—

"অবনীবাবু কোথা বলতে পারেন?"

"তিনি বাসা বদলেছেন।"

"আপনারা নতুন ভাড়াটে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ—।"

"তাঁর ঠিকানাটা জানেন?"—

ঠিকানা ঠিক জানি না। তবে আজ রাত্রে তাঁর আসবার কথা আছে। আপনার নাম ঠিকানা যদি দিয়ে যান তাঁকে বলব।"

"আচ্ছা, আমি রাত্রে আসব একবার।"

"আপনার নামটি কি?"

"মহীতোষ।"

অকম্পিতকণ্ঠে মিথ্যাকথাটি বলিয়া বরেন চলিয়া আসিল। কাহারও নিকট নিজের প্রকৃত নাম ব্যক্ত করা তাহাদের দলের নিয়ম নয়। হোটেলে সে নিজেকে রামরূপ কানুনগো নামে পরিচিত করিয়াছিল।

যিনি বাড়ির তালা খুলিয়াছিলেন তিনি অপস্রিয়মাণ বরেনের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অন্য কেহ নন—স্বয়ং মজিদ। অবনীবাবুকে কয়েক-দিন পূর্বে গ্রেপ্তার করিয়া তিনি সদলবলে তাঁহার বাসাটি দখল করিয়াছিলেন এবং বরেন নামক ফেরারি আসামীর জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস

ছিল তাঁহাকে সাবধান করিতে বরেন আসিবেই। ঘরের ভিতর হইতে একটি ছোকরা বাহির হইয়া আসিল।

"মজিদ-দা, লোকটা কে—"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, তুমি প্লেন ড্রেসে ওকে 'ফলো' কর।"

পরদিনই বরেন বিধুর গারাজে ধরা পড়িল। সে যে মহীতোষ নয়, তাহাও প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হইল না। বাল্যকালে ফ্যাশানের বশবর্তী হইয়া নিজের দক্ষিণ বাহুতে সে নিজের নামটি উল্‌কি দিয়া লিখাইয়াছিল। তাহাই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল।

বিধুভূষণ তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং রহস্যময়ভাবে অন্তর্ধানও করিলেন। বিশাখা নাম্নী রেফিউজি মেয়েটির ভার তাহার উপরই পড়িয়া গেল। তাহার পরিচর্যার জন্য বিধুভূষণ তাহাকে যথেষ্ট অর্থও দিয়া গেলেন। অন্য কোন অবস্থায় বরেনও হয়তো সরিয়া পড়িত। কিন্তু ব্যাপারটা রেফিউজি-সংশ্লিষ্ট হওয়াতে সে গেল না; বরং প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিল, সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। বিশাখার সহিত ফোনে যে আলাপ সে করিতে লাগিল তাহা অতি সন্তর্পণে। মণিকার জন্য তাহার মনের নেপথ্যে একটা দুশ্চিন্তা ছিল বটে কিন্তু খুব বেশী উদ্বিগ্ন সে হয় নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল শিবাজী যখন খবর পাইয়াছে তখন মণিকার একটা সুব্যবস্থা হইবে। গ্র্যাণ্ড হোটেলেই তাহাদের আড্ডা। শিবাজী যদি মণিকাকে কলিকাতায় পাঠানোই ঠিক করিয়া থাকে তাহা হইলে মণিকা নিশ্চয়ই আসিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠিবে। তাই বরেন একটু ফাঁক পাইলেই রাস্তায় বাহির হইয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলে ফোন করিত মিস্ মণিকা নামে কেহ হোটেলে আসিয়াছে কি না। হঠাৎ একদিন নজরে পড়িল দূরে একটা লোক তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। তখনই ঠিক করিয়া ফেলিল বিধুভূষণের বাড়িতে বেশীদিন সে থাকিবে না। অনুসরণকারী লোকটা যে পুলিসের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পক্ষে যে-কোনও মুহূর্তে সরিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু রেফিউজি বিশাখাকে এমন অসহায়ভাবে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। বিধুভূষণের চালচলন সন্দেহজনক, ভদ্রলোকের কি যে মতলব তাহাও ঠিক সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কেন যে তিনি মেয়েটিকে আনিয়া এমনভাবে আটকাইয়া রাখিয়াছেন কে জানে। যদিও সে অনুভব করিতেছিল এখানে থাকিলে অচিরেই তাহাকে পুলিসের কবলে পড়িতে হইবে, তবু সে ভাবিতেছিল মেয়েটিকে এমনভাবে ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? ইহাদের রক্ষা করাই তো তাহাদের সমিতির উদ্দেশ্য।

কি করিবে চিন্তা করিতেছিল এমন সময় হঠাৎ সিনেমা-দেখার বুদ্ধিটা তাহার মাথায় খেলিয়া গেল। বিশাখাও আপত্তি করিল না। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল সিনেমা শেষ হইয়া গেলে সে বিশাখাকে বিধুভূষণের চাতুরীপূর্ণ মিথ্যাচরণের কথা খুলিয়া বলিবে। বিধুভূষণের নিশ্চয়ই একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা না হইলে

তিনি তাঁহার দিল্লীগমন গোপন করিতেছেন কেন। সব শুনিবার পর বিশাখা যদি বিধুভূষণের কাছেই ফিরিয়া যাইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে সে তাঁহার বাসায় রাখিয়া আসিবে। যদি ফিরিয়া না যাইতে চায় তাহা হইলে সে তাহাকে দিল্লীতে তাহার নিজের ঠিকানাতেও পৌঁছাইয়া দিতে পারে। কিংবা দিল্লী না গিয়া সে যদি তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তাহাকে নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান করিয়া দিতে বলে তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। শিবাজীরও হইবে না।

সে কিন্তু নিশ্চিন্তমনে সিনেমা দেখিতেছিল না। যে লোকটি তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল তাহার কথাই বারবার মনে হইতেছিল। এখানেও লোকটি আসিয়াছে কি? সে উঠিয়া বাহিরে গেল, দেখিল আসিয়াছে। মনে হইল এখনই যদি পালাইতে হয় কোথায় যাইবে সে? গ্র্যাণ্ড হোটেলে আর একবার খবর লওয়া যাক। ফোনে মণিকাকে পাইয়া সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে উল্লাস বাড়িল যখন সিনেমা শেষ হইবার পর সে দেখিল যে শুধু মণিকা নয়, গোপীনাথ, শিবাজী এবং ভার্গব তাহার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

মণিকার দিকেই সে আগাইয়া গেল।

"আমার সাদা কোট এনেছ?"

"এই যে—"

মণিকা একটি ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স তাহার হাতে দিল। তাহাতে ছিল পরচুলা, সাদা গোঁফ, সাদা দাড়ি এবং সাদা চুল। এই বাক্সটিরই নাম সাদা কোট।

"খোকা কই?"

"এই যে—"

এদিক ওদিক চাহিয়া মণিকা আঁচলের তলা হইতে চামড়ার কেসটি বাহির করিয়া দিল। রিভলবার। শিবাজী একটা মোটরের স্টিয়ারিং ধরিয়া বসিয়াছিল। সে নামিয়া আসিয়া বরেনকে একটু দূরে লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও মেয়েটি কে—"

"রেফিউজি। বিপদে পড়েছে।"

'আমাদের কথা বলেছ ওকে?"

"কিছুই বলি নি। তবে বলতে চাই।"

"তাহলে সোজা আমাদের ছ' নম্বর আড্ডায় চলে যেও। আমি একটু পরেই আসছি।"

"বেশ।"

শিবাজী রাস্তা পার হইয়া অপরদিকের ফুটপাতে যাইতে না যাইতেই কিন্তু একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। প্লেন ড্রেসে যে পুলিস অফিসারটি বরেনকে লক্ষ্য করিতেছিলেন তাঁহার মনে হইল অবিলম্বে গ্রেপ্তার না করিলে পক্ষী উড়িয়া যাইবে। তিনি আগাইয়া আসিয়া বরেনকে বলিলেন, "দাঁড়ান আপনি একটু।"

"কেন ?"

"আপনাকে আমি অ্যারেষ্ট করলাম।"

"অ্যারেষ্ট ? কেন ?—"

ভার্গব মোটরের ব্যাকসিটে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন একটা গুলিখোর ঝিমাইতেছে। উপরোক্ত কথাগুলো কানে যাইতেই সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকাইল।

"কেন তা থানায় গিয়ে জানতে পারবেন।"

"আপনি কি পুলিস অফিসার ?"

"হ্যাঁ। প্রমাণ চান ?"

প্রমাণ দেখাইবার অবসর কিন্তু তিনি পাইলেন না। ভার্গবের হস্তে রিভলবার গর্জন করিয়া উঠিল। বিদীর্ণমস্তকে তৎক্ষণাৎ তিনি ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

নিমেষের মধ্যে মণিকা, গোপীনাথ ও বরেন মোটরে চড়িয়া বসিল। বিশাখা চিৎকার করিয়া উঠিল।

"চিৎকার করবেন না, চলে আসুন, চলে আসুন, দেরি করবেন না। ছি, ছি, কি করছেন। আপনার কোন ভয় নেই—"

প্রায় টানিয়া বরেন তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইল। শিবাজী রিভলভারের শব্দ শুনিয়া অপরদিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। দ্রুতবেগে বরেনের মোটরটা যখন নির্বিঘ্নে বাহির হইয়া গেল, তখন হঠাৎ সে গোঁফটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। একটু শিস দিল। তাহার পর ধীরেসুস্থে আগাইয়া গিয়া দুইটি ফোন করিল। একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আর একটি লালবাজারে, নিজের নাম বলিল সনৎ সেন।

গোপীনাথ ড্রাইভ করিতেছিল। গাড়ি খুব দ্রুতবেগে চলিতেছিল না। গাড়ির বেগ অস্বাভাবিকরকম দ্রুত করিয়া দিলে যে পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এ জ্ঞান তাহার ছিল।

বরেন বিশাখার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ভয় পাবেন না। আমরা সত্যই আপনার হিতৈষী।"

"কেমন করে জানব সেটা। আপনাদের ব্যবহার তো মোটেই ভদ্র মনে হচ্ছে না। এমনভাবে আমাকে নিয়ে এলেন কেন ?"

"স্বচক্ষেই তো দেখলেন গত্যন্তর ছিল না। না পালালে পুলিসের হাতে পড়তে হত।"

"আমাকে যেখান থেকে এনেছিলেন সেখানে রেখে আসুন।"

"বিধুবাবুর বাড়িতে ?"

"হ্যাঁ—"

"বেশ।"

বরেন কার্ড-বোর্ডের বাক্স হইতে সাদা গোঁফ, দাড়ি, ভ্রূ প্রভৃতি বাহির করিয়া নির্বিকারভাবে পরিয়া ফেলিল। বিশাখা সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল অনেকদিন পূর্বে সে কোথায় যেন ওমর খৈয়ামের একটা ছবি দেখিয়াছিল। রূপান্তরিত বরেনকে অনেকটা সেইরকম দেখাইতে লাগিল।

"মণিকা, তোমার ব্যাগে বোরখা আছে?"

"আছে—"

"এঁকে দাও। গোপী, গাড়িটা একটু নিরিবিলি জায়গায় দাঁড় করাও। আপনি বোরখাটা পরে নিন, আমি এখুনি ট্যাক্সি করে আপনাকে বিধুবাবুর বাসায় রেখে আসছি।"

গাড়ি মাঠের ধারে থামিল।

"বোরখা পরব কেন?"

"নিরাপদ বলে। পুলিস হয়তো আপনাকেও দেখেছে। পট করে যদি ধরে ফেলে বিপদে পড়ে যাবেন।"

কথাটা সমীচীন মনে হইল। আপত্তি না করিয়া বোরখাটা পরিয়া ফেলিল সে।

"গোপী, এইবার কোন একটা ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি আমাদের নাবিয়ে দাও। আমি এঁকে পৌঁছে দিয়ে এখুনি ফিরছি।"

কিছুদূর গিয়া গাড়ি আবার থামিল।

বরেন বিশাখাকে লইয়া অদূরে অবস্থিত ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া বরেন বলিল, "আমি যতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিলাম অর্থাৎ যতক্ষণ বিধুবাবুর আস্তানা আঁকড়ে থাকা ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস হয়নি আমার। বিবেকেও বাধছিল, তিনি নিজে যেরকম লোকই হোন, আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন এ কথা আমাকে মানতেই হবে। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর সম্বন্ধে যা আমার মনে হয় তা আপনাকে অন্তত অপকটে জানানো উচিত।"

"বলুন।"

"আমার মনে হয় আপনাকে কেন্দ্র করে বিধুবাবু কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। তাঁর চালচলন কেমন যেন একটু গোলমেলেগোছের মনে হয়েছে আমার।"

"গোলমেলে মানে?"

"উনি জামশেদপুর যাননি, গেছেন দিল্লী। অথচ সে কথাটা আপনার কাছে প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন—"

"দিল্লী গেছেন কেন?"

"তা জানি না। কিন্তু আপনাকে লুকিয়ে দিল্লী যাওয়া, আপনাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখবার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া, আপনার স্যুটকেসটাকে রহস্যজনকভাবে

সরিয়ে ফেলা, নির্বিচারে আপনার ফরমাশ অনুযায়ী আপনাকে জিনিস-পত্র কিনে দেওয়ার জন্য আমাকে টাকা দিয়ে যাওয়া,—এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় ভদ্রলোকের ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা দুরভিসন্ধি আছে। ভাল কথা, তিনি যে টাকা আমাকে দিয়েছিলেন তার সবটা খরচ হয়নি, কিছু বেঁচেছে। এটা আপনিই রেখে দিন—"

বরেন পকেট হইতে একটা লম্বা খাম বাহির করিয়া বিশাখার হাতে দিল।

"ওর ভিতর হিসেবও আছে।"

"আচ্ছা, আমাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র করছেন উনি, ঠিক এ কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার?"

"হয়তো আমার অনুমান ভুল। যা মনে হয়েছে তাই বললাম। হয়তো উনি আপনার ভালোর জন্যেই এ সব করছেন, তাও হতে পারে। তাঁর এই লুকোচুরি ব্যাপারটা ভালো লাগেনি আমার, তাই বললুম আপনাকে।"

নীরবে কিছুক্ষণ পথ অতিবাহন করিয়া অবশেষে বরেনই পুনরায় কথা বলিল।

"ছাড়াছাড়ি হবার আগে একটা কথা বলতে চাই আপনাকে, আমাদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা যাতে আপনার না হয়। সাধারণতঃ খুনী বা ডাকাত বলতে যা বোঝায় আমরা তা নই। আমরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত, প্রত্যেকেই আদর্শবাদী। যে ভণ্ডামি, যে জুয়াচুরি আজ দেশকে অধঃপাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আইন ও শৃঙ্খলার নামে যে বেপরোয়া জবরদস্তি ন্যায় ও ধর্মের মুখোশ পরে দেশে রাজত্ব করছে আজ, আমরা জন-কয়েক মিলে তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণা করেছি। হয়তো এর জন্যে আমাদের কারাবাস, নির্যাতন এমন কি ফাঁসি পর্যন্ত হবে, তবু আমরা থামব না। আমরা নতুন কিছু করছি না। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ। সেই আদর্শ-ই অনুসরণ করছি আমরা, বাক্যে নয়, কাজে। অনেক নিপীড়িত রেফিউজিদের আমরা সাহায্য করেছি, অনেক কালোবাজারীকে আমরা শায়েস্তা করেছি, অনেক অসাধু, চরিত্রহীন গভর্নমেণ্ট অফিসারকে আমরা শাস্তি দিয়েছি। আপনি যদি চান আপনাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করব। সমস্ত প্রদেশেই আমাদের লোক আছে। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বেহারী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী সবরকম লোকই আছে আমাদের দলে। এই ট্যাক্সি—"

একটা ট্যাক্সি আগাইয়া আসিল।

ট্যাক্সিওয়ালাকে ঠিকানাটা বলিয়া দিয়া তাহারা দুইজনে পাশাপাশি নীরবে বসিয়া রহিল। ট্যাক্সি যখন বিধুবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া পড়িল তখন বরেন কথা কহিল।

"ওই আপনাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি আর ওখান পর্যন্ত যাব না। এটুকু আশা করি আপনি হেঁটে যেতে পারবেন। বিধুবাবু এলে সব কথা খুলে বলবেন তাঁকে। ওহে, এইখানেই থাম একটু—"

ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া পড়িল। বিশাখার কিন্তু নামিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

"ধরুন, যদি আমি আপনাদের সাহায্য চাই, কি করে আবার নাগাল পাব আপনার ?"

"তা বলা শক্ত। আমাদের গতিবিধি বড় অনিশ্চিত। আমাদের সাহায্য যদি চান এখনি তাহলে চলুন না। আমাদের সাহচর্য যদি ভাল না লাগে আবার ফিরে আসবেন।"

"বেশ, চলুন—"

"ড্রাইভার, তাহলে সোজা তুমি হাওড়া চল। ময়দানে আমাদের নামিয়ে দিও।"

বিশাখা এবং বরেন পৌছিবার পূর্বেই শিবাজী তাহার ছয় নম্বর আড্ডায় পৌছিয়া গিয়াছিল। একটু পরে ভার্গব, গোপীনাথ এবং মণিকাও আসিয়া হাজির হইল। শিবাজী প্রশ্ন করিল, "ভার্গব, কি হল সে ব্যাপারের ?"

"প্লেনে তিনটে সিট বুক করেছি। ভোরে প্লেন ছাড়বে। আমি আটটা নাগাদ পৌছে যাব।"

"লোকটাকে চেন তুমি—"

"ফটো দেখেছি।"

"ফটো কোথায় পেলে ?"

"ননকু দিল্লী থেকে পাঠিয়েছিল। ননকুও তার সঙ্গে থাকবে টেলিগ্রাম করেছে।"

"বেশ। কোলকাতার ব্যবস্থাটা করে আমিও সোজা পাটনায় আমাদের তিন নম্বর আড্ডায় হাজির হব। মোটরে যাব।"

ভার্গব হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, "আমি চললাম তাহলে। গোপীনাথ আর মণিকাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। একজন আসল স্ত্রীলোক থাকলে সুবিধা হবে।"

"সেই প্ল্যানটা কাজে লাগাবে ঠিক করেছ বুঝি ?"

শিবাজীর চোখের দৃষ্টি হাসিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ—"

"বেশ, নিয়ে যাও ওদের।"

ভার্গব, গোপীনাথ ও মণিকা চলিয়া যাইবার একটু পরেই বিশাখাকে লইয়া বরেন প্রবেশ করিল।

শিবাজী প্রশ্ন করিল, "ইনি আবার কে ?"

"বিশাখা। পাঞ্জাবের রেফিউজি একজন। এখানে এসে বিপদে পড়েছেন। আমি একদিন একজন বিধুভূষণ মল্লিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছিলাম। সেই বিধুবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন এঁকে। কিন্তু তাঁর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না। তাই এঁকে নিয়ে এসেছি।"

"ব্যাপারটা কি শুনি। ভার্গব পাঞ্জাবের এক রেফিউজি বাঙালী পরিবারের সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্তে লাগিয়েছে একজনকে। আপনার ব্যাপারটা কি?"

বিশাখা সংক্ষেপে নিজের কাহিনী বিবৃত করিল। সমস্ত শুনিয়া শিবাজী বলিল, "আপনাকেই বোধ হয় খুঁজছি আমরা। আপনার বাবার নাম নবেন্দু বিশ্বাস?"

"হ্যাঁ।"

শিবাজী পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

"দিল্লীর মোহিত মৈত্রকে চেনেন আপনি?"

"না। দিল্লীর বিশেষ কাউকেই চিনি না।"

"ও। আচ্ছা, থাকুন আপনি। একটা কথা কিন্তু শুনে রাখুন। আমাদের সঙ্গে যদি থাকেন প্রথমত ভদ্রভাবে থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত আমরা আপনার ভালর জন্ত যা বলব নির্বিচারে তা করতে হবে। আমরা অনেক সময় বে-আইনী কাজ করি, বাধ্য হয়েই করতে হয়। আশা করি আপনি আমাদের পুলিসে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনার ব্যবহারে যদি বিশ্বাসঘাতকতার আভাসমাত্র পাই তাহলে আপনাকে কেটে কুচিয়ে কাবাব করে খেয়ে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না আমাদের। আশা করি এ অপ্রীতিকর কাজ করতে আপনি আমাদের বাধ্য করবেন না। আপনার উপর সত্যিই যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে আর আপনি আমাদের উপর সত্যিই যদি বিশ্বাস করেন, আপনার জন্তে প্রাণপাত করব আমরা। আমি এখন চললুম। বরেনের কাছে থাকুন আপনি। আপনার কোনও কষ্ট হবে না। দরকার হলে আপনাকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করব আমরা। আচ্ছা চলি নমস্কার—"

শিবাজী বাহির হইয়া গেল।

বিশাখা বলিল, "রাত্রে খাবার, শোবার কি হবে?"

"সব হবে। কাছেই পাঞ্জাবী হোটেল আছে, সেখান থেকে খাবার আনব। কি কি খাবেন বলুন। আর দুটো ঘর আছে, যেটা খুশি আপনি বেছে নিন। খেয়েদেয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ুন—"

আর আপনি?

"আমি ঘুমোব না, পাহারা দেব। কখন কি হয় বলা যায় না। হয়তো আজ রাত্রেই অন্তত্র সরে পড়তে হবে। এক ডাকে আপনার ঘুম ভাঙবে তো?"

"হ্যাঁ। আমার ঘুম খুব পাতলা। আমার কিন্তু একটু একটু ভয় করছে বরেনবাবু, টু বি ফ্র্যাংক—"

"কিচ্ছু ভয় নেই।"

বরেনের হাস্যোজ্জ্বল চোখের দিকে চাহিয়া বিশাখা সত্যই একটু সাহস পাইল।

কোনও যক্ষ্মারোগীর যদি ফোড়া হয় তাহা হইলে কয়েকদিনের জন্য মূল রোগ অপেক্ষা ফোড়াটা যেমন অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া ওঠে এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে, ট্রেনের কোণে উপবিষ্ট ছোকরাটির সান্নিধ্য ভূপেশ মজুমদারের নিকট তেমনি যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। তাঁহার গুরুতর বিপদের কথা তিনি খানিকক্ষণের জন্য বিস্মৃত হইলেন। সিনেমা-মাসিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়াই ছোকরা বসিয়াছিল না, মাঝে মাঝে আড়চোখে তাঁহার দিকে চাহিতেও ছিল। ছোকরা যে স্পাই, ভূপেশের এ সন্দেহ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। সত্য নির্ণয় করিবার উপায় নাই, অথচ নির্ণয় করিতে না পারিলে···মুশকিল! বহুকাল পূর্বে এক জ্যোতিষীর পরামর্শে ভূপেশ মজুমদার একটি নীলা-সমন্বিত আংটি ধারণ করিয়াছিলেন। নিরুপায় হইয়া সেইটিই তিনি ঘর্মাক্ত কপালে ঘষিতে লাগিলেন।

ফল হইল।

একটা স্টেশনে ট্রেনের সব যাত্রীগুলি নামিয়া গেল। নামিল না কেবল সেই ছোকরা। ভূপেশ আগাইয়া গিয়া তাহার সামনা-সামনি বসিলেন এবং মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কতদূর যাবেন?"

"আমি? আমি দিল্লী যাব। আপনি?"

"আমিও। ভালই হল, সঙ্গী পাওয়া গেল একজন।"

ছোকরা কিন্তু তেমন আমল দিল না। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটি সিগারেট ধরাইল সে। ব্যাপারটা যদিও ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, তবু ভূপেশ মজুমদার আরও কয়েকটি প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলেন। জেরার মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সত্য যে আত্মপ্রকাশ করে ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

"দিল্লীতে কোথায় উঠবেন আপনি?"

"এক বন্ধুর বাড়িতে। আপনি?"

"আমি হোটেলে উঠব। দিল্লীতে কি জন্যে যাওয়া হচ্ছে—"

"বিশেষ একটা দরকারে যেতে হচ্ছে। আপনি যাচ্ছেন কেন?"

ভূপেশ মজুমদার দেখিলেন ছোকরা প্রতিবার পাল্টা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জানিয়া লইতেছে, অথচ তিনি বিশেষ কিছুই জানিতে পারিতেছেন না।

"আমিও যাচ্ছি বিশেষ দরকারে—"

সহসা ভূপেশের মনে হইল লুকোচুরি করিয়া লাভ কি! ছোকরাকে গল্প-ছলে সব কথা অকপটে খুলিয়া বলিলে কোন ক্ষতি নাই। ও সত্যই যদি স্পাই হয় উহার কিছু অজ্ঞাত নাই। আর স্পাই যদি না হয় তাহা হইলেও জানাইতে কোন আপত্তি নাই।

তিনি এমন কিছুই করেন নাই যাহা লজ্জাকর। বন্ধুর অনুরোধে একটা লোককে ছাড়িয়া দিয়াছেন—এই তো ? ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই, বরং বাহাদুরি দেখাইবার সুযোগ আছে। হয়তো তিনি ছোকরার মনে সহানুভূতি (কিম্বা শ্রদ্ধাও, কিছুই বলা যায় না) উদ্রিক্ত করিতে পারেন।

সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দরকার ছাড়া আজকাল কে আর দিল্লী যায় বলুন এই গরমে। সমস্ত ব্যাপারের কলকাঠি তো ওখানেই। আপনিও নিশ্চয় আপিসের দরকারে যাচ্ছেন—"

"না আমি যাচ্ছি একটি মেয়ের খোঁজে।"

"মেয়ের খোঁজে ? দিল্লী লাড্ডুর জন্য প্রসিদ্ধ শুনেছি।"

রসিকতায় একটু ফল ফলিল। ছোকরার গম্ভীর বদনে একটু হাসির রেখা দেখা দিল।

"আমার বাবার এক বন্ধুর মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। তারই সন্ধানে বেরিয়েছি—"

"ও, তাহলে আমি তো আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব। আমি পুলিসে চাকরি করি। আপত্তি যদি না থাকে মেয়েটির পরিচয় আমাকে বলতে পারেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাকে হেলপ করতে। আই. বি ডিপার্টমেন্টের বহুলোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার—"

"ও, তাহলে তো সুবিধাই হল। মেয়েটির নাম বিশাখা। তার বাবার নাম নবেন্দু বিশ্বাস। লাহোরে থাকতেন তাঁরা। রায়টের সময় পালিয়ে আসেন দিল্লীতে। তারপর নবেন্দুবাবু কোলকাতায় যান। সেখান থেকে যান ঢাকায়। ঢাকায় তাঁর কিছু সম্পত্তি ছিল। এক মুসলমানের সঙ্গে সেই সম্পত্তি বিনিময় করে কোলকাতায় তিনি বাড়িও কিনেছিলেন। যখন দ্বিতীয়বার রায়ট বাধল কোলকাতায়, তারপর থেকে তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় রায়টের সময় তিনি কোলকাতাতেই ছিলেন। কোন খবর না পেয়ে বিশাখা তাই তাঁকে খুঁজতে কোলকাতায় আসে। তারপর থেকে বিশাখাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। কোলকাতায় চেনা-শুনা কোন জায়গায় সে নেই। দিল্লীতে সে ফিরেছে কি না এই খবর নিতেই আমি দিল্লী যাচ্ছি—"

ভূপেশ মজুমদার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্যাপারটা খানিকক্ষণ প্রণিধান করিলেন। তারপর জেরা শুরু করিলেন।

"নবেন্দুবাবুদের সঙ্গে আপনাদের কতদিনের আলাপ ?"

"আমি তাঁকে দেখিনি। তিনি আমার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলত।"

"আপনারা থাকেন কোথায় ?"

"কোলকাতায়।"

"ও। আপনি নবেন্দুবাবুদের চেনেন না বলছেন অথচ তাঁর মেয়ের খোঁজে দিল্লী

যাচ্ছেন, ব্যাপারটা বুঝলাম না ঠিক। আপনার বাবাই আপনাকে পাঠিয়েছেন নাকি ?"

"বাবা ছমাস আগে মারা গেছেন। আমি এদের কথা জানতাম না বিশেষ। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বাবা আমাকে তাঁর চিঠিগুলি দেন। দিয়ে বলেন যে বিশাখার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব নবেন্দুকে এ প্রতিশ্রুতি অনেকদিন আগেই আমি দিয়েছি। তুমি পড়াশুনা করছিলে বলে তোমাকে কিছু বলিনি। এইবার তুমি পাস করেছ, আমার ইচ্ছা, এইবার বিয়েটা হয়ে যাক।"

"আপনি কি পাস করেছেন ?"

"এম. এ.। ল'টাও পাস করেছি।"

"ও। বিশাখাকে দেখেছেন আপনি ?"

"দেখেছি। দূর থেকে—"

"দূর থেকে মানে ?"

"বাবার অনুরোধে তাকে দেখতেই আমি দিল্লীতে গিয়েছিলুম একবার। কিন্তু সামনা-সামনি দেখা করতে পারিনি। কেমন যেন লজ্জা হল। তার ওপর শুনলাম বিশাখার মা নাকি অসুস্থ। তাই ওদের বাড়িতে আর আমি যাই নি। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে আমি উঠেছিলাম, সে ওদের খবর রাখত, সে-ই আমাকে দূর থেকে একদিন দেখিয়ে দিয়েছিল বিশাখাকে—"

"তারপর ?"

"তারপর বাবা মারা গেলেন। ও ব্যাপার চাপাই পড়ে গেল। দিনকয়েক আগে হঠাৎ মোহিতের এক চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, বিশাখা কোলকাতায় গেছে। আমার মনে হল ঠাট্টা করে লিখেছে বোধ হয়। তবু টেলিগ্রাফ করলাম একটা। মোহিত উত্তর দিলে বিশাখা দিল্লীতে নেই, কোলকাতাতেই আছে—"

"মোহিত কে ?"

"আমার সেই বন্ধুটি। তার টেলিগ্রাফ পেয়ে আমি একটু অবাক হলাম। কৌতূহলও হল একটু। কোলকাতায় যে-সব ঠিকানায় বিশাখার যাওয়া সম্ভব সব জায়গায় খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও তাকে পেলাম না। তাই দিল্লী যাচ্ছি ভাল করে ব্যাপারটা জানবার জন্যে—"

"বিশাখা যে আপনার বাগদত্তা, এ কথা সে জানে ?"

"জানে। নবেন্দুবাবু তাকে বলেছিলেন—"

"ওদের কথা আপনি জেনেছিলেন আপনার বাবার চিঠি থেকে—"

"হ্যাঁ।"

"ওদের বাড়ির কাউকেই চিনতেন না ?"

"না। বিশাখার মাও মারা গেছেন শুনেছি! প্র্যাকটিকালি মেয়েটি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। সেইজন্যে আমি আরও তার খবর নিতে যাচ্ছি—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভূপেশ মজুমদার পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "মেয়েটি লেখাপড়া জানে ?"

"বি. এ. পাস করেছে শুনেছি।"

"কোলকাতায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটি রেফিউজি মেয়ে আশ্রয় নিয়েছে। শুনেছি সেও দিল্লী থেকে এসেছে, সে লেখাপড়াও নাকি জানে—"

"তাই নাকি—!"

ভদ্রলোকের চক্ষুদুইটি আগ্রহে জলজল করিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ। এ যদি সেই মেয়ে হয় তাহলে আপনাকে বেশী খুঁজতে হবে না। আমার সেই বন্ধুটিও এখন দিল্লীতে আছেন। যদি দেখা হয়ে যায়, হবারই বেশী সম্ভাবনা, তাহলে আপনি পুরো ডিটেলস পেতে পারবেন; আর এ যদি সে-মেয়ে না হয় তাহলেও আই-বি-র থ্রু দিয়ে আপনাকে কিছু সাহায্য আমি নিশ্চয়ই করতে পারব।"

"দিল্লীতে আপনি কদিন থাকবেন ?"

"ঠিক বলতে পাচ্ছি না। চাকরির ব্যাপারে এসেছি, এখন কদিন লাগবে কে জানে—"

ছোকরার সহিত আলাপ করিয়া ভূপেশ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল ছোকরা স্পাই নয়। বিছানাটি পাতিয়া শুইবার আগে ভূপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামটি কি ?"

"কৈলাসপতি রায়। আপনার ?"

"ভূপেশ মজুমদার। এইবার শুয়ে পড়া যাক, কি বলেন। আপনি নীচে থাকতে চান, না ওপরে উঠবেন ?"

"আমি পরে যেখানে হোক শোব। আপনি শুযে পড়ুন। নীচের বেঞ্চটাই নিন আপনি। ওপরে উঠতে আপনার কষ্ট হবে।"

ভূপেশ প্রীত হইলেন। হোল্ড-অল্‌টি খুলিতে ভূপেশের অসুবিধা হইতেছিল। কৈলাসপতি আগাইয়া আসিয়া হোল্ড-অল্ খুলিয়া বিছানাটি পাতিয়া দিল। ভূপেশ আরও প্রীত হইলেন।

ভোরে উঠিয়া একটা স্টেশনে উভয়ে চা-পান করিলেন; কৈলাসই দামটা চুকাইয়া দিল। ভূপেশ লক্ষ্য করিলেন তাহার আচরণে, কথাবার্তায় বেশ একটা সমীহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভূপেশ অসঙ্কোচে তাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

ট্রেন যথাসময়ে দিল্লী পৌছিল। ভূপেশ ট্যাক্সি করিয়া প্রথমেই গেলেন বিধুভূষণের ঠিকানায়। কৈলাসও সঙ্গে রহিল। হোটেলে গিয়া শোনা গেল বিধুভূষণ কিছুক্ষণ পূর্বে হিসাবপত্র চুকাইয়া দিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন তাহা হোটেল-ওলা বলিতে পারিল না।

কৈলাস বলিল, "আপনি আমার বন্ধুর বাসায় উঠবেন চলুন! কোনও অসুবিধা হবে না।"

ভূপেশ মজুমদার বিশাখার সন্ধান দিতে পারেন এই সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই কৈলাস ভূপেশের অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

"বেশ তাই চল। জিনিসপত্রগুলো হোটেলেই থাক। তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে' আসি। আমাকে নানা জায়গায় ঘুরতে হবে, খাবার, শোওয়ার ঠিক থাকবে না হয়তো, তোমার বন্ধুকে বিব্রত করতে চাই না। ছিনে মিস্ত্রিকে পাকড়াতে হবে, বাসুকী মহারাজকে ধরতে হবে—"

"মোহিত সব ব্যবস্থা করে দেবে। সে অনেক খবর রাখে। চলুন তো—"

"বেশ চল—"

দেখা গেল মোহিত মৈত্র নামক হাস্যমুখ যুবকটি বেশ চালাক চতুর অথচ ভদ্র। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় সে সহকারী সম্পাদকের কাজ করে এবং হেন খবর নাই যাহা সে না রাখে। রেসে যে সব ঘোড়া প্রথম হইয়াছে তাহাদের বংশপরিচয় কি, সিনেমা অভিনেত্রীরা বয়স ভাঁড়াইবার জন্য কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, কোন্ মিনিস্টারের কি দুর্বলতা, কোন্ কোন্ খেলোয়াড়ের কি কি দোষ না থাকিলে তাহারা ওয়ার্লড চাম্পিয়ান হইতে পারিত, স্টালিনের পাইপের বিশেষত্ব কি ছিল, সোভিয়েটের আসল মতলব কি, বিখ্যাত ভারতবাসীরা ইংরেজী লিখিতে গিয়া কি রকম শোচনীয় ভুল করেন, কোন্ কোন্ লেখকেরা ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবল নামের জোরে টিকিয়া আছেন—এই ধরণের নানা খবর মোহিত মৈত্রের নখদর্পণে। কৈলাসপতির সহিত সে শুধু কলেজেই নয়, স্কুলেও একসঙ্গে পড়িয়াছিল। সত্যই সে তাহার বন্ধু।

পিতার নিকট কৈলাস যেদিন জানিতে পারিল যে তিনি তাহার ভাবী পত্নীকে বহুদিন পূর্বেই মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন এবং পত্নীটি বর্তমানে দিল্লীবাসিনী, তখন স্বভাবতই খবরটি সে বন্ধু মোহিতকে পত্রযোগে জানাইতে বিলম্ব করে নাই। মোহিতও বিলম্ব না করিয়া বিশাখা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে উত্তর দিয়াছিল। যে পত্রটি সে কৈলাসকে লিখিয়াছিল তাহার শেষাংশ এইরূপ—

"মেয়েটি চমৎকার টু দি পাওয়ার এন্। এনের ভ্যালু কত তা তুমি এসে নিজের চোখে দেখে ঠিক কর। মেয়েটির সামনাসামনি না হয়েও যাতে তাকে ভ্রূচক্ষে, বিস্ফারিতচক্ষে, কুঞ্চিত-চক্ষে, নিরীক্ষণ করতে পারো সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। একটু দূর থেকে দেখাই ভাল। আসবার আগে শুধু 'কামিং' এই ইংরাজী শব্দটি তার-যোগে প্রেরণ কোরো। বাকী সব আমি করব।"

নিমন্ত্রণটি লোভনীয় হলেও কৈলাসপতি যাইতে পারে নাই, কারণ পিতা হিমাদ্রিনাথ কড়া লোক ছিলেন। হঠাৎ দিল্লী চলিয়া গেলে তিনি সবই বুঝিতে

পারিবেন এবং বুঝিতে পারিলে কি যে করিবেন তাহা আন্দাজ করা শক্ত ছিল তাহার পক্ষে। তিনি যে তাহার জন্য একটি বধূ এতদিন ধরিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই কি সে আন্দাজ করিয়াছিল! হিমাদ্রিনাথ ছিলেন হাই-ব্লাডপ্রেসারের রোগী। তাঁহাকে অযথা উত্তেজিত করিবার সাহস কৈলাসের ছিল না, সুতরাং লোভটি সে সংবরণ করিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং হিমাদ্রিনাথই তাহাকে একদিন বলিলেন, "তুমি নিজেই গিয়ে বিশাখাকে দেখে এস একবার। নবেন্দু তো নেই, বিশাখার মাকেই আমি চিঠি লিখেছিলাম একটা, তিনি তোমাকে যেতে বলেছেন। তুমি মোহিতের বাসায় উঠতে পার, দুজনে একসঙ্গে দেখে এস—"

বিশাখাকে গিয়া সে দেখিয়া আসিল। মোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী দূর হইতেই সে তাহাকে দেখিল। ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে সে স্বপ্নের জালও বুনিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ হিমাদ্রিনাথ মারা গেলেন। আসন্ন মিলনটা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছাইয়া গেল। অন্তত এক-বৎসরের জন্য তো বটেই। তাহার পর খবর পাওয়া গেল, বিশাখার মা-ও মারা গিয়াছেন। মোহিতই খবরটি সরবরাহ করিল। ঠিক সেই সময় কৈলাস আই-এ-এস পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে তাহার কি কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাইল না। আরও মাস দুই কাটিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় মোহিতের আর একটি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রটি এই—

ভাই কৈ,

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে যিনি একজন অথবা শ্রীরাধার অষ্টসখীর মধ্যে যিনি অন্যতমা তাঁহাকে গত কয়েকদিন হইতে দিল্লী শহরে দেখিতেছি না। তাঁহার প্রতিবেশী ভদ্রলোকের নিকট খবর লইয়া জানিলাম তিনি কলিকাতা গিয়াছেন। কাহার তর সহিতেছে না সে গবেষণা করিবার সময় আমার নাই। তাঁহার এক বান্ধবীর মুখে শুনিলাম তিনি তোমার সমস্ত খবর পাইয়াছেন, এমন কি তোমার পিতৃ-প্রেরিত ফটোখানিও নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার নিকট সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষেও অধৈর্য হওয়া অসম্ভব নয়। তুমি যে অধীর হইয়াছ তাহা তো জানিই। একটি কথা শুধু মনে করাইয়া দিতেছি। পিতা বা মাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হিন্দুর ঘরে কোনও শুভকার্য হয় না। আর প্রাক্-বিবাহ 'হনিমুন' ভদ্র খৃস্টানসমাজেও অচল। ব্যাপারটা কি জানাও। ইতি—

মুগ্ধ মোহিত

ইহার পর পত্র ও টেলিগ্রাম আদান-প্রদানের পর কৈলাসপতিকে দিল্লী ছুটিতে হইল।

মোহিত একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ফ্ল্যাটটি তাহার মার্জিত-রুচির নানাচিহ্ন বহন করিতেছে। ঘরে ঢুকিলেই মনটা খুশী হইয়া ওঠে, ছোট টিপয়ে রক্ষিত সুদৃশ্য ফুলদানীতে চমৎকার ফুলের তোড়াটি যে কাগজের তাহা বুঝিতে দেরি লাগে এবং বুঝিবার পর মনটা আরও খুশী হয়।

সমস্ত শুনিয়া সে ভূপেশ মজুমদারকে বলিল, "ছিনে মিত্তির আজকাল অন্ধ এবং কালা হয়ে গেছে। কাউকে দেখতেও পায় না, কারও কথা শুনতেও পায় না।"

"তাহলে উপায় ?"

"উপায় আছে—"

"খুব চেঁচিয়ে কথা বলতে হবে নাকি ?"

"না। গলা ফাটিয়ে ফেললেও সে শুনতে পাবে না। ভুতির কাছে যেতে হবে।"

"ভুতি কে ?"

"ভুতিবালা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণীর কাছেই ছিনে মিত্তির থাকেন আজকাল। ভুতিবালা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে যা বলেন তাই শোনেন তিনি। আর অন্য কোনও উপায়ে তাঁকে কিছু শোনানো যায় না।"

"আমার সঙ্গে এককালে খুবই বন্ধুত্ব ছিল ; আমাকে চিনতে পারবেন না ?"

"পারবেন যদি ভুতিবালা তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে আপনার পরিচয় দেন। এ সব করবার জন্য প্রণামী দিতে হয় তাঁকে শুনেছি একশ টাকা। বেশীও দেন কেউ কেউ।"

"ও বাবা! আমি গরীব মানুষ কোথা পাব অত টাকা! ছিনে মিত্তিরের আশা ছাড়তে হল তাহলে—"

"কিছু ছাড়তে হবে না। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি দেখুন না।"

"কি করে ঠিক করবে তুমি ? অত টাকা পাব কোথা ?"

"টাকার দরকার নেই।"

"তবে—"

ভুরু নাচাইয়া মোহিত বলিল—"গুহা—"

"গুহা ? মানে, কেভ ?"

"না ডাক্তার। অন্তরঙ্গমহলে ভি. ডি. গুহা নামে পরিচিত। কেউ কেউ এস. জি. গুহাও বলে। সিফিলিস, গণোরিয়ায় ধন্বন্তরী। ভুতিবালাকে তিনি বিনা পয়সায় ইনজেকশন দেন। আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব।"

ভূপেশ আবেগভরে মোহিতকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"আমাকে বাঁচাও ভাই।"

"কিছু ঘাবড়াবেন না। বাসুকী মহারাজের সঙ্গেও আপনার দেখা করিয়ে দেব। তবে এটা একটু শক্ত হবে। কারণ মিনিস্টাররা হরদম গাড়ি পাঠাচ্ছে কি না। দেখি—করতেই হবে একটা উপায়। আমি দেরি করব না, বেরিয়ে পড়ি তাহলে। আপনি চামটান করুন। কৈলাস রইল—"

একটি ঝকঝকে বাইকে আরোহণ করিয়া সজোরে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে মোহিত মৈত্র বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের ঘরের একটা চৌকিতে কৈলাস বিছানা পাতিতেছিল। ভূপেশবাবুর দিকে চাহিয়া অনেকটা জবাবদিহির সুরে সে বলিল, "একটু ঘুমিয়ে নেব ভাবছি। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি কাল। ঠায় জেগে বসেছিলাম।"

"কেন, জায়গা তো ছিল প্রচুর।"

"ঘুম আসছিল না—"

বলিয়াই কৈলাসপতি লজ্জিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল ঘুম না আসার প্রকৃত কারণটা ভূপেশবাবু বোধ হয় অনুমান করিয়া ফেলিলেন। সে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া বিছানার চাদরটা ঠিক করিতে লাগিল।

"আচ্ছা, তুমি তাহলে ঘুমিয়ে নাও। আমি আপিস থেকে ঘুরে আসি একবার।"

"এখানেই ফিরবেন তো ?"

"আমি সেই হোটেলেই ফিরব। বিকেলে দেখা হবে আবার—"

আপিসে গিয়া ভূপেশ প্রথমে কোন হদিসই পাইলেন না। কনফিডেনশাল ক্লার্ক তাঁহার দিকে একনজর তাকাইয়া যে মন্তব্যটি করিল, তাহাতে অস্বস্তি বাড়িল বই কমিল না।

"আপনি এসে গেছেন ? ভালই হয়েছে।"

"কেন বলুন তো ?"

"জানতেই পারবেন ; আই-জির সঙ্গে দেখা করুন একবার।"

"দত্তগুপ্ত কোন রিপোর্ট করেছে নাকি ?"

"দত্তগুপ্ত ? আপনার নামে ? জানি না তো।"

বলিয়াই ফিক করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাজে মন দিল। এই ক্লার্কটিকে সকলে আড়ালে "জিলাপী" বলিয়া ডাকে। ভদ্রলোকের ভিতর নাকি অনেক জটিল প্যাঁচ আছে।

"আই-জির-সঙ্গে দেখা করব বলছেন ?"

"করুন, তিনি জনকয়েক ভাল সিনিয়র অফিসারের নাম চেয়ে পাঠিয়েছেন শুনলাম।"

"আমার নাম লিস্টে গেছে না কি ?"

"ঠিক জানি না। লিস্টই এখনও যায় নি বোধ হয়। আপনি যান না, আপনাকে দেখলে হয়তো লিস্টের দরকারই হবে না তাঁর।"

"কি রকম—"

কনফিডেনশাল ক্লার্ক আর উত্তর দিল না। হেঁট হইয়া কি লিখিতে লাগিল। ভূপেশের মনে হইল এই অস্পষ্ট উক্তির নানারকম অর্থ হইতে পারে। দত্তগুপ্ত হয়তো আই-জিকে গোপনে কিছু লিখিয়াছেন। আই-জি হয়তো তাঁহাকে সরাইয়া দিতে চান। সরাইয়া দিলে তাঁহার স্থানে অন্য লোক পাঠাইবেন। তাই সম্ভব লিস্ট চাহিয়াছেন।

ভূপেশ কনফিডেনশাল ক্লার্কটির দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন, ঝুঁকিয়া লিখিয়াই চলিয়াছে—মুখখানি যেন মার্জারের মুখ। মনে হইল ইহাকে কচলাইয়া এখন আর সুবিধা হইবে না। স্থির করিলেন আই-জির সহিত দেখা করিয়া যদি সুবিধা না হয় তাহা হইলে কিছু লেবু এবং মেওয়া লইয়া সন্ধ্যার পরে কনফিডেনশাল ক্লার্কের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করিবেন। ইতিমধ্যে মোহিতও হয়তো কিছু সুরাহা করিতে পারে। দেখা যাক! কপাল ঠুকিয়া তিনি আই-জির সহিত দেখা করিলেন। আই-জির ব্যবহার বেশ ভদ্র মনে হইল। মনে হইল ভূপেশকে দেখিয়া যেন তিনি প্রীতই হইয়াছেন।

"ও আপনি এসেছেন—"

"হ্যাঁ সার। ছুটি নিয়ে এসেছি।"

'ভালই হয়েছে। কোথায় উঠেছেন এখানে?"

"হোটেলে।"

"ফোন আছে সেখানে?"

"আছে।"

"ফোন নম্বরটা আমাকে দিয়ে যান।"

ভূপেশ পকেট হইতে ডাযেরি বাহির করিলেন। ডায়েরিতে ফোন নম্বর লেখা ছিল। বিধুভূষণের হোটেলের ফোন নম্বর বরেনের নিকট হইতে তিনি টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। একটুকরা কাগজে সেটা তিনি লিখিয়া আই-জিকে দিলেন।

"যদি দরকার হয় আপনাকে ফোন করব। একটা কাজের জন্য একজন পাকা লোক হযতো দরকার হবে। আপনি ফ্রি আছেন ত?"

"আছি সার।"

প্রস্টেটের কথাটা তিনি চাপিয়া গেলেন।

"কাল কি আপনার সঙ্গে দেখা করব সার?"

"দেখা করবার দরকার নাই। দরকার হলে আমি ফোন করব, কিংবা লোক পাঠাব। এখন যান।"

"আচ্ছা সার। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ভূপেশ বিচিত্র সম্ভাবনাদোলায় দুলিতে দুলিতে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া একটু বিশ্রাম করিবার বাসনা হইল। চাকরকে বিছানাটা পাতিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু ভৃত্যটি যে ঘরে তাঁহার জন্য বিছানা প্রস্তুত করিল সে ঘরে ঢুকিয়া তিনি অনুভব করিলেন, সেখানে শোওয়া যাইবে না। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ছাড়িতেছে।

"বড় বিশ্রী গন্ধ যে হে এখানে।"

"আজ সকাল থেকে দেখছি জানালার নিচে একটা বেড়াল মরে পড়ে আছে। মেথরটা এখনও আসেনি। দুবার লোক পাঠিয়েছি—"

"অন্য ঘর নেই?"

"বিধুবাবু যে ঘরটায় ছিলেন সেটা খালি আছে। কিন্তু সেটা পরিষ্কার হয়নি এখনও। তার চার্জও একটু বেশী।"

"সেখানে গন্ধ-টন্ধ নেই?"

"আজ্ঞে না। ঘর চমৎকার। তেতালার উপরে—"

"সেই ঘরে চল—"

ত্রিতলের ঘরটি সত্যই ভাল। ভৃত্য সেইখানেই বিছানা পাতিয়া দিল। ভূপেশ মজুমদার শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিলেন। নিদ্রা কিন্তু আসিল না। আসিল চিন্তা। নীল-তারা, সুলোচনা, দত্তগুপ্ত, বিধুভূষণ, কনফিডেনশাল ক্লার্ক, আই-জি, কৈলাস, মোহিত, ছিনে মিত্তির সকলেই কিছু-না-কিছু চিন্তার খোরাক লইয়া তাঁহার মুদিত নয়ন-পল্লবের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। কাহারও মুখে মৃদু হাসি, কাহারও ভ্রূকুটি, কেহ নির্বিকার, কেহ ভীত, কেহ কৌতুক-প্রবণ, কেহ শ্রদ্ধাবিষ্ট···বিরক্ত হইয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন তিনি। উঠিয়া বসিয়াই কিন্তু যাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহা সাধারণতঃ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কৌতূহলও উদ্রিক্ত করে না। কিন্তু পুলিসের লোক বলিয়াই হোক বা চিন্তার হাত হইতে আপাতত পরিত্রাণ পাইবার জন্যই হোক তিনি ঘরের কোণে দোমড়ানো মোচড়ানো যে নীল কাগজের টুকরাটি পড়িয়াছিল তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কাগজটি পাকাইয়া লম্বা করিবেন এবং সেটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া কান চুলকাইতে চুলকাইতে কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃতি-লাভ করিবেন। উঠিয়া কাগজের টুকরাটি কুড়াইয়া আনিলেন। কাগজটি খুলিয়া কিন্তু তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল। একখানা চিঠির তলায় বিধুভূষণের নাম। ব্যাপার কি! পড়িয়া আরও বিস্মিত হইলেন। কাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বিধু এই পত্র লিখিতেছিল? সেই মেয়েটির নিকট নাকি, চিঠিতে অনেক কাটাকুটি রহিয়াছে, এটা বোধ হয় রাফ কপি। বিশাখাকে চিঠি লিখিবার পূর্বে বিধু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যে মুশাবিদাটি করিয়াছিলেন এবং চিঠিটি পরিচ্ছন্ন করিয়া লিখিবার পর যাহা তিনি অবহেলাভরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে ভূপেশ মজুমদারের হাতে পড়িয়া যাইবে তাহা বিধুর সুদূরতম কল্পনাতেও আভাসিত হয় নাই। ভূপেশও এ রকম পত্র এভাবে পাইবার প্রত্যাশা করে নাই। অদ্ভুত যোগাযোগটি কিন্তু ঘটিয়া গেল। ভূপেশ খানিকক্ষণ পত্রটির দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূ ক্রমশঃ মসৃণ হইল, অধরে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটিল। চিঠিটি ভাল করিয়া ভাঁজ করিলেন, তাহার পর সযত্নে নিজের পার্সের একটি খোপে সেটি রাখিয়া দিলেন।

"নিচে মোহিতবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

ভৃত্য আসিয়া খবর দিল।

"নিচে বসিয়েছ তাঁকে ?"

"মোটরে বসে আছেন তিনি।"

"তাই নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চল।"

ভূপেশ নামিয়া দেখিল সত্যই একটি বিরাট মোটরে মোহিত মৈত্র বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া নামিয়া আসিল এবং স্মিতমুখে "আপনার অদৃষ্ট ভাল, মানে খুবই ভাল। বাসুকী মহারাজকে যে এত চট করে বাগাতে পারব ভাবিনি। খুব শুভ মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। গিয়ে দেখি পূজোটি শেষ করে মালপোয়া খাচ্ছেন। আপনার কথা বলতেই চিনতে পারলেন আপনাকে। বললেন, নিয়ে এস। আচ্ছা আপনার ডাকনাম কি গ্যাঁড়া ?"

"হ্যাঁ।"

"গ্যাঁড়া নামেই আপনার উল্লেখ করলেন। আচ্ছা, মন্তর নিতে আপত্তি আছে কি আপনার ?"

"মন্তর ?"

"মানে, দীক্ষা। আপত্তি আছে কি, বলুন তাহলে অন্য একটা প্যাঁচ কসতে হবে।"

"বুঝতে পাচ্ছি না ঠিক। হঠাৎ দীক্ষা নেবার কথা উঠল কি করে—"

"আমিই ওঠালাম। বললাম পুলিস লাইনের পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে আপনি আপাদমস্তক কর্দমাক্ত হয়ে গেছেন। আপনার ভুরু, চোখ সমস্ত কাদায় ঢেকে গেছে। তাই আপনি ব্যাকুল হয়ে বাসুকী মহারাজের কাছে ছুটে এসেছেন, কিন্তু সাহস করে কাছে আসতে পারছেন না। অভয় পেলে কাছে যাবেন, গিয়ে দীক্ষা নেবেন। কারণ আপনার দৃঢ়-ধারণা হয়েছে অন্য কোনরকম সাবানেই এ কাদা উঠবে না—"

ভূপেশ বিস্ফারিতচক্ষে মোহিতের কথা শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, "আপনি তো একরকম 'কমিট' করেই এসেছেন, না নিলে আপনার মুখ থাকবে কোথায়—"

'মুখ আমি সামলে নেব। হরবোলা পাখী তো আমরা, নানারকম বোল বলতে পারি। আপনার দীক্ষা নিতে আপত্তি আছে কি না সেইটেই বিবেচ্য—"

"দীক্ষা নিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে একটু পরামর্শ না করে দীক্ষা নেওয়াটা কি ঠিক হবে—"

মোহিত এক নজর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিল।

"ওই কথাটাই বলুন তাহলে গিয়ে। বলুন, আপনি যদি অভয় দেন তাহলে সস্ত্রীক আপনার চরণতলে এসে আশ্রয় নিই। খুব খুশী হবেন। ওঁর স্ত্রীলোকশিষ্যই বেশী।"

"তাই নাকি—"

"সেদিন কসে দেখেছিলাম নাইন্টি-ফাইভ পয়েণ্ট সেভেন পারসেণ্ট—"

"ও—"

"চলুন। ওই কথাই বলবেন তাহলে।"

"ছিনে মিত্তিরের কি হল ? দেখা হয়েছে—?"

"হয়েছে। ভুতিবালার মারফত আপনার কথা তাঁর কর্ণগোচর করিয়েছি। এতক্ষণ তিনি বোধ হয় ফোন করেছেন।"

"কোথায়—"

"তা ঠিক জানি না। ভুতিবালা শুধু বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে। চলুন আর দেরি করবেন না। আমাকে আপিসে ফিরে গিয়ে দুটো প্রুফ দেখতে হবে, মেসিন না হলে বসে থাকবে—"

'চলুন। এ গাড়ি কার—"

"বাস্থকী মহারাজের।"

ভূপেশ মজুমদার আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

বাস্থকী মহারাজ যে এতটা সদয় ব্যবহার করিবেন তাহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। ভূপেশ যখন তাঁহার বিপদের কথা বিবৃত করিতেছিলেন তখন হয়তো তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল, হয়তো নয়নকোণে একবিন্দু অশ্রু আভাসিত হইয়াছিল, কে জানে! কিন্তু বাস্থকী মহারাজ যাহা করিলেন তাহা মোহিত মৈত্রের মতে "আন্-থট্-অফ!" সমস্ত শুনিয়া বাস্থকী মাভৈঃ-ভঙ্গীতে-প্রসারিত-করতল দক্ষিণ-বাহুটি উত্তোলন করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভয় ভগবানকে সমর্পণ কর, তাহলে ব্যবস্থা তিনিই করবেন। বিধুবাবুকে দিয়ে তুমি লিখিয়ে নিতে চাও যে বরেন বলে যে ছোকরাটিকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ সে খুব ভাল ছেলে এবং তিনি তাঁর জন্য জামিন রইলেন। এই তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি বিধুবাবুকে এখানে পেলে না ?"

"আজ্ঞে না। আমার দুর্ভাগ্য, তিনি চলে গেছেন শুনলাম।"

"তুমি বরেনকে যেদিন ধরেছিলে সেটা কোন্ তারিখ ?"

ভূপেশ ডাইরি দেখিয়া তারিখটা জানাইল। বাস্থকী মহারাজও একটি ছোট ডায়েরি বাহির করিয়া সেটির পাতা উলটাইতে লাগিলেন। একটি পাতায় কয়েকমুহূর্ত দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,

"হয়েছে।"

"কি ?"

"আমিও ওই তারিখে কোলকাতায় ছিলাম। দত্তগুপ্তের বাড়িতেই ছিলাম। তুমি বিধুবাবুকে দিয়ে যা লিখে নিতে চাইছ, আমি যদি সেটা লিখে দি, চলবে ?"

আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেও ভূপেশ এতটা পুলকিত হইতেন কি না সন্দেহ।

"আপনি দিলে চলবে না! তা কি হতে পারে কখনও! আপনি কি বরেনকে চেনেন?"

এই প্রশ্নে বাসুকীনাথের চক্ষুদুটি নিমীলিত হইল। ধীরে ধীরে মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ড এইভাবে থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে কহিলেন, "চিনি, সবাইকে চিনি আমি। অচেনার মধ্যে চেনাকে, সকলের মধ্যে এককে দেখেছি, এই তো আমার সাধনা, গ্যাঁড়া!"

এই আধ্যাত্মিক উক্তি ভূপেশ মজুমদারকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করিল যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাসুকী মহারাজের পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িলেন।

"কোন ভয় নেই গেঁড়ু। সব ঠিক হয়ে যাবে। মালপো খাও দুখানা।"

মোহিত ঘরের এককোণে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হয় নাই। মালপোয়াপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়াতে সে বুঝিল ব্যাপারটা আরও কিছুদূর গড়াইবে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আপনি তাহলে বসুন এখানে। আমি আপিসে যাই। ফেরবার পথে আপনাকে নিয়ে যাব।"

বাসুকী মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় নিয়ে যাবে?"

"আমার বাসায়।"

"তারজন্য তোমাকে কষ্ট করে আসতে হবে কেন? সুখনলাল তোমার বাসা চেনে তো?"

সুখনলাল বাসুকী মহারাজের ড্রাইভার।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চেনে বই কি।"

"তাহলে আমার গাড়িই ওকে পৌঁছে দেবে। তুমি আর কষ্ট করে আসবে কেন?"

"তাহলে আমি চলি।"

"এস।"

মোহিত উঠিয়া পড়িল এবং বাসুকী মহারাজের পিছনদিকে গিয়া নিজের কর্ণ-স্পর্শ করিয়া চক্ষুর একটা রহস্যময় ভঙ্গী করিল। ভূপেশ বুঝিলেন মোহিত দীক্ষার ব্যাপারটা আলোচনা করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। মোহিত চলিয়া যাইবার পর ভূপেশ দীক্ষাপ্রসঙ্গেই উপনীত হইলেন।

হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "আমার অনেকদিন থেকে একটা বাসনা আছে। কিন্তু মুখ ফুটে সেটা বলবার সাহস পাইনি কোনদিন! যদি অভয় দেন, আজ বলি।"

"বল।"

"জেনে-না-জেনে অনেক পাপ করেছি জীবনে। আপনাদের মতো মহাপুরুষের কৃপাকণা না পেলে আমাদের মতো পাপীর উদ্ধারের আশা নেই। আপনি যদি চরণে আশ্রয় দেন তাহলে—"

ভূপেশ পুনরায় তাঁহার চরণে উপুড় হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বাসুকী মহারাজ বাধা দিলেন।

"বারবার চরণ নিয়ে টানাটানি কর কেন? চরণটা তো আমি নই। আমার এই দেহটাও আমি নই, সেটা কেন তোমরা বোঝ না।"

ভূপেশ করজোড়ে আনতনয়নে বসিয়া রহিলেন।

"দীক্ষা নিতে চাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যদি আপনি কৃপা করেন—"

"বেশ, দেব।"

বাসুকী মহারাজ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল। ধীরে ধীরে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "সব বাঙালীকেই এবার দীক্ষা নিতে হবে। এখন এ পথ ছাড়া অন্য পথ নেই তার। একদিন সে ভোগের পথে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। চাকরির ক্ষেত্রে, পেশার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সবক্ষেত্রেই একদিন বিজয়পতাকা উড়িয়েছে সে। ভোগ-শিখরের চূড়ান্তে সে পৌঁছে গেছে। ভগবান এবার তাই দয়া করেছেন তাকে। কর্মীকেই তো তিনি দয়া করেন। কিন্তু তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের রূপ নিয়ে আসেনি, এসেছে নিষ্ঠুরতার রূপ নিয়ে। ভোগের ভোগবতী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ভোগের সর্বক্ষেত্র থেকে বাঙালী-বিতাড়ন চলছে আজ। এইবার বাঙালীকে কবি রবি ঠাকুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে হবে, "দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল—"

ভূপেশ জোড়হস্তে এই জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনিতেছিলেন। বাসুকীনাথ থামিতেই তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,

"তাই গাইব—।"

"দীক্ষা নিতে হলে কিছু কিছু আয়োজন করতে হবে।"

'করব। আমার ইচ্ছে সস্ত্রীক দীক্ষা নি। যদি অনুমতি দেন নীলুকে নিয়ে আসি গিয়ে—"

"স-স্ত্রীক দীক্ষা নেওয়াই উচিত। তবে নীলুকে এখানে আনবার দরকার নেই। আমিই কোলকাতা যাব। দত্তগুপ্তের ওখানেই যাব। শীতলাক্ষী বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছে। তার জন্যে একটা স্বস্ত্যয়নেঃ আয়োজন করতে হবে। সেইসময় তোমাদের দীক্ষা দিয়ে দেব। কি বল—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ভাল।"

বাসুকীনাথ ফতুয়ার পকেট হইতে একটি মূল্যবান ঘড়ি বাহির করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

"এক মিনিস্টারের বাড়ি থেকে গাড়ি আসবে একটু পরে। তুমি উঠেছ কোথা?"

"একটা হোটেলে।"

"মোহিতকে কোথা পেলে? বড় ভাল ছোকরা, ভারী জ্ঞানবান।"

"এবারই আলাপ হল।"

"তার কাছেই যাবে নাকি এখন?"

"তাই কথা আছে। কিন্তু তিনি কি আপিস থেকে ফিরেছেন?"

"তার আপিসেই যাও না হয়। সুখন আপিসও চেনে।"

বাসুকীনাথ উঠিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া ভূপেশ অবিলম্বে আসল প্রসঙ্গটির অবতারণা করিয়া ফেলিলেন।

"বরেনের কথাটা এখুনি লিখে দেবেন কি?"

"এক্ষুনি।"

তাহার পর সেকেণ্ড দুই চোখ বুঁজিয়া রহিলেন।

"তোমার নামে একটা চিঠি লিখে দি, কি বল?"

"আপনাকে আমি আর কি বলব। যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

"তাই দি।"

বাসুকীনাথ উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটি তুলোট কাগজে পরিষ্কার বাংলায় লিখিয়া আনিলেন।

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

কল্যাণীয় ভূপেশ, শ্রীমান বরেনকে আমি চিনি। উহাকে তুমি ছাড়িয়া দাও, আমি উহার জন্য জামিন রহিলাম। প্রয়োজন হইলে দত্তগুপ্তকেও আমি এ কথা বলিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাড়িয়া দিতে পার। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্বাদক
বাসুকীনাথ

ভূপেশ পত্রটি পাঠ করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

মোহিতের আপিস পর্যন্ত যাইতে হইল না। পথেই তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল। সে নিজেই হাত তুলিয়া গাড়ী থামাইল।

'চলুন সোজা আই-জির আপিসে। সেখান থেকে লোক এসেছিল আপনাকে খুঁজতে। আপনার হোটেলে এসেছিল, সেখানে আপনাকে পায়নি, হোটেলের চাকরটা আমাকে চেনে, সেই পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার আপিসে, ছিনে মিত্তিরও কিছু করেছে মনে হচ্ছে।"

"তোমার আপিসের কাজ হয়ে গেল?"

"প্রুফটা আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এলাম। আপনার ব্যাপারটা বেশী দরকারী।"

আই-জির আপিসে গিয়া ভূপেশ যাহা শুনিলেন তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

আই-জি বলিলেন, "আমাদের এক মিনিস্টারের নামে গত এক মাস থেকে ক্রমাগত চিঠি আসছে। সবগুলোই হুমকি। কুড়িখানা চিঠি এসেছে। এর তদন্তের ভার আপনাকে নিতে হবে। এখানকার কোন অফিসারের উপর তদন্তের ভার দেবার উপায় নেই। মিনিস্টারের সেটা ইচ্ছে নয়, তাঁর মাথায় কে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে এখানকার পুলিস অফিসাররাই এর সঙ্গে জড়িত আছেন। রং ইম্প্রেশন অবশ্য। আমি আপিসে বাংলাদেশের পাকা অফিসারদের একটা লিস্ট চেয়েছিলাম। এমন সময় কাল আপনি এলেন। মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছেন নাকি?"

"আজ্ঞে না! কেন বলুন তো?"

"তিনি একটু আগে ফোন করে বললেন কোলকাতা থেকে মজুমদার এখানে এসেছেন, তাঁকেই এন্‌কোয়ারির ভার দিন।"

"আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি। আমার সঙ্গে পরিচয়ও নেই।"

"তাহলে অন্য কোথাও আপনার সুখ্যাতি শুনে থাকবেন। আপনি ব্যাপারটার ভার নিন তাহলে। কাল এই চিঠিটা এসেছে দেখুন—"

একটা চিঠি ভূপেশকে দিলেন। ভাষা ইংরেজী। টাইপ করিয়া লেখা। বাংলা অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—

মন্ত্রী মহাশয়,

আপনার দুষ্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর আমরা রাখিতেছি। আপনার গতিবিধির উপরও আমাদের তীক্ষ্ণ নজর আছে। আপনি এখনও বিরত হউন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। আপনার শোণিতে মৃত্তিকা সিক্ত করিবার বাসনা আমাদের নাই, হত্যা করা আমাদের পেশাও নয়। কিন্তু ইহা স্থির জানিবেন দেশের কল্যাণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। ইতি— ভবানী পাঠক

"নিন এগুলোও, আপনার কাছেই সব থাক।"

ড্রয়ার টানিয়া একগোছা চিঠি তিনি বাহির করিয়া দিলেন। ভূপেশ সেগুলিও খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় আই-জি বলিলেন, "ওগুলো বাড়িতে পড়বেন। আসল ব্যাপারটা শুনুন এখন। কাল মিনিস্টার শ্বশুরবাড়ি যাবেন, সেখানে প্লেন নামবার জায়গা নেই, ট্রেনেই যেতে হবে। আজই আপনি বরং লাইনটা দেখে আসুন, আর সেখানে পাহারার ব্যবস্থা করুন। আমি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, আপনার যা দরকার সব পেয়ে যাবেন।"

"যে আজ্ঞে।"

নমস্কার করিয়া ভূপেশ আপিস হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পরমুহূর্তেই আই-জি মিনিস্টার মহাশয়কে ফোন করিয়া বলিলেন, "মজুমদারকেই লাগালাম। লোকটি সত্যিই ভাল। আপনি কিন্তু পরের প্যাসেঞ্জারটায় যাবেন। সবাই জানুক যে আপনি এক্সপ্রেসেই যাচ্ছেন, পাহারাও মোতায়েন থাকুক, যদি কেউ তাতে যেতে চায় যাক—কিন্তু আপনি যাবেন পরের ট্রেনে। বুঝলেন না? আমি যাচ্ছি একটু পরে—।"

আপিস হইতে বাহির হইয়া ভূপেশ মজুমদার স্বপ্নাচ্ছন্নের মত মোটরে উঠিয়া বসিলেন। সত্যই তাঁহার মন ক্ষণকালের জন্ত বৈদান্তিকভাবে আপ্লুত হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহা স্বপ্ন, মায়া, না মতিভ্রম!

"কি হল।"

মোহিতের প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙিল।

"ভালই। খুব ভাল—"

সহসা আবেগভরে তিনি মোহিতকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"তোমার ঋণ কখনো শোধ করতে পারব না ভাই।"

"ছাড়ুন, ছাড়ুন। অত সহজে ভোলবার ছেলে আমি নই। ঋণ আপনাকে শোধ করতেই হবে। একটি পয়সা ছাড়ব না—।"

"কি করতে হবে বল।"

"কৈলাসের বিয়েটি দিয়ে দিতে হবে। আমি যতদূর বুঝতে পারছি বিশাখা মেয়েটি অথৈ জলে পড়ে আছে। এর থেকে সাঁতরে উঠে আসবার ক্ষমতা তার আছে কিনা জানি না। আপনার সাহায্য পেলে হয়তো পারলেও পারতে পারে। আপনি পুলিসের লোক কিনা, তাই অনুরোধ এ ভারটি আপনাকে নিতে হবে।"

"নিশ্চয় নেব। বিশাখার সম্বন্ধে তুমি যা যা জান আমাকে বল—।"

"আমি সব লিখে দেব। এলোমেলো কাজ আমি করি না। লিখে খামে পুরে আপনাকে দিয়ে দেব। কবে নাগাদ আপনি ফ্রি হবেন?"

"ঠিক বলতে পাচ্ছি না ভাই। এ মিনিস্টারের প্যাঁচ কি না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, অ্যাট অল্ দাঁড়াবে, না, হু হু করে বইতেই থাকবে, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

"কেন, মিনিস্টারের কি হল আবার?"

"কনফিডেনশাল ব্যাপার। বলা যাবে না। কিছু মনে কোরো না।"

"মনে করব কি। আপনার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আপনি কি নাগাদ কোলকাতা ফিরবেন তার একটা আন্দাজ দিন অন্তত।"

"দরকার পড়লে হয়তো কালই যেতে হতে পারে। আবার দেরিও হতে পারে। কিছু বলা যায় না।"

"কৈলাস তাহলে কি করবে এখন। এখানে বসেই ভ্যারাণ্ডা ভাজুক।"

"আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকুক না। ওর বিশেষ কোন কাজ নেই যখন—।"

"কাজ ইচ্ছে করলে আপনি দিতে পারেন। আপনি যদি বিধু-বাবুর ঠিকানাটা ওকে দিয়ে দেন ও সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে পারে।"

"তা পারে। কিন্তু বিধু কোথায় আছে তার ঠিক নেই, তার অনুপস্থিতিতে সে মেয়েটি ওখানে আছে কি না তাও অনিশ্চিত। আমি নিজে না গেলে সুবিধে হবে না।"

"তাহলে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আপনার কুকুরের শখ আছে?"

"ছিল এককালে. এখনও আছে একটু-একটু। কেন?

"তাহলে সুখ পাবেন। আপনাকে একটা ভাল জিনিস দেখাই চলুন। ড্রাইভার, বাঁ-হাতি গলিটাতে ঢোক তো ভাই একবার।"

"কি দেখাবে?"

"কুকুর। শুদ্ধকুলোদ্ভব ককার্স স্প্যানিয়েল একটি। নাবুন, রাস্তা থেকেই দেখতে পাবেন।"

নাবিতে হইল। মোহিত মৈত্র একটি বাড়ির বারান্দায় উপবিষ্ট একটি কুচকুচে কালো লোমশ কুকুর দেখাইয়া বলিল,

"ওই দেখুন। বিউটি একটি, নয়?"

"হ্যাঁ, চমৎকার।"

ভূপেশের এসব তত ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে হাসিয়া এবং ঘাড় নাড়িয়া কুকুরটির তারিফ করিতে হইল।

মোহিত বলিল, 'ওই কুকুরটিকে আদর করবার জন্য আমিও বাড়ির একটা ছেলের সঙ্গে ভাব করেছি। অতি বদ ছেলে, খালি ধার চায়, কিন্তু কুকুরটিকে আদর করবার লোভ সামলাতে পারি না। কিন্তু আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলুন।"

উভয়ে আবার গাড়িতে আসিয়া বসিলেন। গাড়ি চলিতে লাগিল।

"কৈলাস তাহলে আপনার সঙ্গে যাচ্ছে?"

"চলুক—"

"কৈলাসের পরিচয় পেয়েছেন কি?"

"কিছু কিছু পেয়েছি—"

"আমি আর একটু দি। সংক্ষেপেই বলছি। ও কিরকম লোক জানেন? যেন একটি পাকা ল্যাংড়া আম। সর্বগুণান্বিত। খোলা পাতলা, প্রচুর মিষ্টি শাঁস, আঁশ নেই, আঁটিটি ছোট। কিন্তু এইজন্যই ওর বিপদ বেশী। যে পাবে সেই খেয়ে ফেলবে। অথচ জরদগবও নয়, দামী হীরের টুকরো। বুঝেছেন?

'বুঝেছি—"

"সুতরাং ওকে একটু রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।"

"করব। নিশ্চয় করব।"

"আপনার হাতে ওঁকে সঁপে দিয়ে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি?"

"নিশ্চয়।"

সেইদিনই সন্ধ্যায় ভূপেশ মজুমদার স্বাধীন ভারতের জনৈক মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়িযাত্রা নির্বিঘ্ন করিবার জন্য পুলিসবাহিনীসহ বাহির হইয়া পড়িলেন।

।। দুই ।।

বিধুভূষণ বেশ শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছিলেন। ও. সি কুণ্ডু তাঁহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। ও. সি. কুণ্ডুর সহিত হোটেল ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিতই তিনি ঘুরিতেছিলেন। যে ট্রেন তাঁহার ধরিবার কথা সে ট্রেন তিনি ধরিতে পারেন নাই। ও. সি. কুণ্ডু বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ জিনিসপত্র কিনিতে কিনিতে এত দেরি করিয়া ফেলিলেন যে, সময়মতো স্টেশনে পৌঁছানো গেল না। পরবর্তী ট্রেনটাই ধরিতে হইল।

বিধুভূষণ থার্ডক্লাস কিংবা বড়জোর ইন্টারক্লাসে চিরকাল চড়িয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বা প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়া পয়সা অপব্যয় করিবার কল্পনা তিনি কখনও করেন না। কিন্তু ও. সি. কুণ্ডুর সন্তোষবিধানার্থে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিতে হইল। ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন তিনি ফার্স্ট্‌ক্লাস ছাড়া "ট্রাভল" করেন না। তিনি বিধুভূষণের নিকট হইতে টাকা লইয়া নিজেই গিয়া টিকিট খরিদ করিলেন। অনেকগুলি টাকা লাগিল। বিধুভূষণ আপত্তি করিতে পারিলেন না। এই নামজাদা ডিটেকটিভকে চটাইবার সাহস তাঁহার ছিল না। মনে হইয়াছিল ইহারা কেঁচো খুঁড়িবার নাম করিয়া সাপ খুঁজিয়া বেড়ায়, কখন কি মতলবে থাকে বোঝা শক্ত, কয়টা টাকার জন্য কি দরকার ইহাকে চটাইয়া! ও. সি. কুণ্ডু আসিয়া বলিলেন, "কে এক মিনিস্টার এই গাড়িতে যাচ্ছে। তাঁর লটবহর, জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী একটি গোটা ফার্স্ট্‌-ক্লাস দখল করে বসেছে। আমি অনেক কষ্টে দুটি বার্থ-ওলা একটি কূপে পেয়েছি। এক হিসেবে সুবিধাই হল, তৃতীয় লোক উঠে বিরক্ত করবে না আমাদের।"

বিধুভূষণ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। সমস্ত পথটা এই লোকটার সহিত মুখোমুখি বসিয়া থাকিতে হইবে। সর্বনাশ।

ও. সি. কুণ্ডু গাড়িতে উঠিয়াই বাথরুমটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঝুঁকিয়া উপুড় হইয়া সার্শি, খড়খড়ি টানিয়া নানাবিধ পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

"কি দেখছেন বাথরুমে?"

"দেখছি পালাবার কোনও রাস্তা আছে কিনা। একবার এই বাথরুমে একটা চোরকে ধরেছিলাম আমি। সেইজন্যে গাড়িতে চড়েই প্রথমে বাথরুমটা দেখে নি।"

"ও।"

ইহার বেশী কোনও কথা আর বিধুভূষণের মুখ হইতে বাহির হইল না। সেইসময় একটা খাবারের ফেরিওয়ালা খাবারের গাড়িটি ঠেলিতে ঠেলিতে আসিয়া তাঁহাদের কামরার সম্মুখে দাঁড়াইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিধুভূষণ তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন এবং খাবার কিনিতে লাগিলেন। অনেক খাবার কিনিয়া ফেলিলেন। ভাবিলেন, লোকটাকে খাওয়াইয়া যদি একটু নরম করা যায়!

"অত খাবার খাবেন আপনি?"

প্রশ্ন করিলেন ও. সি. কুণ্ডু।

"আপনিও তো আছেন।"

"আমি আপনার হাত থেকে কিছু খাব না, নট এ গ্রেন। আমার খাবার আমার বাস্কেটে আছে। সঙ্গেও আছে।"

প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকাইয়া কুণ্ডু মহাশয় একটি চ্যাপটা গোছের বোতল বাহির করিয়া দেখাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "যতক্ষণ না অন্যরকম প্রমাণ পাচ্ছি ততক্ষণ আপনাকে শত্রু বলে মনে করব। আপনার হাত থেকে এক গণ্ডূষ জল পর্যন্ত খাব না" এই বলিয়া তিনি রঙীন চশমাটা খুলিয়া ফেলিতেই বিধুভূষণ পুনরায় তাঁহার রক্তবর্ণ জ্বলন্ত চক্ষুদুইটি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া খুবই ঘাবড়াইয়া গেলেন তিনি। প্ল্যাটফর্মে অনেক লাল পাগড়ী পুলিস আসিয়াছিল। সম্ভবত মিনিস্টারের দেহরক্ষী উহারা। বিধুভূষণের একবার মনে হইল, উহাদের একজনকে ডাকিয়া ও. সি. কুণ্ডুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাঁহার বিবেকে গলদ ছিল। ভাবিলেন, দরকার নাই, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সত্যই যদি সাপটা বাহির হইয়া পড়ে!

খাবারওলা দাম লইয়া চলিয়া গেল। ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন, "আপনি ঘুমুতে চান, ঘুমুন। আমি ঘুমুব না। আমি সমস্ত রাত জেগে বসে থাকব।

"কেন?"

"আপনাকে পাহারা দেব। আপনি যে মাঝরাত্রে উঠে স্যুট করে নেবে যাবেন সেটি হতে দিচ্ছি না।"

ও. সি. কুণ্ডু সামনের খোলা জানালার দিকে চাহিয়া শিস দিতে লাগিলেন। বিধুভূষণের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না পর্যন্ত। বিধুভূষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল উঠিয়া গিয়া লোকটার গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় বসাইয়া দিতে। কিন্তু বিবেকে গলদ ছিল, আত্মসংবরণ করিতে হইল। যে খাবার কিনিয়াছিলেন তাহাই কিছু গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিলেন ঘি নয়, দালদা। দালদায় প্রস্তুত এতগুলো খাবার কি তিনি হজম করিতে পারিবেন? তির্যকপথে, আর একটি চিন্তাও আসিয়া এই অবসরে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ

অন্তমনস্ক করিয়া দিল। জিৎরাম বেশ ফালাও করিয়া দালদার ব্যবসায় ফাঁদিয়াছে। তাঁহাকেও অংশীদার করিতে চাহিয়াছিল, এখনও চায়···আরও গোটা দুই নিমকি চর্বণ করিলেন···তাহার পর আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়িতে জলের কুঁজাটি ফেলিয়া আসিয়াছেন। বাথরুমে ঢুকিয়া হাতটা, মুখটা ধুইয়া ফেলিলেন। বাথরুমের জল খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—বাচিয়া তিনি আবার ও সি. কুণ্ডুর সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, উদ্দেশ্য, আলাপ করিয়া তাঁহাকে যদি একটু নরম করিতে পারেন—বলিলেন, "ও মশাই, আমি এক কাণ্ড করেছি। জলের কুঁজোটা ফেলে এসেছি। অমন ভাল কুঁজোটা চাকরব্যাটা গাপ করবে নিশ্চয়। পরের স্টেশনে জল নিতে হবে। তেষ্টা পেয়েছে খুব!"

"আমার কাছে জল আছে, ইচ্ছে করেন তো খেতে পারেন। তবে প্লেন জল নয়, ব্রাণ্ডিমেশানো। প্লেন জল আমি খাই না—"

"না, থাক। ব্রাণ্ডি খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।"

"খেয়ে দেখতে পারেন, খারাপ লাগবে না, ঘুম হবে।"

"না, থাক—"

বিধুভূষণ একটা বার্থে নিজের বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। ও. সি. কুণ্ডুর দিকে পিছন ফিরিয়া চোখ বুঁজিলেন। ঘুম কিন্তু আসিল না। নানা জটিল চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া জটিলতর হইতে লাগিল। একটা কথা বিশেষভাবে আকুল করিয়া তুলিল। নীহারবাবুর বাড়িতে কাবুলি-চপ্পল-পরা ষণ্ডাগোছের সেই ছোকরা যে খবরটি দিল তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তো ভয়ানক কথা। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যদি দেখেন বিশাখা, বরেন কেহ নাই তাহা হইলেই তো সর্বনাশ। ও. সি. কুণ্ডু তাহা হইলে যে কি কাণ্ড করিবে! সত্যই হুইসল্ বাজাইয়া হয়তো পুলিস জড়ো করিয়া ফেলিবে! পাড়ার মাঝখানে তাহা হইলে যে কেলেঙ্কারী হইবে তাহা কল্পনা করিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ঘুম আসিল না।

সহসা ও. সি. কুণ্ডু কথা কহিয়া উঠিলেন।

"ঘুমুলেন না কি?"

"না, ঘুম আসছে না।"

"আপনার কোলকাতার ঠিকানা কি?"

"কেন?"

"টুকে রাখতে চাই। ওটা গোড়াতেই জিজ্ঞেস করে টুকে রাখা উচিত ছিল আমার।"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"বলুন।"

বলিতেই হইল। এ তো এক আচ্ছা মোগলের হাতে তিনি পড়িয়া গিয়াছেন! কত খানাই যে উহার সহিত খাইতে হইবে কে জানে!

ঠিকানাটা শুনিয়া ও. সি. কুণ্ডু উঠিয়া বসিলেন এবং পকেটবুক বাহির করিয়া তাহাতে সেটা টুকিয়া রাখিলেন। তাহার পর যে পুস্তকটি পাঠ করিতেছিলেন তাহাতেই পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন। বিধুভূষণ ঈষৎ ব্যায়ত আননে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন তাহার দিকে। লক্ষ্য করিলেন, ও. সি. কুণ্ডু রঙীন চশমা খুলিয়া একটা মোটা-রিম-ওয়ালা সাদা চশমা পরিধান করিয়াছেন। যে বইটা পড়িতেছেন তাহার মলাটের উপর বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—আগাথা ক্রিস্টি। সাদা চশমা পরিয়া তাঁহাকে আরও ভয়ানক দেখাইতেছিল। তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ঘোর লাল তাহা তিনি ইতিপূর্বেই দেখিয়াছিলেন কিন্তু অক্ষিতারকাযুগল যে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা তিনি পূর্বে লক্ষ্য করেন নাই। ঠিকানা টুকিয়া লইয়া তিনি পুস্তকে মন দিয়াছিলেন।

হঠাৎ ফিরিয়া বলিলেন, "ঘুমোতে চান তো ব্রাণ্ডি খান একটু। খুব স্থদিং।"

"খাইনি কখনও কি না।"

"সেইজন্যই বলছি, খেলেই ঘুমিয়ে পড়বেন। প্রথম যারা খায়, তাদের ঘুম পায়। দেব ?"

"না, থাক।"

ও. সি. কুণ্ডু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুনরায় পাঠে মন দিলেন। মনে হইল তাঁহার চোখের তারাদুইটি আরও খানিকটা যেন বাহির হইয়া পড়িল। চোখ দেখিয়া বিধুভূষণ আরও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল ইঁহার অনুরোধ বারংবার উপেক্ষা করাটা কি সুবুদ্ধির কাজ হইতেছে ? ইঁহার কবলে যখন পড়া গিয়াছে তখন ইঁহাকে চটাইয়া তো কোন লাভ নাই। বরং ভিজাইবার চেষ্টা করা উচিত। ভিজাইবার জন্যই তিনি খাবার কিনিয়াছিলেন, কুঁজা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ও সবে তো সুবিধা হইল না। একটু ব্রাণ্ডি পান করিলে কিই বা এমন হইবে ? মতির এরূপ গতি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বিধুভূষণ খানিকক্ষণ চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। ব্রাণ্ডি প্রত্যাখ্যান করিয়া আবার তাহা চাহিয়া লইতে কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কখনও এপাশ, কখনও ওপাশ করিতে লাগিলেন। দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে চিত্ত নিবিষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেন। চিত্ত কিন্তু কিছুতেই স্থির হয় না। সহসা লক্ষ্য করিলেন, তিনি বিশাখার কথাই চিন্তা করিতেছেন, যেন তাহার পায়ে ধরিয়া বলিতেছেন, আমাকে তুমি বাঁচাও। বিষ্ণুচরণের কথা একবার মনে হইল। লোকটা অতগুলো টাকা সত্যই গাপ করিবে না কি! ফোনের কথাবার্তার শুরু তো মোটেই তাঁহার ভাল লাগে নাই। ট্রেনটা কি ভীষণবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, মনে হইতেছে যেন অট্টহাস্য করিতেছে। নাঃ, ঘুম কিছুতেই আসিবে না। বিধুভূষণ উঠিয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কুণ্ডু মশাই, দিন, আপনার ব্রাণ্ডিই দিন একটু। কিছুতেই ঘুম আসছে না।"

ও. সি. কুণ্ডু তড়িৎবেগে উঠিয়া নিজের বেতের বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং একটা ফ্লাস্ক হইতে পরিষ্কার একটি কাঁচের গ্লাসে খানিকটা বাদামী রঙের পানীয় ঢালিয়া ফেলিলেন।

"সিপ করে করে খান। একেবারে ঢক্ ঢক্ করে খাবেন না।"

"বেশ।"

ও. সি. কুণ্ডু বেশ যেন একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রদীপ্ত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি বিধুভূষণের মদ্যপান দেখিতে লাগিলেন, যেন একটা অদ্ভুত কিছু দেখিতেছেন।

"কেমন লাগছে—"

বিধুভূষণ মুখ বিকৃত করিয়া সিপ করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল ঔষধ পান করিতেছেন। গলাটা জ্বলিতেছিল। কিন্তু ও. সি কুণ্ডুব প্রশ্ন শুনিযা তাঁহার বদনে হাসি ফুটিল।

"চমৎকার লাগছে—"

"আর একটু দি তাহলে।"

বিধুভূষণ আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। আরও খানিকটা মদ লইয়া 'সিপ' করিতে লাগিলেন।

"কেমন লাগছে?"

"অতি চমৎকার।"

"আর একটু নিন তাহলে।"

"দিন।"

এইভাবে বিধুভূষণ প্রায় পুরা দুই পেগ ব্রাণ্ডি পান করিয়া ফেলিলেন।

"এইবার শুয়ে পড়ুন।"

বাধ্য বালকের মতো বিধুভূষণ শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করিতেছিল। ক্রমশঃ তাঁহার চৈতন্যও ঘোলাটে হইয়া আসিল। মিনিট দশেকের মধ্যে তিনি ঘুমাইযা পডিলেন। আনন ঈষৎ ব্যাদিত হইল, নাক ডাকিতে লাগিল।

হঠাৎ যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কি ঘটিয়াছে। চতুর্দিকে যেন অন্ধকারসমুদ্র গর্জন করিতেছে। সহসা তিনি আবিষ্কার করিলেন ট্রেন চলিতেছে না।

"কুণ্ডুমশায়—মিস্টার কুণ্ডু—"

কোন সাড়া নাই। সহসা একটা টর্চের আলো অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিল। ট্রেনে কে একজন উঠিল যেন। উঠিয়া বলিল, "আপনার লাগেনি তো কোথাও?"

বিধুভূষণ উঠিয়া বসিলেন।

"কে আপনি?"

"আমি পুলিসের লোক। আপনার কোথাও আঘাত লাগেনি তো?"

"না আঘাত লাগবে কেন?"

"তাহলে আপনি নাবুন।"

"কেন, কি হয়েছে।"

"ট্রেন ডিরেল্‌ড হয়েছে?"

"ডিরেল্‌ড?"

"হ্যাঁ, নেবে পড়ুন।"

"নেবে যাব কোথায় এই অন্ধকারে।"

"আপাতত আমাদের কাছেই থাকুন।"

"আপানাদের কাছে, মানে, থানায়?"

"থানা কোথা মশাই এখানে, চতুর্দিকে মাঠ।"

"এখানে আপনি এলেন কি করে?"

"পুলিসফোর্স সমস্ত লাইনটাকে ঘিরে ফেলেছে।"

"কেন—"

"এই গাড়ীর পিছনদিকে বোমা পড়েছে একটা।"

"বোমা? সর্বনাশ। কুণ্ডুমশাই গেলেন কোথা।"

"কুণ্ডুমশাই কে?"

"আমার সঙ্গে ছিলেন এক ভদ্রলোক।"

"তিনি নেবে গেছেন বোধ হয়, আপনিও নাবুন।"

"আমার জিনিসপত্র?"

"সব ব্যবস্থা হবে। আপনি নাবুন তো আগে।"

কণ্ঠস্বরে ধমকের আভাস পাইয়া বিধুভূষণ নামিয়া পড়িলেন। বুকে হাত দিয়া একবার দেখিলেন 'ইনার পকেটে' মানিব্যাগটা ঠিক আছে কি না। দেখিলেন, আছে। দেখিলেন, অসংখ্য লোক চতুর্দিকে কলরব করিতেছে। বহু টর্চের আলো জ্বলিতেছে চতুর্দিকে। অন্ধকার কিন্তু আলোকিত হইতেছে না। অসংখ্য আলোর বল্লম যেন একটা কালো জন্তুর গায়ে বিঁধিয়াছে, কিন্তু জন্তুটা নড়িতেছে না। ও. সি. কুণ্ডু কোথায় গেলেন? কাছেপিঠে তো কোথাও নাই। হঠাৎ একটা কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি আরাম অনুভব করিলেন। মনে পড়িল কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি না কি বলিয়াছিল, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। তাঁহাকে ও. সি. কুণ্ডুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই ভগবান হয়তো ট্রেনখানা ডিরেল্‌ড করিয়া দিলেন। কে জানে!

পুলিসের লোকটি বলিলেন, আপনাকে চলুন একটু আলাদা বসিয়ে নিচ্ছি। আপনি ফার্স্ট্‌ক্লাস প্যাসেঞ্জার, আপনি যাতে একটু আরামে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওই গাছতলাটায় চলুন, ওখানে ভিড় নেই।"

গাছটা একটু দূরে ছিল। কিছুদূর হাঁটিয়া তাহারই তলায় গিয়া বিধুভূষণ আশ্রয় লইলেন। একটু পরে তাঁহার জিনিসপত্রও আসিয়া পড়িল। বিধুভূষণ লক্ষ্য করিলেন, ও. সি. কুণ্ডুর বেতের বাক্সটিও তাঁহার জিনিসপত্রের সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। বাক্সটির উপর ও. সি. কুণ্ডুর নাম, ঠিকানাও লেখা আছে দেখিলেন।

"ও বাক্সটা আমায় নয়, কুণ্ডুমহাশয়ের।"

"থাক ওটা এখানে। তাঁর খোঁজ পেলে তাঁকেও এখানে নিয়ে আসব।"

"না মশায়, দয়া করে ও কাজটি করবেন না। অদ্ভুত লোক, সারারাত আমাকে জ্বালাতে জ্বালাতে এসেছে। ও বাক্স আপনারা নিয়ে যান, তাঁর দেখা পেলে দিয়ে দেবেন। আর দয়া করে বলবেন না আমি এখানে আছি। তাহলেই এসে হাজির হবে আর বকবক করবে।"

পুলিস অফিসারটি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ। বাক্সটা নিয়ে যাই তাহলে। আপনি বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমরা পাহারায় থাকব, কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুন। সকাল নাগাদ সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বড়সায়েবও এসে পড়বেন ততক্ষণ।"

বিধুভূষণের তন্দ্রা আসিয়াছিল। কিন্তু ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

"বকু—বকু ও বকু, কোথা গেলে তুমি—"

কে যেন কাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। বকু নামটা শুনিয়া কিন্তু বিধুভূষণের সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। মনে হইল যেন তাঁহার মেরুদণ্ড বহিয়া তুষারশীতল জলধারা সর্পিলগতিতে নামিতেছে। জেলের সেই দৃশ্যটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, বুকের গুলি-বিদ্ধ রক্তাক্ত শবদেহটা মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া আছে! সঙ্গে সঙ্গে একটা অসম্ভব কথাও তাঁহার মনে হইল। বকু বাঁচিয়া নাই তো! হয়তো জেলের ডাক্তারেরা অপারেশন করিয়া গুলি বাহির করিয়া দিয়াছে, তাহার শরীরে অপরের রক্ত দিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে। আজকালকার দিনে কিছুই অসম্ভব নয়। সেদিন কাগজে এইরকম একটা সংবাদ তিনি পড়িতেছিলেন।

"বকু—বকু—বকু—ও বকু—এদিকে—এদিকে—"

অন্ধকারে অজানাকণ্ঠে কাতর চিৎকারটা ক্রমাগত যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিধুভূষণের আতঙ্ক হইল। তাঁহাকেই খুঁজিতেছে না তো। একবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু এই অন্ধকারে কোথায় যাইবেন? পা দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"বকু—বকু—বকু।"

বিধুভূষণ অবশেষে দুই কানে আঙুল ঢুকাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াই রহিলেন।

প্রথমশ্রেণীর বার্থে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া নিমীলিতচক্ষু বিষ্ণুচরণ চিন্তা করিতেছিল

বিশাখা মেয়েটি কেমন। তাহার জাগ্রত মানস কল্পনা-বেলুনে চড়িয়া যে-সব দেশে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল তাহা রূপকথার দেশ। সেখানে সে নিজেকে রাজপুত্র এবং বিশাখাকে ঘুমন্ত রাজকন্যা ভাবিয়া সোনার কাঠির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অতি শৈশবে তাহার ঠাকুরমার মুখে যে আজগুবি রূপকথা সে শুনিয়াছিল তাহাই এখন তাহার নিগূঢ় চৈতন্যলোক হইতে উঠিয়া আসিয়া জাগ্রত মানসলোককে স্বরঞ্জিত করিতে লাগিল। ট্রেনের দোলানিতে জাগ্রত মানস কিন্তু বেশীক্ষণ জাগ্রত থাকিতে পারিল না, ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের দেশের কল্পনা-বেলুন রূপান্তরিত হইল স্বপ্নে। বিশাখার পরিবর্তে শিবানী আসিয়া দেখা দিল।

শিবানী বলিল, "দেখ, আমি কেমন সুখে আছি। খোকন কত বড় হয়েছে দেখ। তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে আসতে পারতে কেমন সুখে থাকতাম সবাই মিলে। অনেক চেনা-শুনা লোক আছে এখানে।"

কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বিষ্ণুচরণ স্বপ্নলোকে অতি স্বাভাবিকভাবে শিবানীর সহিত আলাপ করিতে লাগিল। বলিল, "তা আর আসতে পারলাম কই। আমি ভীতু, তোমার মতো সাহসী নই। এখন কিন্তু কি করি বল তো—"

"জুবেদাকে যখন বিয়ে করেছ, তখন তাকে নিয়েই ঘরকন্না কর।"

"কিন্তু সে যে আমার কাছে থাকতে চায় না।"

"না থাকতে চায়, চলে যাক।"

"আমি তখন কি করব?"

"অপেক্ষা কর।"

"কিসের অপেক্ষা?"

"পারের খেয়ার। আমি যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।"

"আমি যদি আর একটা বিয়ে করি তাহলেও অপেক্ষা করে থাকবে?"

"নিশ্চয়। তবে আমার যদি পরামর্শ শোন, আর বিয়ে করতে যেও না। ওই চন্দ্রলেখা বা বিশাখাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না, শুধু ঝামেলা বাড়বে। তার চেয়ে বরং বাধ্য হয়ে যাকে বিয়ে করেছ, তাকে নিয়েই থাক। মেয়েটি খারাপ নয়। সে যদি বোঝে যে তুমি তাকে ভালবাস তাহলে তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইবে কেন? ভালবাসায় পশুও বশ হয়।"

"সাধারণ পশুরা হয়, কিন্তু মানুষ আজব জানোয়ার। তুমি নিজেই কি করেছ ভেবে দেখ না!"

ট্রেনটা একটা স্টেশনে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা। লাইন ক্লিয়ার ছিল না। সামনে একটা ট্রেণ নাকি লাইনচ্যুত হইয়া পথরোধ করিয়াছে।... শিবানীর স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। বিষ্ণুচরণ পাশ ফিরাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ বেশ সুনিদ্রা হইল।

ট্রেন পুনরায় ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিষ্ণুচরণের সহযাত্রীটি জাগিয়াই ছিলেন। ট্রেন যেই চলিতে আরম্ভ করিল তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিলেন।

ট্রেন যখন পাটনা স্টেশনে প্রবেশ করিল তখন গভীর রাত্রি। বিষ্ণুচরণ পুনরায় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। জুবেদা যেন আসিয়াছে। বলিতেছে—আপনি বড় তাড়াতাড়ি চলে এলেন, আমারও ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে আসি। বিশাখার সঙ্গে অনেক-দিন দেখা হয়নি, সম্ভব হলে এ বিপদে তাকে সাহায্য করতাম।

ঠিক এইমুহূর্তে তাহার সহযাত্রীটি ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিলেন।

"উঠুন, উঠুন, এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছেন।"

"আমাকে?"

ধড়মড় করিয়া বিষ্ণুচরণ উঠিয়া বসিল।

"এটা কোন্ স্টেশন?"

"পাটনা।"

"এখানে কে আমাকে খুঁজছে?"

"এই যে, এই ভদ্রলোক।"

ভার্গব জানালা দিয়া মুখ গলাইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনিই কি. মিস্টার জমিরুদ্দিন, করাচী থেকে আসছেন?"

'হ্যাঁ।"

"নাবুন তাহলে। আপনার স্ত্রী করাচী থেকে চলে এসেছেন। আপনাকে নামিয়ে নেবার জন্য স্টেশনে এসেছেন তিনি। আপনি নেবে পড়ুন। আপনার জিনিসপত্তর কোন্‌গুলো? এই কুলি, ভিতর যাও।

"আমার স্ত্রী? জুবেদা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"ওই যে।"

বিষ্ণুচরণ দেখিল কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সত্যই একটি নারীমূর্তি প্ল্যাটফর্মের একধারে দাঁড়াইয়া আছে।

"জুবেদা এখানে এল কি করে—"

"প্লেনে এসেছেন। আপনাকে ধরবার জন্যে প্রত্যেকটি ট্রেনে নিজে এসে খোঁজ করছেন। আপনার কি একটা বিপদের খবর পেয়েই এসেছেন শুনছি। আপনি আর দেরি করবেন না, নেবে পড়ুন—"

গার্ডের হুইস্‌ল শোনা গেল। বিষ্ণুচরণ হুড়মুড় করিয়া নাবিয়া পড়িল। নাবা উচিত কি না সে বিচার করিবার অবসর ছিল না। তাহার সহযাত্রীটিও নাবিল। বোরখাপরা

নারীটি হস্তের ইঙ্গিতে বিষ্ণুচরণকে আহ্বান করিয়া ওভারব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিষ্ণুচরণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বিষ্ণুচরণের সহযাত্রীটিকে আড়ালে ডাকিয়া ভার্গব নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "ঠিক লোক তো?"

"ঠিক লোক।"

"তুমি ফিরে যাচ্ছ দিল্লীতে?"

"হ্যাঁ। দিল্লী থেকে করাচী যাব।"

স্টেশনের বাহিরে একটি বেশ বড় মোটর দাঁড়াইয়াছিল। বোরখা-ধারিণী বিষ্ণুচরণকে লইয়া গিয়া তাহাতেই আরোহণ করিলেন। ভার্গব বসিল ড্রাইভারের পাশে।

"ব্যাপার কি"—নিম্নকণ্ঠে বিষ্ণুচরণ বোরখা-ধারিণীকে প্রশ্ন করিল।

"চলুন। বলছি সব"—অতি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল বোরখা-ধারিণী। বিষ্ণুচরণের মনে হইল সঙ্গে লোক আছে বলিয়া জুবেদা বোধ হয় জোরে কথা কহিতে পারিতেছে না। ইহাই বোধ হয় মুসলমানী নিয়ম।

মোটর চলিতে আরম্ভ করিল। অচিরেই তাহার গতিবেগ বাড়িয়া চলিল।

উদ্যোগপর্ব

॥ এক ॥

মিনিস্টারমহাশয়ের যে ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাইবার কথা ছিল সত্যই সে ট্রেনে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। মিনিষ্টারের জন্য নির্দিষ্ট সেলুনটি পিছনদিকে ছিল, তাহারই কয়েকটা কাঁচ ভাঙিয়া গিয়াছিল মাত্র। ট্রেনটি লাইনচ্যুতও হইয়াছিল। আর কিছু হয় নাই।

ভূপেশ মজুমদার কয়েকজন পুলিস অফিসারসহ অবস্থান করিতেছিলেন ঠিক আগের জংশন স্টেশনটিতে। ফোনে খবর পাইয়া মোটর-ট্রলিযোগে তিনি যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া অকুস্থলে পৌছিলেন তখন ভোর হইতেছে। বোমা-নিক্ষেপকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে বা তাহার সন্ধান-সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি শতগুণ বাড়িয়া যাইবে এই দুরাশার বশবর্তী হইয়া তিনি সংবাদটি পাইবামাত্র ফোনে হুকুম দিয়াছিলেন যে, তিনি না পৌছানো পর্যন্ত যেন কাহাকেও স্থানত্যাগ করিতে না দেওয়া হয়। এমনিই স্থানত্যাগ করিবার উপায় ছিল না, কারণ লাইনচ্যুত ট্রেনকে লাইনস্থ করিতে বেশ বিলম্ব হইতেছিল।

প্রতি যাত্রীর নাম, ধাম, ঠিকানা ও টিকিট পরীক্ষা করিতে করিতে ভূপেশ মজুমদার অবশেষে বিধুভূষণের সমীপবর্তী হইলেন।

"আরে, একি বিধু—তুমি এখানে—"

"এই ট্রেনে কোলকাতা ফিরছিলাম ভাই। রাস্তার মাঝখানে কি বিপদ দেখ—"

"খুব বেঁচে গেছ। ট্রেনে বোমা পড়েছিল—"

"শুনেছি! এখন কি হচ্ছে?"

"ট্রেন ডিরেল্‌ড হয়ে গেছে। যে বোমা ফেলেছিল আমরা তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি —"

"ও।"

বিধুভূষণকে দেখিয়া ভূপেশের যুগপৎ কৈলাসের কথা এবং হোটেলে প্রাপ্ত চিঠিটির কথা মনে হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কিছুই বলিলেন না। কৈলাস তাঁহার সঙ্গে আসে নাই, কারণ একটি জরুরি টেলিগ্রাম পাইয়া তাহাকে কলিকাতা ফিরিতে হইয়াছিল। বিধুভূষণের পত্রটি কিন্তু তাঁহার মনি-ব্যাগে ছিল। কথাটা মনে হইতেই একটি সূক্ষ্ম স্মিত-

হাস্য তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কোন কথা না বলিয়া কয়েক মুহূর্ত তিনি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"যে বোমা ফেলেছিল তাকে ধরতে পেরেছ ?"

"এখনও খোঁজাই শেষ হয়নি।"

"কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এই গাছতলায় ?"

"তা থাকতে হবে খানিকক্ষণ। লাইনই ঠিক হয়নি এখনও। তা তোমার এখানে বসবার দরকার কি, তুমি আমার ট্রলিতে গিয়ে বস। কিংবা আমাদের ঘরেও যেতে পার, ট্রেনের তো বিস্তর দেরি এখন। ওহে, শোন—"

একটি ছোকরা দারোগা আগাইয়া আসিল।

"একে আমাদের ঘরটায় নিয়ে গিয়ে বসাও। আমার বন্ধু একজন। চা-টা সব ব্যবস্থা করে দিও। বিধু, যাও তুমি এর সঙ্গে—"

"তোমার কাজ কতক্ষণে শেষ হবে ?"

"ঘণ্টাখানেক অন্ততঃ লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। তুমি বিছানা পেতে ঘুমোওগে না। আমি আসছি একটু পরেই—"

দারোগাটির সহিত বিধুভূষণ চলিয়া গেলেন। তাঁহার জিনিসপত্রও একজন কনস্টেবল বহন করিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিল। বিধুভূষণ গিয়া দেখিলেন, স্টেশনের খানিকটা অংশ পুলিসরা দখল করিয়া রহিয়াছে। পুলিসের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে দারোগা-সাহেব বিধুভূষণকে বসাইয়া দিল। পুলিস কনস্টেবলটি হোল্‌ডঅল্ খুলিয়া তাঁহার বিছানা পাতিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই চা এবং গরম গরম সিঙাড়া আসিল। দারোগাটি সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল—"আর আপনার কিছু দরকার হবে কি ? কাগজ-ওলাকে বলেছি একখানা কাগজ এখুনি আপনাকে দিয়ে যাবে।"

"না, আমার আর কিছু লাগবে না—"

"আমি যাব তাহলে ? অনেক কাজ—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান। আমার আর কিছু লাগবে না।"

দারোগা চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কাগজ-ওলা একখানা বাংলা দৈনিক পত্রিকা লইয়া প্রবেশ করিল। বিধুভূষণ দাম দিতে চাহিলেন। সে বলিল, দারোগাবাবু দাম দিয়াছেন। বিধুভূষণ পূর্বেও অনেকবার অনুভব করিয়াছেন, পুনরায় অনুভব করিলেন পুলিসেরাই সর্বেসর্বা। পুলিসের নেকনজরে থাকিলে আর কোন ভাবনা থাকে না। ভূপেশ মজুমদারের বন্ধু শুনিবামাত্র সকলেই তটস্থ হইয়া পড়িয়াছে। চা-সহযোগে সিঙ্গাড়া চর্বণ করিতে করিতে তাঁহার পূর্বজীবনের কথা মনে পড়িল। ওই ভূপেশের কি দুর্দশাই ছিল আগে। তিনি টাকা না দিলে পড়িতেই পারিত কি ? সেই ভূপেশ আজ কি হইয়াছে! কেমন যেন একটু ঈর্ষা হইতে লাগিল। ঈর্ষার অনলে কিছুক্ষণ দগ্ধ হইলেন। তাহার পর খবরের কাগজটা উল্টাইতে লাগিলেন। মনোযোগ-

সহকারে বাজারদর অংশটি পড়িয়া ফেলিলেন। রাজনৈতিক বা বৈদেশিক সংবাদগুলি বাদ দিয়া 'চিঠিপত্র'গুলি পড়িলেন। হঠাৎ নজরে পড়িল এক পুলিস গোয়েন্দা এক পলাতক খুনীকে নাকি বহুদিন পরে ধরিয়াছে। লোকটি তাহার ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছিল। ও সি কুণ্ডুর কথা বিদ্যুৎঝলকের মতো তাঁহার মানস-গগনকে ঝলসাইয়া দিল। তিনি শঙ্কিতদৃষ্টি মেলিয়া একবার খোলা ঘরটার পানে চাহিলেন, তাহার পর উঠিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। মনে হইল লোকটা আবার যদি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে, ভূপেশের কাছে সব কথা যদি প্রকাশ করিয়া দেয়! বদ্ধদ্বারের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে সভয়ে তিনি চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে যখন ভূপেশ মজুমদার ফিরিলেন তখনও বিধুভূষণ জাগিয়াই ছিলেন। ভূপেশের সাড়া পাইয়াও কিন্তু তিনি মুখের ঢাকা খুলিলেন না, নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। ভূপেশের সঙ্গে আর দুই তিনটি লোক, সম্ভবত দারোগা আসিয়াছিল। তাহাদের নিকট মুখ দেখাইতে বিধুভূষণের ভয় করিতে লাগিল। মনে হইল ইহাদের কাহারও সহিত ও. সি. কুণ্ডুর যদি যোগাযোগ থাকে! কিছুই অসম্ভব নয়। নিদ্রার ভান করাই তিনি সমীচীন মনে করিলেন।

কপালের ঘাম মুছিয়া ভূপেশ বলিলেন, "কটা লোককে অ্যারেস্ট করা হল? লিস্ট করেছে?

কে একজন উত্তর দিল—"করেছি। সবসুদ্ধ জনদশেক হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে এক রজত ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে কেস টিকবে না।"

রজত নামটা শুনিবামাত্র বিধুভূষণের কান খাড়া হইয়া উঠিল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া রুদ্ধশ্বাসে ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন।

ভূপেশ বলিলেন, "রজতটা কে—"

"বাংলাদেশের লোক। বহুকালের ফেরারী আসামী। এককালে নাকি জমিদার ছিল। খুন, আর্সন, রেপ, ডাকাতি অনেকরকম চার্জ ওর নামে আছে। লোকটা অনেক-দিন থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যে ফেরারী আসামীদের ফটো অ্যাল-বামটা সঙ্গে ছিল, তাই ওকে ধরতে পারলাম—"

"দেখি কেমন চেহারাটা—"

ভূপেশ অ্যালবামটা দেখিতে লাগিলেন।

"এই লোকটা অনেকদিন থেকে ফেরার। একে ধরেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দ্যাট্ ইজ সামথিং। এখানে যিনি কনস্টেবলদের ইনচার্জ ছিলেন বিভীষণ পাণ্ডে, তিনি কিন্তু বলেছেন যে লোকটা বোমা ফেলেছে সে কনেস্টবল সেজেই এসেছিল।"

"কি করে বুঝলেন তিনি?"

"কাল সন্ধ্যের সময় যতগুলো কনস্টেবল তাঁর কাছে রিপোর্ট করেছিল সবাইকে

তিনি চিনতেন না। চেনা সম্ভব নয়। কারণ বাইরে থেকেও অনেক লোক পাঠিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে বিশ্বামিত্র সিং বলে যে লোকটা নিজের পরিচয় দিয়েছিল তাকে আজ সকালবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে না। গুণে দেখা যাচ্ছে একজন কম রয়েছে। সুতরাং অসম্ভব নয় যে সে কনস্টেবল সেজেই এসেছিল।"

"হতে পারে কিন্তু সে যখন বোমা ছুড়ল তখন অপর কেউ দেখতে পাবে না ?"

"নাও পেতে পারে। কাল অমাবস্যা ছিল। তা ছাড়া ওরা পাশাপাশি ছিল না তো, একশ গজ দূরে দূরে ছিল। চল, রজত লোকটাকে দেখে আসি। কোথায় বসিয়েছ ওদের ?"

"প্লাটফর্মেই আছে সব।"

"চল।"

সকলে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর বিধুভূষণ অতি সন্তর্পণে মুখটা বাহির করিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন একবার। না, কেহ নাই। রজত ? কোন্ রজত ? জমিদার ছিল ? খুন করা, নারীধর্ষণ করা, লোকের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এই সব ও করেছে ? বিধুভূষণের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। ঠোঁটদুটি নড়িতে লাগিল, তিনি কাতর-হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ভগবান রক্ষা কর। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মনে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হইল, শুধু তাই নয়, কৌতূহলও। তাহার সহিত ঈষৎ মমতা এবং কিঞ্চিৎ অনুকম্পাও হয়ত ছিল। রজত লোকটার প্রতি তাঁহার এতদিনের সঞ্চিত নিদারুণ বিতৃষ্ণায় সহসা যেন একটু কোমলতার সঞ্চার হইল। যাহা এতদিন জমাট কঠিন ছিল তাহা যেন গলিতে আরম্ভ করিল। অন্তরের অন্তস্তলে, মগ্ন চৈতন্যের নিগূঢ়লোকে যে যুক্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহারা অকস্মাৎ যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে বলিল, লোকটা পাপিষ্ঠ সন্দেহ নাই, তোমার প্রতি নিদারুণ অবিচার করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে ওই এখন তোমার একমাত্র আপন লোক, হয়তো উহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্কও আছে, হয়ত ও তোমার বাবা। আর একটা কথাও মনে রাখিও, তুমিও যুধিষ্ঠির নও, তুমিও নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছ, নিজের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যার জটিল জাল সৃষ্টি করিতে ইতস্তত কর নাই। টাকার মোহে একটা অসহায়া নারীকে ছলে, বলে, কৌশলে ঘরে আটকাইয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছ। তুমি এ কথা বেশ ভাল করিয়াই জান যে তুমি কুৎসিত, তুমি মূর্খ, তুমি জারজ, পাত্র হিসাবে কোন দিক দিয়াই তুমি লোভনীয় নও। কেবল অর্থের জোরে তুমি মেয়েটির ভবিষ্যৎ সুখশান্তি পদদলিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। রজতের সঙ্গে তোমার তফাত কি ?

বিধুভূষণের চিন্তাধারাকে বিঘ্নিত করিয়া ভূপেশ মজুমদার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"এই যে উঠেছ দেখছি। ঘুম কেমন হল ?"

বিধুভূষণ মুখে একটা গদগদ ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন।

"ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভাই, তা না হলে হাড়ির হাল হত আমার। অতগুলো সিঙ্গাড়া খেলাম কিন্তু এর মধ্যেই বেশ খিদে পেয়েছে।"

"মাংসের ঝোল, ভাত প্রায় রেডি হয়ে এসেছে। চান করতে চাও তো সে ব্যবস্থাও হতে পারে। চমৎকার ইঁদারা রয়েছে।"

"না থাক, চান আর করব না।"

"আমিও করব না। কি দরকার কাপড়চোপড় ভিজিয়ে। বাড়ি ফিরে যা হয় করা যাবে। তোমার গাড়ীও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কলকাতা ফিরছ তো—"

"তুমি ?"

"আমাকে এখন দিল্লী যেতে হবে। হ্যাঁ, আসল কথাটাই তো তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। তোমার কথায় সেই বরেন ছোকরাকে ছেড়ে দিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিলাম। যতটা খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে ও সত্যিই ডেন্‌জারাস ক্যারেকটার। ও তোমার ওখানে নেই, একটা খুন করে সরেছে। মহাবিপদে পড়েছিলাম আমি, চাকরি নিয়ে টানাটানি হবার যোগাড় হয়েছিল, অনেক কষ্টে টালটা সামলেছি। তোমাকে দিল্লীতে ধরতে না পেরে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল।"

"কেন—"

"আমি তোমার মুখের কথায় ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম তো। তুমি যে ওর জন্যে জামিন রইলে এ কথা তো তোমার কাছ থেকে লিখিয়ে নিই নি। তারপর ওর যখন স্বরূপ বেরুল, আমার ওপরওলা আমাকে চেপে ধরলে, তুমি ওকে ধরে ছেড়ে দিয়েছ কেন, নিশ্চয় ওর সঙ্গে তোমার ষড় আছে বা নিশ্চয় তুমি ঘুষ খেয়েছ।"

"ও বাবা, খুব প্যাঁচে পড়েছিলে বল।"

"সঙীন। কোনক্রমে বেঁচে গেছি।"

"বরেন তাহলে পালিয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"বিশাখার কোন খবর জান ?"

"না।"

তাহার পর ভূপেশ হাসিয়া বলিলেন—"একটা গোপন খবর কিন্তু জানি, মানে জেনে ফেলেছি।"

"কি খবর ?"

"পরে বলব এখন।"

ঠিক এইসময় আরদালিগোছের একটি লোক প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল খাবার দেওয়া হইয়াছে।

"চল, খেয়ে নেওয়া যাক—"

বিধুভূষণও ভূপেশ মজুমদারের পিছু-পিছু বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার একটু ভয়-ভয়ও করিতেছিল, যদি প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ ও. সি. কুণ্ডুর সহিত দেখা হইয়া যায়! ক্ষুধা তাঁহার মোটেই পায় নাই। ভূপেশ মজুমদারকে অনর্থক কেন যে তিনি মিছা-কথাটা বলিতে গেলেন!

কিছুদূর গিয়া চোখে পড়িল পুলিস-বেষ্টিত হইয়া একস্থানে কতকগুলি লোক বসিয়া আছে। প্রত্যেকেরই কোমরে দড়িবাঁধা। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি রজত? লক্ষ্য করিতে করিতে হঠাৎ তিনি চিনিতে পারিলেন। যদিও বহুদিন পূর্বে দেখিয়াছিলেন, চেহারাটা খুব স্পষ্ট মনে ছিল না। রজতবাবুর অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের চিহ্ন, গালদুইটি অস্বাভাবিকরকম লাল, নাকটা ফোলা। ভুরুর চুল নাই। কান দুইটাও কেমন যেন! চক্ষু দুইটি চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু মনে হয় দৃষ্টি নাই। বিধুভূষণ 'থ' হইয়া গেলেন। এই সেই প্রবল-প্রতাপান্বিত রজত চৌধুরী যিনি টাকার জোরে দিনকে রাত করিতে পারিতেন, হাতে মাথা কাটিতেন, সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করিতে পারিতেন? এই দশা হইয়াছে তাঁহার? বিধুভূষণ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এতকালের পুঞ্জীভূত ক্রোধ কোথায় মিলাইয়া গেল। তাঁহার বরং মনে হইল—"আহা, একটা হাতী খাদে পড়ে গেছে!"

"তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন—"

"এই যে যাচ্ছি। এরাই বুঝি ধরা পড়েছে।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভূপেশ কণ্ঠস্বর নামাইয়া মন্তব্য করিল, "ধরেছি বটে আমরা, তবে ওদের কারো বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা শক্ত হবে। তবে ওই রজতটা অনেকদিনের ফেরারী আসামী, ওই ব্যাটারই সাজা হবে। চোখে ভাল দেখতে পায় না, তাই ধরতে পেরেছে ওকে, ভয়ঙ্কর শয়তান ব্যাটা।"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ভূপেশ মজুমদারের জন্য আহারের বেশ সুবন্দোবস্তই হইয়াছিল। আরও জনকয়েক পদস্থ পুলিস অফিসারও আহারে ব্যাপৃত ছিলেন। বিধুভূষণকে লইয়া ভূপেশ প্রবেশ করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, "আমার ইনি বিশিষ্ট বন্ধু একজন। এই হাঙ্গামায় এখানে আটকে পড়েছেন, একে টেনে নিয়ে এলাম খাবার জন্যে—"

সকলেই স্মিতমুখে বিধুভূষণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন।

খাইতে খাইতে ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

"তোমার ট্রেন ছাড়ছে বোধ হয়। কোলকাতা যাবে নাকি? যদি যাও তো বল, ট্রেনটাকে ডিটেন করি একটু।"

"থাক, পরে যাব এখন। তোমার সঙ্গে দিল্লীই ফিরে যাই। তারপর একসঙ্গে কোলকাতা ফেরা যাবে—"

"বেশ—"

একাধিক কারণে বিধুভূষণ ভূপেশ মজুমদারের সঙ্গত্যাগ করা সমীচীন মনে করিলেন না।

ভূপেশ বলিলেন, "আমার কিন্তু দিল্লী ফিরতেও দেরি হবে একটু। এখানকার কাজ না মিটিয়ে তো ফিরতে পারব না। সমস্ত লাইনটাও ইন্‌স্‌পেকশন করতে হবে। তোমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না তো—"

"না।"

"বেশ তবে চল—"

॥ দুই ॥

বিশাখাকে লইয়া হাওড়া ক্যাম্পে বেশীক্ষণ থাকা যে নিরাপদ নহে একথা বরেন, শিবাজী দুইজনেই বুঝিয়াছিলেন। পুলিসের লোক যখন খুন হইয়া গিয়াছে, তখন খুনীকে বাহির করিবার জন্য পুলিস চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া লোকে যেমন মাথার ময়লা বাহির করে, ইহারাও তেমনিভাবে কলিকাতা এবং কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া খুনীকে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং হাওড়ায় থাকা নিরাপদ নহে। এই উপদেশটি শিবাজী বরেনকে দিল। বলিল—"এখানে তোমরা বেশীক্ষণ থেকো না। ভোরের আগেই বেরিয়ে পোড়ো। আমি এখনই যাচ্ছি, কারণ আমাকে যেমন করে হোক কাল পাটনায় পৌছতেই হবে। নবেন্দু বিশ্বাসের কিছু খবর এখানে পেয়েছি, ভদ্রলোক মারাই গেছেন সম্ভবতঃ, ঠিক খবরটা পাব পাঠনায়। কাল বিকেল নাগাদ সেখানে লোক এসে পৌছবে। তা ছাড়া আর একটা জরুরি ব্যাপার আছে এদেরই সম্পর্কে। আমাকে কাল আমাদের উকীল জয়সওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে হবে একটা ডকুমেণ্ট করাবার জন্যে। সেজন্য কাল বিকেল নাগাদ আমাকে পাটনা পৌছতেই হবে। তোমাদেরও আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে নিচ্ছি না। পুলিস তোমাকেও দেখেছে, বিশাখাকেও দেখেছে। তারা নিশ্চয়ই খবরও দিয়েছে চারিদিকে। হঠাৎ কোথাও যদি কেউ তোমাদের চিনে ফেলে আমিসুদ্ধ আটকে পড়ব। তার চেয়ে তোমরা ভোরের দিকে এখান থেকে বেড়িয়ে পোড়ো। আলাদা আলাদা যাবে। আমরা পাটনা ক্যাম্পে বেশীক্ষণ থাকব না। কাজ শেষ করেই চম্পট দেবো সেখান থেকে। নবেন্দু বিশ্বাসের আরও খবর যদি পাই—আশা করি পাব—তাহলে সে খবরটা রেখে যাব সেখানে। কাংড়া বা ছক্কন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে সেখানে। তার কাছেই চিঠি থাকবে। সে তোমাদের জন্যে সাতদিন অপেক্ষা করবে। সাতদিনের

মধ্যে তোমরা যদি পাটনা ক্যাম্পে না গিয়ে পৌঁছও তা হলে বুঝব তোমাদের কোন বিপদ ঘটেছে।"

"পাটনা থেকে ফিরবে কোথায় তোমরা—"

"হাওড়ায় কিংবা গ্র্যাণ্ড হোটেলে! গোপীনাথও সেইখানেই ফিরে যাবে, মণিকাকে নিয়ে আমিও সেইখানেই ফিরব।"

শিবাজীর দূরদৃষ্টিতে বরেন মুগ্ধ হইল।

বলিল, "বেশ—"

শিবাজী মোটরে স্টার্ট দিল।

বরেন ঘরে ফিরিয়া দেখিল বিশাখা তখনও জাগিয়া আছে।

"ঘুমোন নি এখনও?"

"ঘুম আসছে না।"

"কেন ভয় করছে?"

"করছে বই কি একটু-একটু।"

বরেনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"হাসছেন যে।"

"যুধিষ্ঠিরের সেই কথাটা মনে পড়ছে, কিমাশ্চার্যমতঃপরম্। মৃত্যুভয়টা মানুষ কিছুতেই জয় করতে পারে না, সকলকে যে একদিন মরতেই হবে এ কথা ভুলে থাকতে চায় সবাই।"

"মরতে আমার ভয় নেই। সম্প্রতি চোখের উপর এত মৃত্যু দেখেছি যে মৃত্যুভয়টা তত নেই। ভয় অসম্মানকে। ভয় হয় কলঙ্কের পাঁক সর্বাঙ্গে মেখে যদি বেঁচে থাকতে হয়। বাঘ, সিংহের মুখে পড়ে প্রাণ দেওয়া সহজ, কিন্তু একটা আরশোলা বা টিকটিকি গায়ে উঠে যদি সড়সড় করে ঘুরে বেড়ায় তা অসহ্য।"

বরেনের মুখে আবার হাসি ফুটিল।

"আমার কাছে যতক্ষণ আছেন, নির্ভয়ে থাকতে পারেন। পুলিসের দুএকটা গুলি হয়তো ছিটকে আপনার লাগলেও লাগতে পারে, কিন্তু টিকটিকি আরশোলাকে আপনার অঙ্গস্পর্শ করতে দেব না। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ অন্ততঃ দেব না—"

"আপনারা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন তাতে আপনিই বা কতক্ষণ বাঁচবেন তার ঠিক কি?"

"কিচ্ছু ঠিক নেই। আমার অবর্তমানেও যাতে আপনি আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারেন সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।"

পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিয়া বরেন বলিল, "এইটে রেখে দিন আপনার কাছে। টিকটিকি, আরশোলাকে যদি মারতে নাও পারেন, নিজের মুখের

ভিতর নলটা ঢুকিয়ে ট্রিগারটা টেনে দেবেন যদি বেগতিক বোঝেন। আত্মসম্মান রক্ষা করবার ইচ্ছে থাকলে কেউ তা কেড়ে নিতে পারে না।"

বিশাখা রিভলভারটি লইয়া সবিস্ময়ে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

"ট্রিগার কোন্‌টা—"

"এইটে। লোডেড্ আছে, দেখবেন—"

"আমাকে দিচ্ছেন, আপনার দরকারের সময় কোথায় পাবেন ?"

"আমার আছে আর একটা।"

বিশাখা হাসিয়া বলিল, "তাহলে থাক এটা আমার কাছে। কিন্তু মরবার ইচ্ছে আমার নেই।"

'মরবার ইচ্ছে কারই বা থাকে বলুন। কিন্তু দরকার হলে মরতে হয়।"

"তা হয়।"

বিশাখা স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বরেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'দু-একটা ব্যক্তিগত কথা আপনাকে জিগ্যেস করতে পারি কি? আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য ঠিক করবার জন্য কথাগুলো জানা দরকার।"

"কি কথা ?"

"আপনার নিজের লোক কে কে আছেন, তাদের ঠিকানাই বা কি। আপনার মা তো মারা গেছেন বললেন, বাবাও নিরুদ্দিষ্ট। আর কে আছেন আপনার—?"

"বাবার খোঁজ যদি না পাওয়া যায় তা হলে আমার রক্ত-সম্পর্কের আপন লোক আর কেউ থাকবে না।"

"কোথায় কার আশ্রয়ে তা হলে পৌঁছে দেবো আপনাকে ? বিধুবাবুর কাছে ফিরে যাবেন না নিশ্চয়।"

"না।"

"সেখানে ফেরা নিরাপদও নয়। বিধুবাবুর ভাবগতিক সন্দেহজনক, তা ছাড়া সেখানে গেলে পুলিস ধরবে হয়তো আপনাকে।"

"না, সেখানে যাব না।"

'তবে ?"

বিশাখা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "বাবা তাঁর এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করেছিলেন। বাবা যদি ফিরে আসেন সেখানেই আমার বিয়ে হবে, আর যদি না ফেরেন তা হলে ভদ্রলোককে চিঠি লিখব, যদি আমাকে বিয়ে করতে চান, বিয়ে করে নতুন সংসার পাতব আবার। আর যদি না করেন, চাকরিবাকরি জুটিয়ে নেব একটা।"

"কোথায় তা হলে পৌঁছে দেব আপনাকে আমরা ?"

"দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে দিলেই আমি চলে যেতে পারব। বাবার কি কোন খবর পেয়েছেন আপনারা ?"

মৃত্যু-সংবাদটা দিতে বরেনের ইচ্ছা হইল না।

"না, ঠিক খবর পাইনি এখনও। তবে লোক লেগে আছে, ঠিক খবর শীগগিরই পাব। আপনার ভালর জন্য যা যা করবার তা আমরা করব, এই আমাদের ব্রত, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন একটু। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা বেরুব।"

"কোথায় যাব আমরা—"

"দিল্লীর দিকেই। পথে কোথাও ট্রেনে উঠিয়ে দেব আপনাকে। পাটনায় কিংবা গয়ায়।"

"ক'টার সময় বেরুব আমরা—"

"দুটো আড়াইটের সময়। তিনটের আগেই।"

"মোটরে যাবেন ?"

"হ্যাঁ। আলাদা আলাদা মোটরে যাব আমরা। আপনি ট্যাক্সিতে যাবেন। আপনাকে যদি কেউ ধরে ফেলে রাস্তায়, আপনি ঘাবড়ে যাবেন না। বলবেন পাটনা যাচ্ছি, সেখান থেকে দিল্লী যাব। ঠিকানা চাইলে আপনার সত্যিকার ঠিকানা দিয়ে দেবেন। আমাদের সঙ্গে যে আপনার কোন সংস্রব আছে তা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করবেন না।"

"না, তা করব না।"

"আপনি তা হলে গড়িয়ে নিন একটু। রিভলভারটা সাবধানে রাখবেন। বালিশের নীচে রাখুন এখন, যাবার সময় পেট-কাপড়ে গুঁজে নেবেন। শুয়ে পড়ুন—"

"ঘুম হবে কি ?"

"চেষ্টা করুন।"

বরেন কপাটটি ভেজাইয়া দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। আর একটি রিভলভার বাহির করিয়া সেটিতে টোটা পুরিল। তাহার পর একটা পরচুলা ও গোঁফ পরিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

॥ তিন ॥

মোটর-বাহিত হইয়া প্রায় একঘণ্টা পরে বিষ্ণুচরণ ওরফে জমিরুদ্দিন যে স্থানে নীত হইল তাহা শহর হইতে অনেক দূরে। মনে হইল যেন একটা পল্লীগ্রাম। চতুর্দিকে বড় বড় গাছ রহিয়াছে। বিষ্ণুচরণ একটু ভীত হইয়া পড়িল।

"নাবুন—"

মোটর থামিতেই বোরখাধারিণী নামিয়া পড়িলেন। সমস্ত পথ তিনি একটিও কথা বলেন নাই। বিষ্ণুচরণ দুই একটা প্রশ্ন করিয়াছিল কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ব্যাপারটা তাঁহার কেমন যেন গোলমেলে মনে হইতেছিল। জুবেদা কথা কহিতেছে না কেন!

"নাবুন। আমরা এসে গেছি—"

বিষ্ণুচরণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল চারিদিকে বড় বড় গাছ। শুধু তাই নয়, একটা এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বহিতেছে, গাছের শাখা-প্রশাখা সবেগে দুলিতেছে, অদ্ভুত শব্দ হইতেছে একটা। মনে হইতেছে গাছগুলাই যেন অট্টহাস্য করিতে করিতে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

"নাবুন।"

"কোথায় এসেছি আমরা?"

"নাবলেই দেখতে পাবেন।"

নাবিতে হইল।

"চলুন এবার—"

"আমার জিনিসগুলো?"

"সব ঠিক আছে, চলুন আপনি।"

ভার্গবের হাতের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিল।

"আসুন।"

যন্ত্রচালিতবৎ বিষ্ণুচরণ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বোরখাধারিণী ভার্গবের আগে আগে চলিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল একজন লোক তাঁহার জিনিসপত্রগুলিও বহন করিয়া আনিতেছে।

কিছুদূর যাইবার পর একটি ছোট বাড়ি দেখা গেল। বাড়িটির সামনে একটি ধূলি-ধূসরিত মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে, বাড়ীর জানালা দিয়া আলো দেখা যাইতেছে।

বাড়ীর সমীপবর্তী হইয়া ভার্গব হাঁক দিল, "উকিলসাহেব জেগে আছেন না কি?"

"আছি বই কি। এস।"

দাড়ি-ওলা চশমাপরা এক ব্যক্তি ঢিলা-পাজামার রসি বাঁধিতে বাঁধিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"মক্কেল নিয়ে এলেন না কি?"

"এলাম।"

বোরখাধারিণী সিঁড়ি দিয়া গটগট করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুচরণের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না পর্যন্ত।

"ভিতরে আসুন।"

ভার্গবের পরুষ কণ্ঠস্বরে বিষ্ণুচরণ চমকাইয়া উঠিল। দেখিল ভার্গব একটি ঘরের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে তর্জনী প্রসারিত করিয়া আছে। বিষ্ণুচরণের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

"দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি, আসুন—"

বিষ্ণুচরণকে সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হইল। প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভার্গব ভিতর হইতে কপাটের খিল বেশ করিয়া আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বিষ্ণুচরণ প্রশ্ন করিল, "ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

"খুব সঙীন। ওই চেয়ারে বসুন। এখনই জানতে পারবেন।"

বিষ্ণুচরণ তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

"বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এখুনি পারবেন। বসুন। উকিলসাহেব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন ওঁকে। বসুন আপনি—"

ভার্গব তাঁহাকে প্রায় জোর করিয়া চেয়ারটায় বসাইয়া দিল। উকিলসাহেব তখন গলাখাঁকারি দিয়া প্রশ্ন করিলেন,

"আপনার নামই তো আগে বিষ্ণুচরণ ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কোলকাতায় বেলেঘাটা অঞ্চলে কি তিনখানি বাড়ি ছিল আপনার?"

"ছিল।"

"এই বাড়ি তিনখানির বিনিময়ে কি আপনি পূর্ববঙ্গের কোনও নবেন্দু ঘোষের বিষয় কিনেছিলেন?"

"কিনেছিলাম।"

"সে বাড়ি তিনখানি কি নবেন্দু ঘোষকে দেওয়া হয়েছে?"

"না, হয়নি। খবর পেয়েছি নবেন্দু ঘোষ মারা গেছেন।"

"ঠিক খবর পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কোন উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিণী আছেন কি না সেটা খোঁজ করেছিলেন?"

বিষ্ণুচরণ গুম হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল সত্যকথাটা বলা উচিত কি না।

"বলুন, খোঁজ করেছিলেন?"

"করেছিলাম, কিন্তু খবর পেয়েছি কোনও উত্তরাধিকারী নেই।"

পাশের দেওয়ালে একটা কালো পরদা ঝুলিতেছিল। সেই পরদার পিছন হইতে নারীকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল।

"মিথ্যেকথা। আমি নিজে তোমাকে বিশাখার কথা বলেছি,—তার চিঠিও দেখেছ তুমি।"

উকিলসাহেব মৃদু হাসিয়া আনতনয়নে দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন বাক্য নির্গত হইল না।

তাহার পর উকিলসাহেবই কথা কহিলেন।

বলিলেন, "সেই বিশাখা দেবীর নামেই ওই বাড়িতিনটে আপনাকে আজ এক্ষুনি লিখে দিতে হবে। আমি সব তৈরি করে রেখেছি। আপনাকে কেবল সইটি করতে হবে।"

উকিলসাহেব একটি দলিল বাহির করিয়া দেখাইলেন। বিষ্ণুচরণ নির্নিমেষদৃষ্টিতে দলিলটির দিকে চাহিয়া রহিল। পড়িয়া দেখিল—একটি 'উইল'। মহম্মদ জমিরুদ্দিন ওরফে বিষ্ণুচরণ দাস পাঞ্জাব রিফিউজি স্বর্গত নবেন্দুমোহন বিশ্বাসের কন্যা শ্রীমতী বিশাখাকে এই বাড়িতিনটি 'উইল' করিয়া দিয়া যাইতেছে। এ কথাও লেখা আছে যে ইহার পরিবর্তে সে উক্ত নবেন্দুমোহন বিশ্বাসের পূর্ববঙ্গস্থ বিষয়সম্পত্তি পাইয়াছে। বিষ্ণুচরণ স্তম্ভিত হইয়া কাগজখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমশঃ তাহার মুখে একটা কুটিল ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"সই যদি না করি—"

উকিলসাহেব কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিলেন শুধু।

ভার্গব এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, একটি মোড়া টানিয়া সে বসিয়া পড়িল। বিষ্ণুচরণ সভয়ে দেখিল তাহার স্তিমিতনয়নের দৃষ্টিতে ধিকিধিকি করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সেই অগ্নিময় দৃষ্টি বিষ্ণুচরণের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ভার্গব বলিল, "যতক্ষণ না সই করছেন ততক্ষণ আপনাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, নানারকমে আপনাকে নির্যাতন করব আমরা।"

বিষ্ণুচরণের অন্তরটা সহসা জমাট হইয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোনও কথাই বাহির হইল না। তাহার মুখে মুখোশের যে হাসিটা শত দুঃখেও নিবিত না, সে হাসিটাও যেন নিবিয়া গেল।

॥ চার ॥

"সই করুন।"

স্থির কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে ভার্গব পুনরায় আদেশ করিল।

বিষ্ণুচরণ ঢোক গিলিয়া বলিল, "এইজন্তেই আমাকে ভুলিয়ে আপনারা এখানে এনেছেন?"

"হ্যাঁ, এইজন্তেই।"

"আপনারা কে?"

"তা জানবার দরকার নেই আপনার। সই করুন। একটি কথা শুধু বলতে পারি আমরা আপনার নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। পাকিস্তানে, কোলকাতায়, করাচীতে আপনি যা যা করেছেন তা আমাদের অজানা নেই। সই যদি না করেন ভয়ঙ্কর কষ্ট পাবেন।"

"জুবেদার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই একবার।"

"যিনি বোরখা পরে আমাদের সঙ্গে এলেন তিনি জুবেদা নন। তিনি আমাদের সহকর্মিণী একজন। আপনাকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে স্টেশনে গিয়েছিলেন। জুবেদা বেগম করাচীতেই আছেন। তবে তিনিও আমাদের পক্ষে। তাঁর কাছ থেকেই আমরা আপনার সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করেছি।"

উকিলসাহেব হাসিমুখে দাড়ি চুমরাইতেছিলেন, ভার্গবের কথা শেষ হইলে আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "সই যখন করতেই হবে, দেরি করছেন কেন?"

বিষ্ণুচরণ বলিল, "কিন্তু এমনভাবে জোর করে সই করিয়ে নিলে কি এ দলিলের দাবি আদালতে টিকবে! শুনেছি রেজেস্টারী না করলে।"

সহসা ভার্গব প্যান্টের পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিল। রিভলভারটি দক্ষিণ-মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া বলিল, "দাবি টিকবে কিনা সে চিন্তা করব আমরা। আপনাকে যা বলছি করুন। সই করুন। এই বাড়িতিনটি নবেন্দু বিশ্বাসকে বা তার ওয়ারিশকে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি আপনি পাকিস্তান গভর্ণমেন্টকে দিয়েছেন। আপনার স্ত্রী জুবেদা সে কথা জানেন। সুতরাং দাবি যে টিকবে তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। সই করুন আপনি—"

"সই করলেই মুক্তি দেবেন আমাকে?"

"দেব।"

"এক্ষুনি?"

"এক্ষুনি।"

বিষ্ণুচরণ দলিলটি পড়িয়া দেখিল।

"এটা কি উইল?"

"হ্যাঁ, উইলই।"

"এ দুটো কার সই—"

"দুজন সাক্ষীর। একজন উকিল, আর একজন ডাক্তার।"

"কিন্তু তাঁদের সামনে আমার সই করা উচিত।"

"তাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে আমরা ঠিক লোককে দিয়েই সই করিয়ে নেব। আপনি ও সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বৃথা। যা বলছি তাই করুন।"

বিষ্ণুচরণ তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"চুপ করে আছেন কেন। করে ফেলুন সইটা। নিন।"

উকিলসাহেব কলম আগাইয়া দিলেন।

"একটু ভাববার সময় দিন আমাকে।"

"ভাববার তো কিছু নেই এতে। বাড়ি যাঁর ন্যায্য প্রাপ্য তাঁকেই দিচ্ছেন আপনি।"

"তিনি কোথা—"

"আসবেন একটু পরে।"

"বেশ, তিনি এলেই সই করব।"

উকিলসাহেব হাসিমুখে দাড়ি চুমরাইতে লাগিলেন। তাহার পর ভার্গবের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে কিসের যেন একটা ইশারা চকমক করিয়া উঠিল। ভার্গব সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত পুরিয়া রবারের দস্তানা বাহির করিয়া পরিয়া ফেলিল এবং নিমেষের মধ্যে দুই হাত দিয়া বিষ্ণুচরণের গলা টিপিয়া ধরিল। জাঁতি-কলে পড়িয়া ইঁদুর যেমন ছটফট করে বিষ্ণুচরণ তেমনি ছটফট করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল তাহার চক্ষুদুইটি এখনই বুঝি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। উকিলসাহেব চক্ষু-দিয়া আর একবার ইঙ্গিত করিলেন; ভার্গব বিষ্ণুচরণকে ছাড়িয়া দিল।

"কেন কষ্টভোগ করছেন, সই করে ফেলুন"

বিষ্ণুচরণ হাঁপাইতে বলিল, "একি অন্যায় অত্যাচার—"

"অন্যায় আপনিই করেছেন, আমরা তার প্রতিকারের চেষ্টা করছি। স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে দেখুন কথাটা—"

উকিলসাহেব দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিমুখে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। বিষ্ণুচরণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল; আড়চোখে চাহিয়া দেখিল ভার্গব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরবে রিভলভারে টোটার পর টোটা পুরিতেছে।

উকিলসাহেব পুনরায় হাসিমুখে বলিলেন, 'বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন? সই যখন করতেই হবে, করে ফেলুন—"

"আচ্ছা, একটা কথা বলুন আমাকে। জুবেদা কি ষড়যন্ত্র করে আমাকে এই বিপদে ফেলেছে?"

"না। আপনি যে বিপদে পড়বেন তা তিনি কল্পনাও করেননি। তবে আপনার সম্বন্ধে সমস্ত খবর তিনিই আমাদের দিয়েছেন—"

"কি করে তাঁর নাগাল পেলেন আপনারা?"

"হোসেন খাঁর মারফত। আপনিও দেখেছেন তাকে। দিল্লী থেকে একসঙ্গে এক-গাড়িতেই তো এলেন আপনারা।"

"তিনি কি জুবেদার কেউ হন নাকি?"

"বাল্যবন্ধু। রায়ট না হলে তঁরে সঙ্গেই জুবেদার বিয়ে হত।"

বিষ্ণুচরণ নির্বাক হইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"নিন, সই করুন। আর দেরি করবেন না।"

"আচ্ছা, আপনারা আমার খবর কি জুবেদার কাছেই পেলেন প্রথমে?"

"না। প্রথমে আমরা দিল্লীতে রিফিউজি নবেন্দু বিশ্বাসের খবর পাই। কাগজে তাঁর মেয়ে বিশাখা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সেটাও আমাদের চোখে পড়ে। খোঁজ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল যে নবেন্দু বিশ্বাসের সম্পত্তি আপনিই কিনেছেন তার কোলকাতার বাড়ির বিনিময়ে। তারপর জানা গেল আপনি হোসেন খাঁর বাগদত্তাকে বিয়ে করেছেন। হোসেন খাঁ আমাদের দলের লোক। সুতরাং আপনার সম্বন্ধে জানতে আর বাকি রইল না কিছু। আপনার এটর্নি বীরেনবাবুর সঙ্গেও পরিচয় আছে আমাদের। এমনকি আপনি কোলকাতায় "মাসাজ এণ্ড বাথ" খোলবার যে মনোরম পরিকল্পনাটি করেছেন তাও আমাদের অবিদিত নেই। আপনার সম্বন্ধে কোথাও কোন ভুল হয়নি আমাদের। সমস্ত খবর নিয়ে আটঘাট বেঁধে তবে আপনাকে ধরেছি আমরা। এখন আপনার আর পালাবার উপায় নেই, সইটা করে ফেলুন, নিন—"

বিষ্ণুচরণ কলমটা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর সই করিয়া দিল।

ভার্গব কথা কহিল এইবার।

"বাস্। মুক্তির জন্য প্রস্তুত হোন এবার। রামনাম বা আল্লার নাম যা করতে চান করুন।"

বিষ্ণুচরণ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার নীচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"রামনাম ? আল্লার নাম ? কেন ?"

"যে উইল এখুনি করলেন সেইটেই যাতে আপনার শেষ উইল হয় সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তা ছাড়া দেশকে পাপমুক্ত করব এ-ও আমাদের ব্রত।"

বিষ্ণুচরণ সহসা লাফাইয়া উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভার্গবের লক্ষ্য অব্যর্থ। দ্বারের কাছে বিদীর্ণমস্তকে আর্তনাদ করিয়া বিষ্ণুচরণকে ভবলীলা সমাপ্ত করিতে হইল।

উকিলসাহেব সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি খুলিয়া শিবাজীতে রূপান্তরিত হইলেন। ভার্গব ত্বরিতহস্তে একটা বোরায় বিষ্ণুচরণের দেহটা পুরিয়া ফেলিল, মণিকা ভিতর হইতে আরও গোটা দুই বোরা লইয়া আসিল। উপর্যুপরি তিনটি বোরায় বিষ্ণুচরণের শবকে আবৃত করিবার পর শিবাজী মণিকাকে বলিল, "তুমি খাকি মিলিটারী পোশাক পরে ক্যাপ্টেনসাহেব হয়ে পড় এইবার। কটা রংয়ের বাটারফ্লাই গোঁফটাও লাগিয়ে নাও। গোপীনাথ আশা করি নৌকা যোগাড় করে রেখেছে এতক্ষণ।"

বলিতে বলিতে জল ঢালিয়া চারিদিক ধুইয়া তিনজনে পুনরায় মোটরে চড়িল। গঙ্গাতীরের সমীপবর্তী হইতেই আরদালিবেশী গোপীনাথকে দেখা গেল। তাহার সঙ্গে নৌকার মাঝিরাও দাঁড়াইয়াছিল। আরদালিবেশী গোপীনাথ সেলাম করিয়া ক্যাপ্টেনবেশী মণিকাকে জানাইল যে নৌকা ঠিক আছে। নৌকার মাঝিদুইটিও সেলাম করিল। ক্যাপ্টেনসাহেবের স্কন্ধে চামড়ার কেসে বন্দুক ঝুলিতেছিল। তিনি

আগাইয়া গেলেন। বোরাটি ভার্গব বহন করিয়া লইয়া গেল। মাঝিদের বলা হইল, ক্যাপ্টেনসাহেব শিকারে গিয়াছিলেন, বোরার ভিতর মরা হাঁস আছে। বোরাটি নৌকার গলুইয়ের কাছে রাখা হইল।

·· ক্যাপ্টেনসাহেবকে নৌকায় চড়াইয়া দিয়া শিবাজী ভার্গবসহ মোটরযোগে গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া একটা পথের বাঁকে গাছের তলায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নৌকা যখন মাঝগঙ্গায় পৌঁছিয়াছে তখন ঝপ্ করিয়া শব্দ হইল একটা।

"কেয়া গিরা—"

আরদালি গোপীনাথ সঙ্কুচিতভাবে বলিল "বোরা গির গয়ী হুজুর—"

"ও ড্যম সোয়াইন!—"

সাহেবী কায়দায় মণিকা চিৎকার করিয়া ধমকাইয়া উঠিল।

"নাও ঘুরাও। ফির আজ শিকারমে যানা পড়েগা। কমিশনার সাহেবকো হাঁস দেনেকা ওয়াদা কিয়া হ্যায়। ঘুরাও, ঘুরাও, জলদি নাও ঘুরাও—"

নৌকা পুনরায় আসিয়া তীরে ভিড়িল।

মণিকা ও গোপীনাথ নামিয়া গেল।

পিশাচ বিষ্ণুচরণ অন্তিমে গঙ্গালাভই করিল।

বিশাখাকে লইয়া বরেন বৈকালের দিকে পাটনা ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিল। পথে কোনরূপ বিপদ হয় নাই। পৌঁছিবামাত্র কাংড়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি লম্বা খাম বরেনের হাতে দিল। খাম খুলিয়া বরেন যে চিঠিটা পাইল তাহা এই—

"নবেন্দুবাবু মারা গেছেন। বিশাখাদেবীকে খবরটা দিয়ে দিও। নবেন্দুবাবুর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুচরণবাবু তাঁর বেলেঘাটার বাড়িতিনখানা গ্রাস করেছিলেন। তিনিও মারা গেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। মৃত্যুকালে তাঁর মতি-পরিবর্তন হয়, তিনি বিশাখাদেবীকে বাড়িতিনটি উইল করে দিয়ে গেছেন। বিশাখাদেবীকে উইলটা দিয়ে দিও। এইসঙ্গে রইল সেটা। তাঁকে বলো বাড়িতিনটি তিনি যেন অবিলম্বে দখল করবার ব্যবস্থা করেন। ইতি—"শিবু"।

বরেন চিঠিখানার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর নীরবে সেখানা বিশাখার হাতে দিল।

"কার চিঠি?"

"পড়ে দেখুন।"

বরেন আশঙ্কা করিতেছিল চিঠিখানা পড়িয়া বিশাখা হয়তো ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু সে কিছুই করিল না। নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"আপনি দিল্লী ফিরবেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"চলুন তা হলে, আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। একটু পরেই আপনার ট্রেন।"

"চলুন।"

স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল।

বরেন বলিল, "যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তিনি কি এখন কোলকাতায় আছেন—"

"হ্যাঁ—"

"তাঁর ঠিকানাটা যদি আমাকে দেন তাঁকে গিয়ে খবর দিয়ে দিতে পারি একটা। আমি তো কোলকাতায় ফিরছি।"

"বেশ, লিখে নিন।"

বরেন কৈলাসপতির ঠিকানাটা লিখিয়া লইল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গে দিল্লীগামী ট্রেনখানাও আসিয়া পড়িল। বিশাখা ট্রেনে উঠিয়া বরেনকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনার পুরো পরিচয় পাইনি। তবু যতটুকু পেয়েছি তাতেই মুগ্ধ হয়েছি। আশা করি আবার দেখা হবে।"

"আশা করি।"

বরেন স্টেশন হইতে বাহির হইয়া একটা পোস্টাফিসে গেল। কৈলাসপতির নামে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিল—রিটার্নিং টু ডেলহি। বিশাখা।

।। পাঁচ ।।

মণিকাকে লইয়া শিবাজী কলিকাতা অভিমুখে চলিযাছিল। তাহাদের দেখিয়া হঠাৎ চিনিবার উপায় ছিল না। শিবাজী মিলিটারী পোশাক পরিয়াছিল, আর মণিকা সাজিয়াছিল মেমসাহেব। মেমসাহেবের পোশাকে মণিকাকে চমৎকার মানাইয়াছিল, সোনালী রঙের পরচুলা পরিয়া তাহার চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখে ছিল একটি ফিকে সবুজরঙের চশমা, শিবাজীর ছিল মিলিটারী গগলস্। শিবাজী দাঁতে একটা পাইপও কামড়াইয়া ধরিয়াছিল।

একটা গ্রাম পার হইয়া একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখা গেল। মাঠের মাঝখানে একটা গাছ ছিল। শিবাজী সেই গাছতলায় গাড়িটা দাঁড় করাইল।

মণিকা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "এখানে থামছেন কেন?"

"তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।"

"কি কথা?"

শিবাজী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি জুবেদার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয়

করেছ। কর্মীহিসাবে তুমি প্রথমশ্রেণীর। তোমার চরিত্র, তোমার বুদ্ধি, তোমার অভিনয়-ক্ষমতা অদ্ভুত। আমাদের সমিতি তোমাকে পেয়ে লাভবান হয়েছে। তবু ঠিক করেছি তোমাকে আমাদের দলে রাখব না।"

"রাখবেন না? কেন!"

"রাখব না, কারণ তুমি স্ত্রীলোক। শুধু তাই নয়, তুমি মোহিনী। তোমাকে কেন্দ্র করে আমাদের দলে অনর্থসৃষ্টি হতে পারে। যদিও এখনও তেমন কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু অনুভব করছি বরেন, ভার্গব, গোপীনাথ, কাংড়া, ছক্কন প্রত্যেকেরই মনে তুমি কিছু-না-কিছু প্রভাব বিস্তার করেছ। এরা আমাদের সমিতির মেরুদণ্ড। ভয় হচ্ছে তোমার জন্তে আমাদের সে মেরুদণ্ড না ভেঙে যায়। বরেনের কথায় তোমাদের যখন নিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম, ধোপে টিকবে না। হয়তো তোমাদের মেরেই ফেলতে হবে। কিন্তু এখন দেখছি তোমরা টিকে গেছ। শুধু তাই নয়, কর্মী হিসাবে লোভনীয় হয়ে উঠেছ, সবাই তোমার সঙ্গে কাজ করতে উৎসুক, ভার্গব তোমাকে পাঞ্জাবে নিয়ে যেতে চাইছিল। তোমার বদলে গোপীনাথকে তার সঙ্গে দেব বলাতে সে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে মনে হল। এই সব দেখে তোমাকে দলে রাখা সঙ্গত মনে হচ্ছে না—"

মণিকা মনে করিয়াছিল শিবাজী মাঝে মাঝে যেমন করে, তেমনি বুঝি বা পরিহাস করিতেছে। তাহার চোখে একটা কৌতুক-দীপ্তি ফুটিফুটি করিতেছিল কিন্তু শিবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া সে দীপ্তি নিবিয়া গেল।

"আপনি এ কি বলছেন?"

"আনন্দমঠ পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"তা হলে তো যা বলছি তা তোমার বোঝা উচিত। বঙ্কিমবাবু ঋষি ছিলেন, তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন স্ত্রীলোকের জন্তই সবনাশ হয়ে গেল।"

মণিকা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। ক্রমশঃ তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

"আমাকে যখন দলে নিয়েছিলেন তখনই কি আপনার এ সব কথা ভাবা উচিত ছিল না?

"ছিল। আমার অপরাধ হয়েছে স্বীকার করছি। তোমাদের নিয়েছিলাম দুটো প্রধান কারণে। তোমাদের মোটরটার লোভে আর টোপিরামের টাকাটার জন্তে। তোমরা যে টিকে থাকতে পারবে এ কল্পনাও করিনি।"

মণিকা চুপ করিয়া রহিল। তারপর স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আমাকে এখন কি করতে বলেন তা হলে?"

"বিয়ে করতে। গোপীনাথকে যদি বিয়ে করতে চাও সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

বিয়ে করে তোমরা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পার সে ব্যবস্থাও হতে পারে অনায়াসে। পাঞ্জাবে বা উত্তরপ্রদেশে অনেকে চেনাশোনা লোক আছে আমাদের, তারা তোমাদের অনেক সাহায্য করবে। তোমরা গার্হস্থ্যজীবনযাপন করেও আমাদের সমিতির অনেক উপকার করতে পার, বরেন যেমন করেছে। রাজী আছ ?"

মণিকার চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিল। বলিল, "বিয়ে করলে গোপীনাথকেই করতাম, কিন্তু তা আর হয় না। সে আমাকে যা বলেছে, তাকে বলতে আমি বাধ্য করেছি। ছোট্ট একটি সংসার পাতব— এই স্বপ্নই তো ছিল আমার। কিন্তু আপনার সংস্পর্শে এসে সে স্বপ্ন পুড়ে গেছে। নতুন ধরণের আর একটা মন্ত্রে আপনি দীক্ষা দিলেন। এখন আপনি বলছেন যেহেতু আমি স্ত্রীলোক, এই অপরাধে আমাকে দলত্যাগ করতে হবে। আমাদের কি আপনি নির্জীব খেলনা মনে করেন না কি ?"

"না, তা করি না। তুমি অত্যন্ত বেশী সজীব। অপরাধও তোমার কিছু নেই। শিখায় পতঙ্গেরা পুড়ে মরে, শিখার কোনও অপরাধ নেই তাতে। কিন্তু পতঙ্গ নিয়ে যার কারবার, শিখাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ তার পক্ষে।"

মণিকা সহসা উঠিয়া পড়িল।

"বেশ, আমি চললুম তা হলে। এই আপনার পরচুলা আর চশমা রইল।"

পরচুলা ও চশমা সে খুলিয়া ফেলিল।

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"তা জানি না। কিন্তু যাব। আমি মেয়েদের নিয়ে নতুন দল গড়ে আপনাকে দেখিয়ে দেব যে আমরাও আপনাদের চেয়ে কম নই। আমি শুধু আনন্দমঠই পড়িনি, দেবী চৌধুরাণীও পড়েছি। কিন্তু আমি যে দল গড়ব, তাতে ভবানী পাঠক থাকবে না। থাকবে মণিকা। চললুম—"

শিবাজী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যা বলছ তা সত্যিই যদি পার, তা হলে বুঝব আমাদের সুদিন আসন্ন। তবে এমন থিয়েটারী কায়দায় এখানে তোমাকে নাবতে দেব না। হঠাৎ অমন ক্রোধান্ধ হলে কি চলে ? আমার সঙ্গে কোলকাতা চল, সেখানে যা হয় কোরো। আমিই তোমাকে সাহায্য করব এ বিষয়ে।"

"আমি আপনার সাহায্য চাই না।"

"বেশ, নিও না। এখন এস, উঠে পড়। পরচুলা আর চশমাটা পর। এ সব ব্যাপারে হঠকারিতা চলে না। এস—"

মণিকা কয়েকমুহূর্ত ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটর আবার দ্রুতবেগে চলিতে শুরু করিল।

।। ছয় ।।

যে দুইটি কারণে বিধুভূষণ ভূপেশ মজুমদারের সঙ্গ ছাড়েন নাই তাহার মধ্যে একটি বিশাখা-সম্পর্কীয়। বিশাখা বিষয়ে ভূপেশ কি খবর সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্ত তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লীতে কাবুলী-চপ্পল-পরা সেই ষণ্ডাগোছের ছোকরা যে খবর দিয়াছিল তাহা অস্বস্তিকর। বিশাখা, বরেন কাহাকেও সে তাঁহার বাড়িতে পায় নাই, মধু কেবল বাহির হইয়া আসিয়া খবর দিয়াছিল, বাড়িতে কেহ নাই। ইহার অর্থ কি! হইতে পারে, বাহিরের কোনও লোকের, কাছে আত্মপ্রকাশ করিতে বরেন রাজী হয় নাই, কিন্তু সে আত্মগোপন করিবে কি করিয়া? তাহার তো নীচের ঘরে সর্বদা বসিয়া থাকিবার কথা। তাহার সহিতই তো ওই ষণ্ডা ছোকরার প্রথমে দেখা হওয়া উচিত ছিল। তবে কি সে উপরে গিয়া বিশাখার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে? আজকালকার ছোকরা, কিছুই বলা যায় না। ভূপেশ বিশাখার সম্বন্ধে কি খবর সংগ্রহ করিয়াছে? তাহা গোপন করিবার চেষ্টাই বা করিতেছে কেন? যেমন করিয়া হোক কথাটা তাহার নিকট হইতে বাহির করিতে হইবে। কিন্তু কথাটা খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগই তিনি অনেকক্ষণ পাইলেন না। ভূপেশ মজুমদার সমস্তদিন একদল পুলিস আর দারোগা লইয়া কখনও মোটরে, কখনও ট্রলিতে, কখনও বা হাঁটিয়া এমন হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে তাঁহাকে ধরিবার অবসরই তাঁহার মিলিল না। একটু সুস্থির না হইয়া বসিলে কি এ সব কথা পাড়া যায়? সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া সারিয়া শুইবার পূর্বে সুযোগটি মিলিল।

ভূপেশ মজুমদার বলিলেন, "কালকের আগে আমাদের যাওয়া হবে না। এ অঞ্চলে আরও কয়েকটা দাগী গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দুএকজন নাকি সন্ধ্যার সময় স্টেশনের কাছে ঘোরাঘুরিও করছিল। তাদের পাকড়াতে হবে কাল। আজই হয়তো ধরা পড়বে। লোক পাঠিয়েছি। তোমার অসুবিধে হচ্ছে না কি?"

"না, অসুবিধে আর কি। তোমার কাছে ত' রাজ-হালে আছি। কোলকাতার কাজকর্ম মোটামুটি সেরেই এসেছি। কেবল ওই বিশাখার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, তখন তুমি বললে, বিশাখার সম্বন্ধে কি একটা খবর নাকি পেয়েছ, কি খবর—"

"খবরটা ঠিক বিশাখা সম্বন্ধে নয়, তোমার সম্বন্ধে। ব্যাপারটা আগেই অনুমান করেছিলাম, এখন আর সন্দেহ নেই।"

"সন্দেহ নেই মানে? কি বিষয়ে সন্দেহ নেই—"

"পরেশ আমাকে যে খবরটা দিয়েছিল সেটা মিছেকথা নয়। ওই বিশাখাকেই তুমি বিয়ে করতে চাও, ফোনে যদিও সেটা অস্বীকার করেছিলে।"

বিধুভূষণ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "কি করে জানলে সেটা—"

"তুমি বিশাখাকে যে চিঠিটা লিখেছ তাই থেকে জানলাম।"

বিধুভূষণ এইবার আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বিশাখার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল নাকি ?"

"দেখা হয়েছিল কিনা তা পরে শুনো। তাকে তুমি চিঠি লিখেছিলে কিনা সেইটে বল আগে।"

"লিখেছিলাম।"

"সে চিঠিতে বিয়ের প্রস্তাবও করেছিলে।"

"করেছিলাম। তবে তার মধ্যে একটা ইয়ে ছিল। মানে—"

"বুঝেছি—"

ভূপেশ মজুমদার কৈলাস-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল কথাটা শুনিলে বিধুভূষণ হয়তো কৈলাসের বিবাহে কোনরূপ বাগড়া লাগাইয়া দিতে পারে। লোকটা টাকার কুমীর এবং এ যুগে টাকার জোর সবই করা সম্ভব। কৈলাসের কথাটা তিনি চাপিয়া গেলেন।

"বুঝেছি মানে, কি বুঝেছ ?"

কোলকাতায় গিয়ে শুনো সব।"

ভূপেশ বিধুভূষণের আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অনর্গল মিথ্যাকথা বলিতে লাগিলেন।

"বিশাখার কাছে আমার চিঠি তুমি দেখলে কি করে ?"

"বিশাখাই দেখিয়েছে।"

"তুমি আমার বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি ?"

"বরেন যখন একটা খুন করে পালাল তখন যেতে হয়েছিল।"

"কবে—"

"ঠিক এখানে আসবার আগে।"

'তারপর ?'

"তোমার চাকর বললে বরেনবাবু সরে পড়েছেন। পুলিস অফিসার হিসাবে তখন বিশাখার সঙ্গে দেখা করাটা আমার কর্তব্য বলে মনে হল। বিশাখা তখন তোমার চিঠিটা দেখালে আমাকে—"

"চিঠিটা পড়েছিলে তুমি সবটা ?"

"চোখ বুলিয়ে দেখেছিলাম একবার।"

"বিশাখা চটেছে মনে হল ?"

"না, চটবে কেন। তোমার মতো সুপাত্র এ বাজারে পাবে কোথায়। তুমি যে এ প্রস্তাব করবে তা আমি জানতাম। আমার কাছে ব্যাপারটা লুকোতে গেলে কেন শুধু শুধু ? এ সব ব্যাপার কি কখনও লুকোনো যায় ?"

"তুমি যখন আমাকে ফোন করেছিলে তখন আমি এ কথা ভাবিই নি। তা ছাড়া চিঠিতে ঠিক বিয়ের প্রস্তাবও তো আমি করি নি। আমি কেবল লিখেছিলাম ওঁর ব্যাপার যে রকম জটিল মনে হচ্ছে তাতে আমি যদি ওঁকে বিয়ে করি তা হলেই সুরাহা হতে পারে। অন্য কোনও উপায় নেই।"

"ও। আচ্ছা, কোলকাতায় ফিরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে। এখন শুয়ে পড়া যাক। সমস্তদিন যা হয়রানি গেছে, আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—"

ভূপেশ বিছানায় শুইয়া পাশবালিশটি জড়াইয়া চক্ষু বুঁজিলেন। বিধুভূষণও শুইয়া পড়িলেন এবং ভূপেশের কথাগুলি প্রণিধান করিতে লাগিলেন। ভূপেশের কথা শুনিয়া তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। বিধু যে বিশাখাকে বিবাহ করিতে উৎসুক এ কথা বেশীদিন চাপা থাকিত না। ভূপেশ না হয় দুই চারিদিন আগেই জানিয়াছে। তাহাতে ক্ষতিই বা কি। কিন্তু বিশাখা যে এ প্রস্তাবে রাগ করে নাই, বিশাখা যে এখনও তাঁহার বাড়িতে আছে, এই অলীক সংবাদটি তাঁহার কর্ণে মধুবর্ষণ করিল। ও. সি. কুণ্ডু নামক যে শনিটা তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের হিড়িকে সেও নামিয়া গিয়াছে। সুতরাং ওদিকের আকাশের ঘোলাটে ভাবটা প্রায় কাটিয়া আসিতেছে। কলিকাতায় গিয়া বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিশাখাকে বিবাহ করিয়া তিনি বেলেঘাটার বাড়িতিনটি ন্যায়তঃ অধিকার করিতে পারিবেন এবং যে পঁচিশ হাজার টাকা বিষ্ণুচরণ গাপ করিয়াছিল তাহা সুদসুদ্ধ উশুল হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি আরাম-বোধ করিলেন। কিন্তু আরামে নিদ্রা তিনি দিতে পারিলেন না। দ্বিতীয়, যে কারণটির জন্য তিনি ভূপেশের সঙ্গ ছাড়েন নাই, সেইটি তাঁহার মনে এইবার প্রভাব-বিস্তার করিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কর্তব্যনির্ধারণে এত চিন্তিত তিনি আর কখনও হন নাই। চিন্তাটা প্রথমদিকে আত্মবিশ্লেষণের আকার ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা আত্মতিরস্কারে রূপান্তরিত হইল। নিজেকেই তিনি মনে মনে ভুরু নাচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, ওই রজতটার জন্য তুমি অনর্থক মাথা ঘামাইয়া মরিতেছ কেন? লোকটা জীবনে হেন দুষ্কার্য নাই যাহা করে নাই। পাকালমাছের মতো এতদিন পাঁকে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল। ভগবানের জালে এইবার ধরা পড়িয়াছে। এই অতিশয় ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে তুমি মাথা গলাইতে যাইতেছ কেন? নানারূপ অদ্ভুত উপমাও তাঁহার মাথায় আসিতে লাগিল। মনে হইল নদী যেমন অনিবার্যপ্রবাহে বহিয়া অবশেষে সমুদ্রে গিয়া মেশে, ওই রজতও তেমনি স্বাভাবিকনিয়মে ফাঁসিকাষ্ঠে গিয়া ঝুলিবে। যেমন কর্ম করিয়াছে তেমনি ফল পাইবে। পাওয়াই উচিত। তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কল্পনা কেন করিতেছেন? তাঁহার তো বরং খুশিই হওয়া উচিত। এ কথা কি সত্য নয় যে ওই লোকটাই তাঁহার সকল কষ্টের মূল? সারাজীবন তিনি এই যে লুকোচুরি খেলিতেছেন

তাহার জন্য কি ওই দায়ী নয় ? রজতবাবুর সহিত সম্পর্ক ছিল বলিয়াই তো স্বর্ণলতাকে অকালে প্রাণ হারাইতে হইল। অন্য উপায়ই বা ছিল কি! বিধুভূষণ চক্ষু বুঁজিয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলেন। এ রকম পাষণ্ডকে পুলিসের হাত হইতে উদ্ধার করিবার বাসনা কেন তাঁহার মনে জাগিতেছে, জাগা উচিত কি না, জাগিলেই বা তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে, এই সব কথাই তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। ঘুম আসিল না। চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, কখনও বা এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন ভূপেশের নাক ডাকিতেছে। আবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভূপেশের কথাই মনে হইতে লাগিল। লোকটা কি ছিল, কি হইয়াছে। একদিন যাহার মেসের চার্জ মিটাইয়া দিবার সামর্থ্য ছিল না, জলখাবার খাইবার পয়সা জুটিত না, আজ তাহার কি বাড়বাড়ন্ত। তাহার হুকুমে দশ বারোটা দারোগা ছুটাছুটি করিতেছে, ট্রেনকে যখন যেখানে খুশি দাঁড় করাইয়া ফেলিতেছে। খাবার-ওলা, হোটেলওলা খাবার লইয়া সাধাসাধি করিতেছে। আর একবার তিনি ভূপেশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একপেট মাংস-ভাত খাইয়া স্প্রিংয়ের খাটে শুইয়া আরামে নাক ডাকাইতেছে। সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্টের কথা মনে হইতেই তাঁহার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে বহিতে শুরু করিল। তাঁহার অন্তরের নিগূঢ়লোকে যে সত্তাটি রজতের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একটু পুলকিত হইয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—'বন্ধু, অদৃষ্টই যদি মানিতে চাও তবে আর রজতকে দোষী করিতেছ কেন? উহার অদৃষ্টকে দোষী কর। অদৃষ্ট উহাকে কুবুদ্ধি জোগাইয়া মন্দ পথে লইয়া গিয়াছে, চরিত্রহীন পাষণ্ডে পরিণত করিয়াছে। তুমি বিচারক সাজিয়া বসিলে কোন্ অধিকারে? সেদিন তো কথক মহাশয়ের মুখে শুনিলে, ভগবান বলিয়াছেন আপন আপন কর্তব্য করিয়া যাও, কারণ তাহা ছাড়া আর কিছু করিবার ক্ষমতাই তোমার নাই। ফলাফল লইয়া মাথাঘামানো বৃথা, কারণ তাহার উপর তোমার কোনও হাত নাই।' বিধুভূষণ ইহার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিসংগ্রহ করিতে পারিলেন না। মাথায় হাত বুলাইলেন একবার। ঘাড় ফিরাইয়া আর একবার দেখিলেন। ভূপেশ নাক ডাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রজতকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ভূপেশকে অনুরোধ করিলে সে কী রাজী হইবে? খুব সম্ভবতঃ হইবে না। বরেনকে ছাড়িয়া দিয়া যেরকম বিপদে পড়িয়াছিল বলিতেছে, তাহাতে ওপথে আর ও পা বাড়াইবে না। তা ছাড়া ব্যাপারটা মিনিস্টারের সঙ্গে জড়িত যে! রজতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি ওয়ারেণ্টও রহিয়াছে। ভূপেশের ইচ্ছা থাকিলেও ছাড়িয়া দিবার সাহস হইবে না। নাঃ, ভূপেশকে বলিয়া লাভ নাই। বিধুভূষণ অনেকক্ষণ চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। পায়ের পাতাটা মাঝে মাঝে নাচাইতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মিনিটপাঁচেক পরেই তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া

বসিলেন। মনে হইল বাহিরে কে যেন আর্তনাদ করিতেছে। পুলিসেরা কয়েদীদের ঠ্যাঙাইতেছে না কি? বিধুভূষণ শুনিয়াছিলেন অপরাধস্বীকার করাইবার জন্ত পুলিসেরা কয়েদীদের নির্যাতন করে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহের শিরায়, শিরায় অসংখ্য রক্তকণিকা যেন চিৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "তোমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলছে আর তুমি চুপ করে বসে আছ? ওঠ, যেমন করে পার বাঁচাও ওকে,"—রজত যে তাঁহার বাবা এ কথা কেহ তাঁহাকে বলে নাই, ইহার কোনও প্রমাণ নাই, অথচ এমন একটা ধারণা কি করিয়া যে তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল সে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে বাহির হইলেন। বাহির হইতেই একটি উর্দিপরা কনস্টেবল উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল। লোকটি পাহারায় নিযুক্ত ছিল। বিধুভূষণ দেখিলেন চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। দূরে একটা ইঞ্জিন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ঝিঁঝি ডাকিতেছে। কনস্টেবলটির দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিষা হনহন করিয়া খানিকটা আগাইয়া গেলেন। কয়েদীরা যে স্থানটায় বসিয়াছিল, দেখিলেন সে স্থানটা শূন্য। কাছাকাছি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। একটু দূরে কযেকটা কুলি শুইয়া ঘুমাইতেছে। ফিরিয়া আসিলেন। কনস্টেবলটার সহিতই আবার দেখা হইল। ভাঙ্গা হিন্দীতে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'কয়েদি সব কাঁহা গিয়া—'

কনস্টেবল উত্তর দিল বাংলায়।

"ওদের লক্‌-আপ'-এ রাখা হয়েছে।"

"আপনি বাঙ্গালী বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

'এখানে গারদ আছে না কি?"

"স্টেশনে নেই, থানায় আছে। থানা বেশী দূর নয়—"

'থানায় আছে কে?"

"দারোগা আছেন একজন। অন্য সিপাহীরাও আছে—"

"ও।"

"কেন, কিছু দরকার আছে আপনার?"

'না, এমনি জিগ্যেস করছি। দিনের বেলা ওরা ওইখানটায় বসে ছিল কি না, এখন দেখছি খালি, ভাবলাম কোথা গেল সব—"

আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি পুনরায় ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, ভূপেশ পাশ ফিরিয়াছে, এবং সেইজন্যই সম্ভবতঃ নাক-ডাকাটা বন্ধ হইয়াছে। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। কর্তব্যচিন্তা করিতে লাগিলেন। এ ধরণের কার্য আগেও তিনি অনেকবার করিয়াছেন। আসল মন্ত্রটি তাঁহার জানা

আছে। তবু একটু চিন্তা করিয়া দেখা তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন। কয়েকবার মাথায় হাত বুলাইয়া এবং ওষ্ঠের নানারকম ভঙ্গী করিয়া তিনি একটি কথাই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন, কথাটা কি করিয়া পাড়া যায়। কথা পাড়াটাই সবচেয়ে কঠিন জিনিস, ইহাই তাঁহার অভিজ্ঞতা। কায়দা করিয়া কথাটা একবার পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাকীটা ঠিক হইয়া যায়। মিনিটখানেকের মধ্যেই তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন, দেখাই তো যাক, কি দাঁড়ায়। সহজে যদি না হয়, আইন-আদালত তো আছেই। সন্তর্পণে আগাইয়া গিয়া নিজের ট্রাঙ্কটির সামনে উবু হইয়া বসিলেন। ভূপেশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একবার। তাহার পর খুব আস্তে চাবি ঘুরাইয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া ডালাটি তুলিলেন। কাপড়ের তলা হইতে হইতে লম্বা খাম বাহির করিলেন একটি। খামের ভিতর নোট ছিল। প্রত্যেকটি একশ টাকার নোট। গণিয়া গণিয়া খান-কয়েক নোট তিনি বাহির করিয়া লইলেন। তারপর আর একটি খাম বাহির করিলেন। তাহাতে দশ টাকার নোট ছিল। তাহাও খানকয়েক লইলেন। তাহার পর বাক্সটি পুনরায় সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাথরুমের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ভূপেশ বা বাহিরের কনস্টেবলটি তাঁহার নির্গমন টের পাইল না।

থানা কোথায় তাহা আবিষ্কার করিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না তাঁহাকে। রাস্তায় বাহির হইয়া একটা 'রিকশ' পাইলেন, সেই তাঁহাকে থানার সামনে নামাইয়া দিল। থানায় প্রবেশ করিতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল এবং বারান্দায় যে কনস্টেবলটি শুইয়াছিল, তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। বিধুভূষণ নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কনস্টেবলটি আগাইয়া আসিল, বিধুভূষণকে সে-ও চিনিতে পারিল। বিধুভূষণ যে ভূপেশের অন্তরঙ্গ বন্ধু এ কথা প্রায় সকলেই জানিয়াছিল। কনস্টেবল আসিয়া বিধুভূষণকে সেলাম করিল।

বিধুভূষণ বলিলেন, "দারোগাসাহেবের সঙ্গে একটু জরুরি দরকার ছিল; দেখা হবে কি?"

"জরুর।"

কনস্টেবল বিধুভূষণকে ভিতরে লইয়া গিয়া একটি চেয়ারে বসাইল। একটু পরেই দারোগাসাহেব আসিলেন।

"নমস্কার। এত রাত্রে হঠাৎ—"

"নমস্কার। বলছি, বসুন। একটু গোপনীয় কথা, কপাটটা ভেজিয়ে দিন।"

"কিছু দরকার নেই; আচ্ছা, বলছেন যখন, ভেজিয়ে দিই।"

উঠিয়া গিয়া তিনি কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। দারোগাকে বাঙালী দেখিয়া বিধুভূষণ আশান্বিত হইয়াছিলেন।

"ব্যাপার কি বলুন তো—"

বিধুভূষণ হাসিয়া বলিলেন, "ভূপেশের কাছে আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি, তাই আপনার কাছে আসতে সাহস হল। ভূপেশকে যে অনুরোধ করতে ভরসা পাইনি তা আপনাকে করতে এসেছি। ভূপেশ আমার বাল্যবন্ধু, কিন্তু বড় কড়া অফিসার। তাই তাকে লুকিয়ে আপনার কাছেই এলাম—"

বিধুভূষণ হাসিমাখা দৃষ্টি দারোগাসাহেবের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

"ব্যাপার কি –"

"ওই যে রজতকে আপনারা ধরেছেন, ও আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। লোকটা পাষণ্ড সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর মা বেঁচে আছে। আশা করে আছে একদিন ও ফিরে আসবে। আমি তাঁকে কতদিন এই বলে সান্ত্বনাও দিয়েছি। আর বিধির চক্র দেখুন, ও আমারই চোখের সামনে ধরা পড়ে গেল। কিছুতেই ঘুম হল না আমার। তার মায়ের মুখটা বারবার মনে জাগতে লাগল। তাই চলে এলাম আপনার কাছে, যদি ওর উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে—"

দারোগাসাহেব আনতনয়নে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিধুভূষণ মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "ওর মায়ের কথা মনে পড়েই আমার কষ্ট হচ্ছে। আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই এতে। তবু ওর মায়ের কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছি যে ওকে বাঁচাবার জন্যে যত টাকা লাগে তা আমি খরচ করব। আপনি যদি দয়া করে ছেড়ে দেন ভালই, আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমি দেব, আর আপনি যদি অসম্মত করেন তা হলে টাকাগুলো ব্যারিস্টারের পেটে যাবে।"

দারোগাবাবু এতক্ষণ আনতচক্ষু হইয়াছিলেন এ কথা শুনিয়া টেবিলের উপর যে কাগজের টুকরাটি ছিল সেটি তুলিয়া লইয়া গুলি পাকাইতে লাগিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "আপনি যা বলছেন তা করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ ব্যাপার তো আমি একা করতে পারি না। জন দুই কনস্টেবল রয়েছে—"

"তাদেরও দলে টেনে নিন। যা টাকা লাগে আমি দেব –"

দারোগাসাহেব পুনরায় আনতচক্ষু হইয়া কাগজের গুলি পাকাইতে লাগিলেন।

আলাপটা এইভাবে আরম্ভ হইল এবং ঘণ্টাখানেক চলিয়া ঈপ্সিত পরিণতিতে পৌঁছিয়া গেল। দারোগাসাহেবকে নগদ এক হাজার টাকা এবং দুইজন কনস্টেবলকে পাঁচশত করিয়া দিতে হইল। বিধুভূষণ টাকা সম্বন্ধে কোনরূপ দরদস্তুর করিলেন না, একটি অনুরোধ কেবল তিনি করিলেন, রজতকে এখনই গারদ হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। তাহাই হইল। বিধুভূষণ স্বচক্ষে দেখিলেন একটি কনস্টেবল রজতকে গারদ হতে বাহির করিয়া আনিয়া কিছুদূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল এবং বলিল—"ভাগো, জোর সে ভাগো –"

দারোগাসাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া চুপিচুপি বলিলেন, "এইবার তাড়াতাড়ি একে এ তল্লাট থেকে সরিয়ে ফেলুন আপনি। ভোরের দিকে আমরা হাল্লা করব যে,

কয়েদিটা পায়খানা যাব বলাতে একজন কনস্টেবল বেকুবি করে তার কোমরের দড়ি খুলে দিয়ে তাকে গারদ থেকে বার করে পায়খানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার পেটে লাথি মেরে সরে পড়েছে। আপনি যত শিগ্‌গির পারেন ওকে পার করে দিন। কাছেই পারঘাটা আছে, নৌকাও পাবেন—'

রজত ছাড়া পাইয়া ছুটিতেছিল। ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। বিধুভূষণ ছুটিয়া গেলেন এবং তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন।

"লাগল না কি?"

"কে তুমি বাবা?"

বিধুভূষণ কোন উত্তর না দিয়া ধরিয়া ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন।

"কে তুমি বাবা—"

'আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপনি পড়ে গেলেন—"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমাকে একটা গাড়ি ডেকে দিতে পার বাবা, চোখে ভাল দেখতে পাই না—"

"আপনি আমার হাত ধরে চলুন, দিচ্ছি আপনাকে গাড়ি ঠিক করে—"

বিধুভূষণের হাত ধরিয়া রজত হাঁটিতে লাগিল। বেশ কিছুদূর হাঁটিবার পরও কিন্তু কোন গাড়ির দেখা পাওয়া গেল না। দুই একটা রিক্‌শাওয়ালার দেখা মিলিল বটে, কিন্তু রিক্‌শাতে চড়াইয়া দেওয়া বিধুভূষণ নিরাপদ মনে করিলেন না। রজতের হাত ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন একটা ট্যাক্সি, অন্তত একটা ঘোড়ার গাড়ি মিলিয়া যাইবে। কিন্তু মিলিল না। শেষ পর্যন্ত একটা রিক্‌শওয়ালাকেই ডাকিতে হইল।

রিক্‌শওয়ালাকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখান থেকে নদীর ঘাট কত দূর?"

"প্রায় মাইলখানেক হবে, বাবু।"

"সেখানে খেয়া পারাপার হয়?"

'হয়। তবে এখন এত রাত্রে তো খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"

"তা হলে উপায় কি করা যায় বল্‌তো। বাবুর একটা নৌকো চাই। যোগাড় হবে কি?"

"হতে পারে। তবে ভাড়া বেশি চাইবে।"

'ভাড়া যা চাইবে দেব। তুই যদি ভাল করে চড়িয়ে দিস তোকেও বখসিস দেব। ভাড়া কত নিবি?"

"দুটাকা বাবু। তার কমে পারব না।"

"তোকে দশ টাকা দেব। তুই হেফাজত করে বাবুকে নিয়ে গিয়ে একটা নৌকো-ভাড়া করে তাতে চড়িয়ে দিস। বাবু চোখে একটু কম দেখেন, বুঝলি।"

রিক্‌শাওলা দশ টাকা পাইবে শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সসম্ভ্রমে উত্তর

দিল—"এক মাঝির সঙ্গে আমার দোস্তি আছে। আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দেব। তবে সে-ও কিছু বেশী ভাড়া চাইবে বাবু।"

"দেব বেশী ভাড়া। ভাড়ার জন্তে কিছু আটকাবে না।"

বিধুভূষণ কয়েকখানা দশটাকার নোট রজতের হাতে দিয়া বলিলেন,—খানকয়েক দশটাকার নোট রেখে দিন আপনি। রিক্শাওলাকে দশটাকা দিয়ে দেবেন। মাঝিও যা চায় দেবেন তাকে। নৌকো করেই চলে যান আপনি। এটাও রাখুন—এটা একশ' টাকার নোট।"

একখানা একশত টাকার নোটও তিনি বাহির করিয়া রজতের হাতে দিলেন।

রজত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধদৃষ্টি তুলিয়া বিহ্বলকণ্ঠে সে পুনরায় প্রশ্ন করিল,— তুমি কে বাবা?"

বিধুভূষণের একবার ইচ্ছা হইল বলেন,— আমি দামিনীর ছেলে"—কিন্তু আত্মসংবরণ করিলেন।

বলিলেন,—"আমার নাম বংশীবদন মিত্র। আপনাকে চিনি আমি। পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

রজত হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল। রিক্শা চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন। বাথরুমের পিছনকার দরজা দিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। দেখিলেন ভূপেশ পুনরায় চিৎ হইয়া নাক ডাকাইতেছে। বিধুভূষণ সন্তর্পণে আবার বাক্সটি খুলিলেন এবং নোটগুলি পুনরায় গণিয়া সেই খামে পুরিয়া কাপড়ের তলায় রাখিয়া দিলেন। বাক্স বন্ধ করিয়া তিনি আর একবার প্ল্যাটফর্মে বাহির হইলেন। কনস্টেবলটি ঢুলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ঘুম হচ্ছে না। আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার, বাবা?"

"পারি।"

কনস্টেবল রিফ্রেশমেণ্টরুমের দিকে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণের জল খাইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি যে বরাবর ঘরের মধ্যেই ছিলেন কনস্টেবলের মনে এই ধারণাটি জন্মাইবার জন্য কুপট আচরণটি করিলেন। কনস্টেবল একটি কাঁচের গ্লাসে জল লইয়া আসিল। জলপান করিয়া বিধুভূষণ ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় অঙ্গ প্রসারিত করিলেন। একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদে তাঁহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। দেখিলেন ভূপেশ ঘরে নাই। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া দেখিলেন কনস্টেবলরাও কেহ নাই। বিধুভূষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর দেখিতে পাইলেন ভূপেশ আসিতেছে।

"ঘুম ভাঙ্গল তোমার! এদিকে আমি একা মহাফ্যাসাদে পড়ে গেছি—"

"কি—"

"সেই রজত ব্যাটা পুলিসের হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে। একের নম্বর বদমাস তো—"

"তাই না কি! কখন—"

"সকালে।"

"তা হলে তোমার ফিরতে তো বেশ দেরি দেখছি।"

"আমি আর এখানে থেকে কি করব। এখানকার পুলিসরাই যা হয় করবে। আমি আজই ফিরব।"

"কোথা ফিরবে?"

"দিল্লীতে। সেখানে রিপোর্টটা দাখিল করতে হবে তো!"

"সেখান থেকে কোলকাতায় ফিরছ তো?"

"হ্যাঁ। তুমি কি এখান থেকেই কোলকাতায় ফিরতে চাও—"

"না, চল, তোমার সঙ্গেই যাব। সৎসঙ্গে কাশীবাস।"

বিধুভূষণ হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

"চা খেয়েছ?"

"না।"

"আমিও খাইনি। চল, চা খাওয়া যাক।"

অপ্রত্যাশিতভাবে রজতবাবুর সহিত দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে বিধুভূষণের সমস্ত সত্তা যে প্রচণ্ড ভাবাবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ফলে কেবল যে কতকগুলি পুলিসের লোক অবৈধভাবে কিছু অর্থোপার্জন করিয়া রজতকে ছাড়িয়া দিল তাহা নয়, তাহার ফলে বিধুভূষণের মানসিক জগতের চেহারাটাই বদলাইয়া গেল। দরিদ্র পিতামাতার আদরে লালিত সন্তান অতি শৈশবে যে রূপকথার জগতে বাস করে, সে-জগতে কিছুকালের জন্ত সে নিজেকে মনে করে রাজপুত্র। কিন্তু একটু বড় হইয়া সে প্রথমে যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করে যে বাস্তবিক সে রাজপুত্র নয়, সে একটি দরিদ্র নগণ্য ব্যক্তির সন্তান, তখন তাহার মনের অবস্থা যেমন হয় বিধুভূষণের মনের অবস্থা অনেকটা তেমনি হইল। বিধুভূষণ নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করিলেন ঐশ্বর্যের অথবা মিথ্যার যে আবরণেই তিনি নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া যেমনভাবেই বাহিরে আত্মপ্রকাশ করুন না কেন তাঁহার আসল পরিচয়—তিনি ওই দুর্বৃত্ত রজতের অবৈধ সন্তান, তাঁহার মা জনৈকা চরিত্রহীনা দাসী। ইহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। প্রমাণ কিছুই নাই, তবু অন্তরের অন্তস্তলে এই নিদারুণ সত্যটা তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিলেন। প্রতি মানুষের অন্তরে যে বোদ্ধা কোনও প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া সত্যনির্ণয় করে, সেই সর্বজ্ঞ নিগূঢ় চেতনাই তাঁহাকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ করিল। সত্যটা তিনি বরাবরই জানিতেন, এই সত্যটাকে চাপা দিবার জন্তই তিনি সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিপুল বিত্ত অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি উপলব্ধি করিলেন এতদিন বাহিরের লোককে তিনি ভুলাইয়াছেন সত্য, কিন্তু নিজেকে ভুলাইতে পারেন নাই। পারিলে বিপন্ন রজতকে দেখিয়া তিনি অতটা বিচলিত হইতেন না, তাহার উদ্ধারের চেষ্টাও করিতেন না। তাঁহার অন্তরের মুখোশটাও হয়তো কোনও অচিন্তিতপূর্ব আঘাতে হঠাৎ একদিন খসিয়া পড়িবে, ওই রজতের যেমন পড়িয়াছে। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার রজতনারায়ণ সিংহের এ দুর্দশা কে কল্পনা করিয়াছিল! বিধুভূষণের মনোজগতের রূপ সত্যই বদলাইয়া গেল। যে নিষ্ঠুর নিদারুণ ভাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি এতদিন বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়াছিলেন, সহসা তাহার নিকট তিনি নতিস্বীকার করিলেন। মনে মনে সবিনয়ে স্বীকার করিলেন, নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি মানুষের নাই। একটা সান্ত্বনাও তিনি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। ভাবিলেন, নিজের জন্মের জন্ত তিনি দায়ী নহেন, নিজের কর্মের জন্তই তিনি দায়ী। পূর্বজন্মের কোন পাপের ফলেই এই-রকম হইয়াছে, ইহজীবনে সৎকর্ম করিলে আগামী জন্মে সুখে থাকিবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা ভাবিয়াও তিনি একটু ম্রিয়মাণ হইলেন যে তাঁহার ইহজীবনের কর্মগুলি সব সৎ নয়। অসুস্থ স্বর্ণলতার মুখটা মনে পড়িল। আরও অনেক কিছু মনে পড়িল। একটু দমিয়া গেলেন। আগামী জন্মেও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না কি!

মনের অবস্থা যখন এইরূপ তখন তিনি হাওড়া'স্টেশনে নামিলেন। ভূপেশও সঙ্গে ছিলেন। যদিও ভূপেশ কোন আসামীকে ধরিতে পারেন নাই, তবু মন্ত্রীমহাশয় তাঁহার কর্মতৎপরতায় খুশী হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। সংবাদটি নীলতারার কর্ণগোচর করিবার জন্য, সুতরাং ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। সুলোচনার সম্বন্ধেও তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। মজিদ তাহার কি ব্যবস্থা করিল, কে জানে।

বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, "গিন্নীকে সুখবরটা দিতে হবে। আমি এখান থেকে সোজা ট্যাক্সি করে বাড়ি যাচ্ছি। পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। বিশাখা দেবী কি ঠিক করলেন তা জানবার কৌতূহল আমারও কম নয় তোমার চেয়ে। আমি তোমার বাড়িতে আসছি একটু পরে—"

ভূপেশ একটা ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিধুভূষণ কি করিবেন চট্ করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটার দিকে চাহিলেন, মাথায় দুই একবার হাত বুলাইলেন। বাসে যাইবেন, না ট্যাক্সি করিবেন স্থির করিতে তাঁহার একটু সময় লাগিল। ট্যাক্সি করিয়া অতগুলা পয়সা খরচ করিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না।

"বাসে খুব ভিড় হবে ?"

কুলিটাকে প্রশ্ন করিলেন।

"বাসে ভিড় হবে বইকি। মালপত্র নিয়ে অসুবিধাও হবে।"

"তবে চল, একটা ট্যাক্সিতেই চল—"

মনে একটা যুক্তিও জাগিল। তাড়াতাড়ি যাওয়াই উচিত, বরেন ছোকরা কি কাণ্ড যে করিয়া গিয়াছে কে জানে। কিন্তু বাড়িতে গিয়া যাহা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইল তাহার পূর্বাভাস পাইলে ট্যাক্সি চড়িয়া তিনি আসিতেন না। মোটেই আসিতেন কিনা সন্দেহ। গিয়া দেখিলেন ও. সি. কুণ্ডু বারান্দায় বসিয়া অধীরভাবে পা দোলাইতেছেন।

"গুড্ মর্ণিং যোগজীবনবাবু। শো মি ইওর ওয়াইফ্।"

বিধুভূষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আপনি কোথা ছিলেন এতক্ষণ। ট্রেন থেকে কোথা গেলেন—"

"ট্রেনটা থেমে যেতেই আমি নেবে পড়লাম। শুনলাম ট্রেনে বোমা পড়েছে। সিরিয়াস ব্যাপার! কে বোমা ফেলেছে তারই সন্ধানে ছুটাছুটি করলাম খানিকক্ষণ। তারপর মনে হল ছুটোছুটি করে লাভ নেই। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে চট্ করে ফটো তুলে ফেললাম গাড়িটার। ওই ফটো থেকেই 'ক্লু' বার করব আমি। আপনার ব্যাপারটা মিটিয়ে দিল্লী ছুটতে হবে আজই আমাকে। দেরি করবেন না, শো মি ইওর ওয়াইফ্। ভাগ্যে আপনার ঠিকানাটা টুকে রেখেছিলাম তা না হলে এবারও আপনি ঠিক ফস্কে যেতেন। নিন, আর দেরি করবেন না—"

ও. সি. কুণ্ডু তাঁহার রিস্টওয়াচে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

ভৃত্য মধু বাহির হইয়া আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। মধুকে দেখিয়া বিধুভূষণ একটু যেন সাহস পাইলেন।

"মধু, এঁর জন্যে একটু চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর। আপনি বসুন, আমি কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে আসি।"

মধু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন, "আপনার এখানে এক গণ্ডূষ জল পর্যন্ত খাব না। নট্ এ ড্রপ্—"

"বসুন তা হলে। আসছি আমি ভেতর থেকে।"

"আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব।"

"কেন ?"

'আপনি যদি সরে পড়েন ! আই অ্যাম নট এ ফুল। হয় আপনার স্ত্রীকে এখানে ডেকে পাঠান, কিংবা আমাকে ভিতরে নিয়ে চলুন। আপনাকে আমি চোখের আড়াল করব না।"

"যদি আমি জোর করে চলে যাই, কি করবেন ?"

ও. সি. কুণ্ডু পকেট হইতে প্রকাণ্ড হুইসল্‌টি বাহির করিয়া বলিলেন, "এইটি বাজাব। বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এসে ঘিরে ফেলবে আপনার বাড়ি।"

বিধুভূষণ বিস্ফারিতচক্ষে হুইসল্‌টির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মস্তকে একবার হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বেশ, আসুন তাহলে আমার সঙ্গে ওপরে।"

"চলুন।"

উপরে উঠিযাই ঝিয়ের সহিত দেখা হইল।

বিধুভূষণ বেশ সপ্রতিভভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "উনি কোথা—"

"চান করছেন।"

"খবর দাও, বল একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বসুন আপনি –"

ঝি চলিযা গেল।

ও. সি কুণ্ডু বলিলেন, "আপনিও বসুন।"

উভয়ে মুখোমুখি খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। বিধুভূষণের বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হইতেছিল বিশাখা আসিয়া হয়তো সব ভণ্ডুল করিয়া দিবে। বিশাখার সহিত কথাবার্তা কহিবারও সুযোগ দিল না লোকটা।

"আমি একবার ভিতরে গিয়ে দেখি।"

"আপত্তি নেই, কিন্তু আমিও যাব।"

এমন সময় দ্বার ঠেলিয়া একটি তরুণী প্রবেশ করিল। বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া গেলেন ! এ কে ! এ তো বিশাখা নয়।

"ইনিই আপনার স্ত্রী ?"

"হ্যাঁ—"

ইহা বলা ছাড়া বিধুভূষণের গত্যন্তর ছিল না।

"আপনিই এঁর স্ত্রী?"

তরুণীটি ঘাড় হেঁট করিয়া একটু মুচকি হাসিল, তাহার পর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"বিধু, ও বিধু—ওপরে আছ নাকি?" নিচে হইতে ভূপেশের গলা শোনা গেল। মধুও প্রবেশ করিয়া খবরটি দিল, "নিচে ভূপেশবাবু এসেছেন—"

বিধুভূষণ মধুকে প্রশ্ন করিলেন, "মধু, আর একটি মেয়েকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম, তিনি কোথায়?"

"তিনি বরেনবাবুর সঙ্গে চলে গেছেন, আর ফেরেন নি।"

"তুমি ভূপেশবাবুকে ওপরেই পাঠিয়ে দাও।"

মধু নিচে নামিয়া গেল।

ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন, "আপনার স্ত্রীকে আর একবার ডাকুন, দুচারটে কথা জিগ্যেস করতে চাই।"

"আবার কি জিগ্যেস করবেন?"

"ডাকুনই না।"

"ও ঝি, ওঁকে আর একবার বাইরে আসতে বল—"

বিধুভূষণ মহাফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। মেয়েটি কে, কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিয়াছে, কিছুই তাঁহার জানা নাই। জেরার মুখে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে তাহাও অনিশ্চিত। ভূপেশও আবার ঠিক এই সময়ে আসিয়া জুটিয়া গেল।

তরুণীটি দ্বার ঠেলিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল। ও. সি. কুণ্ডু জেরা শুরু করিলেন।

"আপনার নাম কি?"

"সুলোচনা।"

"কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে আপনার?"

সুলোচনা কোন উত্তর না দিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভূপেশ মজুমদার প্রবেশ করিলেন।

"এই যে সুলি, যাক বাঁচা গেল"—সুলোচনা আগাইয়া আসিয়া ভূপেশকে প্রণাম করিল এবং প্রণাম করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ও. সি. কুণ্ডুর দিকে চাহিয়া ভূপেশ প্রশ্ন করিলেন—"ইনি কে—"

ও সি. কুণ্ডু নিজেই আত্মপরিচয় দিলেন।

"আমি ও. সি. কুণ্ডু, ডিটেকটিভ।"

ভূপেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

"এখানে কি করছেন?"

"এঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু এনকোয়ারি করতে এসেছি।"

"বিধুর স্ত্রীর সম্বন্ধে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমার সন্দেহ ওঁর নাম বিধু নয়, যোগজীবন।"

"যে মেয়েটি এখানে দাঁড়িয়েছিল আপনার ধারণা তিনি বিধুর স্ত্রী ?"

"উনি স্ত্রী বলেই তো পরিচয় দিলেন।"

ভূপেশ সবিস্ময়ে শুনিলেন বিধুভূষণ একটা অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিতেছেন—"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী বই কি। তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে।"

ভূপেশের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল। মধু কয়েক পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ভূপেশ তাহাকে বলিলেন, "মধু, নিচে গাড়ি থেকে আমার বড় ব্যাগটা নিয়ে এস তো—"

ব্যাগ আসিলে ভূপেশ তাহার ভিতর হইতে একটি ফটো অ্যালবাম বাহির করিয়া পাতা উলটাইতে লাগিলেন। উলটাইতে উলটাইতে একটা পাতায় আসিয়া থামিয়া গেলেন তিনি। আর একবার ও. সি. কুণ্ডুর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি আমরা। আপনি পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছেন না ?"

ও. সি. কুণ্ডু হঠাৎ উঠিয়া দ্বারের দিকে ধাবমান হইলেন। কিন্তু ভূপেশের ক্ষিপ্রতার কাছে তাঁহাকে হার মানিতে হইল। ভূপেশ তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে টানিতে নিচে লইয়া গেলেন এবং যে পুলিস কনস্টেবলটি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "লোকটা পাগ্‌লা গারদ থেকে পালিয়েছে, একে এখন নিয়ে গিয়ে একটা লক্‌-আপে রেখে দাও। পরে গিয়ে আমি ব্যবস্থা করছি। একটা মোটরে করেই নিয়ে যাও—"

বিধুভূষণও ভূপেশের সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিয়াছিলেন। দেখিলেন ও. সি. কুণ্ডু পকেট হইতে হুইস্‌লটি বাহির করিয়া খুব জোরে জোরে বাজাইতেছেন আর বলিতেছেন, "মজা দেখাচ্ছি দাঁড়ান আপনাদের। অলিগলি থেকে পিলপিল করে আর্মড ফোর্স এসে পড়বে এখুনি—"

পুলিস কনস্টেবল একটি ধাবমান ট্যাক্সিকে থামাইল।

ও. সি. কুণ্ডু ট্যাক্সিতে চড়িতে আপত্তি করিলেন না, হুইস্‌ল বাজাইতে বাজাইতে ট্যাক্সি চড়িয়া চলিয়া গেলেন।

"লোকটা পাগল ?"—বিধুভূষণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"হ্যাঁ। তুমি এর পাল্লায় পড়লে কি করে !"

"সব বলছি, চল।"

"তুমি হঠাৎ সুলোচনাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে গেলে কেন ?"

"ও মেয়েটিকে তুমি চেন না কি ?"

"আরে, ওই তো আমার সেই শালীর মেয়ে যার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম—"

"ও এখানে এল কি করে ?"

"মজিদ রেখে গেছে।"

"তার মানে ?"

"ওপরে চল, সব খুলে বলছি।"

উপরের একটি ঘরে ঢুকিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "কপাটটা ভেজিয়ে দাও, খিলই দিয়ে দাও। তোমাকে আজ আমার জীবনের এমন অনেক কথা বলব যা আর কাউকে বলিনি কখনও। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি তো ?"

"নিশ্চয়।"

"তবে শোন।"

বিধুভূষণ অকপটে নিজের জীবনের সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলেন। কিছুই গোপন করিলেন না। কাহিনী শেষ হইলে বলিলেন, "এইবার আমি ভদ্রভাবে থাকতে চাই, ভাই। তুমি একটু সাহায্য কর আমাকে। তোমার শালীর মেয়েকেই আমি বিয়ে করব, অবশ্য সব কথা শোনার পর তোমার যদি বিয়ে দিতে আপত্তি না থাকে।"

ভূপেশ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। বিধুর এই কথায় তাঁহার চমক ভাঙিল। বলিলেন, "না আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কথাটা পাকাপাকি হবার আগে তোমারও একটা কথা জানা দরকার।"

"কি বল।"

"সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা।"

বিধুভূষণ ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তা হোক। আমার মা-ও কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। কুন্তীও হয়েছিল। আমি ছেলেবেলায় বড় কষ্ট পেয়েছি ভাই। আমাকে কেউ ছুঁতো না, পাঁটা বলে ডাকত সবাই। সুলোচনার সন্তান দুঃখ পাবে না আমার কাছে। ছেলেবেলায় ভালবাসা না পাওয়ার যে কি দুঃখ তা মর্মে মর্মে আমি জানি। সুলোচনার ছেলেকে বুকে করে মানুষ করব আমি—আমাকে তুমি বিশ্বাস কর—"

ভূপেশ হাসিয়া বলিলেন—"বেশ।"

গল্প গুচ্ছ

অনুগামিনী

উৎসর্গ

স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী

বন্ধুবর শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

হীরের টুকরো

অশীতিপর বৃদ্ধ বিমল ডাক্তারের কাছে সেদিন যে রোগীটি আসিয়া হাজির হইলেন তিনিও খুব বৃদ্ধ। যে যুবকটি রোগীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনিই প্রথমে ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ করিলেন।

বলিলেন, "আমার ঠাকুরদাকে একবার দেখতে হবে ডাক্তারবাবু। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি—"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। অনেকদিন থেকেই ওঁর মাথা খারাপ। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই আপনার কাছে এনেছি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?"

"কোলকাতা থেকে।"

"কোলকাতা থেকে ? সেখানে কত বড বড় ডাক্তার আছেন, তাঁদের ছেড়ে আপনি পাড়াগাঁয়ে আমার কাছে এসেছেন, আশ্চর্য তো !"

যুবক একটু অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আসল কারণটা ব্যক্ত করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। ডাক্তারের গুণের জন্য নয় 'বিমল' এই নামটার জন্যই যে তিনি ঠাকুরদাকে তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন এ কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। অথচ যে ডাক্তারের নাম 'বিমল' নয় তাহার কাছে ঠাকুরদা কিছুতেই যাইতে চান না। প্রথমেই গিয়া জিজ্ঞাসা করেন 'আপনার নামটি কি'। নাম বিমল না হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসেন। মানসিক ব্যাধিতে যশস্বী দুই একজন ডাক্তারের সহিত তিনি ষড়যন্ত্রও করিয়াছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নাম 'বিমল', রোগীর হিতার্থে তাঁহারা মিথ্যা-ভাষণ করিতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু কোন ফল হইল না। ঠাকুরদা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াই উঠিয়া আসিলেন, তাঁহাদের ঔষধ স্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না। একজন জোর করিয়া একটা ইনজেকসন দিয়াছিলেন, তাহাতে খানিকক্ষণ ঘুম হইয়াছিল, আর কিছু হয় নাই। মুখ দিয়া কোনও ঔষধ ঠাকুরদাকে খাওয়ানো যায় না। তিনি বলেন, 'আমার কোনো অসুখ নেই, ওষুধ খাব কেন ? আসল বিমলের সঙ্গে দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অথচ তিনি সমস্ত রাত ঘুমান না। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নাই, অনেক সাধ্যসাধনা করিলে সামান্য কিছু খান। নিজের মনেই কাঁদেন, হাসেন। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছে। সকালকে বলেন সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বলেন সকাল। তারিখ, বার কিছুই মনে থাকে না। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন কোনও বিমল ডাক্তারের সহিতই ইঁহার রোগের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহার সহিত দেখা হইয়া গেলেই অসুখ সারিয়া যাইবার

সম্ভাবনা। তাই কোনও বিমল ডাক্তারের খবর পাইলেই সেখানে ঠাকুরদাকে লইয়া যান। বিমল নাম শুনিলে ঠাকুরদাও আগ্রহ দেখান।

বিস্মিত বিমলবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় আপনার ঠাকুরদা ?"

"বাইরে গাড়িতে বসে আছেন।"

"নিয়ে আসুক তাঁকে। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। আপনার কাছ থেকে ওঁর হিস্ট্রিটা জেনে নি একটু, উনি হয়তো কিছু বলবেন না। আপনি চেয়ারটায় ভাল করে বসুন—"

যুবকটি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আমিও বিশেষ কিছু জানি না। ঠাকুরদা বরাবরই বিদেশে বিদেশে ঘুরতেন, আমি বোর্ডিংএ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতাম।"

"আপনার বাবা কোথায় ?"

"আমি শিশুবয়সেই পিতৃমাতৃহীন। নিকট-আত্মীয় বিশেষ কেউ নেই। ঠাকুরদার কাছেই আমি সাত বছর পর্যন্ত ছিলাম। তারপর উনি আমাকে বোর্ডিংএ দিয়ে দেন।"

"বোর্ডিংএর খরচ আপনার ঠাকুরদাদাই দিতেন ?"

"হ্যাঁ। উনি ছাড়া আর তো কেউ নেই আমার।"

"কি করতেন উনি, চাকরি ?"

"না, উনি চিত্রকর। ছবিবিক্রির টাকা থেকেই আমাদের সংসার চলত। বছর-খানেক থেকে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ছবি আঁকেন না আর।"

"এখন কি করে সংসার চলে ?"

"আমি রোজগার করি কিছু।"

"কি করেন ?"

"প্রফেসারি।"

যুবকটির কুণ্ঠিতমুখের দিকে চাহিয়া বিমল ডাক্তারের হৃদয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইল। ছেলেটি বিদ্বান, অথচ বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ নাই।

"আপনার ঠাকুরদার পাগলামিটা কি ধরনের বলুন তো, কি করেন—"

"নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। রাত্রে ঘুমোন না। আপনমনে বিড়বিড় করে কি বলেন সর্বদা—"

"কি বলেন, শুনেছেন কিছু কখনও ?"

"একটি কথাই বার বার বলেন। 'এ ভার আমি আর বইতে পারছি না—এ ভার আমি আর বইতে পারছি না'। বলতে বলতে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন।"

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

"ওঁর পাগলামিতে আর কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন কি ?"

যুবকটি এইবার একটু মুশকিলে পড়িলেন। সত্যকথাটা বলিলে ডাক্তারবাবু মনে

আঘাত পাইবেন কি ? অথচ না বলিলে রোগের সূত্রটা হয়তো তিনি ধরিতে পারিবেন না, অবশ্য উহাই যদি রোগের সূত্র হয়। একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সব কথা খুলিয়া বলাটাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন।

"করেছি। মনে হয় উনি কোন বিমল ডাক্তারকে খুঁজছেন। ডাক্তারের নাম বিমল না হলে সেখানে যেতেই চান না। আপনার কাছে বিশেষ করে এসেছি সেইজন্তেই —"

"ও। আপনার ঠাকুরদার নামটি কি ?"

"নিরঞ্জন সেন।"

"আপনার নামটি ?"

"বিকাশ।"

"আচ্ছা, আপনার ঠাকুরদাকে নিয়ে আসুন এবার।"

বিকাশবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরে বৃদ্ধ শিল্পী নিরঞ্জন সেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিমলবাবু দেখিলেন নিরঞ্জন সেনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একমুখ পাকা গোঁফদাড়ি, মস্তক কেশবিরল। যে কয়গাছি চুল আছে তাহাও পাকা, অবিন্যস্ত এবং তৈলহীন। মুখে জরার চিহ্ন। কপালে, চোখের কোণে বলি-রেখা, গালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের দৃষ্টিই কেবল এখনও বেশ তীক্ষ্ণ আছে। অতীতের সাক্ষী কেবল ওই দৃষ্টিটুকু। বিমলবাবু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে যৌবনের বন্ধু নিরঞ্জনকে তিনি চিনিতে পারিতেন না। নিরঞ্জনকে দেখিয়া মনে মনে তিনি একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধারণা ছিল নিরঞ্জন মারা গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রমাণ সে এতদিন দেয় নাই। দিবার সুযোগও অবশ্য ছিল না। লখ্‌নৌ হইতে চলিয়া আসিবার সময় বিমল ডাক্তার কোনও ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া আসেন নাই। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটিবার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি লখ্‌নৌ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। পঞ্চাশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে নিরঞ্জন আসিয়া হাজির হইয়াছে কি মনে করিয়া! চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে।

বিমল ডাক্তার নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনও নির্নিমেষে বিমলকে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘাড় ফিরাইয়া বিকাশকে বলিলেন—"তুমি বাইরে গিয়ে বোসো। এঁর সঙ্গে আমার গোপনীয় কিছু কথা আছে—।"

বিকাশ ইহা প্রত্যাশাই করিতেছিলেন, প্রতিবারই ঠাকুরদা এ কথা বলেন। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

।। দুই ।।

আরও কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনই কথা কহিলেন প্রথমে।

"বিমল আমাকে চিনতে পারছ?"

"পারবার কথা নয়, কিন্তু পেরেছি। ছিলে কোথায় এতদিন?"

"ছিলাম না কোথায় তাই বরং জিগ্যেস কর। আমি সারাজীবন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। লছমী বেঁচে আছে?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমল ডাক্তার বলিলেন, "আছে।"

"তার যে ছবিটা এঁকেছিলাম সেটা কি আছে তোমার কাছে?"

"আছে।"

"একবার দেখাও তো—"

"সেটা ভিতরে টাঙানো আছে। ছবিটা দেখতে চাইছ কেন, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"না। তোমার চেহারা এত বদলে গেছে যে তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না। ছবিটাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি সেই বিমল। বহু বিমল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে তুমি সেই বিমল।"

"বেশ, একটু বোসো তা হলে।"

বিমল ডাক্তার উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ফিরিলেন প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। সঙ্গে একটি বালক ভৃত্য প্রকাণ্ড একখানা ছবি বহন করিয়া আনিল। একটি নর্তকী নাচিতেছে। অপূর্ব ছবি। নিরঞ্জন সেন বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার অতীত কীর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার আর সন্দেহ নেই। ছবিটা নিয়ে যেতে পার।"

বালক ভৃত্য ছবিটা লইয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন প্রশ্ন করিলেন—"লছমী কি আমার সঙ্গে দেখা করবে? তাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই। কথাটা খুবই মর্মান্তিক, তবু তার জানা উচিত।"

"কি কথা?"

"তার ছেলে আর বেঁচে নেই। তাকে আমি বড় করে তুলেছিলাম, লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, বিয়ে দিয়েছিলাম, তার একটি ছেলেও হয়েছিল, কিন্তু বিধাতার এমনি অভিশাপ, প্লেগে ছেলে, বউ দু-জনেই মারা গেল, বেঁচে রইল শুধু শিশুটা। তাকেও আমি মানুষ করে তুলেছি। কিন্তু আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, তার জিনিস তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমার আর একটা আতঙ্কও হয়েছে, আমার

বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে আমি অভিশপ্ত। লছমীকে পাই নি, লছমী নিজেই আমার কাছে থাকতে চায় নি। সে তোমাকে বিয়ে করেছিল, তাই বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে। আমার কাছে থাকলে মরে যেত। ছেলেটাকেও তোমরা যদি নিয়ে নিতে হয়ত সে বেঁচে থাকত—"

নিরঞ্জন সেন রুদ্ধবাক হয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার চোখ হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি বিমল ডাক্তারের হাতদুটি চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বিকাশ তোমাদের কাছেই থাকুক। লছমীকে বল তুমি, তুমি বললেই সে রাজী হবে—"

"সেই বিকাশই কি তোমার সঙ্গে এসেছে?"

"হ্যাঁ। খুব ভাল ছেলে, হীরের টুকরো—"

"ও কি সব কথা জানে?"

"না। কিন্তু ওকে আমি বলব সব। তার আগে লছমীর মত চাই, তোমারও মত চাই।'

বিমল ডাক্তার মাথায় হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন চলছে চলুক না। ও সব ঘাঁটিয়ে আর লাভ কি—'

"না, আমি আর পারছি না। যার জিনিস তার কাছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। ওর ঠাকুরমার কাছেই ও বেঁচে থাকবে, আমার কাছে থাকলে বাঁচবে না। আমি অভিশপ্ত, অভিশপ্ত. অভিশপ্ত—"

নিরঞ্জন সেন চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখদুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। বিমল ডাক্তার ভয় পাইয়া গেলেন।

"বেশ, তাই হবে। বিকাশ আমাদের কাছেই থাকবে। কিন্তু লছমীকে এত বড় মর্মান্তিক খবরটা তো চট করে দেওয়া যাবে না, সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। সে আমি বলব এখন। যদিও ছেলের সঙ্গে ওর বহুকাল ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবু ছেলে তো, তার মৃত্যুসংবাদটা হঠাৎ এভাবে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের আর কোনও সন্তান হয় নি, ও হয়তো আশা করে আছে যে ওর ছেলে একদিন ফিরে আসবে—"

"তুমি বলবে তাকে? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?"

"দিচ্ছি।"

"কতদিনের মধ্যে বলবে?"

"এই ধর মাসখানেক।"

"মাসখানেক পরে তা হলে আমি বিকাশকে বলতে পারি?"

"বেশ, বোলো।"

নিরঞ্জন সেন সোৎসুকদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত বিমল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"লছমীর সঙ্গে একবার দেখা হয় না? সে দেখা করবে কি, একবার বলে দেখ না।"

"বললে হয়তো দেখা করবে। কিন্তু এখন দেখা করাটা উচিত নয়। দেখা হলেই ছেলের কথা উঠবে—"

"তাকে একবার দেখতে খুবই ইচ্ছে করছে ভাই—"

"দূর থেকে দেখতে পার। এই জানলাটা খুলে দিচ্ছি, ভিতরের দিকে বারান্দায় বসে আছে সে। ভালোভাবেই দেখতে পাবে এখান থেকে—"

বিমল ডাক্তার পিছনের দিকের একটি জানলা খুলিয়া দিলেন। নিরঞ্জন দেখিলেন বারান্দায় একটি বৃদ্ধা বসিয়া বই পড়িতেছে। মাথার চুল সাদা, মুখে জরার চিহ্ন, চোখে চশমা।

"ওই লছমী!"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য বদলে গেছে।"

"তুমিও বদলেছ, আমিও বদলেছি।"

নিরঞ্জন সেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

॥ তিন ॥

ঠিক একমাস পরে বিকাশ একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন নিরঞ্জন সেন গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। টেবিলের উপর নিম্নলিখিত পত্রটি রহিয়াছে।

ভাই বিকাশ,

আমি চললাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এই ব্যর্থ জীবন বহন করবার আর কোনো সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। যাবার আগে একটি কথা তোমাকে বলে যেতে চাই। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অনেক কবিতা, অনেক উপন্যাস পড়েছ, তাই আশা করছি আমার প্রথম যৌবনের উন্মাদনাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে। ঘটনাটা সত্যিই গল্পের মতো। প্রথম যৌবনে লখ্‌নৌ শহরে আমি লছমী নামে একটি নর্তকীকে ভালোবেসেছিলাম। তার সঙ্গে একঘরে বাস করেছিলাম, তার গর্ভে আমার একটি ছেলেও হয়েছিল। লছমীর সুন্দর ছবিও এঁকেছিলাম একটি। ভেবেছিলাম তাকে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ে তুলব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। তার এক ডাক্তার প্রণয়ী জুটল। প্রণয় শেষে এমন গাঢ় হল যে লছমী অবশেষে আমাকে বলল—আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না। আমি ঠিক করেছি বিমলবাবুকে বিয়ে করব। বললাম—সে কি, তোমার ছেলে হয়েছে—! লছমী হেসে উত্তর দিলে, তোমার ছেলে তুমি রাখতে পার, আমি কিন্তু বিমলবাবুকেই বিয়ে করব। জিজ্ঞাসা করলাম, বিমলবাবু

বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন ? তারপর একটু হেসে বললে, পরশুদিন রেজিষ্ট্রি করে আমাদের বিয়ে হয়েও গেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, সত্যিই আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। তার পরদিনই লছমী কাউকে কিছু না বলে নিজের ছেলেকে ফেলে রেখে আমাকে ছেড়ে চলে গেল বিমলের সঙ্গে। বিমল ডাক্তার ছোট একটি চিঠি লিখে গিয়েছিল—'স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তোমার আঁকা লছমীর ছবিটি নিয়ে যাচ্ছি। রাগ কোরো না, বন্ধু'। সত্যিই বিমল ডাক্তার আমার বন্ধুই ছিল। তার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। লছমীর উপর আমার কিন্তু রাগ হল না। মনে হল ওরা উর্বশীর জাত, কোথাও কোনো কারণেই বাঁধা পড়ে না কখনও। নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে ছেলেটিকেই মানুষ করে তুলতে লাগলাম। সে বড় হল, লেখাপড়া শিখল, তার বিয়ে দিলাম, ছেলেও হল একটি। আবার পড়ল অভিশাপের বজ্র। প্লেগ এপিডেমিকে আমার ছেলে, বউ মারা গেল, বেঁচে রইল কেবল তাদের শিশুসন্তানটি, মানে তুমি। তোমাকেও আবার মানুষ করে তুলেছি. কি করে তা সম্ভব হয়েছে, কি ভাবে টাকা রোজগার করে তোমার পড়ার খরচ যুগিয়েছি তা তুমি জান না, তা তোমার জানবার দরকারও নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, শুধু ছবি এঁকে তা হয় নি। এদেশে তা হয় না। এখন আমার ভয় পাছে আমার ছোঁয়াচ লেগে তোমার আবার কিছু হয়। আমার জীবন অভিশপ্ত, আমার কাছে কেউ থাকবে না, তাই ঠিক করলাম লছমীকে খুঁজে বার করব। যদি বার করতে পারি তাকে সব কথা বলে তার হাতে তোমাকে সমর্পণ করে সরে পড়ব। এতদিন সব দায়িত্ব আমি একাই বহন করেছি, এবার সেও করুক খানিকটা। এ দাবি করবার অধিকার আমার আছে। তাই বিমল ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন তার দেখা পেয়েছি। তাকে সব খুলে বলেছি। সে রাজী হয়েছে। এইবার তুমি তোমার ঠাকুরমার কাছে ফিরে যাও। বাস্, আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি চললাম ! আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও, যে আদর্শে তোমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি তা যেন তোমার জীবনকে মহিমান্বিত করে। ইতি

তোমার দাদু।

। চার ।

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ের পথে একটি বৃদ্ধাকে স্কন্ধে লইয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিতেছেন। সম্মুখে চড়াই, তাহার পরই একটি চটি। সময়মতো চটিতে পৌছিতে না পারিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যদিও ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হইতেছিল তবু সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি ক্ষণকালের নিমিত্তও শ্লথগতি হন নাই।

নাতি ঠাকুরমাকে কেদার-বদরী দর্শন করাইতে লইয়া চলিয়াছে। ডানডিতে লইয়া যাইবার মতো সঙ্গতি নাই, ঠাকুরমারও হাঁটিবার শক্তি নাই, অগত্যা তাই কাঁধে করিয়া লইতে হইয়াছে। যথাসময়ে তাহারা চটিতে পৌঁছিয়া গেল। পরদিন ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রা শুরু হইবে। সামনে আর একটা নাকি চড়াই আছে। আহারাদির পর যে যেখানে স্থান পাইল শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধা ও তাঁহার নাতিও একবার শয়ন করিলেন।

…গভীর রাত্রি। বাহিরে শনশন করিয়া হাওয়া বহিতেছে, চটির সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমান নাই কেবল বৃদ্ধা। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার নাতিকে ডাকিলেন।

"বিকাশ, ঘুমুচ্ছ না কি?"

"কি হয়েছে?"

বিকাশ ধড়মড় করিয়া উঠিযা বসিল।

"কিছু হয় নি। তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই আজ। অনেকদিন থেকেই বলব ভাবছি, উনি বলতে মানা করেছিলেন বলেই এতদিন বলি নি। আজ উনি নেই, তোমার ঠাকুরদাও নেই, আমি কেদার-বদরী দর্শন করতে যাচ্ছি তোমার কাঁধে চড়ে, আমার মন কিন্তু বলছে কথাটা তোমাকে না বললে আমার তীর্থদর্শনের পুণ্য হবে না—"

"কি কথা?"

"আমি তোমার ঠাকুরমা বলেই তো তুমি এত কষ্ট সহ্য করে আমাকে কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ—"

"নিশ্চয়ই। এটা আমার কর্তব্য।"

"কিন্তু আমি তোমার ঠাকুরমা নই।"

"তার মানে?"

"আমি লছমী নই, আমার নাম দুর্গা। লছমী ওঁর কাছেও বেশীদিন থাকে নি, ছ-মাস পরেই পালিয়েছিল। তারপর উনি আমাকে বিয়ে করেন। তোমার ঠাকুরদা যখন ওঁর কাছে এসেছিলেন তখন সত্যিকথাটা উনি তাঁকে বলেন নি। ভেবেছিলেন মিথ্যাকথা বললে হয়তো উনি সান্ত্বনা পাবেন। হয়তো ওঁর পাগলামি সেরে যাবে। তারপর ঠাকুরমা বলে তুমি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালে তখন আমার অন্ধকার ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। তখন প্রাণ ধরে আমি বলতে পারলাম না তুমি আমার কেউ নও। তারপর দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল। উনিও চলে গেলেন, আমার ছেলে-মেয়ে হয় নি, তুমিই আমার আশ্রয়, নির্ভর, সব। আমাকে কাঁধে করে তুমিই কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু কেবলই আমার মনে হচ্ছে সত্যিকথাটা তোমাকে বলা উচিত। সত্যিকথা শুনে তুমি আমাকে যদি এখানে ফেলে রেখেও চলে যাও তা-ও বরং আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু মিথ্যার বোঝা বুকে লুকিয়ে রেখে আমি কেদার-বদরী যেতে পারব না, গেলে পাপ হবে, পুণ্য হবে না।"

বিকাশ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার গোড়ার কথা মনে পড়িল। ঠাকুরমার অতীত জীবনকে ঘিরিয়া যে রূপকথা-লোক তিনি মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাও চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু তিনি একটি কথা বলিলেন না।

"এ কথা শোনার পর আমাকে কাল নিয়ে যাবি তো?"—বৃদ্ধা প্রশ্ন করিলেন।

"নিশ্চয়, তুমিই আমার ঠাকুরমা। ঘুমিয়ে পড়, খুব ভোরে উঠতে হবে কাল। সামনেই চড়াই আছে—"

।পাঁচ।

বিকাশের সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। আলোর আভাস দেখা যেতেই তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উষার অরুণরাগে পূর্বাকাশ রঞ্জিত। মেঘে মেঘে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে স্বপ্নলোক মূর্ত হইয়াছে; সহসা বিকাশের মনে হইল ওই তো আমার ঠাকুরমা। তিনিও তো উষার মতো চঞ্চলা, অবগুণ্ঠনা ছিলেন··।

তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"দাদু, দাদু, বিকাশ, কোথা গেলি দাদু—"

বৃদ্ধা ঘরের ভিতর হইতে আতঙ্কিতকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল বিকাশ বুঝি তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

"এই যে ঠাকুরমা, যাচ্ছি, এবার ওঠ। বেরুতে হবে এক্ষুনি।

একটু পরেই দেখা গেল বিকাশ বৃদ্ধাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চড়াই ভাঙিতেছেন। আকাশে উষা নাই, চতুর্দিকে কেবল পাহাড়···।

সবিলা

জনৈক খবরের কাগজের রিপোর্টার তাসের আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে যে মেয়েটিকে কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, সে-মেয়ে যে রাজকন্যা, তা বেচারা বুঝতে পারে নি। সুতরাং তার সঙ্গে প্রেম করতেও ইতস্ততঃ করে নি। প্রেম যখন জমে উঠল, তখন হঠাৎ জানা গেল ওই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটির আসল পরিচয়। এতে উক্ত সাংবাদিক যুবকটির মনের অবস্থা যা হল তা বর্ণনীয় নয়, অনুমেয়। বিখ্যাত একটি বিদেশী চলচ্চিত্রে এর শিল্পায়িত অভিব্যক্তি অনেকেই আপনারা দেখেছেন।

সবিলার জীবনেও এইরকম একটি কাণ্ড ঘটেছিল। সবিলা সাংবাদিক নয়, সহিস। সিকিমের একপ্রান্তে তার বাড়ি। সিকিমের রাজার অশ্বশালার সে একজন পরিচারক-মাত্র। কিন্তু তবু সে অসামান্য ব্যক্তি, ধর্মের জ্যোতিতে তার মনপ্রাণ পরিপূর্ণ। সে মুসলমান, তার আকাঙ্ক্ষা, বাড়ির পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করাবে। আয় অল্প, কিন্তু তার থেকেই সে একটু একটু করে টাকা জমিয়েছে অনেকদিন ধরে। জমিও সংগ্রহ হয়েছে একটু একটু, চাঁদাও সংগ্রহ করেছে কিছু-কিছু। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মসজিদ-নির্মাণ অল্প টাকায় হবে না, অনেক টাকা চাই। প্রায় দশ বৎসর ধরে চেষ্টা করে মসজিদের ভিত্তিপত্তন করতে পেরেছে সে। তারজন্যেই মালমশলা, ইঁট, সিমেন্ট সংগ্রহ করতে জিব বেরিয়ে পড়েছে তার। ঋণ হয়ে গেছে কিছু। তবু সে হাল ছাড়ে নি। আবার একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিল, এমন সময় এই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটল। কোট-প্যাণ্ট-পরা একটি সাহেব এসে হাজির হলেন তার কাছে। খাঁটি সাহেব নয়, দেশী সাহেব। চমৎকার লোক কিন্তু। খাসা উর্দুতে বললেন, "আমি পায়ে হেঁটে এই অঞ্চলটা বেড়িয়ে দেখতে চাই, দশ-বারো দিনের মত থাকবার জায়গা কি পাওয়া যাবে কোথাও?'

"এখানে তো হোটেল বা সরাই নেই সাহেব। এ-অঞ্চলে আমরা দশ-বারো ঘর সহিস আছি কেবল। সবাই মুসলমান। আমার গরীবখানায় থাকতে হুজুরের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনার খিদমত করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

সাহেব বললেন, "ও, তুমি মুসলমান বুঝি? যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার গরিবখানাই যে আমার মত মুশাফিরের পক্ষে দৌলতখানা ভাই। তুমি মুসলমান, কত বড় সংস্কৃতির বাহক তুমি—"

পর পর দু-তিনটে উর্দু বয়েত আওড়ালেন, কোরানের কথা বললেন। মুগ্ধ হয়ে গেল সবিলা।

সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন সাহেব। সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসতেন, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। সবিলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল তাঁর। চাচা-সাহেব বলে ডাকতে লাগল তাঁকে তারা।

একদিন পাশের জমিতে মসজিদের অর্ধ-সমাপ্ত ভিত্তিটা চোখে পড়ল তাঁর।

"ওটা কী সবিলা? নূতন বাড়ি করছ?"

একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সবিলা।

"ওটা আমার পাগলামি হুজুর। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার চেষ্টা—"

"কী ব্যাপার বল তো খুলে।"

কুণ্ঠিতমুখে চুপ করে রইল সবিলা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "হুজুর, আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা, একটি মসজিদ তৈরি করব। অনেকে আমার কথা শুনে হাসে, ঠাট্টা করে, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করছি—"

সাহেব বললেন, "দেখ সবিলা, এতদিন তোমাকে আমি আমার মতই সাধারণ মানুষ মনে করতাম। এখন দেখছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। তোমার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এতদিন বুঝতে পারি নি, দেখতে পাই নি। তোমাকে আমি শ্রদ্ধাভরে সেলাম করছি। একটা কথা তুমিও বুঝতে পার নি সবিলা, তোমার মসজিদও তৈরি হয়ে গেছে, তার মিনারও আকাশ স্পর্শ করেছে। স্থান পেয়েছে সূর্যতারার সভায়—"

সবিলা অভিভূত হয়ে শুনছিল, সাহেব থামতেই সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে? এ কী বলছেন আপনি, হুজুর—! কিছুই হয় নি, দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হয়ে গেছে। যে-মুহূর্তে তুমি সঙ্কল্প করেছ সেই মুহূর্তেই তা হয়ে গেছে। তোমার মতো পুণ্যাত্মার সঙ্কল্প পূর্ণ হতে দেরি হয় না। ইঁট, সিমেণ্ট, চুন-সুরকি যোগাড় করতে হযতো দেরি হচ্ছে, কিন্তু তা-ও হয়ে যাবে। টাকা কী করে যোগাড় করছ তুমি?"

"নিজে কিছু কিছু জমাচ্ছি। চাঁদাও পেয়েছি কারো কারো কাছ থেকে। কিন্তু এখানে তো লোকজন বেশী নেই, যারা আছে তারাও গরিব—"

"বেশ, আমি তোমাকে কিছু চাঁদা দিচ্ছি।"

সাহেব নগদ দশ টাকা দিলেন তাকে। আর একটি ইংরেজীতে ঠিকানা-লেখা কার্ড দিয়ে বললেন, "তুমি যদি কখনও কলকাতায় যাও, এই ঠিকানায় আমার খোঁজ কোরো। আমি তোমাকে আরও চাঁদা যোগাড় করে দেব!"

তার পরদিনই নেমে এলেন সাহেব পাহাড় থেকে।

॥ দুই ॥

তারপর তিন বৎসর কেটে গেছে।

কলকাতা শহরে প্রকাণ্ড একটি বাড়ির বাইরের ঘরে বহু রোগীর ভিড়ে সংকুচিত হয়ে বসে আছে সবিলা। প্রায় ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হল। সব রোগী দেখা শেষ করে বেরিয়ে এলেন ডাক্তারসাহেব। সবিলা তখনও এককোণে বসে ছিল। চোখাচোখি হল দুজনে। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ডাক্তারসাহেব। হাত বাড়িয়ে উর্দুতে বললেন, "আরে সবিলা সাহেব যে! কী খবর!..."

সবিলা কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, আমার মসজিদের জন্যে কিছু চাঁদা যোগাড় করে দেবেন।"

"নিশ্চয় দেব। ভিতরে এস!"

সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

"একটু চা খাও, নাস্তা কর। তারপর আমি তোমাকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেই চিঠি নিয়ে তুমি চলে যাও। যাঁর নামে চিঠি দেব তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

॥ তিন ॥

তার পরদিন আবার এল সবিলা।

ডাক্তারসাহেব জিগ্যেস করলেন, "কী হল?"

"টাকা পেয়েছি।"

"কত টাকা?"

"প্রায় তিন হাজার টাকা।"

"ওতে তোমার মসজিদ হয়ে যাবে তো?"

"হয়ে যাবে। আদাব।"

এত টাকা পেয়েও সবিলা কিন্তু ততটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারল না যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল।

সে আবিষ্কার করেছিল যে, ডাক্তারসাহেব মুসলমান নন, হিন্দু।

অপ্রতিভমুখে আদাব করে চলে গেল সে।

অতিদূর ভবিষ্যতে

যে গল্পটি লিখিতেছি, তাহার পরিবেশ বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ। অনতিদূর ভবিষ্যৎ নহে, অতিদূর ভবিষ্যৎ। সে যুগে মানুষের প্রতিপত্তি নাই, জন্তুজানোয়ারদেরই বাড়বাড়ন্ত। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। মানুষই একদা বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া জানোয়ারদের সভ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সে চেষ্টা মর্মান্তিকরূপে সফল হইয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষিত, সভ্য জানোয়ারদের কবলে পড়িয়া বহু নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন। হস্তীরা যখন রাজা হইয়াছিল তখন তাহারা আইন করিয়াছিল যে মানুষ দেখিলেই তাহাকে শুঁড়ে জাপটাইয়া তুলিয়া আছাড় দিতে হইবে। সিংহ-ব্যাঘ্রদের আমলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়! বোলতা-ভীমরুলগণ সম্মিলিতভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিল। সে সময় প্রতিটি মানুষের চেহারা এত বীভৎস হইয়াছিল যে চেনা যাইত না। যে যন্ত্রণা তাহারা ভোগ করিয়াছিল তাহা জনৈক মানব-কবি একটি কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাব্য রাজদ্রোহসূচক বলিয়া ভস্মীভূত করা হয়, কবিকেও লক্ষ লক্ষ বোলতা এবং ভীমরুলের হুলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এই-ভাবে বারম্বার আক্রান্ত হইয়া মানুষেরা ক্রমশঃ সংখ্যায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহারা জানোয়ারদের অধীনে থাকিয়া জানোয়ারদের নির্দেশ মানিয়া কোনক্রমে জীবনযাপন করিতেছে।

যখনকার কথা লিখিতেছি তখন গর্দভ-সম্প্রদায়ের রাজত্ব। ঘোড়ারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাচন-যুদ্ধ আসন্ন। কী হয় বলা যায় না।

সে যুগের জনৈক মানব-লেখক একটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। ই-যন্ত্রের অর্থ ইচ্ছাশক্তি-যন্ত্র। আণবিক যুগ অতীতের পর্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। মনোময় যুগ চলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে কোনও মানুষের ইচ্ছা ই-যন্ত্রযোগে অপরের মনে সঞ্চালিত হইয়া অঘটন ঘটাইতেছে। এমন কি যাহারা কুরূপ, তাহারা সুরূপ হইতেছে, বামনগণ দৈত্যে পরিণত হইয়াছে। জন্তুজানোয়ারদের চেহারাও মনুষ্যাকৃতিলাভ করিয়াছে। ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই ইচ্ছানুরূপ ফল ফলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিশালী মানব ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা কিন্তু এই যন্ত্রে সুফল ফলে না। তাই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবদের এখনও কিছু আধিপত্য আছে!

যে লেখকটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়াছিলেন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল। তিনি যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া দূরবাসিনী কোনও তরুণীর অনমনীয়তাকে নমনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন

এমন সময় গর্দভ-রাজ্যের প্রচার-সচিব আসিয়া প্রবেশ করিলেন

'ও মশাই, একটা মুশকিল হয়েছে। জানেন তো, ঘোড়াদের প্রজাবৃদ্ধি হলেই আমরা ভোটে হেরে যাব। তাই আমরা সমস্ত পুরুষ-ঘোড়াগুলিকে বন্দী করে রেখেছিলাম। খবর পেলাম, কয়েকটি পুরুষ-ঘোড়া বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে। চর এসে খবর দিলে যে তারা কতকগুলি তরুণী-ঘোটকীর সঙ্গে মিলিতও হয়েছে। শুনছি, শ' দুই ঘোটকী গর্ভবতী। আপনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন, যেন একটি ঘোটকীও সন্তানপ্রসব করতে না পারে।'

'যে আজ্ঞে।'

তটস্থ লেখক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যাহা সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। গর্দভ-রাজ্যে উক্ত লেখকটি প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তিবলে সমস্ত ঘোটকীগুলি নাকি ডিম্বপ্রসব করিয়াছিল, একটিও বাচ্চা হয় নাই।

উচিত-অনুচিত

যাহা চিরকাল ঘটে, তাহাই ঘটিতেছিল।

মিত্তিরদের বাড়ির শফরী বসুদের বাড়ির ক্যাবলার সহিত এমন মাখামাখি আরম্ভ করিয়াছিল যে শহরসুদ্ধ সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। সেকাল হইলে শফরীর পিতা কুঞ্জনাথকে একঘরে করিয়া ইহার প্রতিকার করা চলিত। কিন্তু কালের চাকা ঘুরিয়াছে, এখন ফুসফুস, গুজগুজ করা ছাড়া অন্য কিছু করিবার উপায় নাই।

সকালে দেখা যায়, শফরী ও অশোক (ক্যাবলার ভালো নাম) শহরের বাহিরে যে মাঠটা আছে, সেখানে গিয়া সাইকেল চড়া প্র্যাকটিশ করে। অশোক শেখায়, শফরী শেখে।

দুপুরে আহারাদির পর অশোক শফরীদের বাড়িতে যায়। সেখানে প্রায় বেলা পাঁচটা পর্যন্ত তাসখেলা চলে। শফরীর মা এবং বিধবা পিসীমাও খেলায় যোগদান করেন। পান ও দোক্তার শ্রাদ্ধ হয়। অশোক মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখায়, তাসের ম্যাজিক। দুপুরটা বেশ আনন্দে কাটে। শফরীর পিতা কুঞ্জনাথ মিত্র ক্যাবলার পিতা হরগোবিন্দ বসুর বাল্যবন্ধু। সুতরাং এ মেলামেশায় কেহই দোষের কিছু দেখেন না। শফরী ঘরের মেয়ে, ক্যাবলাও ঘরের ছেলে। উভয়েরই পিতামাতার ধারণা, তাঁহাদের পুত্রকন্যা কুসুমের মতো নির্দোষ।

তাসখেলা শেষ করিয়া অশোক শফরীকে লইয়া সিনেমায় যায়। সন্ধ্যাবেলা প্রায় সিনেমাতেই কাটে। রাত্রে তাহারা কোথায় থাকে, কী করে, তাহা কেহ জানে না। নেপথ্যে ফুসফুস, গুজগুজ হইতে থাকে।

আমি তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। আমাদের মহলেও অর্থাৎ উচ্চপদস্থ হাকিমমহলেও ইহা লইয়া সরস আলোচনা চলিত। কুঞ্জবাবু আমার আপিসে কাজ করিতেন আর হরগোবিন্দবাবু করিতেন আবগারি বিভাগে। একজন বিহারী অফিসার একদিন কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আজকালকার মেয়েরা যেরূপ দ্রুতবেগে প্রগতির পথে ধাবিত হইতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে প্রাদেশিকতা জিনিসটা আপনিই উঠিয়া যাইবে। বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

আমার খুব খারাপ লাগিল। কয়েকদিন পরে আমি আমার একজন সাব-ডেপুটিকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম, "অশোকের সঙ্গে শফরীর বিয়ে তো অনায়াসে হতে পারে। ওরা পালটি ঘর। আপনি একটু ঘটকালি করুন না।"

"আচ্ছা, স্যর।"

দিনদশেক পরে নিত্যানন্দবাবু (সেই সাব-ডেপুটি) আসিয়া আমাকে খবর দিলেন।

বলিলেন, "বিয়ে হওয়া শক্ত। হরগোবিন্দবাবুকে আমি বলেছিলাম, তিনি বললেন, তাঁর ছেলের বিয়ে দেবার মালিক তিনি নন, তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্ত্রী যদি মত করেন, তিনি আপত্তি করবেন না। ওঁদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত আছে। আমার স্ত্রীকে বললুম, হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়তে। আমার স্ত্রী কথাটা পেড়েছিল কাল। হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রী কথাটা শুনে যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন, 'ওই বেহায়া মেয়ের সঙ্গে আমি আমার অমন ছেলের বিয়ে দেব, বলছেন কী আপনি! কত ভালো বংশের সুন্দরী মেয়ে সাধাসাধি করছে! ওই কী ক্যাবলার যোগ্য মেয়ে'।"

কুঞ্জবাবুর অভিমতটা কী তাহাও আমি জানিয়াছিলাম। কুঞ্জবাবুর ধারণা তাঁহার মেয়ের যেরকম রূপ, গুণ তাহাতে অনেক বড় ঘরে তাহার বিবাহ হইবে। সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, লেখাপড়া জানে, অনেক কিছু জানে। তা ছাড়া উহারা দুইজনে ভাই-বোনের মতো মানুষ হইয়াছে, উহাদের বিবাহটা বড়ই অশোভন হইবে।

কিছুদিন পরে যাহা অনিবার্য, তাহাই ঘটিল। শফরীকে লইয়া অশোক একদিন সরিয়া পড়িল। তাহার পর কী হইয়াছিল জানি না, কারণ আমিও বদলি হইয়া গেলাম।

॥ দুই ॥

তাহার পর পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার একটি নামজাদা প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সিনেমা দেখিতেছি। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। এ কী! এ যে সেই শফরী আর ক্যাবলা! তাহারাই নায়ক-নায়িকা। পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া চুম্বন করিতেছে। কী আর করিব, বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহারা বেশ ভালো অভিনয়ই করিতেছে। বলা বাহুল্য, এখন তাহাদের শফরী আর অশোক নাম নাই। চিত্র-জগতে নতুন নামে তাহাদের পরিচয়। সত্যই বেশ ভালো অভিনয় করিতেছে! আমার পিছনে যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারাও দেখিলাম উচ্ছ্বসিত।

"উঃ, কী চমৎকার অ্যাক্‌টিং করছে।"

"গুণ আছে, তা না হলে অত টাকা দিয়াছে। দশ হাজার করে। আরও কন্‌ট্রাক্‌ট পেয়েছে ..."

পিছনের সিটে এই জাতীয় আলোচনা চলিতেছিল। শফরী আর ক্যাবলা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে ইহাতে আনন্দিত হইলাম। মনে হইল, এই হওয়াই তো উচিত।

ইন্‌টারভাল হইল।

দেখিলাম, পিছনের সিটে বসিয়া আছেন কুঞ্জনাথ, হরগোবিন্দ এবং আরও দুইটি

প্রৌঢ়া মহিলা। সম্ভবতঃ কুঞ্জনাথ এবং হরগোবিন্দের স্ত্রী। সকলেরই মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কুঞ্জনাথ আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, নমস্কার করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

॥ তিন ॥

ইহার পর আরও পনেরো বৎসর কাটিয়াছে।

আমার কলিকাতার বাসায় একদিন সকালে শফরী আর ক্যাবলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে একটি মেয়ে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রঙ, তেমনি মুখ-চোখ।

শফরী প্রণাম করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই, চিনতে পারেন আমাদের?"

ক্যাবলাও প্রণাম করিল। মেয়েটিও করিল।

"শুনলাম আপনি কোলকাতাতেই আছেন। চিনতে পেরেছেন আমাদের?"

"তোমরা তো বিখ্যাত লোক, না চেনবার কি আছে?"

"এ মেয়েটি কে?"

"আমাদেরই মেয়ে। রুমা।"

"বাঃ, খাসা মেয়েটি। পড়াশোনা করছে তো?"

"এ বছর ম্যাট্রিক দেবে।"

"বাঃ…"

শফরী তাহার পর আসল কথাটি পাড়িল।

"আমরা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ছোটবয়সেই মেয়েটির বিয়ে দিতে চাই, যা দিনকাল পড়েছে। আপনার ছেলেটি তো এবার ডাক্তারি পাশ করেছে। আপনি আমাদের পালটি ঘরও। নিন না রুমাকে—"

বললাম, "আমার ছেলে এই সবে পাশ করেছে। আগে কিছু রোজগার করুক, সেট্‌ল্‌ড্‌ না হলে—"

শফরী বলিল, "যদি কিছু না মনে করেন, তা হলে একটা কথা বলতে চাই। বলব?"

"বল—"

"আমাদের ওই একটিমাত্র মেয়ে। ওকে এক লক্ষ টাকা দেব আমরা। আমাদের যে জামাই হবে, তার যাতে কোনও আর্থিক অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থা আমরা করব।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি—"

প্রণাম করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

খবর লইয়া জানিলাম, শফরী এবং ক্যাবলার তিন আইন অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। রুমা জারজ নয়। তবু কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি নাই। কোথায় যেন একটু বাধিল।

যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত—সুনীতিপরায়ণ, সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ, আমি ডাক্তার, রোগিণী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা কি সতী, এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফী ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকশন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম। আমার ফী দিতে কোনদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফীটা সে দিতে পারে নাই, হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

বছরখানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফী আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পান-দোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায়?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কোলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কি?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে, সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তাহার পর বলিল, কোলকাতাই চলে যাই তা হলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন, তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফীয়ের কথা ভুলি নি পাঠিয়ে দেব পরে। বড় টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল।

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাহনির কোনও খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড়-ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সীল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কোলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটোতে?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল। ভাষাতেও গুরু-চণ্ডালী দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

শ্রীচরণেষু,

শতসহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায়, আশা করি, আপনি ভালো আছেন। আশা করি, এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড় দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও। সবগুলি না পার, অন্ততঃ সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। আমার যে কয়খানা গহনা ছিল তাহা বেচিয়া সোনা দিয়া দাঁত বাঁধাইয়া লইলাম। ইহাতে ফলও হইয়াছিল। এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার অদৃষ্টই মন্দ। আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষ্মা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে, কিছুদিন বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফী বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফী বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে সে-ই কোনো পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। রেশমীর ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি

সেবিকা

চাহনি

আলোবাবু

সবাই তাঁকে আলুবাবু বলত, কিন্তু তাঁর আসল নাম আলো। চেহারা অবশ্য নামের উপযুক্ত নয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মুখটি বেগুনপোড়ার মতো, তার উপর কালো গোঁফ-দাঁড়ি, যুগ্ম-ভ্রূ, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। গলায় তুলসীর মালা, সেটিও কালো হয়ে গেছে। পরনের থানখানি অবশ্য ধপধপে সাদা। গায়ের চাদরখানিও সাদা। আলুবাবু জামা গায়ে দিতেন না। জুতোও পরতেন না।

একদিন সকালে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইদিনই প্রথম দেখলাম তাঁকে।

"কি চাই আপনার ?"

"অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করবেন আমাকে ?"

সাহায্যপ্রার্থী অনেক আসে. অধিকাংশ লোকই টাকা চায়, ভাবলাম, ইনিও বোধ হয় সেই দলের। মনে মনে একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখ ফুটে বিরক্তিপ্রকাশ করতে পারলাম না। বরং বললাম, "অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন, কি করতে হবে—"

তাঁর বাঁ হাতে একটি ছোট থলি ছিল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তিনি একটি ছোট পাখির ছানা বার করলেন।

"একটা ছোঁড়া এই পাখির ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি দু আনা পয়সা দিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে, এর পায়ে লেগেছে. পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেডাচ্ছিল কিনা, একটু দেখবেন দয়া করে ? শুনেছি আপনি বড় ডাক্তার।"

দেখলাম পাখির ছানাটিকে। পায়ে সত্যিই লেগেছিল। টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে বেঁধে দিলাম।

"কি করবেন এটাকে নিয়ে, পুষবেন ?"

"না। ভালো হলে ছেড়ে দেব। জীবন্ত কোনো জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেইজন্যে বিয়েও করি নি।"

কুণ্ঠিতদৃষ্টি তুলে একটু হেসে চাইলেন আমার দিকে।

"ও। এর আগে তো দেখি নি আপনাকে, কোথা থাকেন ?"

"অবিনাশবাবুর বাড়িতে। দিনসাতেক হল এসেছি।"

আর একবার কুণ্ঠিতদৃষ্টি তুলে চাইলেন। অবিনাশবাবু এখানকার নামজাদা উকিল একজন।

"অবিনাশবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

"না, তেমন কিছু নয়। আমার-এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নির বন্ধুর শ্বশুর উনি। আসলে লোক খুব ভালো। তাই দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।"

আলোবাবু পাখির ছানাটিকে নিয়ে চলে গেলেন।

দিনকয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে আলোবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। দেখলাম, তিনি একটি দিশি কুকুরের বাচ্চার পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই একমুখ হেসে বললেন, "বিনুবাবুর কুকুর এটি। কুকুর পোষার শখ আছে, কিন্তু সেবা করতে জানে না। দুটো চোখে এতক্ষণ পিঁচুটি ভরতি ছিল, তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলুম। আর কুকুরকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখলে কি চলে? ওদের সঙ্গে খেলা করতে হয়—"

কুকুরটার দিকে চেয়ে তার মুখের সামনে টুসকি দিতে লাগলেন। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল কুকুরটা। বিনু অবিনাশের ছেলে, বয়স দশ বছর।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হল একটু পরে।

বললাম, "আপনার এই আলোবাবু লোকটি তো অদ্ভুতধরনের মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, অদ্ভুতই। স্নেহের কাঙাল বেচারা। গরীবও খুব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, এক পাখি পেশেন্ট নিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে।"

"দেখবেন তো, যদি ওর চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কোথাও। সেবা করতে বড় ভালোবাসে, বিশেষতঃ সেবার পাত্র বা পাত্রী যদি অসহায় হয়—"

দিনকতক পরে সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা হল। একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলুম। কথায় কথায় আলোবাবুর কথা উঠে পড়ল। সিভিল সার্জন বললে, "এখনকার হাসপাতালে ওকে প্রবেশনার ড্রেসার করে ঢুকিয়ে নিতে পারি। তবে দশ টাকার বেশি এখন পাবে না। পরীক্ষায় পাশ করলে তখন মাইনে বাড়বে—"

আলোবাবু হাসপাতালের আউট-ডোরে রোগীদের ঘা ধোয়াতে লাগলেন। মাসখানেক পরেই কিন্তু চাকরিটি গেল তাঁর। একদিন দেখি, আমার ল্যাবরেটরিতে এসে শুষ্কমুখে বসে আছেন।

"কি খবর—"

"আমাকে দূর করে দিলে।"

"কেন?"

"একটা লোকের পায়ের ঘা কিছুতেই সারছিল না। সে-ই আমাকে একটা ওষুধ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই ওষুধটা দাও, তা হলে সেরে যাবে। ওটা লাগিয়ে অনেকের নাকি সেরে গেছে। দিলুম ওষুধটা লাগিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিলে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি তো চটেই লাল, বললেন,

কার হুকুমে তুমি ঘায়ে কার্বলিক এসিড ঢেলে দিয়েছ ? আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে দূর করে দিলেন। আমি ওর ভালোর জন্যেই ওষুধটা দিয়েছিলাম, আর ওর কথাতেই দিয়েছিলাম—"

আমিও চুপ করে রইলাম, কি আর বলব। সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলোবাবু চলে গেলেন।

কষ্ট হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্য, কিন্তু কি করব ভেবে পেলাম না।

দিনকয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকেও বিদায় নিতে হল আলোবাবুকে। শুনলাম, অবিনাশবাবুর স্ত্রী দূর করে দিয়েছেন তাঁকে। আলোবাবু যা করেছিলেন তা কোনও মা সহ্য করতে পারেন না। তিনি এক বগলে কুকুর-বাচ্চাটা এবং আর এক বগলে অবিনাশবাবুর শিশু-পুত্র তিনুকে নিয়ে একবার কুকুরটার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনুর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন।

অবশেষে আমিই আশ্রয় দিলাম আলোবাবুকে।

একদিন সন্ধ্যের পর এসে দেখলাম, তিনি একটা সোলার হ্যাট বাজিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন।

"আপনি গানবাজনা জানেন নাকি—"

কুণ্ঠিতমুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"এককালে ডুগি-তবলা বাজাতে পারতাম। দৈন্যের দায়ে সব বেচে দিতে হয়েছে। এখন হ্যাট বাজাই—"

বলা বাহুল্য, খুব কৌতুক অনুভব করলাম।

"হ্যাট পেলেন কোত্থেকে—"

"অনেক আগে স্যুটও পরতাম। সব গেছে, ওই হ্যাটটি আছে কেবল।"

আলোবাবুর আরও পরিচয় পেলাম দিনকয়েক পরে। একদিন দেখি, তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন।

"কি হল, ছুটছেন কেন—"

"দশটা বেজে গেছে, আমার ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি এখনও। রামবাবুর গাইটার বাচ্চা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম, তাঁর বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। তখুনি ছুটলুম, আমার ঘড়িতে ঠিক দশটার সময় দম দি। আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম, বেচারীর খেতে দেরি হয়ে গেল আজকে—"

তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। আলোবাবুর যে ঘড়ি আছে, তা জানতাম না। তাঁর পিছু পিছু এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম, ঘরে ঢুকেই তিনি নিজের ভাঙা তোরঙ্গটা খুললেন। তার ভিতর থেকে বার করলেন একটি ছোট টিনের বাক্স। বাক্সের ভিতর থেকে একটা

ন্যাকড়ার ছোট পুঁটুলি-মতন কি-বার করলেন। ন্যাকড়াটি খুলতেই লালরঙের শালুর পুঁটুলি বেড়িয়ে পড়ল। সেটি খুললেন। বেরুল রেশমী ন্যাকড়ার পুঁটুলি, সেটি খুলতেই বের হল খানিকটা তুলো, তারপর ছোট্ট ঘড়িটি। তিন পুরু কাপড়-ঢাকা ঘড়িটিকে আঙুরের মতো রাখতেন তিনি সযত্নে। ঘড়িটি বার করে চাপটালি খেয়ে বসলেন, তারপর চোখ বুঁজে ধীরে ধীরে দম দিতে লাগলেন। মনে হল, যেন পুজো করছেন।

অবিনাশবাবুর কথাটা মনে পড়ল। স্নেহের কাঙাল বেচারা! জীবনে কিন্তু ভালবাসার সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও। সব স্নেহ তাই উজাড় করে দিয়েছে বোধ হয় ঘড়িটির উপর।

একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে দেখি, আলোবাবু হ্যাট বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইছেন। দুটো লাইনই বার বার গাইছেন—

আমায় ওরা সইলো না কেউ
আমার কাছে রইলো না কেউ—

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এমন গলা ছেড়ে গান গাইতে শুনি নি কখনও তাঁকে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

"আজ এত জোরে জোরে গান গাইছেন যে।"

"এমনি।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিতহাসি হেসে বললেন, "আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিকসময় হয়তো ভাল করে দম দিতে পারবে না—"

টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আলোবাবু এখন পাগলাগারদে আছেন।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারলেন না কিছুতে।

"নমস্কার মহেশবাবু, ভালো তো সব ?"

দন্তপংক্তি বিকশিত করে ধীরেনবাবু নমস্কার করলেন।

সত্ত পাশকরা কলেজের ছোকরা জীবন কেরানীর ছেলে মহেশ দাসকে নমস্কার করা দূরে থাক, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না আগে ধীরেনবাবু। ইদানীং কিন্তু আনছেন। মানে, আনতে হচ্ছে। ধীরেনবাবুর মনিব রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের একমাত্র কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মহেশ দাসের। বিয়ে যাতে না হয়, ধীরেনবাবু গোপনে গোপনে সে চেষ্টার ক্রুটি করেন নি। ধীরেনবাবুর ইচ্ছে ছিল, অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর বিয়ে হোক। অবনীও জমিদারের ছেলে, সুপুরুষ, জয়শ্রীর সঙ্গে ভাবও আছে। কিন্তু হল না। হলে ধীরেন ভাতুড়ীর সুবিধা হত, অবনীকে তিনি প্রাইভেটে পড়িয়েছিলেন কিছুদিন। তাঁর পশার-প্রতিপত্তি বাড়ত। এখন মহেশ দাসকে নমস্কার করতে হচ্ছে। ধীরেনবাবু আর একবার দন্তপংক্তি বিকশিত করলেন।

"মৃণালপুরে যাচ্ছেন না কি ? জয়া মা তো সিমলা থেকে নেবে গেছেন, শুনলাম অবনীর কাছ থেকে।"

মহেশ দাসের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হল। জয়শ্রী সিমলা থেকে নেবে মৃণালপুরে গেছে, এ কথা শোনামাত্রই মহেশ সেখানে ছুটবে কেন বিনা আহ্বানে ? ধীরেনবাবুর এই উক্তি তার আত্মসম্মানকে আঘাত করলে যেন। এ কথা ভাববার মানে !

"না, আমার এখন যাবার কোনো ঠিক নেই।"

"ও, আচ্ছা যদি যান, আমাকে জানাবেন একটু আগে থাকতে, কিছু ডিম দিয়ে দেব সঙ্গে। আজ অবনীর সঙ্গে দিলাম কিছু, আপনার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে দেব। মৃণালপুরে ডিম পাওয়া যায় না কিনা !"

"অবনীবাবু গেছেন নাকি সেখানে ?" প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল মহেশ দাসের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ, বললে, জয়া মা-র চিঠি পেয়েছে কাল। তাকে স্টেশনে তুলে দিয়েই তো আসছি।"

ঘাড়টি কাৎ করে আর একবার হলদে দাঁতগুলি বার করলেন ধীরেনবাবু, তারপর মরাল-গতিতে মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লাম্বেগো হওয়ার পর থেকে ধীরেন-বাবুর মরাল-গতি হয়েছে।

ঘাড় কাৎ করে সাপ বিষ ঢালে, ধীরেনবাবুও বিষ ঢেলে গেলেন।

অবনী সেন জয়শ্রীর চিঠি পেয়েছে, কিন্তু সে কোনও খবরই জানে না। তার চিঠি পেয়ে অবনী মৃণালপুরে চলে গেল !

নিষ্ঠুর বিষটা মহেশ দাসের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতে লাগল ক্রমশঃ। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে, দাঁড়িয়ে থেকে, চলে গেল সে অবশেষে কলেজের দিকে।

॥ দুই ॥

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে মহেশ দাস। কিন্তু চমৎকার ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মহেশের বাবা ছিলেন কলেজের কেরানী, অকালে হঠাৎ মারা গেছেন। মহেশ অধ্যাপক হয়েছে সেই কলেজে। মহেশের সুখ্যাতিতে সকলেই পঞ্চমুখ। যেমন বিদ্বান, তেমনি স্বভাব-চরিত্র, তেমনি স্বাস্থ্য। যদিও গরীব, কিন্তু বংশ বনিয়াদী। রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন হাজির হলেন মহেশের মায়ের কাছে। অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল কিছু। অত বড় একজন ধনীর আগমনে মহেশের মা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রায়বাহাদুর যা বললেন, তা আরও বিস্ময়কর।

'একটি ভিক্ষা আছে আপনার কাছে।"

মহেশের মা মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে নীরব হয়ে রইলেন।

'আপনার মহেশের সঙ্গে জয়ার বিয়ে দিতে চাই। যদি অনুমতি করেন, ব্যবস্থা করি। জয়া এবার আই-এ পাশ করল, এইবার বিয়ে দিতে হবে।"

রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর তাঁর সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হবেন, এ মহেশের মায়ের কল্পনাতীত ছিল। প্রস্তাব শুনে তিনি খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আপনার মেয়ের পাত্রের অভাব কি ? আমরা গরীব—"

বাধা দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, "অমন ছেলের মা আপনি, আপনি গরীব হতে যাবেন কোন দুঃখে—"

মহেশের মা আবার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "আচ্ছা, ছেলেকে জিগ্যেস্ করে দেখি।

মহেশও প্রথমটা রাজি হয় নি।

সে-ও বলেছিল, "মা, ওরা বড়লোক, আমরা গরীব।"

মহেশের মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "বড়লোক হওয়া তো অপরাধ নয়, বাবা। হলই বা বড়লোক। নির্মলবাবু লোক খুব ভালো। তা ছাড়া, অত বড় একটা মানী লোক নিজে বাড়িতে এসে অনুরোধ করলেন, মেয়েও শুনেছি খুব ভালো—"

মহেশ চুপ করে রইল। তখন চুপ করে রইল, কিন্তু রাজি হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। নির্মলশঙ্করবাবু নিজে আরও দুবার এলেন, লোক পাঠালেন কয়েকবার। দরিদ্র মহেশের ক্ষুধিত অহঙ্কারটা তৃপ্ত হল বোধ হয়, কিংবা হয়তো আরও কিছু ··। রাজি হয়ে গেল সে শেষ পর্যন্ত।

সকলেই আশা করেছিল, নির্মলশঙ্করের বন্ধু এবং প্রতিবেশী জমিদার প্রবীর সেনের একমাত্র ছেলে অবনী সেনের সঙ্গেই জয়শ্রীর বিয়ে হবে। অবনীর সঙ্গে জয়শ্রীর খুব মেশামেশি দেখেই লোকে এ কথা ভেবেছিল, কিন্তু ভুল ভেবেছিল।

তারা রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করকে চিনত না। তিনি জহুরী লোক। জমিদারের বিলাসী ছেলে অবনী সেনের তুলনায় বিদ্বান, শুভ্রচরিত মহেশ যে কত ভালো, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি।

...বিয়ের এই ইতিহাস।

মাত্র মাসছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে।

॥ তিন ॥

সমস্তদিন নানাকাজে ব্যাপৃত হয়ে রইল মহেশ। তিনটে পর্যন্ত কলেজের ক্লাশ ছিল, তারপর ইচ্ছে করেই সে গিয়ে যোগ দিলে ছেলেদের ডিবেটিং ক্লাবে, সেদিন 'ডিবেট' ছিল একটা, ছেলেদের সঙ্গে টেনিসও খেললে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে পড়াশোনায় মগ্ন রাখবার চেষ্টা করলে নিজেকে, কিন্তু কিছুতেই মন বসল না। ধীরেনবাবুর কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগল।

অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর মাখামাখি সে-ও যে লক্ষ্য করে নি, তা নয়। কিন্তু গ্রাহ্য করে নি। সে ভেবেছিল, বড়লোকের মেয়ে বিশেষতঃ আজকালকার লেখাপড়াজানা মেয়ে—তা ছাড়া, তার নিজেরও এ বিষয়ে যে খুব একটা আপত্তি ছিল, তা-ও নয়। মিশলেই বা, ক্ষতি কি তাতে। হারেমের দিন এখন আর নেই। কিন্তু তার প্রতি জয়শ্রীর ব্যবহারটা একটু আড়ষ্টগোছের হওয়াতে তার কেমন একটু খটকা লাগছিল। একদিনও সে প্রাণ খুলে কথা কয় নি তার সঙ্গে, ভালো করে হাসে নি। সে নাকি ভালো গান গাইতে পারে। কিন্তু একদিনও গান গায় নি তার কাছে। সম্মানিত অতিথির প্রতি লোকে যেমন মুখোশ-পরা ভদ্র ব্যবহার করে, জয়শ্রীও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করে চলেছে। সর্বদাই কেমন যেন আড়ষ্টভাব। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে তার নিজের আচরণও তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন লেফাফা-দুরস্ত কাণ্ড। মার্বেলপাথরের মেজে, দামী কার্পেট পাতা রয়েছে, পা দিতে সঙ্কোচ হয়। বহুমূল্য সোফা-সেটি, বসতে সাহস হয় না। সব ঝকঝক, তকতক করছে। যেদিকে দৃষ্টি ফেরাও, কেবল ঐশ্বর্যের চাক্যচিক্য। মহেশ একদিনও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে নি। বাড়ির ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরানী, সোফার-সহিস সব ফিট-ফাট ; মিনার্ভা কার, ওয়েলার ঘোড়া, মূলতানী গাই, অ্যালশেশিয়ান কুকুর—মহেশের কেমন যেন ভয়-ভয় করত সর্বদা। বিয়ের পর জামাইহিসেবে যখন সে গেল, তখন তাকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো হৈ-হৈ উঠল না। নতুন-কেনা একটা দামী আসবাবের মতোই সে যেন বড়লোকের প্রাসাদে ঢুকল। দামী আসবাবের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেখানো সঙ্গত, তার বেশী মনোযোগ যেন কেউ তার প্রতি দিলে না।

সে-ও দাবি করতে পারলে না। যত্নের কোনও ত্রুটি হল না অবশ্য। কিন্তু আয়োজনের আধিক্যটাই যেন আঘাত করতে লাগল তাকে। তার মনে হতে লাগল, কারও অন্তরে সে যেন প্রবেশ করতে পারছে না। অনাবশ্যক ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেওয়ালের মতো আড়াল করে ফেলেছে সব কিছুকে।

…রাত্রে ঘুম এল না। কিছুতেই এল না। ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সে। অবনী সেন? কী এমন আছে লোকটার মধ্যে! চেহারা ভালো, ভালো বাঁশীও বাজাতে পারে। তাতে কী! জয়শ্রী অবনীকে খবর দিয়েছে মৃণালপুরে যাবার জন্যে, অথচ তাকে কিছু লেখেনি, এর মানে কী? সে যে সিমলা থেকে চলে এসেছে, এ খবরই তো জানে না সে! আশ্চর্য!

জয়শ্রীর চেহারাটা মনের উপর ফুটে উঠল। তার শেষ যে চেহারাটা সে দেখেছিল সেই চেহারাটা। অদ্ভুত রূপসী! ধবধবে ফরসা রঙ, টকটকে লাল একখানা শাড়ি পরেছিল। কুচকুচে কালো চোখে অদ্ভুত একটা শাণিতদৃষ্টি। লোভনীয়, ভয়ঙ্কর লোভনীয়।

মহেশ দাস শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঠিক করলে— যাবে। বিনা নিমন্ত্রণেই যাবে। কাউকে কিছু না বলে, লুকিয়ে যাবে। হঠাৎ রাত্রিবেলা কোনও খবর না দিয়ে, হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে। দেখতে হবে, অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর প্রকৃত সম্পর্কটা কী। যেতেই হবে। ইতিপূর্বে সে মৃণালপুরে যায় নি কখনও। কিন্তু রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের বাড়ি খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। সে যাবে যেতেই হবে।

॥ চার ॥

রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের বিরাট বাড়ির সামনে মহেশ এসে যখন দাঁড়াল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একটানা ডেকে চলেছে পাপিয়াটা —চোখ গেল – চোখ গেল—চোখ গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের ধারে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহেশ। বাঁশী বাজছে। বাঁশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইছে কে যেন। জয়শ্রী কি? মহেশের একবার ইচ্ছে হল, ডাকে। কিন্তু না—সে ডাকবে না। গেটের সামনে এগিয়ে এল আস্তে আস্তে। বিরাট লোহার গেট। নিষ্ঠুর নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে ঠেলে দেখলো একটু। ভিতর থেকে বন্ধ। না, সে ডাকবে না। বাঁশী বেজে চলেছে। সমস্ত অন্তর যেন গলে পড়ছে গানের সুরে সুরে।…মহেশ ভুলে গেল যে সে একজন অধ্যাপক, ভুলে

গেল যে সে এ বাড়ির জামাই। সে ঠিক করলে যে সে গেট টপকে লোহার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠবে লুকিয়ে। আসল ব্যাপারটা কি দেখতেই হবে তাকে। গেটের লোহার গরাদেতে পা রেখে সে উঠতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

সকালে চায়ের আসরে সবাই জমে বসেছে। রেডিওতে বেহালায় ভৈরবী আলাপ করছে কে যেন। হঠাৎ মালীটা এসে বললে, "হুজুর, বাগানে একটা লাস পড়ে আছে। কোনো চোর-টোর হবে বোধ হয়। রাত্রে গেট টপকে ঢুকেছিল, কুকুরে মেরে ফেলেছে—"

জয়শ্রীর দূর-সম্পর্কের একজন মামা বসে ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—"ইস, তাই নাকি? দু-দুটো অ্যালশেশিয়ান এমনভাবে খুলে রাখিস তোরা। কুকুর তো নয়, যেন বাঘ—"

অবনী সেন বললে—"পাহারা দেবার জন্তেই তো কুকুর। চলুন, দেখে আসা যাক। এখানকার দারোগা কে আজকাল? পুলিসে একটা খবর দিতে হবে—মহাফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। চল জয়শ্রী, যাবে নাকি—"

'যাচ্ছি দাঁড়ান, ভৈরবীটা শেষ হোক—"

চম্পা

শ্রীমান কার্তিক শ্রীমতী চম্পার প্রেমে পড়িয়াছিল। চম্পা কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, বরং খুশীই হইয়াছিল। কারণ, কার্তিক ধনবান তো বটেই, রূপবানও। মিলনের পথে সাধারণতঃ যে সব সামাজিক, আর্থিক বা আধ্যাত্মিক বাধা থাকে, এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। চম্পা রূপোপজীবিনী। সরকারের খাতায় নাম লিখাইয়া আইনসঙ্গত উপায়ে সে ব্যবসা ফাঁদিয়াছিল। এ রকম ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একদিন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

কার্তিকের প্রতিবেশী অমরবাবুর কলিকাতাস্থ বাসায় একদা প্রভাতে তাঁহার বাল্যবন্ধু যোগেনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়া বলিলেন, "ভাই অমর, এসে তো পড়লুম, এবার তুমি সব ব্যবস্থা কর। তোমার পাচু স্যাকরাকে এখনই খবর দাও। আমাকে কালই সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরতে হবে। একদিন ছুটি পেয়েছি। বিয়েরও তো দেরি নেই আর। মাঝে মাত্র পনেরোটি দিন।"

অমরবাবু দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, 'সব হবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আগে হাতমুখ ধোও, কিছু খাও, জিরোও, তারপর সব ঠিক করে দেব। আগে গিন্নিকে খবরটা দিয়ে আসি।" অমরবাবু অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। যোগেনবাবু কোটটি খুলিয়া জানালার ধারে যে পেরেকটি ছিল, তাহাতে ঝুলাইয়া দিলেন। তাহার পর গেঞ্জি খুলিতে লাগিলেন।

অমরবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি একেবারে ভিতরেই এস। বাথরুমটা খালি আছে এখন, স্নানটা সেরে নাও। স্নান করবে তো?"

"স্নান করবো বইকি।"

"তা হলে চলে এস।"

"আমি সন্ধ্যাহ্নিকও করব।"

"সব ব্যবস্থা আছে, চলে এস।"

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

যোগেনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন। রাত্রে ট্রেনে একেবারে ঘুম হয় নাই। স্নানান্তে পূজা করিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করেন। পূজার পর চা-জলখাবারের পালা। তাহাতেও খানিকটা সময় গেল। বাল্যবন্ধু যোগেনের জন্য অমরবাবু নানাবিধ আয়োজন করিয়াছিলেন। আহারাদির পর বিবাহের কথা উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে অনিবার্যভাবে আর্থিক প্রসঙ্গ লইয়া দুই বন্ধুতে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

যোগেনবাবু বলিলেন, "ভাই, ভদ্রাসনটুকু বাঁধা দিয়ে হাজারতিনেক টাকা যোগাড় করেছি। ওইতেই কুলিয়ে নিতে হবে সব—"

"কুলিয়ে যাবে। তবে জিনিসপত্তরগুলো ভালো হবে না। নগদ দিতে হবে না কি কিছু ?"

"নগদ দেড়হাজার চেয়েছেন। সেটা বউমার গয়না বিক্রি করে পাব।"

"বউমা তোমার কাছেই আছেন ?"

"এখন আছেন। কিন্তু বিয়ের পর ভেবেছি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার বাড়িতে দেখা-শোনা করবার কেউ নেই, দিনকালও ভালো নয়। গবুর মা যদি বেঁচে থাকত, তা হলে ভাবনা ছিল না—"

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল। বছরতিনেক আগে যোগেনবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবর্ধনের বিবাহ দিয়াছিলেন। মাসছয়েক পরেই গোবর্ধন মারা যায়। তাহার মাসছয়েক পরেই গোবর্ধনের মা-ও। পুত্রশোক তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

অমরবাবু জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগেনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

"গবুর বিয়েতে তুমি তো নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলে। সব টাকাটা খরচ করে ফেলেছ ?"

"বাড়িটা দোতলা করলাম যে। গবুর জন্মেই দোতলা করাতে হয়েছিল। এখন সব শূন্য পড়ে আছে। যাক, ভাগ্যে বাড়িটা ছিল, তাই সেটা বাঁধা দিয়ে বিয়ের টাকাটা যোগাড় হল—"

"বাড়িবাঁধা দিয়ে মোটে তিন হাজার টাকা পেলে ?"

"তাই দিতে চায় না হে। গরজ যে আমার। এদিকে মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে, সুপাত্র যখন পেয়েছি, তখন আর দ্বিমত করলাম না। কিছুদিন পরে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটা পাব, তাই দিয়ে উদ্ধার করব বাড়িটা। আর কার জন্মেই বা বাড়ি, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বাড়িতে কে থাকবে বল—"

"তা বটে—। পাত্রটি কি করে ?"

"এবার বি. এ. পাশ করেছে। আগে বার দুই ফেল করেছিল। তবে বংশ ভালো। ঘরে খাওয়া-পরার সংস্থান আছে, দেশে বাড়ি আছে—"

"এই পাত্র নগদ পণ দেড় হাজার চাইছে ?"

"আর, বল কেন ভাই। আমি আর দরদস্তুর করি নি, বুঝলে! মেয়ে পছন্দ হতেই ওরা যা বললে তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। গত দু-বৎসর থেকে ক্রমাগত মেয়ে দেখাচ্ছি, কারও পছন্দই হয় না—ওর সামনের দাঁতগুলো উঁচু কি না—"

বলিয়াই যোগেনবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তিনিও গবুর জন্য অনেক

মেয়ে দেখিয়াছিলেন, অনেককে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছিলেন। একটি মেয়েকে তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বাবা নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন নাই। আর একটি মেয়ে……

"পাঁচু স্যাকরাকে ডাকতে পাঠাই তা হলে। ডাকবার দরকার কী, নিজেরাই যাই চল। ট্রামে পাঁচ মিনিট লাগবে।"

দুইজনেই বৈঠকখানায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"এ কী, আমার কোটটা কোথা গেল ? এইখানে টাঙিয়ে রেখেছিলাম যে—"

"কোনখানে—"

"এই পেরেকে—"

"তা হলে ঠিক কেউ জানালা দিয়ে নিয়ে গেছে। ওখানে কোট রাখতে গেলে কেন—"

"ওই কোটের পকেটেই যে তিন হাজার টাকা আছে আমার।"

"অ্যাঁ, বল কী !—"

যোগেনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ব্যাপারটা পাড়ায় চাউর হইয়া গেল।

অমরবাবু নিজের এবং পাশের বাড়ির চাকরদের ডাকিয়া জেরা করিতে লাগিলেন, পুলিসের ভয় দেখাইলেন। যদি খুঁজিয়া দিতে পারে, বকশিশ দিবেন, এ কথাও বলিলেন। কিন্তু ফল হইল না।

অবশেষে একটা চাকর বলিল, "কার্তিকবাবুকে বলুন, তাঁর হাতে অনেক গুণ্ডা আছে, তিনি যদি চেষ্টা করেন, হয়তো কোনও পাত্তা লাগাতে পারেন।"

কার্তিকের পিতা বিশ্বেশ্বরবাবুর সহিত অমরবাবুর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি মারা গিয়াছেন। কার্তিকও তাঁহাকে চেনে, খাতিরও করে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সব কানাঘুষা বাজারে শোনা যাইতেছে তাহাতে তাহার নিকট যাইতে অমরবাবুর প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুর খাতিরে তবু গেলেন। সমস্ত শুনিয়া কার্তিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমি চেষ্টা করে দেখছি, যদি কিছু করতে পারি। যদি কিছু করা সম্ভব হয়, আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আপনার কাছে যাব। আর যদি না যাই, তা হলে জানবেন, কিছু করতে পারি নি।"

অমরবাবু চলিয়া আসিলেন।

কার্তিকও মোটরটি বাহির করিল এবং মিনিটদশেকের মধ্যেই চম্পার বাড়িতে পৌঁছিয়া গেল।

চম্পা বিস্মিত হইল একটু। এ সময়ে কার্তিক সাধারণতঃ আসে না।

"আজ এমন অসময়ে যে ?"

"একটু দরকার আছে। একটা কথা শুনেছিলাম, কিন্তু সে কথা তোমাকে জিগ্যেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার গুণ্ডারা তোমাকে নাকি 'রানী' করেছে?"

মুচকি হাসিয়া চম্পা বলিল, "হ্যাঁ, করেছে—। আমি ত্রিশ ভোটে জিতেছি। ফুলী আমার সঙ্গে কনটেস্ট করেছিল, পারে নি।"

"ভোট নিয়ে ঠিক হয় নাকি এ সব?"

"নিশ্চয়!"

"রানীর ক্ষমতা কী?"

"ঠিক রানীর মতোই ক্ষমতা। ওদের আমি যা করতে বলব তা ওরা তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে করবে। কেন, দরকার আছে নাকি কিছু?"

"আছে—"

কার্তিক সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

"চোর, পকেটমার এদের উপরও তোমার কর্তৃত্ব আছে না কি?"

"আছে বই কী। এ বছরকার মতো কলকাতার আণ্ডার-ওয়ার্লডের রানী আমি। বাংলা ভাষায় পাতালের রানী বলতে পার—"

"দেখ, যদি ভদ্রলোককে সাহায্য করতে পার। বড়ই বিপন্ন হয়েছেন। ধার করে মেয়ের বিয়ের বাজার করবার জন্যে যে টাকা এনেছিলেন তা সব ছিল ওই কোটের পকেটে—"

"দেখি—"

ইলেকট্রিক বেল টিপিতেই দৈত্যের মতো বিরাটকায় একটি লোক অভিবাদন করিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

"দেখ, মুনিম, কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে একটি কোট চুরি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কে সেখানে ডিউটিতে ছিল?"

"সুখন।"

"তাকে ডাক।"

আধঘণ্টা পরে সুখন আসিয়া হাজির হইল। অতিশয় নিরীহ, ভদ্র চেহারা। কে বলিবে, লোকটা চোর।

"সুখন, আজ সকালে কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে কোট পেয়েছ কি একটা?"

"হাঁ, মাইজি। জানলার ধারে ঝুলছিল, গলি থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছি।"

"কোটটা ফেরৎ দিতে হবে।"

"সেটা তো গুদামে জমা হয়ে গেছে মা।"

চম্পা কার্তিকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি কোটটা চেন কি?"

"না—"

"সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এস এখানে, আমি কোটটা এখানে আনিয়ে রাখছি।"

প্রায় ঘণ্টাদুই পরে।

কার্তিক ও যোগেনবাবু চম্পার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সুসজ্জিত ঘর। মেজেতে দামী কার্পেট পাতা। চলিতে গেলে পা ডুবিয়া যায়। প্রত্যেকটি আসবাবই দামী। পরদা ঠেলিয়া চম্পা প্রবেশ করিল।

"এই কোটটা কি আপনার?"

চম্পাকে দেখিয়া যোগেনবাবু একটু চমকাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ, এইটেই—"

"দেখুন, এতে যা যা ছিল তা ঠিক আছে কি না।"

যোগেনবাবু দেখিলেন, সবই ঠিক আছে। ইনার পকেটে নোটের তাড়াটা যেমন পিন করা ছিল, তেমনি রহিয়াছে। একটা পকেটে বিড়ি, দেয়াশালাই ছিল, তাহাও আছে।

যোগেনবাবুর মনে হইল এ মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল।

"তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে?"

"না, কোথাও দেখেন নি।"

"আচ্ছা, তোমার নামটি কি সাবিত্রী?"

"না, আমার নাম চম্পা।"

চম্পা আর দাঁড়াইল না, ভিতরে চলিয়া গেল।

যোগেনবাবুর কিন্তু ভুল হয় নাই। গবুর বিবাহের জন্য যখন তিনি একের পর এক পাত্রী দেখিতেছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে এ মেয়েটিকেও দেখিযাছিলেন। মেয়েটির রূপ দেখিয়া এবং তাহার 'সাবিত্রী' নাম শুনিয়া ইহাকে তাঁহার পছন্দও হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বাবা নিতান্ত গরীব ছিল, পাঁচ হাজার টাকা পণ শুনিয়া পিছাইয়া যায়।

যোগেনবাবু হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

"চলুন, কোট তো পেয়ে গেলেন—"

আসিবার সময় আবার নরম কার্পেটে তাঁহার পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

রঘুবীর রাউত

জমিদারি-প্রথা তখনও অবলুপ্ত হয় নি। মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুবীর রাউতের দোর্দণ্ডপ্রতাপে তখনও বাঘে, গোরুতে একঘাটে জল খাচ্ছে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল তখন, ইংরেজের কড়া আইন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু রঘুবীর রাউত নিজের আইনে চলেন। সে আইনের সংগে ইংরেজের আইনের গরমিল হলেও চিন্তিত হন না তিনি। টাকার জোরে সব ঠিক হয়ে যায়। তা বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। বরং সুবিচার করবার জন্যেই তিনি প্রচলিত আইন অমান্য করতেন। তিনি ব্যাপারটার মর্মস্থলে একেবারে তীরের মত সোজা সবেগে পৌঁছে যেতেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

এক ছোকরা দারোগা এসে তাঁর জমিদারিতে উৎপাত করতে লাগল একবার। লোকের খাসিটা-পাঁটাটা নিয়ে যায়, দাম দেয় না। ঘুস খেয়ে আসল অপরাধীকে ছেড়ে দেয়, নিরপরাধ গরিবকে নিয়ে টানাটানি করে। রাউত মশায়ের গুপ্তচর লোকে গোপনে তাকে মাছুত বলত) মুলুক দাস এসে খবরটি রাউত মশায়ের কর্ণগোচর করল। রাউত মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "সাবধান করে দাও ওকে। পুলিসের লোক, হট করে ঘাঁটাতে চাই না, কিন্তু বেশি যদি বাড়াবাড়ি করে, শিক্ষা দিয়ে দেব।"

সপ্তাহ-খানেক পরে মুলুক দাস এসে বলল, "সাংঘাতিক লোক ব্যাটা। আমাদের হীরু গোয়ালার মেয়েটাকে নিয়ে টানাটানি করেছে রাত্রে। সবাই হৈ-হৈ করে উঠতেই বাইকে চড়ে পালাল। আড়ালে ডেকে বললাম আপনার কথা। জবাবে কী বললে জানেন, বললে, 'আমি স্বয়ং কুইনের প্রতিনিধি, আর উনি একটা সামান্য জমিদার। যদি ইচ্ছে করি, ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলতে পারি, ওঁকে মানা করে দেবেন, উনি যেন আমার ব্যাপারে হাত না দেন। আমি ওঁর প্রজাও নই, খাতকও নই।"

রাউত মশায় কিছু বললেন না। বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফটায় তা দিতে লাগলেন খালি। বাঁ দিকের গোঁফটার উপর তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সাতদিন পরে রাউত মশায় বৈঠকখানায় বসে আছেন, দেখতে পেলেন দারোগাটা তাঁর গেটের সামনে দিয়ে বাইকে করে যাচ্ছে।

"রাবণ মিশির—"

"জী হুজুর!"

বলিষ্ঠ সিপাহী রাবণ মিশ্র সেলাম করে দাঁড়াল।

"দারোগাসাহেব বাইকে করে যাচ্ছে, তাকে ডেকে নিয়ে এসো। যদি আসতে না চায়, ধরে নিয়ে এসো।"

"যো হুকুম।"

মিনিটদশেক পরে ক্রুদ্ধ দারোগাকে টানতে টানতে নিয়ে এল রাবণ মিশির।

"থামের সঙ্গে বেশ কস্‌কসিয়ে বাঁধো ওকে। আগে প্যাণ্ট, কোট, গেঞ্জি সব খুলে নাও, যদি চেঁচায়, মুখটাও বেঁধে ফেলো।"

রাবণ মিশির তাকে টানতে টানতে নির্জন পশ্চিম বারান্দায় নিয়ে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, দারোগাকে থামে বাঁধা হয়েছে। রাউত মশায় উঠে গিয়ে দেখলেন, উলঙ্গ, আবদ্ধ দারোগা নির্বাক হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হলকা ফুটে বেরুচ্ছে।

রাউত বললেন, "আপনি মহারানীর প্রতিনিধি, আমি আমার প্রজাদের প্রতিনিধি। আপনি যে সব অন্যায় করেছেন তার শাস্তি দিচ্ছি। আজ আপনাকে চাবকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফের যদি এ সব করেন, তা হলে বাঘ কিংবা কুমির দিয়ে আপনাকে খাওয়াব। ও দুটো জানোয়ারই আমি পুষি, আশা করি জানা আছে সেটা আপনার। এই, বেত লাগাও—"

রাবণ মিশির একটা হাণ্টার বের করে এনে চাবকাতে লাগল দারোগাকে। রঘুবীর রাউত একটা মোড়ায় বসে বাঁ দিকের গোঁফটি চোমরাতে লাগলেন। একটু পরে দারোগা অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন রাউত মশায় হুকুম দিলেন, "ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হীরু গোয়ালার বাড়ির পিছনদিকের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আয়। তারপর এই টেলিগ্রামটা ডাকঘরে নিয়ে যা। আমি টেলিগ্রাম লিখছি, ওটাকে ফেলে দিয়ে আয় আগে।"

টেলিগ্রাম করলেন পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। লিখলেন, "এখানকার দারোগা একটি গোয়ালার মেয়েকে বলাৎকার করছিল বলে গুরুতররূপে প্রহৃত হয়েছে। অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।"

অনেক হাঙ্গামা, হুজ্জত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল দারোগাটার। রঘুবীর রাউত ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী ছিলেন। যা করতেন, নিজেই করতেন। আবেদন-নিবেদন বা আইনের ঘোরপ্যাচের ভিতর যেতে চাইতেন না। বলতেন, "আইন? ও আইন অনুসারে চললে দোষীকে সাজা দেওয়া যায় কখনও? হাতে-নাতে চোর ধরলেও মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করতে হবে, তা না করলে চোর ছাড়া পেয়ে যাবে!" আদালতে তাঁর মামলা-মকদ্দমা হরদম লেগে থাকত। কিন্তু তিনি একবার ছাড়া কখনও ফরিয়াদী হন নি। বরাবর আসামী হয়েছেন। তিনি নিজের জমিদারিতে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, সুতরাং আইনভঙ্গের অপরাধে আসামী হতে হত তাঁকে।

যে-মকদ্দমায় তিনি ফরিয়াদী হয়েছিলেন, তারই গল্প এবার বলব।

॥ দুই ॥

রঘুবীররা দুই ভাই ছিলেন, রঘুবীর আর সুমিত্রানন্দন। সুমিত্রানন্দন এবং তাঁর পত্নী বহুকাল আগে মারা গেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অযোধ্যাপ্রসাদ রঘুবীরের কাছে মানুষ হচ্ছিল। রঘুবীর অপুত্রক এবং বিপত্নীক। সুতরাং অযোধ্যাপ্রসাদ রাউতই বিশাল জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। রঘুবীর অযোধ্যাপ্রসাদকে লেখাপড়া শেখান নি বিশেষ। স্কুল-কলেজের শিক্ষার উপর তেমন আস্থা ছিল না তাঁর। তিনি তাকে মোটামুটি বাংলা, ইংরেজী এবং অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। পালোয়ান রেখে কুস্তি করতে শিখিয়েছিলেন। গান-বাজনা শেখাবার জন্যে ওস্তাদ রেখেছিলেন একজন। অযোধ্যা-প্রসাদ যখন সাবালক হল, তখন তাকে আলাদা বাড়িও করিয়ে দিলেন একটি। জমিদারির একটা মহালের ভারও দিয়ে দিলেন যাতে সে স্বাধীনভাবে থেকে জমিদারি পরিচালনা করবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ—চাণক্যের এই উপদেশ রঘুবীর মানতেন। প্রাপ্তবয়স্ক অযোধ্যাপ্রসাদের কোনও কাজে বাধা দিলেন না তিনি।

ফল নিম্নলিখিতপ্রকার হল।

যে পালোয়ানেরা তাকে কুস্তি শেখাতে এসেছিল তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরামর্শ দিলে যে, পুষ্টিকর খাবার প্রচুর পরিমাণে না খেলে কুস্তিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট, খুবানি, খোয়া প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। এর সঙ্গে মাছ, মাংস, ডিম থাকলে আরও ভাল হয়। গামা, গোবর, কিক্কর প্রভৃতি বড় বড় ব্যায়ামবীরদের খাদ্য-তালিকা আউড়ে তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে যে, কুস্তি করতে হলে ভাল খাওয়া চাই।

অযোধ্যাপ্রসাদের অর্থাভাব ছিল না। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর আনিয়ে ফেললে। মুশকিল হল মাছ-মাংস নিয়ে। পাড়াগাঁয়ে প্রত্যহ ভালো মাছ-মাংস পাওয়া যায় না। অযোধ্যাপ্রসাদ প্রত্যহ কালীপূজার ব্যবস্থা করে ফেললে। রোজ পাঁঠাকাটা হতে লাগল। তার মহালে বড় দিঘি ছিল একটা। সেখানে সে আর তার পালোয়ানরা রোজ ছিপ ফেলে বসতে শুরু করল। জেলেরা জাল নিয়ে নিয়ে ঘুরতে লাগল। অন্তত: সেরপাঁচেক মাছ রোজ চাই। কারণ, সে একা তো নয়, গোটাপাঁচেক পালোয়ান আছে। মাছও জুটতে লাগল। 'পয়সা খরচ করলে সবই হয়'

গান-বাজনায় ওস্তাদ নুর মহম্মদও একটি পরামর্শ দিলেন তাকে। বললেন, সেতার যখন বাজে, তখন একটি অদৃশ্য নর্তকী সেতারের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে। তার নূপুরের নিক্কণ হুজুর নিশ্চয়ই শুনেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সতরঞ্চের উপর যদি আর একটি নর্তকী নাচে, তা হলেই জুড়ি ঠিক মেলে আর তা হলেই সেতারের মজাটা পুরো পাওয়া যায়। নুর মহম্মদ অযোধ্যাপ্রসাদের বাড়ির পাশেই একটি আলাদা বাড়িতে থাকতেন। বললেন, লখ্‌নৌ থেকে তার বিবির এক বোন এসেছে। সাবিত্রী দেবী নাম নিয়ে সে সিনেমায় নামতে চায়। কিন্তু হুজুর যদি মত দেন—।

বাঁ দিকের গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে মুলুক দাসের কাছে খবর শুনছিলেন রাউত মশায়।

মুলুক দাস বলছিল, "বেলা নটা-দশটার সময় ওঠে অযোধ্যা আজকাল। উঠে মুখ ধোয় ঘণ্টাখানেক ধরে। তারপর চা খায়, তারপর বাদাম, পেস্তার হালুয়া। যা চেহারা হয়েছে, চিনতে পারবেন না আপনি। এই টেবো-টেবো গাল, থলথলে ভুঁড়ি, গর্দানের উপরও চাপ-চাপ চর্বি। প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া কিনেছে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক ধরে তামাকই খায়। তারপর তেল মাখতে বসে। ওই পালোয়ানগুলো তেল মাখায় ওকে। বলে না কি, মাসাজ করলে শরীরের উপকার হবে। প্রথমে সর্ষের তেল, পরে অলিভ অয়েল, তারপর মাথায় ফুলেল তেল। খেতে বসে দুটো আড়াইটের সময়। মাছ, মাংস, রাবড়ি রোজ খায়। নানারকম তরিতরকারি খাবার জন্তে বাড়ির পিছনে বিঘে দুই জমিতে শাকসবজি লাগিয়েছে। হাঁস পুষেছে। রোজ ডিম খায়। খেয়ে-দেয়ে শোয় একটু। তারপর বিকেলে গিয়ে দিঘিতে মাছ ধরতে বসে। পালোয়ানগুলোও বসে। সন্ধ্যের পর থেকে আরম্ভ হয় গানের মজলিস। সাবিত্রী দেবী নাচেন। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গান-বাজনা চলে। আজকাল মদও চলছে শুনছি।"

"চুপ কর, বুঝেছি।"

থেমে গেল মুলুক দাস। তারপর আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে উঠে গেল। রাউত মশায় আরও খানিকক্ষণ গোঁফ চোমরালেন, তারপর তিনিও উঠে গেলেন।

॥ তিন ॥

এর পরই শুরু হল মকদ্দমা।

রঘুবীর রাউত এক জাল দলিল বার করে দাবি করলেন যে, মৃত্যুর পূবে সুমিত্রানন্দন তাঁর অংশের সম্পত্তি তাঁকে (অর্থাৎ রঘুবীরকে) বিক্রি করে গিয়েছিলেন। জমিদারিতে আইনতঃ অযোধ্যাপ্রসাদের কিছুমাত্র অধিকার নেই। কিন্তু সে জোর করে একটা মহাল দখল করে বসে আছে এবং অপব্যয় করে সম্পত্তি নষ্ট করেছে। আদালত থেকে তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করবার অনুমতি দেওয়া হক।

দ্বিতীয় মকদ্দমা করল নর্তকী সাবিত্রী দেবী। তাকে টাকা দিয়ে হাত করলেন রাউত মশাই এবং তাকে দিয়েই এক মকদ্দমা রুজু করা গেল। সাবিত্রী দেবী আদালতে হলফ করে বলে এল যে, অযোধ্যাপ্রসাদ তার উপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার, উকিল এবং আরও জনকয়েক প্রত্যক্ষদর্শী সমর্থন করলেন সাবিত্রী দেবীকে।

তৃতীয় মকদ্দমা করলে কয়েকটি প্রজা। তাদের নালিশ অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি জোর করে তাদের কাছে খাজনা আদায় করেছে। মারধোরও করেছে।

চতুর্থ মকদ্দমা করলে পিয়ারিলাল চনচনিয়া। অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি তাঁর মানহানি

করেছে। এইভাবে নানা ছুতোয় দশটা মকদ্দমা লাগিয়ে দিলেন রাউত মশাই অযোধ্যাপ্রসাদের বিরুদ্ধে।

ঘুমন্ত লোকের মাথায় যদি বাড়ির ছাত ভেঙে পড়ে, তা হলে তার যা অবস্থা হয়, অযোধ্যাপ্রসাদের তাই হল।

সে প্রথমটা ভাবলে যে, জ্যেঠামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এ-ভুল ভাঙতে দেরি হল না। মুলুক দাসই এ-ভুল ভাঙিয়ে দিলে। সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, রঘুবীর বলে পাঠালেন, তিনি তার মুখদর্শন করতে অনিচ্ছুক।

অযোধ্যাপ্রসাদের শ্বশুর শাঁসালো ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হল তাকে। সে মকদ্দমা লড়তে লাগল।

বছর দুই কেটে গেছে।

কয়েকটা মকদ্দমা জিতেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। কিন্তু আসল মকদ্দমাটা অর্থাৎ বিষয়ের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে যে মকদ্দমাটা হচ্ছিল, সেটা শেষ হয় নি। লোয়ার কোর্টে হেরে গেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। হাইকোর্টে আপিল করেছে।

মুলুক দাস রঘুবীর রাউতকে একটি খবর দিলে।

"অযোধ্যাপ্রসাদ, দেখলাম খুব রোগা হয়ে গেছে। দেহের চর্বি বিলকুল ঝরে গেছে। মুখ শুকনো, চুল উসকো-খুসকো —"

রাউত গোঁফ চোমরাতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

হাইকোর্টে রাউত হারলেন। কিন্তু তিনি ছাড়বার লোক নন, বিলেতে আপিল করলেন আবার। বিলেতের আপিলে জিতে গেলেন তিনি।

তারপর ডেকে পাঠালেন তিনি অযোধ্যাপ্রসাদকে। অযোধ্যাপ্রসাদ নতমস্তকে এসে দাঁড়াল।

"এই নাও—"

একটা খাম এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"কী এটা?"

"ডীড অব গিফট। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দান করলাম।"

অযোধ্যাপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটু ইতস্তত: করে মাথা চুলকে তারপরে বলল, "তা হলে মকদ্দমা করবার দরকার কী ছিল?"

তোমার বড্ড চর্বি হয়েছিল, সেটা একটু ঝরিয়ে দিলাম। বিষয়সম্পত্তি কী করে রক্ষা করতে হয় তারও একটু ট্রেনিং হয়ে গেল তোমার। বিপদে না পড়লে তো শিক্ষা হয় না। তুমি যে-রাস্তায় চলেছিলে তাতে আমাদের পিতৃপুরুষের বিষয়সম্পত্তি ডুবে যেত। আমি কাল কাশী যাব, আর ফিরব না। কাল থেকে তোমাকেই স্টেটের ভার নিতে হবে। যাও—"

অযোধ্যাপ্রসাদ প্রণাম করে চলে গেল।

কলার বিবর্তন

তখন সাহেবেরা এদেশে সভ্যতাবিস্তার করিয়াছেন। সাধারণ লোকে সাহেবদেরই দেবতা বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা কিছু ভালো, তাহাই বিলাতী বিশেষণে ভূষিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতাই যে আমাদের দেশকে ত্রাণ করিবে, এ বিশ্বাস শিক্ষিত সমাজেরও মনে শিকড় গাড়িয়াছে, অশিক্ষিত চাষাদের তো কথাই নাই। রেলগাড়ি দেখিয়াই তাহারা বুঝিয়াছে যে, বিলাতী দেবতারা অসাধ্যসাধন করিবে।

হারাধন সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিত। রেলগাড়ি চড়িবার জন্যই সে একদিন গ্রাম হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে কিছু পয়সা-কড়িও লইল। সে জানিত, বিনা পয়সায় কিছু হয় না। এ গোরুর গাড়ি নয় যে, গাড়োয়ানকে অনুরোধ করিলে, কিছুদূর চড়াইয়া লইয়া যাইবে। বিলাতী কলের গাড়ি, টিকিট কাটিয়া চড়িতে হয়। তা ছাড়া শহরে যাইতেছে, কিছু ভালো বিলাতী জিনিস পাইলে কিনিয়া আনিবে। সুতরাং কিছু টাকা-পয়সাও সে সঙ্গে লইল।

অনেক দূর হাঁটিয়া বর্ধমান স্টেশনে সে আসিয়া প্রথম ট্রেনে চাপিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়া গেল। অবাক কাণ্ড, মাত্র কয়েকঘণ্টায় কলিকাতা। গোরুর গাড়িতে আসিলে কয়দিন লাগিত, ঠিক কি!

কলিকাতার জনারণ্যে কিছুক্ষণ দিশাহারা হইয়া ঘুরিবার পর তাহার হুঁস হইল যে, পথ হারাইয়া গিয়াছে। বাড়ি ফেরা যাইবে না। ব্যাকুল হইয়া আরও কিছুক্ষণ ঘুরিল, কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না। অবশেষে হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিল বেচারা।

"কি .র কাঁদছিস কেন, কে তুই—"

"আমি হারাধন। পথ হারিয়ে ফেলেছি—"

"কোথা যাবি—"

"হাওড়া।"

"চল, আমিও হাওড়া যাব। গাছ কটা বেচে ফেলি। আয় আমার সঙ্গে।"

একটি গলির ভিতর দিয়া হারাধন একটা তরকারির বাজারে আসিয়া হাজির হইল। যে লোকটি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সত্যই তাহার কয়েকটি গাছ ছিল একটা ঝুড়িতে। হারাধন যদিও চাষা, তবু ওগুলো কি গাছ, তাহা চিনিতে পারিল না।

জিজ্ঞাসা করিল, "কলাগাছের মতো পাতা, ওগুলো কি গাছ?"

হারাধন যে কি জাতীয় খাজা, তাহা কলিকাতাবাসী শ্যামচাঁদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "কলাগাছই। বিলিতি কলা—"

"বিলিতি কলা! আমিই তা হলে কিনে নিই। কত দাম—"

"পাঁচটি আছে, পাঁচ টাকা পড়বে—"

"কিছু কম হবে না?"

হারাধন গোটাদশেক টাকা লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইযাছিল। ওই টাকা কয়টা জমাইতে তাহার এক বৎসর লাগিয়াছিল। তখন পাঁচটা টাকায় একটা ছোট-খাটো গোরু পাওয়া যাইত। পাঁচটা কলার চারা পাঁচ টাকা দিয়া কিনিবে কি না হারাধন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"নিবি তো, নিয়ে নে। আমিও ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাই, তোকে হাওড়ায় পৌছে দি। এ রকম জিনিস সহজে কোথাও পাবি না। আদত বিলিতি কলা—"

হারাধন চারাগুলি কিনিয়া ফেলিল।

"খুব ভালো গোবরের সার দিতে হবে।"

"তা আমি খুব পারব।"

বাড়ি ফিরিয়া খুব যত্ন করিয়াই সে বিলাতী কলার চারাগুলি পুঁতিল।

॥ দুই ॥

মাস ছয় কাটিয়াছে। গাছগুলি বড় হইয়াছে। কিন্তু কলা একটিও হয় নাই। মোচার মতো হয়, কিন্তু তাহা হইতে কলার কাঁদি বাহির হয় না, ফুল হইয়া যায়। কোনোটা লাল ফুল, কোনোটা হলদে। হারাধন আবার ভাল করিয়া গোবর দিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। ক্রমাগত ফুল হইতে লাগিল। কলা কই?

চটিয়া-মটিয়া আবার একদিন সে কলিকাতার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। এবার আর তাহার রাস্তা ভুল হইল না। সোজা সে সেই তরকারির বাজারে হাজির হইল আবার। সন্দেহ ছিল, শ্যামচাঁদের দেখা পাইবে কি না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শ্যামচাঁদ ছিল। অন্য ফুলের চারা বেচিতেছিল সে।

"এই যে! আচ্ছা, সেবার তুমি যে আমাকে পাঁচ টাকায় পাঁচটা বিলিতি কলার গাছ বেচলে, কিন্তু এক কাঁদি কলাও তো নামল না!"

শ্যামচাঁদ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া রহিল, তাহার পর মনে পড়িল তাহার।

"কিছুই হয় নি?"

"খালি ফুল হচ্ছে। নানা রঙের ফুল—"

"তাই তো হবে। বিলিতি কলা যে—"

"কি রকম—"

"ওতে খাবার কলা হয় না। দেখবার কলা হয়।"

"কিন্তু, দিব্যি করে বলছি, একটি কলাও দেখি নি।"

"কিন্তু, এখনি নিজের মুখে বললে, ফুল হচ্ছে।"

"তা হচ্ছে তো—"

"ওই ফুলই কলা। সাহেবরা বলে আর্ট, বাংলায় ওকেও কলা বলে।"

"কি রকম ?"

"ওই রকম। যাও, মেলা বক্‌বক্ করে আমার সময় নষ্ট কোরো না। বিলিতি কলাগাছে মর্তমান কলা ফলবে কি করে ? কি আপদ।"

হারাধন খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বহুকাল পরে সাহেব-বাড়ির এক মালী তাহাকে আর একটু জ্ঞানদান করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওর বিলিতি নাম ক্যানা—"

॥ তিন ॥

বিখ্যাত পুষ্পবিক্রেতা নগেন্দ্র নাথ এণ্ড কোং-এর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। ক্যানা ফুল বিক্রয় করিয়াই তিনি মাসে হাজার টাকা রোজগার করেন। তাঁহার ক্যানা না কি ভারতবর্ষের বাহিরেও যায়। হারাধন ছিলেন নগেন্দ্রনাথের পূর্ব-পুরুষ। নগেন্দ্রনাথ আর একটি জিনিসও করিয়াছেন। একরকম এসেন্স বাহির করিয়াছেন, যাহার গন্ধ ঠিক কলার মতো। জিনিসটা ঘোলের শরবতে খুব চলে।

॥ চার ॥

নগেন্দ্রনাথের পুত্র স্মরজিৎ নূতন পথ ধরিয়াছে।

সে একজন অতি আধুনিক কবি। বাজারে বেশ নাম হইয়াছে

শ্রীনাথ সেনের 'তুমি'

শ্রীনাথ সেন কবি ছিলেন বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, তিনি একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ জানে না, জানবেও না, কারণ তিনি তাঁর একটি লেখাও ছাপান নি। তাঁর কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাঁর পরিচয়ও কেউ জানে না। তিনি নির্জন বনে ফুটে নির্জনেই ঝরে গেলেন। নির্জন বনেও দু চারটি পুষ্পরসিক অলি আসে, সেইভাবেই তাঁরও দু চারজন সমঝদার বন্ধু জুটেছিল। যাঁরা ইংরেজি ভাষা জানেন না, তাঁদের পক্ষে তাঁর কবিতার রস-গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কারণ, অধিকাংশই কবিতাই তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে। সংস্কৃতেও দু চারটে লিখেছিলেন, কিন্তু তার সংখ্যা খুব অল্প।

তাঁর ইংরেজি কবিতার দু চারটে অনুবাদ নীচে দিচ্ছি, মূলের সঙ্গে অবশ্য অনুবাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ, তবু দিচ্ছি, কারণ তা হলে লোকটাকে বোঝা সহজ হবে। একটা কবিতায় লিখেছেন—"তুমি এসেছ, কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার শাখা শোভিত হয়েছে তোমার আগমনে, স্বীকার করছি, কিন্তু এ-ও আমি বলব, তুমি এসেছ, কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। রাত্রির পর দিন যেমন আসে, অমাবস্যার পর দেখা দেয় যেমন শিশুচাঁদ পূর্ণিমার সম্ভাবনা নিয়ে তেমনি তুমি এসেছ। তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার জীবনে তোমার আগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাই এসেছ। তোমাকে অভ্যর্থনা করি তবু"। আর একটা কবিতায় বলছেন—"আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ। আমার স্থূল অঙ্গুলিস্পর্শে ও-সুর বাজত না। আমার স্থূল অঙ্গুলি তবু বার বার তোমাকে বাজাতে চেষ্টা করেছে, বাধা দিয়েছে তোমার স্বতোৎসারিত সুর-লীলায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি প্রতিষ্ঠিত করেছ নিজের মহিমা। তোমার স্বর্গীয় সুরসাধনা উপভোগ করেছে অসংখ্য নক্ষত্র নিশীথসভায় বসে, আমিও করেছি। কিন্তু, আমি দিনেও তোমার গান শুনেছি। ভিড়েও শুনেছি, একাও শুনেছি। তাই বার বার অনুভব করেছি, আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ ..."

আর একটি কবিতায় বলেছেন, "রক্তের সমুদ্র থেকে প্রতি প্রভাতে তোমার জন্ম হয়; উর্বশীর মতো নয়, মৃত্যুর মতো। জীবনের ছদ্ম-বেশে আলোকের ছলনায় সমস্ত দিন ভোলাও তুমি আমাকে, আমিও ভুলি, কারণ আমি ভুলতে চাই। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, আবার রক্তের সমুদ্র থইথই করে পশ্চিম দিগন্তে, আকাশের নীলের সঙ্গে, রাত্রির কালোর সঙ্গে মেশে রক্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ-নর্তন। তাতে ঝাঁপ দাও তুমি। তোমার মেখলার মুক্তারা ছড়িয়ে পড়ে নক্ষত্রের মতো .."

চতুর্থ যে কবিতাটির অনুবাদ দিচ্ছি, সেটি আমিও ভালো বুঝি নি। কিন্তু আমার মনে হয়, এরই মধ্যে তাঁর মৃত্যু-রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

"অন্ত সরে সরে যাচ্ছে আদির কাছ থেকে। কে যেন তাকে সরিয়ে দিচ্ছে জোর করে, হয়তো সময়ের স্রোত-বেগে অসহায়ের মতো ভেসে চলেছে। কিন্তু চিরকাল যাবে না, স্রোতের বিরুদ্ধে শুরু হবে তার অভিযান। আদির কাছে ফিরে আসবে অন্ত, রক্তাক্ত কলেবরে, স্রোতের বিরুদ্ধে, সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে। তখন অন্ত হবে অনন্ত, আদি হবে অনাদি। প্রলয়ের কালরাত্রে অন্তিম আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে তারা। তুমি তখন হাসবে…"

এই তুমির উল্লেখ তাঁর প্রতিটি কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র মতো ইনি কল্প-লোক-বাসিনী না। ইনি যে সশরীরে মর্ত্যে ছিলেন, তার প্রমাণ অন্ততঃ একবার পাওয়া গিয়েছিল। একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে শ্রীনাথ সেনের পরিবারিক পটভূমিকাটি আঁকা প্রয়োজন।

।। দুই ।।

শ্রীনাথ সেন ছিলেন জমিদারের একমাত্র ছেলে। জমিদার হরিনাথ সেনের পরিচয় তাঁর জমিদারির লোকেরা সকলেই জানত। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটি বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন চার-পাচ শো লোকের পাতা পড়ত। গরীব-দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর, চাকরদেরও আত্মীয়, গরীব প্রতিবেশী সবাই খেত সেখানে। তা ছাড়া অতিথিশালা তো ছিলই। তাঁর বাড়ির হাতাতেই পাঠশালা ছিল একটা, বিনা বেতনে বহু ছাত্র সেখানে পড়ত। এই সবই হরিনাথ সেনের বিলাস ছিল। মদে বা মেয়েমানুষে একটি পয়সা নষ্ট করেন নি তিনি। আশ্চর্যের বিষয়, এইজন্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি তাঁর বিরোধ বেধেছিল। তাঁর স্ত্রী সর্বাঙ্গসুন্দরীর বাপের বাড়ির চাল-চলন ছিল অন্যরকম। বাল্যকাল থেকেই মাইফেল দেখে অভ্যস্ত তিনি, ওস্তাদ-বাইজীর আড্ডা ছিল সে বাড়িতে। ঘরকুণো সাধু স্বামী পছন্দ হয় নি তাঁর। তিনি অধিকাংশ সময়েই বাপের বাড়িতে থাকতেন। শ্রীনাথ সেনের জন্ম মামার বাড়িতেই হয়েছিল, বাল্যকালটাও কেটেছিল সেখানে। সম্ভবতঃ মায়ের জেদেই তাঁকে বিলেত পাঠানো হয়েছিল। সেকালে বড়লোকদের ওই এক কায়দা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ, জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ সকলেই বিলেতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। শ্রীনাথ সেনও গিয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত হন নি, কারণ তিনি বিখ্যাত হতে চান নি। চাইলে, হতেন। তিনি যখন বিষয়ের উত্তরাধিকারী হলেন, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন তিনি। সমস্ত জমিদারিটি বিক্রি করে দিয়ে কোলকাতায় এসে ভাড়া-বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। জমিদারি-প্রথার যে উচ্ছেদ হবে এ তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সর্বাঙ্গ-সুন্দরীর মৃত্যু স্বামীর আগেই হয়েছিল।

শ্রীনাথ সেন তাঁর স্ত্রী ললিতা ও একমাত্র পুত্র আদিনাথকে নিয়ে আহিরিটোলায় ছোট একটি বাড়িতে থাকতেন। সেইসময়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, যদিও তিনি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। একটা ঘরে একা একা চুপচাপ থাকতে ভালবাসতেন। পরে জেনেছি, সেখানে বসে কবিতা লিখতেন। দিনরাত ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকতেন, অনেক সময় বোঝাও যেত না যে, তিনি বাড়িতে আছেন কি নেই। তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারতেন না। তিনি যে ঘরে থাকতেন, সে ঘরে আর একটি দরজা ছিল বাইরের দিকে। সেই দরজা দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর কাছে। তিনিও মাঝে মাঝে ওই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যেতেন। কোথায় যেতেন কেউ জানে না।

আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর খাসবেয়ারা হরলালের মাধ্যমে। হরলালকে তিনি ফরমাশ করেছিলেন একজন ভাল লিখিয়ে যোগাড় করবার জন্যে। তাঁর ফরমাশ—হাতের লেখা শুধু মুক্তোর মতো হলেই হবে না, তা শিল্প হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি একজন উঁচুদরের ক্যালিওগ্রাফার খুঁজছিলেন। আমার জানা-শোনা একটি লোক ছিল—সুরেন পাল। তাকে নিয়ে গেলাম একদিন। তিনি বললেন, আমার এই কবিতাগুলি খুব দামী কাগজে ভালো করে লিখতে হবে। সুরেন পালের কাজ দেখে পছন্দ হল তাঁর। কবিতা পিছু একশ টাকা করে দিতেন। আট-দশ লাইনের একটি কবিতা লিখতে প্রায় মাসখানেক লাগত। কী রঙে লেখা হবে তাই ঠিক করতেই কেটে যেত কয়েকদিন। নানারকম রং এনে নিজেই মিশিয়ে মিশিয়ে দেখতেন, তারপর সুরেনকে বলে দিতেন সেটা। এইসূত্রেই তাঁর কবিতা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ছাপাবার কথা বলেছিলাম তাঁকে একবার। তিনি বলেছিলেন—ছাপাব? বলেন কি! প্রিয়াকে বাজারে বার করে না কি কেউ! কবিতা আমার অসূর্যম্পশ্যা প্রেয়সী।

নিজের বউকে কিন্তু তিনি খুন করেছিলেন। কেন করেছিলেন, তা নিয়ে যে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু সুরেন যা বলে তাই সত্যি বলে মনে হয়। সুরেনকে দিয়ে তিনি প্রায় একশটি কবিতা লেখান। লিখে সেটিকে ভালো মখমল দিয়ে বাঁধান। তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবী নাকি তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। দশ বারোটা কবিতা ছাড়া, বাকি কবিতাগুলো সব পুড়ে যায়। দু-একটা আধ-পোড়া কবিতা আমি নিজেও দেখেছি। উপরে যেগুলির অনুবাদ দিলাম, সেগুলির মধ্যে দুটি আধ-পোড়া কাগজ থেকেই উদ্ধার করেছি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ পুলিসও ঠিক করতে পারে নি। তাদের মতে, ললিতা দেবী আত্মহত্যা করেই মারা গিয়েছিলেন, কারণ তাঁকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সমস্ত কাপড়ে, জামায় স্পিরিট লাগিয়ে আগুন ধরানো হয়েছিল। স্পিরিট তিনি স্বহস্তে দিয়েছিলেন, না, শ্রীনাথ সেন ঢেলে দিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেকে তিনি বিলেত পাঠিয়ে দেন। আহিরীটোলার বাসায় তিনি একাই থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম অবশ্য। কিন্তু গিয়ে স্বস্তি পেতাম না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। প্রায়ই প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে থাকতেন। হঠাৎ একদিন বলতেন, কবিতা শুনবেন? লিখেছি একটা। কবিতা শোনবার জন্তেই যেতাম আমরা। আগ্রহপ্রকাশ করলে কোনো কোনো দিন শোনাতেন, কোনো দিন বা বলতেন, আজ থাক, মেজাজটা ভালো নেই।

একটা গুজব কিন্তু চাউর হচ্ছিল ক্রমশঃ তাঁর সম্বন্ধে। তিনি নাকি গভীর রাত্রে কোথা যান। পায়ে হেঁটে যান। পাড়ার গাঙ্গুলীখুড়ো বললেন, "মেয়েমানুষ রেখেছে—।" মিত্তিরমশাই নাকের দুটি ছ্যাঁদাই নস্যিতে বোঝাই করে বললেন, "রেখেছিস, বেশ করেছিস। পয়সা আছে, গুড় খাচ্ছিস, তবে অত ঢাক-ঢাক কেন। মরদকা বাচ্চা, যা করবি চুটিয়ে কর—"

এইধরনের নানা আলোচনা হতে লাগল তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি কোথায় যান, তা কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। দু-একজন তাঁর পিছু নিয়েছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি। তারা বলে, তিনি হয় গড়ের মাঠে, না হয় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মেয়েমানুষ দেখে নি তারা।

বছরকয়েক পরে তাঁর ছেলে ফিরে এল ব্যারিস্টার হয়ে। তার ফিরে আসার দিন-সাতেক পরেই শ্রীনাথ সেনের মৃত্যু হয়। শোচনীয় মৃত্যু। গড়ের মাঠেই একদল গোরার সঙ্গে লড়তে লড়তে মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁর ব্যাঙ্কে একটি কপর্দকও আর নেই। তিনি গোরাদের সঙ্গে কেন লড়েছিলেন, কি করে তাঁর ব্যাঙ্কের অত টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল, এ সবেরও কোনও সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারি নি আমরা।

মিত্তিরমশাই বললেন, "মেম রেখেছিল বোধ হয়, তাই গোরাদের আক্রোশ হয়েছিল। আর টাকাকাড়ি সব ওই মাগীর গর্ভেই গেছে—এ তো সোজা হিসেব।"

লোহার সিন্দুকে একটি চিঠি ছিল, ছেলে আদিনাথের নামে। ছোট্ট চিঠি।

বাবা আদিনাথ,

ইচ্ছে করেই তোমার জন্তে ব্যাঙ্কে কিছু রেখে গেলাম না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, পিতৃপুরুষের জমানো টাকা নিয়ে যারা জীবন শুরু করে, তারা প্রায়ই অমানুষ হয়। জীবনপথে বেশি টাকা থাকাটা নিরাপদ নয়। আশা করি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সে শিক্ষা তোমাকে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশীর্বাদ জেন। ইতি, তোমার বাবা।

টাকা-কড়ির অভাব, সুতরাং শ্রাদ্ধের আয়োজন খুব সামান্তভাবেই করা হয়েছিল। আদিনাথ শ্রাদ্ধের কাজ আরম্ভ করতে যাবে, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল, আর তার পিছু পিছু একখানা ট্যাক্সি।

মোটর থেকে কালো-বোরখা-পরা একটি মহিলা নেবে এলেন। ধপধপে সাদা পা দুখানি ছাড়া তাঁর অঙ্গের আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আদিনাথ কোথা—"

আদিনাথ এগিয়ে গেল।

মহিলা তখন বোরখার ভিতর থেকে একটি দলিল বার করলেন। "এ দলিলটি নাও তুমি—"

"কিসের দলিল—?"

"দানপত্র। তোমার বাবা আমাকে দুটি বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন, একটি গড়ের মাঠের কাছে, আর একটি গঙ্গার ধারে। সে দুটি তোমাকেই আমি দিয়ে যাচ্ছি। আর এটাও রাখ—"

মোটর-ড্রাইভার একটি বাক্স নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

"তোমার বাবা আমাকে যে গয়না আর নগদ টাকা দিয়েছিলেন, তা এই বাক্সে আছে। এগুলোও তুমি নাও। আমার মোটরখানাও তুমি ব্যবহার কোরো।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম সবাই।

আদিনাথ বললে, "আপনি কে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি ওঁর কবিতার তুমি। এই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এই বলেই উনি চলে যেতে উদ্যত হলেন।

আদিনাথ একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি যাচ্ছেন কোথা—"

"তীর্থে।"

যে ট্যাক্সিটা মোটরের পিছু পিছু এসেছিল, সেইটেতে চড়ে চলে গেলেন তিনি।

ভগবানের দয়া

দীননাথ মল্লিক দীনের নাথ হইতে পারেন নাই, সারাজীবন নিজেই তিনি অত্যন্ত দীন ছিলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি নাথ হইয়াছিলেন ভূতিবালার, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দৈন্য ঘোচে নাই, স্বয়ং লক্ষ্মীর আর এক নাম ভূতি হওয়া সত্ত্বেও ঘোচে নাই। আপিসের চাকরিতে যে গ্রেডে বাহাল হইয়াছিলেন, তদনুসারেই মাহিনা বাড়িয়াছিল, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় নাই। এক হিসাবে অবশ্য ভূতিবালা তাঁহার অনেক আর্থিক সুবিধা করিয়াছিলেন, তাঁহার একটিও সন্তান হয় নাই। দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে হইলে দীননাথ অকূলপাথারে পড়িতেন। তথাপি এই ব্যপদেশে তাঁহাকে কিছু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। সামর্থ্যহীন দরিদ্রেরও সন্তান-আকাঙ্ক্ষা থাকে, দীননাথ এবং ভূতিবালারও ছিল। তাই ডাক্তারদের দ্বারে দ্বারে কিছুদিন তাঁহারা ঘুরিয়াছিলেন। প্রায় শতখানেক টাকা খরচ হইয়া যাইবার পর তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, সন্তান হইবার আশা নাই। একটি মেনি বিড়াল পুষিয়া ভূতিবালা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলেন। মেনিটি মরিয়া গেলে একটি টিয়া পুষিলেন। টিয়া মরিয়া গেলে ময়না। তাহার পর খরগোস। এইভাবেই তাঁহাদের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন কাটিয়াছে। বাকি জীবনটাও হয়তো কাটিয়া যাইত, কিন্তু মুশকিল হইল যখন ভূতিবালার দক্ষিণ অঙ্গটি পড়িয়া গেল। ষাট বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত হইলে তাহা আর সারে না। মৃত্যুই তখন একমাত্র ত্রাণকর্তা। মৃত্যু কিন্তু ভূতিবালাকে ত্রাণ করিল না। ভূতিবালা তো বিপদে পড়িলেনই, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা শতগুণ বিপদে পড়িলেন দীননাথ। দীননাথের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। (সঠিক হিসাব আটষট্টি বৎসর, দুই মাস, ছয় দিন), আপনার জন বলিতে কেহ নাই। ওই ভূতিবালাই তাঁহার প্রিয়া, শিষ্যা, সচিব সব, উপরন্তু রাঁধুনী, চাকরানী, ধোপানিও। ভূতিবালার পক্ষাঘাত হওয়াতে দীননাথই পঙ্গু হইয়া পড়িলেন বেশী। কিন্তু ভগবান আছেন, তিনি দয়া করিলেন। কিছুদিন পূর্বে সুধাংশু বোসের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সেই ছোকরাই এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিল। সুধাংশু বোস সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার। চমৎকার ছেলে। এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি. এস. দুইটা ডিগ্রিই অর্জন করিয়াছে। লোকহিসাবেও মহানুভব। কোনো ফি না লইয়া সে ভূতিবালার চিকিৎসার ভার লইল, কিছু কিছু ঔষধপত্রও নিজের পকেট হইতে কিনিয়া দিল। ইহাতে দীননাথ কৃতার্থ তো হইলেনই, একটু লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়াও পড়িলেন। লজ্জিত হইলেন দারিদ্র্যের জন্য এবং অপ্রতিভ হইলেন আজকালকার ছোকরাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন বলিয়া। চিকিৎসা-রূপী ঝামেলা অনেকটা মিটিল বটে, কিন্তু ঝামেলা জিনিসটা সহজে মিটিবার নহে, অন্যান্য নানা রূপ ধারণ করিয়া তাহা দীননাথকে বিব্রত করিতে লাগিল। ভূতিবালার সেবা

করে কে, পথ্য প্রস্তুত করে কে, তাঁহার নিজের জন্যই বা রান্না করে কে। এই সব জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হইত, যদি দীননাথ অর্থবান হইতেন। দীননাথ পেন্সন পান মাত্র পঁচানব্বুই টাকা। বাড়িভাড়া দিতে হয় পঁচিশ টাকা। বাকি সত্তর টাকায় কোনোক্রমে দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ভূতিবালা অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহার জন্য খরচ কিছু বাড়িয়াছে। সুধাংশু ডাক্তার নানারকম ফুড এবং ভিটামিনের ব্যবস্থা করিয়াছে। গরম জলের সেঁক দিবার জন্য হটওয়াটার ব্যাগ কিনিতে হইয়াছে, বেডপ্যান, ইউরিনালও কিনিতে হইয়াছে। সবই ওই সত্তর টাকার মধ্যে। ইহার উপর চাকর বা রাঁধুনি রাখা সম্ভব নয়।

আবার ভগবান দয়া করিলেন। ওই সুধাংশু ডাক্তারই আবার একদিন দীননাথের দীনতার অন্ধকারে সত্যসত্যই সুধাংশুর মতো উদিত হইল।

"এই লোকটাকে নিয়ে এলাম। এ আপনার এখানে পেটভাতায় থাকবে। রাঁধতেও জানে। রাত্রে আপনার বারান্দায় শুয়েও থাকবে। রাখুন একে।"

একটি কুচকুচে কালো যুবক দীননাথকে নমস্কার করিল। দীননাথ ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে পেলেন কোথা ?" "আমার চেম্বারে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলছে পশ্চিমে ওর বাড়িঘর ছিল, দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে। লেখাপড়াও শেখে নি বিশেষ, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। কোলকাতায় রোজগার করবার জন্যে এসেছে, কিন্তু কাজ পাচ্ছে না, তাই ভিক্ষে করে দিন চালাচ্ছে। আমি আপনার কথা বলাতে রাজি হল। আপনারও তো লোক দরকার একজন---"

"হ্যাঁ, খুব দরকার।"

"একেই রাখুন তা হলে আপাততঃ।"

কিছু খরচ বৃদ্ধি হইল, কিন্তু উপায় কি।

রাধিকারমণ দীননাথের বাড়িতে রহিয়া গেল।

॥ দুই ॥

কিছুদিন পরেই দীননাথ অনুভব করিলেন (মানে, আন্দাজ করিলেন) যে, পূর্বজন্মে তিনি নিশ্চয়ই যৎসামান্য কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাই রাধিকারমণের মতো সর্বগুণান্বিত ভৃত্যটি তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। রান্না করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে, বাজার করে। ইহার উপর ভূতিবালার সেবা করিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু ভূতিবালা তাহা করিতে দেন না। পরপুরুষ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে, ইহা তিনি চান না। দীননাথকেই সব করিতে হয়। কিন্তু এই কর্মটি দীননাথের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। ভূতিবালা স্থূলাঙ্গিনী, দীননাথ শীর্ণকায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভূতিবালাকে নাড়াচাড়া করিবার শক্তি দীননাথের ছিল না। প্রত্যহ

বিছানা বদলানো, গা মুছাইয়া দেওয়া, পিঠে স্পিরিট-পাউডার দেওয়া, বেডপ্যান দেওয়া-নেওয়া, এ সব কর্ম দুই-একদিন করা যায়, রোজ করা সম্ভবপর নহে। দীননাথের খুবই কষ্ট হইতেছিল, ভূতিবালাও তাহা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি। অসহায়ভাবে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পূর্বজন্মে কত পাপই যে করিয়াছি তাই এ জন্মে স্বামীকে দিয়া নরক ঘাঁটাইতেছি। ভগবান আমাকে শাস্তি তো অনেক দিলে, এবার চরণে স্থান দাও। ভগবান কিন্তু এ অনুরোধটি রক্ষা করিলেন না। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না। দীননাথ নরকভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে অবশ্য ভগবান দয়া করিলেন। কিন্তু একটু অন্যভাবে। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না, বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। অনেকদিন পরে চামেলীকে তাঁহার মনে পড়িল।

চামেলী তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাহারও তিনকুলে কেহ নাই। থাকে তাহার পিসামশায়ের কাছে জব্বলপুরে। তাহাকে লিখিলে সে হয়তো আসিতে পারে। টানিয়া টানিয়া কথাগুলি তিনি দীননাথকে বলিলেন। প্রস্তাবটি ভালো, তবু দীননাথকে মাথা চুলকাইতে হইল, সংসারে আর একটি লোক-বৃদ্ধি হওয়ার মানেই খরচবৃদ্ধি। এখনই তো রাধিকারমণ থাকাতে খরচ বেশ বাড়িয়াছে। চামেলী আসিলে সত্তর টাকায় কুলাইবে কি? ইহার উত্তরে ভূতিবালা যাহা বলিলেন, তাহা কিন্তু খুবই আশ্বাসজনক। খবরটা দীননাথ জানিতেন না, চামেলীর কথাই জানিতেন না তিনি। চামেলীর পিতা নাকি পুলিসের সি. আই. ডি. ছিলেন। অগ্নিযুগে বোমারুদের ধরাইয়া দিতেন। অবশেষে একজন বোমারুর গুলিতেই তিনি নিহত হন। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেজন্য চামেলীর মা এবং চামেলীর জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাতা দিতেন। চামেলীর মা মারা যাইবার পর ভাতা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও চামেলী প্রতি মাসে কিছু করিয়া পায়। কত পায়, তাহা ভূতিবালা সঠিক জানেন না, কিন্তু তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন যে চলিয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই, বিবাহ হইলে, বিবাহের খরচস্বরূপ কিছু টাকাও নাকি গভর্ণমেণ্ট দিবে। চামেলীর মা মারা যাওয়ার পর, বাধ্য হইয়া চামেলীকে পিসামশায়ের নিকট যাইতে হইয়াছে, কারণ দেশে তাহার অভিভাবকত্ব করিবার মতো নিকট-আত্মীয় কেহ ছিল না। ভূতিবালার বিশ্বাস, চামেলীকে খবর দিলে সে আসিবে। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন। সম্পর্কটা খুবই দূর, তাই দীননাথ প্রথমটা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ গুছাইয়া একটি পত্র চামেলীকে, আর একটি তাহার পিসামশায়কে লিখিয়া দিলেন। ভগবান দয়া করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পিসামশায়ের উত্তর পাওয়া গেল। সংক্ষিপ্ত উত্তর। লিখিয়াছেন, চামেলীকে লইয়া শীঘ্রই যাইতেছি, সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। দিনসাতেকের মধ্যে তিনি চামেলীসহ আসিয়া পৌছিয়া গেলেন। সাক্ষাতে যাহা বলিবেন লিখিয়াছিলেন, তাহা গোপনে দীননাথকেই বলিলেন।

"মহাবিপদে পড়েছিলাম মেয়েটাকে নিয়ে মশাই। পাড়ার চার পাঁচটা ষণ্ডা ছোঁড়া দিনরাত আমার বাড়ির চারদিকে চক্কোর মারে। সিটি দেয়, রাত্রে টর্চ ফেলে, চিঠি লেখে। আর মেয়েটাও একটু ফরওয়ার্ডগোছের, বুঝলেন। কি করব, দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এমন সময় আপনার চিঠিটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক ঢিলে দুই পাখি মল। আপনার উপকারও হল, ওকে ওখান থেকে সরানোও হল।"

পিসামশায়ের মুখেই তিনি শুনিলেন, চামেলী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিমাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়া ভাতা পায়। বিবাহ হইলে এক হাজার টাকা দিতেও গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন, তবে এখন স্বদেশী গভর্নমেণ্ট হইয়াছে, দিবে কিনা কে জানে। পিসামশায়ের মতে ও-মেয়ের বিবাহ হইবে না, ষাঁড়াইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ষাঁড়ের মতো মোটা ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসামশায় পরদিনই চলিয়া গেলেন।

দীননাথ এবং ভূতিবালা লক্ষ্য করিলেন, চামেলী মেয়েটি হাস্যমুখী, একটু সাজগোজ করিতে ভালবাসে, আর খুব নেটিপেটি। খাটিতেও পারে খুব। গায়ে জোরও আছে। অবলীলাক্রমে সে ভূতিবালার সেবার সমস্ত ভার লইল। দীননাথের মনে হইল, সবই ভগবানের দয়া। সব শুনিয়া সুধাংশু ডাক্তারও খুশী হইল।

কিন্তু আর একটি সমস্যা দেখা দিল দুই মাস পরে।

॥ তিন ॥

ভূতিবালার মনেই দেখা দিল প্রথমে। পক্ষাঘাত হওয়াতে তাঁহার দেহটাই অসমর্থ হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিল, মন মোটেই নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মাস দুই পরে স্বামী দীননাথের জন্য তাঁহার একটু চিন্তা হইল। চামেলী সম্পর্কে দীননাথের কোনও অশোভন আচরণ অবশ্য তিনি দেখেন নাই – দেখিবেনই বা কিরূপে, তিনি তো শয্যাগত – কিন্তু ভূতিবালা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, চামেলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঘনিষ্ঠতা তো হইবেই, দুটিমাত্র ঘর, দুটি ঘরের মধ্যে যে দরজা আছে তাহাতে কপাট নাই, তা ছাড়া শালী সম্পর্ক, ঘি ও আগুন···ভূতিবালার আশঙ্কা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। ভূতিবালা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করা যায়। চামেলী তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, দীননাথ তো অপরিহার্যই। ভূতিবালা চিন্তা করিয়া কোনো কূলকিনারা পাইতেছিলেন না হঠাৎ কিন্তু একদিন তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। দীননাথ তাঁহার ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইতেন। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল, লক্ষ্য করিলেন, দীননাথ বিছানায় নাই। দুই একবার ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না। চামেলী

পাশের ঘরে থাকে, তাহারও সাড়া পাইলেন না। একটু পরে দীননাথ চামেলীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে গো?"

"পায়খানায়। তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে এ দরজাটা আর খুলি নি, চামেলীর ঘর দিয়েই গিয়েছিলাম।"

"চামেলী কোথা?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"একটু ডেকে দাও তো। মাথার বালিশটা সরে গেছে।"

"আমিই ঠিক করে দিচ্ছি। ও বেচারী সমস্ত দিন খাটে তো, মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে।"

চামেলীর প্রতি এই দরদটু ভূতিবালার একেবারে ভালো লাগিল না। ঈর্ষার জ্বালা যদি পক্ষাঘাতের অব্যর্থ ঔষধ হইত, তাহা হইলে ভূতিবালা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিতেন। তিনি সেদিন আর কিছু বলিলেন না। পরদিন চামেলী যখন রাস্তার কল হইতে জল আনিতে গেল, তখন তিনি প্রস্তাবটি করিলেন।

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। চামেলী সোমত্ত মেয়ে, ওর সঙ্গে তোমার এমনভাবে মেলা-মেশা করাটা লোকতঃ ধর্মতঃ খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। অথচ অন্য উপায়ও তো নেই। তাই আমি বলছি, ওকে তুমি বিয়েই করে ফেল—"

দীননাথ আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বলছ কি তুমি!"

"ঠিকই বলছি। ভগবানের দয়ায় বলতে নেই তোমার শরীরটি এখনও সুস্থ আছে। কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারলুম না, আমি এখন তোমার গলগ্রহ। আর আমাকে সেবা করবার জন্যেই চামেলীকে এনেছি, ওকে ছাড়া আমাদের চলবেও না, তাই বলছি বিয়ে কর ওকে, পালটি ঘরও আছে, তোমার দিক থেকেও ভালো হবে, আমার দিক থেকেও হবে। এ রকম বিয়ে তো কত হয়। ভেবে দেখো কথাটা—"

দীননাথ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে গিয়া কিন্তু তিনি অনুভব করিলেন যে, ব্যাপারটাকে প্রণিধান বা পর্যালোচনা করিতে হইলে সুধাংশু ডাক্তারের প্রাজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইবে। ছোকরার বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। তা ছাড়া হিতৈষীও। তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছু করা চলিবে না।

সব শুনিয়া সুধাংশু বলিল, "আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এ অবস্থায় বিয়ে করাই উচিত, আর করলে ক্ষতিই বা কি। আর কিছু না হোক, কেলেঙ্কারির ভয় থাকবে না। সত্যি, আপনার নামে, আপনার পাড়ার লোকেরা ফুসফুস, গুজগুজ আরম্ভ করেছে, কানে এসেছে আমার। বিয়েই করে ফেলুন। জড়ই মেরে দিন ব্যাপারটার।"

"কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করে যদি আবার ছেলেপিলে হয়ে যায়, তা হলেই তো

মুশকিল! যদিও অবশ্য আগে জনকয়েক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, আমার ছেলেপিলে হবে না। কিন্তু যদি হয়ে যায়—"

"তা হলে এক কাজ করুন। আসুন, আপনার ভাসেকৃটমি করে দি।"

"সে আবার কি?"

"সামান্য একটা অপারেশন। ওটা করে দিলে ছেলেপিলে হওয়ার ভয় আর একদম থাকবে না। আর ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না, চামেলীর কানে যেন না যায়। শুনলে হয়তো সে-ই আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না।"

"না, না, আমি কাউকেই বলব না। বেশী সিরিয়াস অপারেশন নয় তো?"

"আরে, না, না, সে কিছুই নয়। চামেলী কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?"

"না, তাকে জিগ্যেস করা হয়নি এখনও।"

"জিগ্যেস করুন। যদি রাজি হয়, খুব ভালো হবে আপনার পক্ষে। আপনার স্ত্রী যে এত বুদ্ধিমতী, তা জানতাম না।"

"ওর দেহটাই মোটা, বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। এতদিন দেখছি তো—"

ভূতিবালাই কথাটা চামেলীর কাছে পাড়িলেন। সে হ্যাঁ বা না কিছুই বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। ভূতিবালা এবং দীননাথ উভয়েই বুঝিলেন, সম্মতি আছে। দিনকয়েক পরে সুধাংশু তাঁহার অপারেশনটুকুও করিয়া দিল। দীননাথ বাড়িতে রটাইলেন যে, কুঁচকির কাছে একটা ফোড়া হইয়াছিল, সুধাংশু ডাক্তার সেটা অপারেশন করিয়া দিয়াছে। দিনসাতেক শুইয়া রহিলেন, তাহার পর সব ঠিক হইয়া গেল। তাহার পর পাঁজি দেখা হইল, মাসখানেক পরে বিবাহের শুভদিনও একটা পাওয়া গেল। কিন্তু গোল বাধিয়া গেল হঠাৎ একটা। হিন্দু কোড বিল পাশ হইয়া গেল। আইন হইল, এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলিবে না। করিতে হইলে, আদালতের সহায়তা লইয়া প্রথম বিবাহ-বন্ধনটি বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। দীননাথ ইহাতে রাজি হইলেন না। বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার সঙ্গত কারণ অবশ্য দীননাথের ছিল, আদালত হয়তো তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। বরং এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, ভূতিবালা ও সুধাংশু জোর করিয়া তাঁহার স্কন্ধে চামেলীকে চাপাইবার চেষ্টায় ছিল, আইনটা পাশ হওয়াতে তিনি রক্ষা পাইলেন। বলিলেন, সবই ভগবানের দয়া।

॥ চার ॥

মাসছয়েক পরে ভূতিবালা স্বর্গারোহণ করিলেন।

বিবাহের বাধা অপসারিত হইল, তবু কিন্তু দীননাথ ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। মাস দুই কাটিল। তারপর হঠাৎ চামেলী একদিন তাঁহাকে বলিল, "এবার বিয়েটা হয়ে যাক, আর দেরি করা উচিত নয়।"

"কেন"—বিস্মিত দীননাথ প্রশ্ন করিলেন।

উত্তরে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া গেল। চামেলী সন্তান-সম্ভবা!

ছুটিয়া চলিয়া গেলেন তিনি সুধাংশু ডাক্তারের কাছে। সমস্ত শুনিয়া ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, "তা হলে সম্ভবত: আমি অপারেশনটা ঠিক করে করতে পারি নি।"

"কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হলপ করে বলছি—"

"চুপ করুন। ভাবতে দিন আমাকে।"

দীননাথ থামিয়া গেলেন। সুধাংশু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম হইয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে দীননাথ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আর একটা বিপদও হয়েছে।"

"আবার কি?"

"রাধিকারমণও কাল থেকে সরেছে।"

সুধাংশুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল।

"এখন কি করি বলুন?"

"বিয়েই করে ফেলুন চামেলীকে। ও ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

বিবাহ হইয়া গেল। যথাসময়ে চামেলী একটি কুচকুচে কালো পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সুধাংশু তাহার নাম রাখিয়া দিল—কোকিলকুমার।

॥ পাঁচ ॥

আরো পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

চামেলীরও মৃত্যু হইয়াছে। সুধাংশু ডাক্তারও একটা বড় চাকরি পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। দীননাথের বয়স প্রায় পঁচানব্বই। কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে, চোখে দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কোকিলকুমার এখন পঁচিশ বৎসরের যুবক। সে লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো ছিল, এখন ভালো চাকরি করিতেছে। সে-ই এখন স্থবির দীননাথের একমাত্র অবলম্বন। দীননাথ ভাবেন, সবই ভগবানের দয়া।

শুনে আমি বললাম, "ওকে হাসপাতালেই নিয়ে যান—"

"কেন, আপনি পারবেন না ?"

পাঠকমশাই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পারব। কিন্তু হাসপাতালেই এ-সব করা ভাল। আজকাল যিনি লেডি ডাক্তার এসেছেন, তাঁর খুব হাত-যশ।"

চুপ করে রইলেন পাঠকমশায় কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মুচকি হেসে বললেন, "একটি গল্প শুনবেন ?"

"কী গল্প—"

"পৌরাণিক গল্প। যদি শোনেন তো বলি—"

যদিও খুব বিরক্ত লাগছিল, তবু প্রবীণ পাঠকমহাশয়কে বলতে পারলাম না যে, শুনব না।

"বলুন।"

"পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবাহ করবার কিছুদিন পরে তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি পথ-ভ্রষ্ট হয়েছেন, ব্রহ্ম থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছেন, মায়াতে জড়িয়ে পড়ছেন, অবিলম্বে সাবধান না হলে অকূলপাথারে ডুবতে হবে। অবিলম্বেই সাবধান হলেন তিনি। বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করলেন একদিন। হিমালয়ে গিয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। বহুদিন তপস্যা করবার পর ভগবান তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'বৎস, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি—বর দিচ্ছি। যে-কোনো লোককে তুমি অমর করে দিতে পারবে। এবার বাড়ি যাও।' ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, তাঁর পত্নী বৃদ্ধা হয়েছেন এবং একটি সুদর্শন যুবক তাঁর পরিচর্যা করছে। পত্নী বললেন, 'এটি আমাদের পুত্র। তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই এ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। একে অবলম্বন করেই আমি এতকাল তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। পুত্রটি কর্তব্যপরায়ণ এবং বিদ্বান হয়েছে, ওর চরিত্রও নির্মল। কিন্তু সেদিন ভৃগুমুনি ওর হস্তরেখা বিচার করে বললেন যে, আর একবছর মাত্র ওর পরমায়ু আছে। শুনে থেকে আমি বড় বিমর্ষ হয়ে আছি। এর কি কোনও উপায় নেই ?'

"তপস্বী উত্তর দিলেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না, ওকে আমি অমর করে দিতে পারি। সে-শক্তি আমি অর্জন করেছি।'

"বৃদ্ধা এতটা প্রত্যাশা করেনি।"

'ও, তাই না কি। তা হলে ওকে অমরই করে দাও।'

তপস্বী ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনই করে দিতে পারি, কিন্তু আমি করলে সেটা ভাল দেখাবে না, কারণ ও আমার ছেলে। আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করছি। তিনিই এসে করে দিন।'

স্মরণ করবামাত্র বিষ্ণু এলেন।

"সব শুনে বললেন, 'তা, এর জন্যে আমাকে ডাকলে কেন? তুমি তো নিজেই ওকে অমর করে দিতে পার।'

"তপস্বী বললেন, 'তা পারি। কিন্তু আপনি করে দিলে আরও ভাল হয়। আপনি স্বয়ং বিষ্ণু—'

"বিষ্ণু বললেন, 'আরও ভালর কথা যদি তুললে, তা হলে ব্রহ্মার কাছে চল। পিতামহ যদি একে অমর করে দেন, তা হলে আর কারও কিছু বলবার থাকবে না।'

'বেশ, চলুন।'

তপস্বী, বিষ্ণু এবং সেই যুবক তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, 'এর জন্যে আমার কাছে আসা কেন? তোমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনই তো একে অমর করে দিতে পারতে।'

'কিন্তু আপনি করে দিলে দেখতে শুনতে সব দিক দিয়েই ভাল হল।'

'দেখতে শুনতে ভাল হয়, যদি মহেশ্বর করে দেন। চল, তাঁর কাছেই যাই।'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তপস্বী আর সেই যুবক মহেশ্বরের কাছে গেলেন।

"সব শুনে মহেশ্বর বললেন, 'এর জন্যে এতদূর এলে? তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে-কেউ একজন তো করে দিতে পারতে।'

ব্রহ্মা বললেন, 'কিন্তু আপনি করে দিলে কাজটা একেবারে পাকা হয়।'

'পাকা হয়, ভাগ্যবিধাতা যদি নিজের খতিয়ানে ওকে অমর বলে লিখে নেন। বেশ, চল, ভাগ্যবিধাতার কাছেই চল, পাকাই করে ফেলা যাক ব্যাপারটাকে—'

"পাঁচজনে ভাগ্যবিধাতার দপ্তরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। একটি প্রকাণ্ড পাথরে-তৈরি সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে সে-দপ্তরে ঢুকতে হয়। সিংহদ্বারে ঢুকছেন, এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সিংহদ্বারের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর খসে পড়ল যুবকটির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তার। হাহাকার করে উঠলেন তপস্বী।

"ভাগ্যবিধাতা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'মুনিবর, এখন হাহাকার করে কী হবে। ওর মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনি। আপনি ওকে অনায়াসেই অমর করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। এই দেখুন, আমার

খাতায় লেখা রয়েছে, ওই যুবক যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর তার বাবাকে নিয়ে আমার সিংহদ্বারের ভিতর ঢুকবে, তখনি সিংহদ্বারের একটি পাথর ওর মাথায় পড়ে ওর মৃত্যু হবে। এই অসম্ভব যোগাযোগ আপনিই করেছেন—।'

গল্পটি বলে পাঠকমশায় বললেন, "উষার প্রথম যখন ব্যথা ধরল, তখন গেলাম নার্স আভার কাছে। সে বললে, আমি পারি, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল হবে শশীবাবু ডাক্তার যদি ভার নেন। শশীবাবুর কাছে গেলাম, তিনি আপনার কাছে আসতে বললেন। আপনি এখন বলছেন, হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাছে যেতে—"

আমি হেসে বললাম, "উষার ভালর জন্যেই বলছি। পরীক্ষা করে দেখলাম, ছেলেটা ঠিক সোজাভাবে নেই ট্রান্সভার্স প্রেজেনটেশন। এ সব হাসপাতালেই ভাল হয়। তা ছাড়া উষার শরীরে রক্তও কম, পা দুটো ফোলা। হয়ত ব্লাড দেওয়ার দরকার হবে, হাসপাতালেই নিয়ে যান ওকে—"

পাঠকমশায় হাসপাতালেই নিয়ে গেলেন ওকে।

হাসপাতালে উষা মারা গেল।

মাসদুই পরে ঠিক এইরকম একটা কেস আমার হাতে এল।

মফঃস্বলের এক জমিদারের পুত্রবধূ। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আমি বললাম "প্রসব করিয়ে দেব, কিন্তু হাজার টাকা চাই।"

রাজি হলেন তাঁরা।

নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেল। প্রসূতি, সন্তান উভয়কেই সুস্থ অবস্থায় রেখে, ফী নিয়ে চলে এলাম। কিছুদূর এসেছি এমন সময় গাড়ির টায়ার গেল ফেটে। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করতে লাগল, আমি নেমে পায়চারি করতে লাগলাম মাঠে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'আমাকে তা হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন কেন কাকাবাবু, আমার বাবা আপনাকে অত ফিস্ দিতে পারবেন না বলে—"

দ্রুতপদে ফিরে এলাম মোটরের কাছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় আমরা রয়েছি বল তো ? অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু।"

"আজ্ঞে, এটা শ্মশান।"

ভাবতে লাগলাম, কথাগুলি কে বললে, উষা, না আমার বিবেক ?

নবজীবন-স্রোত

শ্রীযুক্ত রামবৃছ সিং শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন। পরিচয় বেশীদিনের নয়, কারণ উভয়েই অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকুরিব্যপদেশে এই শহরে আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ভাড়াটে-রূপে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুযোগও ছিল না। দুইজন দুই বিভিন্ন আপিসে চাকরি করেন। একজন পোস্ট-অফিসে, একজন রেলে। নিজের নিজের আপিস আর সংসার লইয়াই দুইজনকে ব্যস্ত থাকিতে হয়, প্রতিবেশীর সংবাদ লইবার মত অবসর মেলে না। ছুটির দিনেও না। ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এতটা ঔদাসীন্য দেখা গেল না। কমলকুমারের দশ বছরের ছেলে অমলকুমার রামবৃছের বারো বছরের ছেলে ছবিলালের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহাদের আলাপ করিবার সুযোগও ছিল। একই স্কুলে, একই ক্লাসে ভরতি হইয়াছিল তাহারা।

অমলকুমার একদিন তাহার মাকে বলিল, "মা, জান ছবিলাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সে সেভ্‌ন্‌ বলতে পারে না, বলে—সেভুন।"

কমলকুমার আয়নার সম্মুখে নানা মুখভঙ্গি করিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, তিনি, প্রশ্ন করিলেন, "ছবিলাল কে ?"

"পাশের বাড়িতে থাকে। ওর বাবার নামটাও অদ্ভুত। রামবৃছ —"

অমল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলকুমার বলিলেন, "ও, বুঝেছি। রামবৃছ সিং আমাদের পাশের বাড়িতে আছে না কি ?"

"হ্যাঁ—"

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, "ওঁর জায়গায় আমাদের বিশ্বেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর চেয়ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোনো মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর কোনো আত্মীয়তাও নেই—"

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁচিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারান্দা ঝাড়ু দিতেছিল। সে বাংলা বোঝে, রামবৃছবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথাসময়ে উক্ত কথোপকথনটি রামবৃছবাবুর পরিবারে নিবেদন করিল। রামবৃছবাবু সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত অমৃতনিষিক্ত হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদ্‌গার তুলিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া—!

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মতো একটি সংবাদও একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। একজন ফেরিওয়ালা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কিছু চিংড়িমাছ এবং নোনাইলিশ তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। তিনি মহা-সমারোহে সেগুলি রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রন্ধনকালে সম্ভবতঃ রান্নাঘরের জানালাটি খোলা ছিল, চিংড়িমাছ এবং নোনা ইলিশের গন্ধ বায়ু-বাহিত হইয়া রামবৃছ সিংয়ের অন্তঃপুরকে আমোদিত করিয়া তুলিল। রামবৃছ তখন রহরকা দাল ও নিমকিসহযোগে মোটা আটার রোটি-চর্বণে ব্যাপৃত ছিলেন। গন্ধ পাইয়া তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

দাইকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ঘর মে কোই জানবর মরল বা ?"

দাই মুচকি হাসিয়া আড়ঘোমটা টানিয়া নিবেদন করিল যে, না, কোনও জানোয়ার মরে নাই, পাশের বাড়ির বাঙালিন বহু মৎস্য রন্ধন করিতেছেন।

রামবৃছ নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, ছি, ছি, ছি ! ই বাংগালি লোগ আদমি নেই থে, গিধ্‌ বা।" অর্থাৎ বাঙালীরা মানুষ নয়, শকুনি, মরা জানোয়ার খায়।

ঠিকা দাইটি কমলকুমারের পত্নীর নিকট এই খবরটিও যথাসময়ে মুচকি হাসিয়া নিবেদন করিল।

আপিস হইতে ফিরিয়া কমলকুমারও সংবাদ শুনিলেন। একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, "ও বেটা ছাতুখোর, মাছের মর্ম কি বুঝবে !"

এ খবরটিও রামবৃছের অবিদিত রহিল না। উভয়পক্ষেই উত্তাপ বাড়িতে লাগিল। তাহা হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল, যখন রামবৃছ একদিন শুনিলেন যে, একজন সিনিয়র বাঙালীকে ডিঙাইয়া তাঁহাকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে—এ খবরটি বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজী পত্রিকায় কে কে. নামক কোন পত্রলেখক প্রমাণসহ বাহির করিয়া দিয়াছেন। রামবৃছ আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইল, কে. কে. কমলকুমার ছাড়া আর কেহ নন। তিনি নিজের ইয়ারমহলে বাঙালীদের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধের আয়োজন কমলকুমারও করিলেন। তাঁহার পুত্র অমলকুমার অতিশয় কম নম্বর পাইয়া কোনোক্রমে ক্লাস-প্রমোশন পাইয়াছিল এবং বাড়িতে আসিয়া বলিয়াছিল যে, শিক্ষকেরা সব হিন্দী ভাষায় পড়ান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া, তাঁহারা পার্শিয়ালিটি করিয়া বেহারী ছেলেদের বেশী নম্বর দেন। কমলকুমার ইহা শুনিয়া যে সব ভাষা ব্যবহার করিলেন, তাহা রীতিমত সাহিত্যিক ভাষা। গানই বাঁধিয়া ফেলিলেন একটা। 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' গানের প্যারডি।

বেহার আমার, মাসীমা আমার,
ধাইমা আমার, আমার দেশ,

কাহে গে মাইয়া, এইসা হালৎ
কাহে গে তোরা এইসা বেশ !
একদা যাহার ভোজপুরিয়া
হেলায় দাঙ্গা করিল মাৎ
আজিও যাহার রাজমিস্ত্রি
জেনানি লইয়া পিটিছে ছাৎ
ঘয়লা ঘাড়ে পানি-পাঁড়ে
খাকি কোর্তা মুরেঠা সাজ
তাদেরই বংশে এ কি প্রহ্লাদ
কলম পিষিছে আপিসে আজ !

—এইভাবে সমস্ত গানটারই প্যারডি লিখিয়া ফেলিলেন।

রামবৃছ সিংয়ের বাড়ির সামনের নর্দমায় একদিন জল আটকাইয়া গেল। দেখা গেল, মাছের আঁশ ও নাড়িভুঁড়ি আসিয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

রামবৃছ দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "শালা মছলিখোর !"

দোলের দিনে রামবৃছের পরিবারবর্গ কাদায়, রঙে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া অশ্রাব্য ভাষায় 'হোলি' গাহিতে লাগিল।

রামবৃছ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানার নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কেন ?"

সে উত্তর দিল, "বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক 'নবজীবন'-এর নাম শুনেছেন ?"

"খুব।—"

"তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সম্বর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।"

"নবজীবন কি এখানে এসেছেন ?"

কমলকুমার কানে আঙ্গুল দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্যাটা বেহারী ভূত !"

এইভাবেই কিছুদিন চলিল। হয়তো বরাবরই চলিত; কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রামবৃছ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানার নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা

হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কেন?"

সে উত্তর দিল, "বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক 'নবজীবন'-এর নাম শুনেছেন?"

"খুব।—"

"তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সম্বর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।"

"নবজীবন কি এখানে এসেছেন?"

"আরে, তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল নাম কমলকুমার ঘোষ। এখানকার এ. এস. এম.।"

রামবৃছের আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল কেবল।

সম্বর্ধনা-সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। শেষ যুবকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কমলকুমার যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তখন রামবৃছ আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "শুনিয়ে—"

কমলকুমার ঘাড় ফিরাইতেই রামবৃছ করজোড়ে বলিলেন, "পহলেই ম্যয় মাফি মাংতা হুঁ। মুঝে মালুম নহি থা যে আপহি 'নবজীবন' হ্যঁয়। ম্যয় আপকা ভকত হুঁ।"

কমলকুমার হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামবৃছ বলিলেন যে তিনি যদিও বাংলা বলিতে পারেন না, কিন্তু বাংলা বুঝিতে পারেন। প্রকাশও করিয়াছেন। কমলকুমার বলিলেন, "তাই নাকি? 'স্রোত' নাম দিয়ে আর একজন লেখকও আমার গল্পের চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেখেছি।"

রামবৃছ হাতজোড় করিয়া স্মিতমুখে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ম্যায় স্রোত হুঁ।"

উভয়ে গাঢ়-আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

ঊর্মির পছন্দ

চার বছরের ঊর্মি তার দাদুর সঙ্গে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে বেড়াতে। শীতকালের গঙ্গা, বালুর চর বেরিয়ে পড়েছে চারদিকে, আর সেই চরের মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বইছে জলের ধারা। স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চিকমিক করছে বালি।

"ওগুলো কি দাদু?"

"বক—"

"চারটেই বক? অত সাদা কেন?"

"ফরসা জামা, কাপড় পরেছে।"

"অমন গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কেন আস্তে আস্তে?"

"তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে বোধ হয়।"

"কেন?"

"তোমাকে বিয়ে করতে চায়।"

ঊর্মি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বকগুলোর দিকে।

"চারটেকেই আমি বিয়ে করব?"

"করলে ক্ষতি কি। দ্রৌপদী তো পাঁচজনকে বিয়ে করেছিল—"

"দ্রোপদী কে?"

র-ফলা বেরোয় না ঊর্মির মুখে।

"সে গল্প আর একদিন বলব তোমাকে।"

"এখনি বল না।"

"আগে ঠিক কর, বকদের বিয়ে করবে কি না।"

ঊর্মি ঘাড় বেঁকিয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—"করব না। বড্ড লম্বা গলা ওদের, ঠুকরে দেবে না?"

"ঠিক বলেছ, কথাটা ভাবি নি তো।"

খঞ্জনও চরছিল কয়েকটা জলের ধারে। দুতিন রকম খঞ্জন, কারও হলদে বুক, কারও সাদা মুখ, কালো পিঠ, কারও ছাই রং, ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছিল সবাই। একটা খঞ্জন লাফ দিয়ে উঠতেই ঊর্মি দেখতে পেলে সেটাকে।

"দেখ দেখ দাদু, আর একটা পাখি। একটা নয়, অনেকগুলো। কি রকম লাফালাফি করছে। ল্যাজও দোলাচ্ছে। দেখতে পেয়েছ?"

"আমি অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ওরা এদেশের পাখি নয়, বিদেশ থেকে এসেছে। অনেক দূর থেকে মাঠ, বন, পাহাড়, নদী পার হয়ে।"

"অনে—ক দূর থেকে ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন এসেছে।"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে।"

"আমাকে ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। কেমন সেজে এসেছে, দেখছ না ?"

"ওরা তো পাখি। পাখিকে বিয়ে করলে মা-বাবা বকবে না ?"

"বকবে কেন ?"

"তা হলে পাখির খাঁচায় হাত দিলে মা বকে কেন ?"

"টিয়াপাখি যে কামড়ে দেয়।"

"ও। খঞ্জন কামড়ায় না বুঝি ?"

"না। কি সুন্দর দেখছ না ? কেমন খুর-খুর করে বেড়াচ্ছে—"

"খঞ্জন তা হলে তোমার পছন্দ নয়।"

"নাঃ।"

"ওই ছুটোকে পছন্দ হয় ?"

"কোন ছুটোকে ? ওই যে খঞ্জনদের ও পাশে চরে বেড়াচ্ছে ?" "কি পাখি ওরা ?"

"বাটান। ছোট বাটান, গলায় কেমন সুন্দর কালো কণ্ঠি দেখেছ—"

"কোথায় থাকে ওরা ?"

'ওরাও বিদেশে থাকে। এখানে বেড়াতে এসেছে।"

"কেন ?"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে।

'সব্বাই আমাকে বিয়ে করবে বলে এসেছে ?"

"তুমি পছন্দ করলেই করবে।"

'আমার কাউকে পছন্দ নয়।"

"তা হলেই তো মুশকিল। মানুষ বর পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। পাখিই একটা পছন্দ করতে হবে।"

"কি পাখি ?"

"চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ, যেটা তোমার পছন্দ হয়।"

ঊর্মি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"ওগুলো কি দাদু ?"

এক ঝাঁক সোয়ালো উড়ছিল জলের উপর। সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছিল তাদের কৃষ্ণ-নীল পিঠের রং। থামছিল না এক মুহূর্ত। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল ক্রমাগত।

"ওগুলো সোয়ালো। বাংলা নাম আবাবিল।"

"ওরাও কি বিয়ে করবে বলে এসেছে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"ওদের আমি বিয়ে করব না। বিচ্ছিরি নাম। তা ছাড়া একটুও বসছে না, খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, গল্প করব কখন? আচ্ছা দাদু, ওরা আমাদের মতো কথা বলতে পারে তো—!

"শেখালে পারবে। টিয়াটা কেমন কথা বলে শুনেছ তো।"

"চমৎকার কথা বলে টিয়াটা। কিন্তু বড্ড কামড়ায় যে। বাঃ, ওই পাখিটা তো চমৎকার, কি ওটা—"

গাছের ডালে একটা শালিক বসেছিল, ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছিল যেন ঊর্মিকে।

"ওটা শালিক—! ঘাড় নেড়ে নেড়ে তোমাকে ডাকছে—চল, ওর কাছেই যাওয়া যাক—"

গাছটার দিকে এগিয়ে যেতেই 'পিড়িং' শব্দ করে উড়ে গেল শালিকটা।

তারপর দাদুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরল ঊর্মি। দাদু তাকে আরও পাখি, গাছপালা, আকাশের মেঘ, সবুজ গমের ক্ষেত দেখালেন। ঊর্মি কিন্তু বেশ একটু অন্যমনস্ক। যে গাছটায় শালিকপাখিটা বসেছিল, সেই গাছটার দিকে ফিরে ফিরে চাইছে কেবল।

দাদু ডাকলেন—"ঊর্মি—"

ঊর্মি মুচকি হেসে বললে "পিড়িং—"

"ও কি—"

"আমি শালিকপাখি হয়েছি। শালিককেই বিয়ে করব। ওর ঠোঁটটা বেশ সুন্দর হলদে, নয়? ঠিক আমার ফকের মতো।"

দুদিন আগে ঊর্মিকে হলদে রঙের ফ্রক কিনে দেওয়া হয়েছিল।

"বেশ, তা হলে শালিকের কাছেই লোক পাঠাই গে চল—! রাজি হয়, তবে তো?"

ঊর্মিকে নিয়ে গম্ভীরমুখে বাড়ি ফিরে এলেন দাদু।

ছবি

আমি হিরণ সেনের কাছে প্রথমে চিকিৎসক হিসাবেই গিয়েছিলাম। আমাকে যিনি ডাকতে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রতিবেশী, আত্মীয় নন। পরে জেনেছিলাম, তাঁর আত্মীয় কেউ নেই, থাকলেও খবর নেন না। প্রতিবেশী সমরবাবুই তাঁর দেখাশোনা করেন। চাকর-বাকর অবশ্য আছে।

সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"উনি বিয়ে-থা করেন নি ?"

"না। যে ধরনের লোক সাধারণতঃ বিয়ে-থা করে সংসার পাতে, উনি সে ধরনের লোক নন।"

"ও—।"

সমরবাবু গোড়াতেই আমাকে বলেছিলেন, ওঁর কি হয়েছে। কোমরের নীচে থেকে সমস্ত অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, আমাদের ডাক্তারিভাষায় যাকে বলে ট্রান্সভার্স মায়েলাইটিস্। সাধারণতঃ, সিফিলিস এর কারণ। সমরবাবু যা বললেন, তা শুনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে।

সমরবাবু রোগীর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ইনিই হিরণবাবু, এঁরই চকিৎসা করতে হবে আপনাকে।"

আমি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম।

সিফিলিস বলেই সন্দেহ হল।

বললাম, "রক্তটা একবার পরীক্ষা করানো দরকার।"

হিরণবাবু বলে উঠলেন, "একবার কেন, দশবার পরীক্ষা করা হয়েছে। সমর, ওই ড্রয়ার থেকে রিপোর্টগুলো বার করে দাও তো ভাই—"

দেখলাম। প্রত্যেকটি রিপোর্টেই এক বার্তা, রক্তে কোনো দোষ নেই। একটু আশ্চর্য হলাম।

হিরণবাবু বললেন, "আপনিও যদি রক্ত পরীক্ষা করতে চান, করুন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা যে পদ্ধতিতে চলছেন, তাতে আমার অসুখ সারবে না। কোলকাতার সব বড় ডাক্তারকেই দেখিয়েছি আমি, ওষুধ, ইনজেকশন, ইলেকট্রিক চিকিৎসা সবরকম হয়েছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, কিচ্ছু হয় নি—"

সমরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আপনারা তা হলে গল্প করুন, আমি ঘুরে আসছি একটু পরে। একটু কাজ আছে আমার। আপনার ট্রেনের এখন ঘণ্টা দুই দেরি। আমি ঠিক-সময়ে এসে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব।

সমরবাবু চলে গেলেন।

হিরণবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কি বুঝছেন আপনি—"

যা বুঝেছিলাম, তা অকপটভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা হচ্ছিল। চুপ করে রইলাম।

"চুপ করে রইলেন যে—"

"আপনার এ অসুখ সারবে না—"

দুজনেই চুপ করে গেলাম এর পর।

মিনিটখানেক পরে হিরণবাবু বললেন, "আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি এখনও।

কোনও রোগীই আশা ছাড়ে না। শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর মনে পড়ল—তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং। চুপ করে রইলাম।

হিরণবাবু আবার বললেন, "না, আশা ছাড়ি নি আমি। আপনি যদি ডাক্তারি না করে অন্য একটা উপায় অবলম্বন করেন, তা হলে হয় তো সেরে যেতে পারি আমি। শুনেছি, আপনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন ভক্ত।"

"তাঁর অসংখ্য ভক্তের মধ্যে আমিও একজন। কে বললে আপনাকে এ কথা—?"

"আপনারই একজন রোগী। শরৎবাবুকে মনে পড়ে আপনার? শরৎ মিত্তির? আপনি তাঁর হাঁপানির চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁর মুখেই শুনেছি আপনার কথা।"

"মনে পড়েছে?"

মনে পড়ল, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। প্রায়ই হত মাঝে মাঝে।

"কিন্তু, তার সঙ্গে আপনার অসুখের সম্পর্ক কি?"

"আপনি আমার হয়ে স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করুন, তা হলেই আমার বিশ্বাস, অসুখ সেরে যাবে।"

"আপনিই করুন না।"

আমি সর্বদাই করছি। কিন্তু, আমার প্রার্থনায় কাজ হচ্ছে না, হবেও না।"

"প্রার্থনায় ফল হবে, এই যদি আপনার বিশ্বাস, তা হলে কোনও ভালো সাধুকে দিয়েই প্রার্থনা করান। আমি অতি সামান্য লোক—"

"আমি সে চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কেউ রাজি হন নি। তারপর শরৎবাবুর মুখে আপনার কথা শুনলাম। তাই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। চিকিৎসার জন্যে ডাকাই নি আপনাকে। তবে, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, চিকিৎসাও করতে পারেন। কিন্তু আমার অনুরোধ, একান্ত অনুরোধ, প্রার্থনা করুন আমার জন্যে, যদি ভালো হই, ওতেই হব। দয়া করুন আমার উপর—"

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন হিরণবাবু। বলা বাহুল্য, খুবই বিব্রতবোধ করতে লাগলাম।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন, এ বিশ্বাস যদি আপনার সত্যিই থাকে, তা হলে যা হয়েছে, সেটাকে হাসিমুখে মেনে নিন।"

চোখের জল মুছে হিরণবাবু বললেন, "সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার

সবচেয়ে বড় দুঃখ, স্বামীজী আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি ডাকলে তিনি আর ফিরবেন না, আপনাদের মতো সচ্চরিত্র, সত্যবাদী লোক যদি অনুরোধ করেন, তা হলে হয়তো ফিরতে পারেন। আপনি চেষ্টা করুন আমার জন্মে—"

কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছিল।

"কোন্ স্বামীজীর কথা বলছেন ?"

"স্বামী বিবেকানন্দ।"

"তিনি ফিরবেন কি করে ? তিনি তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন—"

হিরণ সেন ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন কয়েকমিনিট। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—"সমস্ত ঘটনা খুলে বলি তা হলে আপনাকে। শুধু একটা অনুরোধ, আমাকে পাগল মনে করবেন না। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে অবশ্য, কিন্তু যা বলছি তার একবর্ণ মিথ্যা নয়—"

হিরণবাবু আবার চুপ করে গেলেন। আবার মাথা হেঁট করলেন।

আমি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"বলুন, কি বলবেন—"

মাথা তুলে হিরণবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বলছি। দেখুন, ছাত্রজীবন থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের খুব ভক্ত ছিলাম। বিয়ে-থা করি নি। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্যপালন করেই চলতাম। না, কথাটা একটু ভুল হল। হয়তো আপনার একটা ভুল ধারণা হয়ে যাবে যে, স্বামীজীকে ভক্তি করতাম খুবই, কিন্তু বিয়ে করি নি অন্য কারণে। যে মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছিল, তাকে আমি পাই নি। সহজ সামাজিক উপায়ে পাওয়ার উপায়ও ছিল না। সে ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি কায়স্থ। শেফালীরও অনেকদিন বিয়ে হয় নি, কারণ তার মায়ের সঙ্গতি ছিল না বিয়ে দেবার। নিতান্ত গরীব বিধবা ছিলেন তিনি। আমি অনেকবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হন নি। এইভাবেই চলছিল, আমি দূর থেকে তাকে দেখেই সন্তুষ্ট ছিলাম। একদিন হঠাৎ শুনলাম, শেফালীর বিয়ে হচ্ছে এক ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে। শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। শেফালীর সঙ্গে বিয়ে হবে ওই বুড়োর! ঠিক করলাম, প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না। টাকার অভাব ছিল না আমার। কোলকাতা থেকে গুণ্ডা আনালাম। বিয়ের রাত্রে ঠিক বিয়ে হবার আগেই লুট করে নিয়ে এলাম শেফালীকে। নিয়ে এসে এই ঘরেই আটক করলাম তাকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে বিয়ে করবে তুমি ?"

"শেফালী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'কিছুতেই না। কায়স্থের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে হয় না। আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিন।'

"আমার তখন রোখ চড়ে গেছে, সংযমের প্রাচীরেও ফাটল দেখা দিয়েছে। বললাম, 'কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি হয়তো জানো না, আসুরিক বিবাহও আমাদের

শাস্ত্র-অনুসারে সিদ্ধ। আসুরিকমতেই তোমাকে বিবাহ করব আমি। পৃথিবীতে কোনও শক্তি নেই যে আমাকে বাধা দিতে পারে'—এই বলে জাপটে ধরলাম তাকে।"

"সে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। তাকে বাঁচাতে পারে, ত্রিসীমানায় এমন লোক সত্যিই সেদিন কেউ ছিল না। যারা ছিল, তারা আমারই বেতনভোগী গুণ্ডা। এরপর কি হল জানেন? ঝনঝন করে একটা শব্দ হল। ঘরের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের যে ছবিটা টাঙানো ছিল, দেখি তার কাঁচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর স্বয়ং স্বামীজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাগে থরথর করে কাঁপছেন।"

"বজ্রনির্ঘোষে বললেন, 'পাষণ্ড, এখুনি ছেড়ে দাও ওকে।'

"আমার কোমরে একটা লাথি মারলেন, আমি পড়ে গেলাম; সেইথেকেই কোমর ভেঙে পড়ে আছি—"

হিরণ সেন থামলেন।

"তারপর?"

"তারপর শেফালীর দিকে ফিরে স্বামীজী বললেন, 'এসো মা, তুমি আমার সঙ্গে এস।'

"শেফালীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর ফেরেন নি। ওই দেখুন, ফ্রেম খালি—"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এইবার দেখলাম, দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে-বাঁধানো কার্ড-বোর্ড ঝুলছে। ভিতরে ছবি নেই।

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ফ্রেমটার দিকে।

"শেফালীর কি হল?"

"সে-ও আর ফেরে নি। অনেকে বলে, সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি, স্বামীজী তাকে নিয়ে গেছেন।"

হিরণবাবু হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

হিরণবাবুর ডাক্তারি-চিকিৎসা আমি করি নি। তবে, তাঁর জন্য রোজ প্রার্থনা করতাম। সেদিন খবর পেলাম, তিনি মারা গেছেন।

চম্পা মিশির

"জিৎ গিয়া হুজুর।"

সোৎসাহে রামজানের ছেলে সলিম এসে খবরটা দিল। তারপর সেলাম করে চলে গেল।

মনে পড়ল চম্পা মিশিরকে। এখনও আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, সোজা হয়ে বসে আছেন টমটমের উপর ঘোড়ার রাশ ধরে, আর যার টমটম, সে পিছনের দিকে বসে আছে স-সঙ্কোচে। বেশ লম্বা লোক ছিলেন, কিন্তু চওড়া নয়, সরু, লিকলিকে চেহারা। অসুস্থ নয়, ওইরকমই গড়ন। গোঁফ ছিল, দাড়ি ছিল না। গোঁফ সরু, ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যেত না। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিশে থাকত। গায়ের রঙ কালো ছিল না। গোধূমবর্ণ। গোঁফও তাই। ছোট ছোট চোখের তারাও কটা ছিল। মেরজাই পরতেন, মাথায় থাকত মৈথিলী পাগড়ি, কাপড় আঁট-সাঁট করে পরা, পায়ে দেশী নাগরা জুতো সর্বণ মুচির তৈরী, অন্য মুচির জুতো পছন্দ হত না তাঁর। তাঁর এ সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার অনেক আগেই তাঁকে দেখেছিলাম আমি। রোজই দেখতাম। বস্তুতঃ, না দেখে উপায় ছিল না। আমার ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যে রাজপথ চলে গেছে, তার উপর টমটম হাঁকিয়ে রোজ যেতেন তিনি। এতেও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ, যার টমটম, সে-ই হাঁকায়, আরোহী পাশে বা পিছনে বসে থাকে। আরোহী চম্পা মিশির কিন্তু নিজেই টমটম হাঁকাতেন, যার টমটম, সে পাশে বা পিছনে বসে থাকত। এ খবরটাও আমি পরে জেনেছি।

যেদিন উনি আমার দোকানের সামনে টমটম থেকে পড়ে গিয়ে একটু আঘাত পেলেন, সেইদিনই ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল। আঘাত সামান্যই, পায়ের গোছটা একটু ছড়ে গিয়েছিল। পায়ে একটু টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে দিলাম। এর পর চম্পা মিশির যা করলেন, তাতে আমি নিঃসন্দেহ হলুম, ওর পায়ের হাড়ে কিছু লাগে নি। উনি লাফিয়ে নেবে গেলেন আমার ল্যাবরেটরির বারান্দা থেকে, সঙ্গের লোকটাকে হুকুম করলেন, ঘোড়াটাকে ধর ভাল করে, মুখটা শক্ত করে ধরে থাক। সে ধরতেই আগা-পাশ-তলা চাবকালেন ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছু হটছিল বলেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেজন্যে শাস্তি দিলেন তাকে। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, মিশিরজি টমটমের মালিক নন, আরোহীমাত্র। ঘোড়াটাকে পিটিয়ে মিশিরজি আবার আমার ল্যাবরেটরিতে এসে বসলেন এবং ভাঙলেন কথাটা। মৈথিলীমিশ্রিত হিন্দীতেই কথা বলতেন তিনি। আমি ভাবার্থটা অনুবাদ করে দিচ্ছি। বললেন, এমন বোকা এ দেশের লোক ডাক্তারবাবু, পয়সা দিয়ে ওই ঘোড়া কিনেছে। ও যতটা এগোয়, তার চেয়ে পিছোয়

বেশী। এ টমটমে কোন্ সোয়ারি চড়বে বলুন? আমাকেই এখন ঠিক করতে হবে, কদ্দিন লাগবে কে জানে?

পরে আরও অনেক ঘটনা থেকে জেনেছি, বাজে ঘোড়াকে ঠিক করাতেই ওঁর আনন্দ। ইংরেজীতে যাকে বলে রঙ হর্স (wrong horse) তাকে ব্যাক করেও উনি আনন্দ পেয়েছেন জীবনে। ওঁর বাড়ি গঙ্গার ওপারে মফঃস্বলে, অনেক জমি-জায়গা আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। কিন্তু শহরে উনি প্রত্যহ আসতেন স্টীমারে পেরিয়ে। বাড়ি থেকে স্টীমারঘাটে আসতেও প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হত ওঁকে। কিন্তু তাতে আনন্দই পেতেন উনি, বলতেন, এইভাবে হাঁটার ফলে শরীর বেশ ভাল থাকে। স্টীমারঘাটে নেবেই একটা টমটম ভাড়া করতেন সমস্ত দিনের জন্য। যে টমটমের ঘোড়া খারাপ, সেইটেই পছন্দ করতেন তিনি। তা বলে তাকে যে কম ভাড়া দিতেন তা নয়, বরং বেশীই দিতেন। আর টমটমটা নিজেই হাঁকাতেন। সেই খারাপ ঘোড়া যতদিন না ঠিক হত, ততদিন সেই টমটমকেই বাহাল করে রাখতেন। এই সব কারণে মিশিরজিকে আরোহীরূপে পাবার জন্য সব টমটমওলাই ব্যগ্র হত। দু-একজন ঠকাতও। অর্থাৎ টমটমের ঘোড়া খারাপ না হলেও তাঁকে আরোহীরূপে পাবার জন্য মিথ্যে করে বলত যে, তার ঘোড়া খারাপ। কিন্তু মিশিরজির কাছে এ সব চালাকি চলত না, ঘোড়ার রাশ থাকত তাঁর হাতে। একদিন আমার ল্যাবরেটরির সামনে টমটম থামিয়ে নেবে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, একটা রুগী নিয়ে এসেছি, দেখুন তো, শালার যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন, আরে, ইধার আ—

টমটমওলা ছোঁড়াটা মুচকি হেসে নেবে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে এর?

মিশিরজি তার মুখের দিকে চিন্তিতমুখে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, শালা ঝুঠ্‌ঠা ছে। অর্থাৎ শালা মিথ্যাবাদী। টমটমের ঘোড়া ভাল, কিন্তু খারাপ বলে চালিয়েছে তাঁর কাছে। হেসে বললাম, এর তো কোনও দাবাই নেই আমার কাছে—

চম্পা মিশির তখন ছোঁড়ার একটা কান টেনে বললেন, তা হলে পুরানা দাবাই দিয়ে দি একটু। অমন তেজী ভাল ঘোড়া, বলে কি না খারাপ—

তারপর তাকে একটা সিকি দিয়ে বললেন, দু আনার ছাতু তুই খা, আর দু আনার ঘোড়াটাকে খাওয়া। পেট ভরা থাকলে মুখ দিয়ে মিথ্যেকথা বেরুবে না।

সিকিটা নিয়ে সানন্দে বেরিয়ে গেল ছোঁড়া, মিশিরজি আমার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে গেলেন তার পিছু পিছু।

মিশিরজি শহরে এসে ব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। আদালতেই বেশীর ভাগ সময় কাটত তাঁর। রোজই তাঁর একটা না একটা মকদ্দমা থাকত। তাঁর নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল, সেই পক্ষের মকদ্দমার তদ্বির করতেন উনি। তার জন্য

উকিল ব্যবস্থা করতেন, সাক্ষী যোগাড় করতেন, নিজেও পরামর্শ দিতেন। শহরে তাঁর একটা ছোট বাসা ছিল, সেই বাসায় আশ্রয় দিতেন তাদের। একজন ভাল উকিলের মুখে শুনেছি, মিশিরজি মকদ্দমা বুঝতেনও ভাল। মোটামুটি আইনের জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া বিপক্ষকে জেরা করবার এমন সব ঘাঁৎ-ঘোঁৎ বলে দিতে পারতেন যে, অনেক বুদ্ধিমান উকিলেরও তাক লেগে যেত। সুতরাং মকদ্দমাতেও মিশিরজিকে স্বপক্ষে টানবার জন্য চেষ্টা করত অনেকে। এ বিষয়ে খুব সুনাম ছিল তাঁর। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ সব করে তাঁর কি লাভ হয়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সময় কাটে। কিন্তু তিনি কখনও সবলের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। যার কেস কম-জোর যার অর্থাভাব, যে পুলিসের বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে নাজেহাল হচ্ছে, চম্পা মিশির সর্বদা তার পক্ষে। উকিলরাও, বিশেষ করে নূতন উকিলরা, খুব সমীহ করত তাঁকে। সাধারণতঃ যে সব উকিলের মক্কেল জুটত না, তাঁদেরই নিযুক্ত করতেন তিনি। দরকার হলে কোনও নামজাদা উকিলের পরামর্শ যে না নিতেন, তা নয়, কিন্তু মকদ্দমার সম্পূর্ণ ভার থাকত নূতন উকিলটির উপর। পরে যাঁরা নামজাদা উকিল হয়েছিলেন তাঁরাও প্রথম জীবনে মিশিরজির সাহায্য পেয়েছিলেন, সুতরাং সে মহলেও মিশিরজির খুব খাতির ছিল। একবার এক উকিল কমিশন দিতে চেয়েছিলেন তাঁকে। মিশিরজি জিব কেটে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমাকেও অনেক রোগী পাঠিয়েছেন তিনি মফঃস্বল থেকে। মফঃস্বলের নিরীহ রোগীদের কাছে আমার সম্বন্ধে এমন সব অত্যুক্তি করতেন, যা শুনে আমি লজ্জিত হতাম। আমি নাকি খুন পরীক্ষা করে তড়াক্‌সে (চট করে সমস্ত রোগ নির্ণয় করে ফেলতে পারি। মাঝে মাঝে অপ্রস্তুতও হতে হত। একবার তাঁর প্রেরিত এক রোগী এসে বলল যে, তার রক্ত পরীক্ষা করে বলে দিতে হবে, তার শ্বশুরের রক্তে কোনো দোষ আছে কি না! বললাম, আমি তা পারব না। কিন্তু লোকটা না-ছোড়। বলল, মিশিরজি যখন বলে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি পারবেন। ফী যা লাগে আমি দেব, কাজটা করে দিন। বললাম, তোমার শ্বশুরকেই পাঠিয়ে দাও। সে বলল, তিনি থাকলে তো নিয়েই আসতাম। কিন্তু তাঁর নামে সম্প্রতি হুলিয়া বেরিয়েছে বলে তিনি কোথায় যে আত্মগোপন করে আছেন, তা কেউ জানে না। বললাম, তা হলে আমি পারব না।

পরদিন চম্পা মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল সে।

চম্পা মিশির এসেই আমাকে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, খুন লে লিজিয়ে ডাক্‌টার সাহেব।

আমি পুনরায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চম্পা মিশির হাত তুলে ঈষৎ অধীরভাবে যা বললেন, তার ভাবার্থ—আমি এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা

বলছি, আপনি রক্তটা তো আগে নিয়ে নিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাসারম্যান টেস্টের জন্ম নিলাম খানিকটা রক্ত।

মিশিরজি লোকটার দিকে ফিরে বললেন, ফিস্ রাখখো। লোকটি একটি একশো টাকার নোট আমার সামনে রাখল। আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম যে, একশো টাকা এর ফী নয়। মিশিরজি আবার হাত তুলে বারণ করলেন আমাকে। আদেশের ভঙ্গিতে আবার বললেন, উঠা লিয়া যায়। তুলে নিলাম নোটটা।

মিশিরজি তখন সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, অব তুম্ যাও।

চলে গেল সে।

তখন আমি মিশিরজিকে বললাম, আপনি যা বলছেন তা তো করা অসম্ভব। ওর রক্ত দেখে ওর শ্বশুরের—

মিশিরজি বললেন, আপনি ওরই রক্তে দোষ আছে কি না দেখুন। কিন্তু রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে। ওর নাম প্রয়াগ সিং, ওর শ্বশুরের নাম প্রাণেশ্বর সিং।

আমি বললাম, এ রকম চাতুরীর অর্থ কি!

মিশিরজি তখন যা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, এ লোকটির ছেলে হয়ে হয়ে মরে যাচ্ছে। সিভিল সার্জন বলেছেন—হয় এর রক্তে, না হয় এর স্ত্রীর রক্তে, কিংবা উভয়েরই রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে। কিন্তু এরা দুজনেই হলফ করে ঘোষণা করেছে যে এদের চরিত্র স্ফটিকের মতো নির্মল। ওর স্ত্রী তো রক্ত পরীক্ষাই করাতে চায় না। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে, ভয়ানক কলঙ্ক রটে যাবে একটা। মানী বংশ ওদের। সব দিক বাঁচাতে হবে। তখন আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গেল। পলাতক খুনী শ্বশুরের ঘাড়ে দোষটা চাপালে সবদিক রক্ষে হয়। এ ছোকরার রক্তে দোষ পাবেন আপনি। কারণ, ও বাইরে সাধু সেজে থাকে, কিন্তু আমি জানি, ও ডুবকি মেরে জল খায়। আপনি রিপোর্ট দেবেন পি- সিং—এই নামে।

বললাম, কিন্তু একশো টাকা তো আমার ফী নয়!

তা-ও জানি আমি। এটা ওর জরমানা, ঝুট বলেছে বলে।

রক্তে দোষ ছিল। চিকিৎসার পর ছেলেও হয়েছিল ওদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। গরদের জোড় দিয়ে প্রণাম করেছিল আমাকে প্রয়াগ সিং।

মিশিরজি সম্বন্ধে নানা ঘটনা মনে পড়ছে।

আর একটা ঘটনা বলি। একবার বাড়িতে এসেছিলেন। চা দিতে গেলাম, বললেন চা খান না।

শরবৎ আনিয়ে দেব?

তা দিতে পারেন।

শরবৎ যখন এল, তখন বললেন, আপনি খাবেন না?

আমার তো চিনি খাওয়ার উপায় নেই। ডায়াবিটিস আছে—

শরবৎটি শেষ করে মুখ মুছে বললেন, ইয়ে বাৎ? চিনিসে আপকো ঝগড়া হয়, আচ্ছা, বিনা চিনিসেই আপকো শরবৎ পিলাউঙ্গা—

তার পরদিন এক ঝুড়ি বড় বড় লেবু নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, এর নাম হচ্ছে শরবতিয়া লেবু। দুটো লেবুর রস গেলে এক গ্লাস জলে দিয়ে দিন, এক গ্লাস শরবৎ হয়ে যাবে, চিনি দিতে হবে না। দেখলাম, সত্যিই তাই। অবশ্য এত মিষ্টি লেবুও ডায়াবিটিস-রোগীর পক্ষে অচল, কিন্তু সে কথা তাঁকে বলি নি। পরে তিনি শরবতিয়া লেবুর গাছও একটা দিয়েছিলেন আমাকে। আমার হাতার একধারে এখনও আছে বোধ হয় সেটা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাকে ডেকেছিলেন একবার।

আমাকে দেখেই হেসে বললেন, চিকিৎসার জন্মে নয়, শেষদেখা করার জন্মে ডেকেছি। এবার আর মকদ্দমায় জেতবার আশা নেই। মহাকালের শমন এসেছে, যেতেই হবে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না—

তারপর একটু থেমে বললেন, যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, যদি পারেন, কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রমজান বলে একটা গরিব লোক আছে। ভেড়া আছে তার একটা। ভেড়াটা আগে খুব ভাল লড়ত। রমজান ওকে লড়িয়ে রোজগার করত কিছু। কিন্তু গত দু বাজিতে হেরে গেছে ভেড়াটা। রমজান বলছে, ও দানা হজম করতে পাচ্ছে না, তাই কম-জোর হয়ে গেছে। এখানে কাছেপিঠে তো ভাল পশুচিকিৎসক নেই। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু? লোকটা গরিব, ওই ভেড়া-লড়িয়েই রোজগার করত—

বললাম, আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে।

দু দিন পরে খবর পেলাম মিশিরজি মারা গেছেন।

মানুষেরই ওষুধ দিয়েছিলাম ভেড়াটাকে। বাজি জিতেছে যখন, উপকার হয়েছে নিশ্চয়ই।

মনে হচ্ছে, চম্পা মিশিরের মতো লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালী, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান—এ সব ভেদ ছিল না। যাদের কাছে…?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, শরবতিয়া লেবুর গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চারদিক খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালাম ভাল করে। গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।

ত্রি-ফলা

সুরেন্দ্রনাথ একটি খাতা খুলিয়া পড়িতেছিলেন :—

শুকরির সঙ্গে দেখা হল মাছের বাজারে। কোলে একটি ফুটফুটে মেয়ে, ওরই মেয়ে। আমাকে দেখে একটু সলজ্জ হাসি হেসে একপাশে সরে দাঁড়াল। আমি ওর মেয়েটির গাল টিপে আদর করলুম একটু। শুকরি যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। আমার মনে হল, যাক শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটছে তা হলে।

শুকরি মেথরের মেয়ে। আমি যখন প্রথম এসে ল্যাবরেটরি খুলি তখন ওর ঠাকুরদা মুননিকে আমি বাহাল করেছিলাম। তখন শুকরির বাপ সিতাবীই ছেলেমানুষ। সতেরো-আঠারো বছর বয়স, বিয়ে হয়নি তখনও। মুননি মদ খেত খুব, গাঁজাও। ছোট ছোট চোখদুটি জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত সর্বদা। কিন্তু কখনও বেচাল হয়নি, কখনও বেয়াদপি করেনি। মদ, গাঁজা খেত বটে, কিন্তু খাওয়াটা যে অন্যায়, এ বোধটা তার ছিল। সর্বদাই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে থাকত। একদিন মুননির বউ রঙীন-কাপড়-পরা ঘোমটা-দেওয়া একটি মেয়েকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। বললে, সিতাবীর বিয়ে দিয়েছি হুজুর, দেখুন, কনিয়া কেমন হয়েছে। গোড় লাগ—। নববধূ আমাকে, আমার স্ত্রীকে প্রণাম করে বখশিশ নিয়ে চলে গেল। বেশ বউটি। সত্যিই রূপসী। অমন রূপ ভদ্রঘরেও সচরাচর দেখা যায়। কতদিন আগেকার কথা, অথচ মনে হচ্ছে, যেন সেদিন। সিতাবীর বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরেই মুননি মারা গেল। তার কিছুদিন পরে মুননির বউও। সিতাবী তখন বাহাল হল তার বাপের জায়গায়। আমার চোখের সামনেই ওই শুকরির জন্ম হয়েছে। আমার ল্যাবরেটারির বারান্দাতে ও হামাগুড়ি দিয়েছে, তারপর বড় হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। তারপর বিয়ে হল ওর একদিন। কোলকাতার এক মেথর এসে বিয়ে করে নিয়ে গেল ওকে। মাঝে মাঝে খবর পেতাম, ও সুখে আছে। কলকাতার মেথররা ধর্মঘট করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছে, ওদের পাকা ঘর-বাড়ি। এর কিছুদিন পরে সিতাবীর বউ মারা গেল যক্ষ্মায়, সিতাবী আবার বিয়ে করল। বেশী মাইনের লোভে আমার চাকরি ছেড়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকল। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়।

প্রায় বছরতিনেক পরে একদিন সকালে দেখি, শুকরি আমার বাড়ির উঠোনের একধারে বসে আছে। মুখে হাসি নেই, চুল উসকো-খুসকো। পরনের কাপড়টা রঙীন বটে, কিন্তু ছেঁড়া।

"কি রে, কবে এলি ?"

শুকরি মাথা নীচু করল।

"কবে এলি তুই, তোর ছেলে হয়েছে শুনেছি, ছেলে কই—"

শুকরি মাথাটা আরও নীচু করলে। দেখলাম, কাঁদছে।

"কি হল তোর ? বল না, কি হয়েছে—"

অনেক জেরার পর জানা গেল, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সে।

স্বামী পাগল। ছেলেটাকে কেড়ে রেখে দিয়েছে ওরা।

আমার গিন্নী কিছু খেতে দিলেন ওকে। বাড়িতে কিছু বাসি মাংস আর রুটি ছিল। শুকরি বসে বসে সেগুলি খেলে। খাবার পরও বসে রইল।

"কি রে, আরও খাবি ?"

শুকরি মাথা নেড়ে জানালে, খাবে। পারত-পক্ষে কথা বলতে চায় না, কারণ, তোৎলা।

আরও দুখানা রুটি খেলে। তবু নড়ে না। খানিকক্ষণ পরে আসল মনোভাবটি ব্যক্ত করলে।

"কা-কা-পড়া দে একটো—"

একটা শাড়ি দিলেন গিন্নী, পুরোনো রঙীন শাড়ি। তবু উঠতে চায় না। আরও আট আনা পয়সা নিয়ে তবে উঠল।

···দিনদশেক পরে দেখলাম, শুকরি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। একেবারে অন্যরকম চেহারা। রঙীন শাড়িটি বেশ কায়দা করে পরেছে, যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে শাড়িটির ভাঁজে ভাঁজে। মাথায় তেল দিয়ে পরিষ্কার করে চুল আঁচড়েছে, সিঁদুর পরেছে, হাতে পরেছে কাঁচের বাহারে চুড়ি একগোছা! চোখে, মুখে হাসি ঝলমল করছে।

তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা।

মাসদুই পরে খবর পেলাম—(আমার মেথরটাই খবর দিলে)—শুকরি ডোমনের সঙ্গে ফেঁসে গেছে, তার বাড়িতে গিয়েই আছে নাকি।

ডোমন আর একটি মেথর, বিবাহিত।

এরও মাসখানেক পরে, আবার একদিন দেখি, শুকরি মাথা নীচু করে বসে আছে এসে আমাদের উঠানে, গিন্নী যৎপরোনাস্তি ভৎ´সনা করছেন তাকে। কাঁদছে সে। শুনলুম, ডোমনের প্রথম বউ শুকরিকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুকরি তার বাবার কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার বাবাও দূর করে দিয়েছে তাকে, কারণ সে অন্তঃসত্ত্বা। তাকে ঘরে স্থান দিলে সমাজে একঘরে হতে হবে। সুতরাং, অকূল পাথারে পড়েছে শুকরি।

গিন্নী আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এর ব্যবস্থা কর একটা। তা না হলে ও মুখপুড়ি আমাদের বাড়িতেই আড্ডা গাড়বে এসে।

মেথরদের উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল আমার, কারণ মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসার ডাক্তার সেন আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর সহায়তায় সিতাবী, ডোমন

এবং আরও জনকয়েক প্রবীণ মেথরকে ডেকে পাঠালাম। ছোটখাটো একটা সভা হল আমার বৈঠকখানায়। সেই সভায় স্থির হল যে, শুকরির বেচালের জন্যে সিতাবীকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এ টাকায় ভোজ হবে একটা। শুকরি সকলের সামনে কান মলে, নাক মলে বলবে যে, এমন কাজ সে আর কখনও করবে না। এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ডোমন শুকরিকে বিয়ে করবে। ডোমনের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে শুকরি যদি মানিয়ে না চলতে পারে, তা হলে ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে সিতাবীকে। ডাক্তার সেন বললেন, শুকরিকে মিউনিসিপ্যাটিতে চাকরি করে দেবেন একটা। সুতরাং তাই হল। শুকরি পঞ্চায়েতের সামনে নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আর বিপথে যাবে না।

আজ আবার মাছের বাজারে দেখলুম, শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটেছে।

কোলের মেয়েটা বোধ হয় ডোমনের মেয়ে। হঠাৎ আর একটা ঘাড়-ছাঁটা মেথর ছোঁড়া শুকরির পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা ইলিশ মাছ। ডোমন নয়, আর একজন। আমাকে সেলাম করে গেল তারা। বুঝলাম, হারামজাদি আবার একটা জুটিয়েছে কাকে, আবার ফ্যাসাদ বাধাবে।

মনে হল এদের নীতি-কথা বলে সংশোধন করা শক্ত। তার চেয়ে জন্ম-শাসন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে হয়তো সমাজের উপকার হয়—

এই পর্যন্ত পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ঠাকুরদার ডায়েরিটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলেন।

বন্ধু বিকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুকরি কিন্তু ঠাকুরদার উপদেশ শোনে নি। চোদ্দটা ছেলেমেয়ে হয়েছিল তার। তুমি যে কিষুণের কাছে ইলেকশনে হেরে গেছ, সে ওই শুকরিরই ছেলে—"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, আমরা ভদ্রলোকেরা জন্মশাসন করে সংখ্যায় কমে যাচ্ছি, আর ওরা কিছু না করে সংখ্যায় হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। সংখ্যাধিক্যই যখন যোগ্যতার মাপকাঠি আজকাল, তখন আমাদের পরাজয় অনিবার্য।"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু যাই বল ভাই, এ যুগে জন্মশাসন না করলে চলা অসম্ভব। আমি অন্ততঃ মরে যেতুম।"

সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে বিনয় বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা, শিগগির এস, পিসিমা ডাকছে।"

সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন জগদীশ-পত্নী শ্রীমতী সবলা দেবী।

সাজে-পোশাকে, ভাব-ভঙ্গিতে অতি-আধুনিক।

স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য, তুমি এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছ! তুমি বাড়িতে না থাকলে আমি মিটিংয়ে যাব কি করে—"

"ওহো, একেবারে ভুলে গেছি। চল।"

নমস্কারাদি বিনিময়ের পর স্বামীকে লইয়া শ্রীমতী সবলা চলিয়া গেলেন।

বিকাশের দিকে চাহিয়া অবনী বলিলেন—"জন্মশাসন করলে কি হয়, তার দু রকম নমুনা পাওয়া গেল আজ! বিকাশ ইলেকৃশনে হারল, জগদীশ সুখে আছে—"

"কেন, তৃতীয় নমুনাও তো দেখলে, ওই সবলা দেবী। বছর বছর ছেলে হলে, ও মিটিং করে বেড়াতে পারত কি?"

"জন্মশাসন তা হলে ত্রি-ফলা, তিন রকম ফলের সম্ভাবনা আছে ওতে—"

বিকাশ বলিলেন, "শুকরি মেয়েটিকে কিন্তু ভারি ভাল লাগল। সুরেনের ঠাকুরদা বেড়ে লিখতে পারতেন তো—"

সুরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হইয়া অন্দরমহল হইতে ফিরিলেন;

"অবনী গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারবে—"

"তা পারব। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল—"

"আমার বউয়ের কাল থেকে ব্যথা ধরেছে। ডাক্তার ডাকতে হবে—"

"ও—"

অবনী বড়লোকের ছেলে। অবিবাহিত। পকেটে সর্বদা টাকা থাকে।

অবিলম্বে পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন!

"আমি ডাক্তারের কাছে চললুম—। তোমরা বস। চা করতে বলেছি"—সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

অবনী একটি সিগারেট ধরাইয়া রিং করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, জন্মশাসন না করলে যা হয়, তাও দেখছি ত্রিফলা। ধর্ম, অর্থ, কাম। আমাদের সুরেনের কথাই ধর। খাঁটি ধার্মিকলোক, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। বারোটি সন্তান যখন, কাম ওর চরিতার্থ হয়েছে। অর্থটা যদিও এখন মাইনাসের দিকে চলছে, কিন্তু ওর আটটা ছেলে যদি মানুষ হয়, চারটেও যদি হয়, তা হলে অর্থও হবে—"

চাকর চা লইয়া প্রবেশ করাতে আলোচনা আর বেশীদূর গড়াইল না।

অতি-ছোট গল্প

দীপ-শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, যেন অধীরভাবে কার প্রতীক্ষা করছে। আর আকুল আগ্রহই যেন অচঞ্চল করেছিল তাকে। একটু পরেই ধীরে ধীরে সে কাঁপতে লাগল। এসেছে, হাওয়া এসেছে। কাঁপুনি বেড়ে গেল তার। মনে হতে লাগল, হাওয়ার বাহুপাশে আত্মহারা হয়ে পড়েছে সে বুঝি।

দীপ-শিখা। ছেড়ে দাও, ও কি করছ?

হাওয়া। আমাকে ছেড়ে কি থাকতে পারবে তুমি? বিজ্ঞানীরা কি বলেছেন জানো?

দীপ-শিখা। কি?

হাওয়া। আমার মধ্যে না কি অক্সিজেন-নামে একরকম গ্যাস আছে। সেই গ্যাসই নাকি মূর্ত করেছে তোমাকে শিখা-রূপে। আমি না থাকলে, তুমিও থাকতে না।

দীপ-শিখা। ইস্—। কি করছ তুমি—

হাওয়ার বেগ বাড়ল। দীপ-শিখা কাঁপতে লাগল অসহায়ভাবে।

ঘরের আর এক কোণে।

"ছিঃ, কি করছ—"

"কি ভণ্ড তুমি! এইজন্যেই তো জেগে আছ!"

"ছাড়, ছাড়। ঘরে আলো রয়েছে, বড্ড লজ্জা করছে আমার—"

"আলোটা নিবিয়ে দাও তা হলে।"

একটি নিটোল সুন্দর মুখ এগিয়ে এল দীপ-শিখার কাছে।

একটি ফুৎকারে নিবে গেল দীপ-শিখা।

"বড্ড জোর হাওয়া আসছে। জানলাটা বন্ধ করে দি?"

"দাও—"

দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা।

নাক

কথিত আছে, নাকের জোরেই ক্লিওপেট্রা নাকি বড় বড় বীরদের ঘায়েল করিয়াছিলেন। স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য বীর পাঁচুগোপাল আইচ মহাশয়ও নাকের জন্যই ঘায়েল হইলেন।

শ্রীপাঁচুগোপাল আইচ একটি আপিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। "রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে কে করে মানা"—এ কথা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহার আপিসে সকলেই তাঁহার ভয়ে তটস্থ। কেবল এক গণেশপ্রসাদ আইচ ছাড়া। আইচ পদবী দেখিয়াই ছোকরাকে পাঁচুগোপালবাবু বাহাল করেন। আইচদের সম্বন্ধে তাঁহার কিছু দুর্বলতা আছে। ইণ্টারভিউ করিবার সময়ও ছোকরাকে তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল। বাটারফ্লাই ছাঁটের গোঁফটা যদিও তেমন পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথাবার্তা, চটপটে চাল-চলন, চমৎকার হাতের লেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নামটিও ভালো, গণেশপ্রসাদ আইচ। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার মুগ্ধভাবটা কাটিয়া যাইতেছে। ছোকরার ডাক-নাম না কি পিংপং! একদিন লক্ষ্য করিলেন, আপিসে ঢিলা পায়জামা, চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং লখনৌ-শহর-জাত শুঁড়-ওলা নাগরা পরিধান করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, এটা আপিস। তোমার বৈঠকখানাও নয়, শ্বশুরবাড়িও নয়। হয়, সাহেবী পোশাক পরে এসো, তা না পার, ভদ্র বাঙালী হলেও চলবে। তার মানে, কাপড়ের ওপর গলাবন্ধ কোট বা ভদ্র কামিজ বা পাঞ্জাবি। ফুটানি করবার জায়গা এটা নয়।"

পিংপং বলিল, "এ সম্বন্ধে কি কোনও আইন আছে?"

শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন পাঁচুগোপালবাবু। তাঁহাকে আইন দেখাইতে আসিয়াছে!

বলিলেন, "এ আপিসে আমার কথাই আইন। যা বললাম, তাই কোরো। নইলে চাকরি থাকবে না।"

"এ তো আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি।"

ছোকরা গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ইহার দিনসাতেক পরে পাঁচুবাবু একদিন সিনেমা দেখিতে গিয়াছেন, হঠাৎ নজরে পড়িল, তাঁহার ঠিক সামনের সিটেই পিংপং বসিয়া আছে। সিগারেট খাইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া জ্বলন্ত-সিগারেট-সুদ্ধ হাতটা তুলিয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু সিগারেটটা ফেলিয়া দিল না। তাঁহার নাকের উপর ধোঁয়া ছাড়িয়া একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, ছোকরা যথার্থ ই আইচ-কুল-কুলাঙ্গার।

পরদিন আপিসে গিয়াই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"দেখ, তোমাকে টেম্পোরারি হ্যাণ্ড হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কাজ-কর্ম, চাল-চলন কিছুই আমার পছন্দ নয়, তুমি অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখো. আমরা তোমাকে পার্মানেণ্ট করব না।"

পিংপং স্থিরদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে একটি সুবাসিত রঙীন রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও মুখটা মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "অনেক ধন্যবাদ—"

নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার দিন-তিনেক পরে পিংপং যাহা করিল, তাহা আরও বিস্ময়জনক। আপিসে আসিয়া বলিল, "আমি আর একটি চাকরির যোগাড় করেছি। সেটা এ চাকরির চেয়ে ভালো। মাইনে প্রায় দেড়গুণ, কাজ অর্ধেক। সাহেবী ফার্ম। তবে আপনি রেকমেণ্ড না করলে সে চাকরি হবে না। আমি দরখাস্তটা লিখে এনেছি, আপনি রেকমেণ্ড করে দিন—"

ছোকরার স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন পাঁচুগোপাল।

"সরি, আমি রেকমেণ্ড করতে পারব না।"

ভ্রূযুগল কপালে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পিংপং বলিল, "সে কি!—"

"না, আমি মিছেকথা লিখতে পারব না।"

পিংপং গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পরদিন আপিসেও আসিল না। পাঁচুগোপাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু দিনতিনেক পরেই আবার তাঁহাকে নিঃশ্বাসটি টানিয়া লইতে হইল। তিনদিন পরে লম্বা খামে তাঁহার নামে একটি পত্র আসিল। খামটি খুলিয়া দেখিলেন, পিংপং সেদিন যে দরখাস্তটি রেকমেণ্ড করাইবার জন্য আনিয়াছিল, সেইটি রহিয়াছে, আর রহিয়াছে মেয়েলী-হাতের লেখা একখানি চিঠি।

ভাই পাঁচু,

আমাকে আশা করি, এতদিনে সম্পূর্ণ ভুলে গেছ। ভোলাটাই স্বাভাবিক, যদি ভুলে থাক, তোমাকে দোষ দেব না। আমাকে অনেকেই ভুলেছে। তোমার হাত ধরেই আমি সর্বপ্রথম অকূলে ভেসেছিলাম, তুমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছ, কিন্তু আমি আর কূলে উঠতে পারি নি। অনেকে আবার এসে আমার হাত ধরেছে, আবার ছেড়ে দিয়ে চলেও গেছে। এমনিই হয়। পুরুষমানুষরা পদ্মপত্রের মতো, তাদের গায়ে বা মনে জল দাঁড়ায় না, এমন কি চোখের জলও নয়। তুমি এখন মানী, পদস্থ ব্যক্তি হয়েছ, আমার সঙ্গে তোমার যে কি সম্পর্ক ছিল, তা সবাই ভুলে গেছে, এমন কি তুমিও ভুলে গেছ। কি সব বাজে কথা লিখলুম, আসল যে কথাটা বলবার জন্যে এই চিঠি লিখছি, সেইটেই আগে বলি। পিংপং আমার ছেলে। ওর বাবা কে, তা আমি হলফ করে বলতে পারব না, কিন্তু আমার ধারণা, তুমিই ওর বাবা, তাই ওর আঁইচ পদবী দিয়েছি। তাই তোমার আপিসে ও কাজ পেয়েছে শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। এখন

শুনছি, ওকে নাকি তোমার তেমন ভালো লাগে নি, তাই ওকে নোটিশ দিয়েছ। আর একটা আপিসে ও চাকরি যোগাড় করেছে, কিন্তু তুমি সুপারিশ না করলে সে চাকরি ওর হবে না। দরখাস্তটি এই সঙ্গে পাঠালুম, দয়া করে একটু সুপারিশ করে দিও। ওই আমার একমাত্র সন্তান, একমাত্র ভরসা। ও যদি রোজগার করতে না পারে, আমাকে উপবাস করতে হবে। কারণ, আমি এখন অসমর্থ, আর রোজগার করতে পারি না। আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও। আর, দয়া করে একটু সুপারিশ করে দিও লক্ষীটি।

ইতি—তোমারই সুশী।

নীচে ঠিকানা দেওয়া ছিল। হাড়কাটা গলির ঠিকানা।

পত্রটি পাঠ করিয়া পাঁচুগোপাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের সামনে হইতে ত্রিশ বৎসরের যবনিকা সরিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—দ্বিতলের একটি জানালায় ষোড়শী সুশীলা দাঁড়াইয়া আছে। পানের মতো মুখখানি, তাহার উপর বাঁশীর মতো নাকটি। প্রথমে নাকটাই তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল, নাক দেখিয়াই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মনে পড়িল—ওই-নাক, সই-নাক, মৈনাক, কই-নাক, প্রভৃতি মিল মিলাইয়া দীর্ঘ একটি কবিতাও তিনি লিখিয়াছিলেন। সব মনে পড়িল। দরখাস্তটির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর জোর কলমে সুপারিশ করিয়া দিলেন।

দিনদুই পরে সন্ধ্যার পর পাঁচুগোপাল হাড়কাটা গলিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং খুঁজিয়া সুশীলার বাড়িটা বাহির করিলেন। একটি স্থবিরা চাকরাণী বাহির হইয়া আসিল।

"সুশীলা কি এইখানে থাকে—"

"হ্যাঁ।"

"পিংপং বাড়িতে আছে—"

"না, তিনি বেরিয়ে গেছেন। রাত বারোটার আগে ফিরবেন না।"

"সুশীলাকে বল, পাঁচুগোপালবাবু এসেছেন—"

চাকরাণী একটু পরেই আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। পাঁচুগোপালবাবু দেখিলেন, একটি অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

"এ কি সুশীলা, ঘোমটা কেন—! ঘোমটা খোল।"

সুশীলা ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ঘোমটা সরাইয়া দিল। পাঁচুগোপালবাবু আঁৎকাইয়া উঠিলেন। সে নাক নাই, নাকের জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গর্ত।

বিশ্বাস মশাই

আমরা আগ্রার তাজমহল দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আগ্রার বাঙালী বন্ধুবান্ধবেরা বলেন, "এতদূর যখন এসেছেন, তখন হরিদ্বারটাও দেখে যান।" আমাদের তত ইচ্ছে ছিল না। কারণ, প্রথমতঃ, টাকা কমে গিয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ, অত বড় পরিবার এবং লটবহর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করবার আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমাদের দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবই ছিল, আর প্রত্যেকের বিবিধরকম বায়নাক্কা। কেউ ঝাল পছন্দ করে, কেউ করে না; কারও বাথরুম না হলে স্নানের সুবিধা হয় না; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা স্লেচ্ছাচার পছন্দ করেন না; ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় তাঁদের; দু-তিনটে ছেলে অসুখে পড়ে গেল। আর টাকা তো জলের মতো খরচ হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আগ্রার বন্ধুরা একেবারে না-ছোড়। টাকা কমে গিয়েছে শুনে তাঁরা কিছু টাকা ধার দিতেও উদ্যত হলেন। তাঁদের বললাম, "হরিদ্বারে কাউকে তো চিনি না। এখানে আপনারা ছিলেন—কোনো অসুবিধা হয়নি।"

একজন বন্ধু বললেন, "হরিদ্বারেও হবে না, সেখানে বিশ্বাস মশাই আছেন—"

"বিশ্বাস মশাই কে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

যদিও প্রত্যেকটি লোক অসুবিধা ভোগ করছিল, তবু হরিদ্বারের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠল সবাই। বিশেষ করে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শেষটা, বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে যাওয়াই স্থির করলাম। হুজুকে-বাঙালী আর কাকে বলে!

॥ দুই ॥

হরিদ্বারে পৌঁছলাম ভোরে। তখনও অন্ধকার ভাল করে কাটে নি। জানলা দিয়ে খুব আশাভরে মুখ বাড়ালাম, ভাবলাম, কোনও অপরূপ দৃশ্য বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ড টেনে নিতে হল। বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে শীত। প্যাসেঞ্জার-কুলি ভিজে-ভিজেই ছুটোছুটি করছে প্যাচপেচে প্ল্যাটফর্মে। দমে গেলাম বেশ। মালপত্র আর সাজোপাঙ্গ নিয়ে আমাকেও নামতে হবে এর মধ্যে। বিদেশে কুলিরাই বন্ধু। তাদেরই সাহায্যে নেমে পড়লাম অবশেষে। নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। কোথায় আশ্রয় মিলবে, কিছু জানা ছিল না। অবিলম্বে কয়েকটা পাণ্ডা এসে ঘিরে ধরল এবং কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, পিতামহের নাম কী, কোনও পাণ্ডা ঠিক করা আছে

কি না, প্রভৃতি প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলল সকলকে। কী করব, দিশাহারা হয়ে ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বাস মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একটা কুলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, বিশ্বাস মশাই কোথা থাকেন জান?"

"ওই তো বিশ্বাসবাবু। এ বিশ্বাসবাবু, এ বিশ্বাসবাবু, ইধর আইয়ে—"

কুলির ডাকে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চেহারা দেখে তো চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। এরই ভরসায় আমরা এসেছি! এ যে ভিখারী একটা! পরনে আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেড্‌স। মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে, তাও কেমন যেন খাপছাড়াগোছের, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, এখানে চারটি, ওখানে চারটি, ছড়ান-ছড়ান। রংটি কুচকুচে কালো। হাতদুটি জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখদুটি ছোট ছোট, কিন্তু অপরূপ। যে বিনয়, ভদ্রতা এবং স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছিল সে-চোখের দৃষ্টি থেকে, তা আজকাল দুর্লভ। অথচ ভদ্রলোকের বেশবাস এমন কুৎসিত কেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

"আমাকে ডাকছিলেন?"

নমস্কার করে বললাম, "আগ্রার মতিবাবু আপনার খোঁজ করতে বলে দিয়েছিলেন। আমরা এখানে নতুন এলাম তো, কিছুই জানি না, কাউকে চিনিও না—"

"তা বেশ, চলুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

তারপর কুলির দিকে ফিরে বললেন, "কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ওখানে নিয়ে চল—"

বিশ্বাস মশাইয়ের পিছু পিছু আমরা সার বেঁধে চলতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। না নিলে ওর জন্যে আর একটা কুলি করতে হত। কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আস্তানায় যখন পৌঁছলাম, তখন কুলিরা পয়সা চাইতে লাগল। সাধারণতঃ কুলিরা যা করে বিদেশী দেখে, খুব বেশী চাইতে লাগল। আমার কাছে দশ টাকার নোট ছিল, খুচরো পয়সা ছিল না, তাই বেশ একটু বিব্রতবোধ করতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই বললেন, "নোটটা আমাকে দিন—"

অচেনা লোককে নোটটা দিতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না, বলে দিলাম। বিশ্বাস মশাই কুলিদের দিয়ে জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়ে বিছানাপত্র পাতিয়ে আমাদের খালি কুঁজোদুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুলিরাও তাঁর পিছু পিছু গেল। তারপর যা ঘটল, তাতে অবাক হয়ে গেলাম। কুলিদের গোলমালে ব্যাপারটা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। গঙ্গার কলকলধ্বনি শোনা গেল। নদী যে কলকলধ্বনি করে, এ-কথা কেতাবেই পড়েছিলাম, কানে শুনি নি কখনও। কুম্ভকর্ণের বাড়িটা ঠিক গঙ্গার উপরই, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, যেন একটি তন্বী কিশোরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে। গঙ্গার এমন রূপ আর কখনও দেখি নি। খুব কম চওড়া, নীলাভ জল, অত্যন্ত স্বচ্ছ, নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। আর, বড় বড়

মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ হরিদ্বারের মহিমা যেন চোখে পড়ল, গম্ভীর বিরাট কিছু নয়, সজীব, সতেজ, চিরনবীন।

"খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথা করবেন আপনারা—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, বিশ্বাস মশাই ফিরে এসেছেন। নোটটি ভাঙিয়েছেন তিনি, কুলিপিছু দু-আনার বেশী দেন নি, কিছু টাকার খুচরো করে এনেছেন, এমন কি চার-আনার আধলা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। বললেন, "অনেক ভিকিরিকে দিতে হবে কি না।" পাই পয়সা হিসেব দিলেন, তারপর বললেন, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী করবেন বলুন—"

"কী ব্যবস্থা আছে এখানে ?"

"দোকান থেকে কিনে খেতে পারেন। লুচি, তরকারি পাওয়া যেতে পারে, ভাতও পাবেন একটা হোটেলে। কিন্তু ও-সব কি আপনারা খেতে পারবেন ? দামও নেবে, তৃপ্তিও পাবেন না।"

আমার স্ত্রী বললেন, "এখানে রান্না করার ব্যবস্থা হয় না ? আমাদের স্টোভ আছে—"

"হ্যাঁ মা, খুব হয়। আমি একটা তোলা উনুনেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি—"

"তাই হক, তা হলে। খিচুড়ি আর কিছু ভাজাভুজি করা যাক, বৃষ্টিও নেবেছে, জমবে ভাল।"

সকলে এই ব্যবস্থাতেই রাজি হয়ে গেল।

আমার শালী প্রশ্ন করলেন, "মুগডাল পাওয়া যাবে ?"

"যেতে পারে। তবে এখানে অড়র, বুটই বেশী চলে। আমি চেষ্টা করে দেখব।"

মুগের ডাল এখানে পাওয়া যায় না বলে বিশ্বাস মশাই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। এটা যেন তাঁরই অপরাধ।

"মুগ না পাওয়া গেলে, মুশুরি আনবেন। খাঁড়ি মুশুরি হলেই ভাল হয়—"

"চেষ্টা করব। খুবই চেষ্টা করব।"

"তরকারি কি পাওয়া যায় এখানে ?"

"আলু, নেনুয়া, ঝিঙে। পেঁয়াজও পাওয়া যাবে।"

"পটল ?"

আবার কুণ্ঠিত হলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, পটল এখানে পাওয়া যাবে না।"

"বেগুন ?"

আরও কুণ্ঠিত হলেন।

"না, বেগুনও নয়।"

হাত কচলাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

'লঙ্কা পাওয়া যাবে নিশ্চয় ?" আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"তা যাবে, তা যাবে।"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফোঁস করে উঠলেন আমার বোনটি।

"লঙ্কা পেয়ে আর কাজ নেই। বৌদি খিচুড়িটি ঝালে পুড়িয়ে দেবে তা হলে।"

"তোকে আমি সাবু করে দেব, তাই খাস।"

কিন্তু-কিন্তু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বাস মশাই।

আমি তাঁকে গোটাপাঁচেক টাকা দিয়ে বললাম, "যা পান, কিনে আনুন। আমি ততক্ষণ স্টোভ জেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

দুটো ঘর নিয়েছিলাম আমরা। একটা ঘরে বাবা, মা ছিলেন।

মা বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার বাবা, একটু গঙ্গাজল চাই!"

বিশ্বাস মশাই কখন যে কুঁজোদুটি ভরে এনেছিলেন টের পাই নি। বললেন, "দু-কুঁজো জল আমি এনে রেখে দিয়েছি ও-ঘরে।"

"ও কুঁজো বাবা, শতেক জাতে ছুঁয়েছে। একটু শুদ্ধভাবে যদি—"

"আচ্ছা, আনব মা। নতুন কলসী কিনে ভরে আনি তা হলে—"

বিশ্বাস মশাই চলে গেলেন।

আমি স্টোভ জেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিলাম।

গিন্নী ছোট ছেলের কপালে হাত দিয়ে বললেন, "এর তো বেশ জ্বর হয়েছে, দেখছি—"

মন্তব্য করলাম, "আগ্রাতেই তো ওর জ্বর হয়েছিল। লাফিয়ে তো চলে এলে।"

"আমি লাফিয়ে এলাম, না তুমি লাফিয়ে এলে ? পরের ঘাড়ে দোষ চাপান তোমার কেমন একটা স্বভাব—"

দাম্পত্য-কলহের উপক্রম হল।

ছোট ছেলেই থামিয়ে দিলে সেটা।

"না বাবা, আমার কিচ্ছু হয়নি। র্যাপার মুড়ে শুয়েছিলাম কিনা, তাই কপালটা গরম হয়েছে—"

"খুব হয়েছে, শুয়ে থাক এখন।"

মায়ের ধমক খেয়ে র্যাপার মুড়ি দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বিশ্বাস মশাই বাজার থেকে ফিরলেন জিনিসপত্র নিয়ে। দেখলাম, আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার শালীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "খাঁটি মুশুরিই পেয়েছি, মা। বেশ ভাল ডাল।"

তাঁর পিছনে দেখলাম, পাণ্ডাদের একটা ছোঁড়া নতুন কলসীতে করে গঙ্গাজলও নিয়ে এসেছে মায়ের জন্যে। বিশ্বাস মশাই আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, "আমিই

নিয়ে আসতুম গঙ্গাজলটা. কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। কর্তা-মা যদি আপত্তি করেন, তাই ওকেই বললাম নিয়ে আসতে। গোটাচারেক পয়সা দিলেই চলবে।"

বিশ্বাস মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সপসপে ভিজে কাপড়ের কোঁচাটা নিঙড়ে জল বার করতে লাগলেন। কামিজের সামনের দিকটাও নিঙড়ে ফেললেন।

চা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, "চা খান, বিশ্বাস মশাই।"

"দেবেন ? বেশ দিন—"

একটা গ্লাসে চা দিলাম। তিনি একধারে সসংকোচে বসে চা খেলেন।

গিন্নী বাজারের জিনিস দেখে বললেন, "গুঁড়ো হলুদ আর লঙ্কা এনেছেন, কিন্তু ও তো ধুলোয় ভরতি, ওতে খিচুড়ির রং তো ভাল হবে না—"

বিশ্বাস মশাই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

"হ্যাঁ, সে কথা আমারও মনে হয়েছিল। আচ্ছা, দেখছি—"

পাণ্ডার সেই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়েছিল, বিশ্বাস মশাই তার কানে কানে কী বললেন, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দেখলাম, তিনি ছোট একটি শিল-নোড়া, কিছু গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসেছেন।

আমার শালী বললেন, "ওরে বাবা, ও সব এখন বাটবে কে ?"

"আমি বেটে দিচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে—"

বিশ্বাস মশাই এক কোণে বসে বাটনা বাটতে লেগে গেলেন।

বাটনা বেটে, তোলা উনুনটা নিয়ে এলেন তিনি। বাজারে যাওয়ার সময়েই সেটাতে আঁচ দিয়ে গিয়েছিলেন। গিন্নী খুশী হলেন খুব। বেশ গনগনে আঁচ উঠেছে।

শালী বললেন, "আমি আলু-ছেঁচকি করব। উষা, তুই ভাই, আলুগুলো কুটে ফেল—। ও হরি, বঁটিই যে নেই—"

"এনে দিচ্ছি—"

বিশ্বাস মশাই পাণ্ডাদের কাছ থেকে বঁটি যোগাড় করে আনলেন।

আলু কোটা হলে আবিষ্কৃত হল, ছেঁচকি হওয়ার পথে আর একটি অন্তরায় বিদ্যমান। পাঁচ-ফোড়ন নেই। বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন।

তারপর স্নান করার পালা। গঙ্গার স্রোত এত বেশি যে, সেখানে নেবে দাঁড়ান পর্যন্ত যায় না। একটা শিকল আছে, সেইটে ধরে কোনরকমে একটা কি দুটো ডুব দেওয়া যায়। বিশ্বাস মশাই সবাইকে একে একে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন। তারপর দল বেঁধে সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আনলেন।

এ সব সেরে বেশ খিদে পেয়ে গেল সকলের। তখনও কিন্তু রান্না চড়ে নি। ঠিক হল, কিছু গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নেওয়া যাক জলখাবার হিসেবে। বিশ্বাই মশাই

আবার গেলেন সে-সব ভাজিয়ে আনতে। তাঁকে পই-পই করে বলে দেওয়া হল, তিনি যেন নিজের সামনে ভাজিয়ে আনেন সব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আনব বই কি। নিজের সামনে ভাজিয়ে আনব।"

বৃষ্টির বেগটা কমেছিল, কিন্তু টিপ-টিপ করে পড়ছিল তবু। বিশ্বাস মশাই বেশ ভিজেই ফিরলেন।

বললাম, "বিশ্বাস মশাই, আপনি কাপড়টা, জামাটা ছেড়ে ফেলুন না।"

বিশ্বাস মশাই নির্বিকার। খাবারের ঝুড়িটা খুলতে লাগলেন। বললেন, "খাঁটি ঘিয়ে ভাজিয়ে এনেছি। আচারও বেশি করে এনেছি একটু—"

"এনেছেন; বেশ করেছেন। কাপড়-জামাটা ছাড়ুন—"

বিশ্বাস মশাই হেসে বললেন, "ও একেবারে রাত্রে শোবার সময় ছাড়ব। শুকনো জামা-কাপড় পরলে আবার এখুনি তো ভিজে যাবে।"

বুঝলাম, এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। কারণ, পরমুহূর্তেই বাবা বললেন, তাঁর নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, এখানে পাওয়া সম্ভব কি?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বাস মশাই।

"হ্যাঁ, সম্ভব বই কি। র-মাদ্রাজী, পরিমল দু-রকমই পাওয়া যাবে। কোন্‌টা আনব বলুন—"

বাবা র-মাদ্রাজী আনতে বললেন। র-মাদ্রাজী নস্যি এনে বিশ্বাস মশাই পা-টি মুড়ে যেই বসেছেন, অমনি আমার গিন্নী বললেন, "ছায়া, চিরুনিটা যে তোর হাতে দিলুম, আগ্রা হোটেলে "

ছায়া আমার শালী। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, "আমার হাতে কখন দিলে আবার। দিয়ে থাকলে ওই অ্যাটাচিতেই রেখেছি—"

"কই, এতে তো নেই!"

বাক্স, সুটকেশ, তোরঙ্গ সব খোঁজা হল। চিরুনি নেই।

সুতরাং, বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন চিরুনি কিনতে, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে ছুটলেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেট আনতে দিলাম। আমার ছোট ছেলেটার জ্বর যদি বেড়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব এই বিদেশে। সমস্ত এনে দিলেন বিশ্বাস মশাই।

খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস মশাইকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। খাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বিশ্বাস মশাই বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। ভাল ঘি আছে আমার একটু, নিয়ে আসি—।" দৌড়ে চলে গেলেন এবং ভালো গাওয়া ঘি নিয়ে এলেন একটা শিশি করে। বললেন, কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি দিয়ে গিয়েছেন এটা তাঁকে। বেশ তৃপ্তিসহকারে খাওয়া গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। বিশ্বাস মশাই বসে রইলেন একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

"আপনিও যান না, একটু বিশ্রাম করে নিন।"

বিশ্বাস মশাই সসঙ্কোচে বললেন, "আপনাদের যদি কোনও দরকার হয়—"

"না, আর কিছু দরকার হবে না। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন গিয়ে। বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।"

চলে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

বিকেলে এলেন একটি লোক সঙ্গে করে। বললেন, "আপনারা কি হৃষীকেশ, লছমনঝোলা যাবেন। যদি যান, তা হলে বাসে করেই যাওয়া ভাল। ইনি আমার চেনা বাসওলা। একটা ছোট বাস যদি রিজার্ভ করে নেন, ইনি সস্তায় করে দেবেন—"

বললাম, "যেতে তো খুবই লোভ হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তো দেখছেন, এখানে আপনি ছিলেন, তাই সামলে দিলেন, কিন্তু সেখানে—"

"যদি বলেন, সেখানেও আমি যাব।"

খবরটি পাওয়ামাত্র চনমন করে উঠলো সবাই।

বাবা বললেন, "এতদূর এসে যদি না দেখে ফিরে যাই, তা হলে আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা হয়ত আবার আসতে পার, কিন্তু আমরা আর পারব না।"

এ যুক্তি অকাট্য। একটা কুইনিনের বড়ি খেয়ে ছেলেটার জ্বরও কমে গিয়েছিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হল।

হৃষীকেশ-লছমনঝোলার বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না, কারণ, তা বর্ণনা করা যাবে না। হৃষীকেশ-লছমনঝোলায় বিশ্বাস মশাই যা করেছিলেন, তা-ও প্রায় অবর্ণনীয়। আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বলে আমার পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছিলেন তিনি। হৃষীকেশের সরাইখানায় বিশ্বাস মশাইকে একটু নির্জনে পেয়েছিলাম রাত্রিবেলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার দেশ কোথা, বিশ্বাস মশাই। বাংলা দেশে নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, বাংলাদেশে বই কি। তবে সে-দেশ ছেলেবেলায় ছেড়ে এসেছি।"

"কোথা বাড়ি ছিল আপনার?"

"তা আর না-ই শুনলেন। আমি সামান্য লোক—"

কাঁচুমাচু হয়ে থেমে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, না, বলুন শুনি।"

"আমার পরিচয়, দেবার মত নয়। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি নি, লেখাপড়া পর্যন্ত শিখি নি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

সসঙ্কোচে থেমে গেলেন।

"বাংলাদেশের কথা মনে আছে আপনার ?"

"খুব বেশি নেই। তবে একটি ছবি মনে আছে। ছোট একটি পুকুর, পুকুরের পাড়ে তালগাছ, নারকেল গাছ। পুকুরের জল কুচকুচে কালো, সবুজ পানায় ঢাকা, ঘাটে একটি বউ কলসী ভাসিয়ে চান কচ্ছে, টুকটুকে লাল গামছা তার হাতে। হৃষীকেশ, হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়েও ও-ছবি আমার বেশি ভাল লাগে—"

"আপনি তো কবি-লোক দেখছি—"

কুণ্ঠিতহাসি হেসে বিশ্বাস মশাই বললেন, "আমি সামান্য লোক। তবে আমার দাদা একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁর কথা বলতেও লজ্জা করে আমার। আমি তাঁর ভাই হওয়ার উপযুক্ত নই।"

"কে আপনার দাদা, বলুন তো—"

"কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস। আমি দাদার নামের মর্যাদা রাখতে পারি নি।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। "আপনি কি করেন এখানে—"

"এই যাত্রীদের, বিশেষ করে বাঙালী যাত্রীদের, সেবা করি। এ ছাড়া আর কী করবার যোগ্যতা আছে বলুন—" "বাসা বলে তো আমার কিছু নেই। ট্রেনগুলো অ্যাটেণ্ড করি, যদি কোনো যাত্রী আসে। প্ল্যাটফর্মেই থাকি অধিকাংশ সময়। আর তা না হলে ওই কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার বাড়ির বারান্দায়। যাত্রীদের সেবা করাই কাজ তো—"

পাশের ঘরে আমার ছোট ছেলেটার গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন বিশ্বাস মশাই।

"খোকন উঠেছে, ওর জন্যে দুধ যোগাড় করেছি একটু, গরম করে খাইয়ে আসি—"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

ফেরবার সময় হরিদ্বারে বিশ্বাস মশাই এলেন আমাদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। অনেক রাত হয়েছিল। নিজ হাতে তিনি আমাদের বিছানাপত্র পেতে দিলেন, জিনিসগুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে দিলেন, রাত্রের খাবার আলাদা করে বেঁধে দিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিকে চেয়ে। মনে হল, তিনি যেন অতি প্রিয় পরিজনদের বিদায় দিতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, গার্ডসাহেব বাঁশি বাজালেন।

হঠাৎ আমার কী মনে হল, হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম। "বিশ্বাস মশাই, শুনুন—"

বিশ্বাস মশাই এগিয়ে এলেন। "এইটে রেখে দিন, সামান্য কিছু—"

একখানা দশ টাকার নোট বার করে তাঁর হাতে দিলাম।

"অ্যাঁ, এ কী, আপনি আমাকে টাকা দিলেন, টাকা দিলেন!"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

দেখলাম, বিশ্বাস মশাই নোটটি হাতে করে অসহায়ভাবে চেয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

পুত্র

নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফঃস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। এই প্রথম বেরিয়েছেন তিনি। প্রতিভাবান বাঙালী যুবক, অল্প কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সসম্মানে। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্টেশনে এসেছেন প্রবীণ অবাঙালী সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস (ইনি খাঁটি সাহেব), থানার দারোগা, কয়েকজন কনেস্টবল। আর এসেছেন জিতেন্দ্রনাথ বসু, সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কেরানী একজন। স্টেশনের বাইরে তিনখানি মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। একটি এস-ডি-ও. সাহেবের, একটি এস-পির। তৃতীয় কারটি স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী যুগলরাম মারোয়াড়ীর। এই তৃতীয় কারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ, এটি পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। সাধারণতঃ, বিয়ের সময় বরের গাড়ি যেভাবে সাজানো হয়, এটি সেইভাবে সাজানো। এ গাড়িটি চেয়ে এনেছেন কেরানী জিতেন্দ্রনাথ বসু।

…ট্রেন একটু লেট আসছে। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। ছোট শহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আগমনও একটা হৃৎস্পন্দনকর ঘটনা। স্টেশনমাস্টার, টিকিট-কালেক্টার পর্যন্ত একটু যেন সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তখন ইংরেজের আমল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ ও প্রতীক। লাল-পাগড়ি পুলিস, দারোগা, এস-পি, এস-ডি-ও. এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে, প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রীরা পর্যন্ত সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে আধময়লা জামা-কাপড়-পরা জিতেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। তাঁর মনিব সাব-ডিভিশনাল অফিসারের সামনে প্রগলভতা প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু তাঁর নাচতে ইচ্ছে করছে।

ঢং, ঢং, ঢং, ঢং—ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ট্রেন। এস-ডি-ও, এস-পি. এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। জিতেনবাবুও দৌড়ে গেলেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি যেতে পারলেন না। মনিবের সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নাবলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কচি মুখ, নেহাৎ ছেলেমানুষ। প্রতিভার দীপ্তি, কিন্তু বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ, মুখ থেকে।

নেবেই এস-ডি-ও. এবং এস-পির সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিছুদূর এসেই জিতেনবাবুকে দেখতে পেলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। অবাক হয়ে গেল সবাই।

এস-ডি-ওর দিকে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, "ইনি আমার বাবা—।" এস-ডি-ও. এই ধরনের একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে নমস্কার করলেন জিতেনবাবুকে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ কেরানীর কাছে সর্বসমক্ষে মাথা নোয়াতে হল বলে ক্ষুব্ধও হলেন একটু।

খাঁটি সাহেব এস-পি. বাঙালী-মহলে-প্রচারিত এ খবরটা জানতেন না। বেশ অবাক হলেন। কিন্তু টুপিটা ঈষৎ তুলে শিষ্টাচারসম্মত অভিবাদন জানাতে কসুর করলেন না।

জিতেনবাবু বললেন, "আমি গাড়ি এনেছি—"

"ও—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

"জাস্ট এ মিনিট সার—"

এস-পি. তাঁকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে। এস-ডি-ও. সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এস-পি. বললেন, "আপনি আমার ওখানে চলুন। এখানে ভালো ডাকবাংলো নেই। আমার বাংলোতেই সব ব্যবস্থা করেছি আপনার। ডিনার ইজ ওয়েটিং—" এস-ডি-ও বললেন, "এক্সকিউজ মি, আর একটা কথাও বিবেচনা করবার আছে। মিস্টার বোস আমার আপিসের একজন ক্লার্ক। একজন সাব-অর্ডিনেট ক্লার্কের বাড়িতে আপনার ওঠাটা অফিসিয়াল দৃষ্টিতে একটু অশোভন হবে না কি? জানেনই তো, আজ-কাল যিনি কমিশনার, অফিসিয়াল ফর্মের দিকে তাঁর খুব কড়া নজর।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর বাবাকে গিয়ে বললেন সে কথা। জিতেনবাবু বললেন, "ও তাই না কি। তা হলে যাও তুমি ওঁদের সঙ্গেই। কমিশনার সহেব সত্যিই খুব কড়া লোক। হয়তো—না থাক, ওদের সঙ্গেই যাও তুমি।"

এস-পি. সাহেবের গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

তাঁর পিছু পিছু এস-ডি-ও সাহেবও গেলেন।

পুষ্পে, পত্রে সজ্জিত যুগল মারোয়াড়ির গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল।

জিতেনবাবু ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, "একটা জরুরি দরকারে ওকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে চলে যেতে হল। তোমার গাড়ির আর দরকার হল না। তুমি যাও—"

যুগলবাবুর গাড়িও চলে গেল।

জিতেনবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হেঁটে হেঁটেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি।

অতিশয় ছোট বাড়ি তাঁর, গলির গলি, তস্য গলির মধ্যে। তবু এই বাড়িটিকেই

যথাসাধ্য সাজিয়েছিলেন তিনি। চুণকাম করিয়েছিলেন। বাড়ির সামনেটা দেবদারু-পাতা আর রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন। একটা লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লিখেও টাঙিয়ে দিয়েছিলেন বারান্দার সামনে। দুচারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই উপলক্ষে।

জিতেনবাবু যখন ফিরে এলেন, তখনও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা বসেছিলেন।

"সুকু আসতে পারলে না। একটা জরুরি দরকারে পুলিস সায়েব টেনে নিয়ে গেল তাকে।"

"তাই না কি—"

হতাশ হলেন দু-একজন, কেউ কেউ অবাক হলেন, মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলেন দু-একজন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেলেন একে একে।

সবাই চলে যাবার পর জিতেনবাবু চুপ করে বসে রইলেন বারান্দার উপর খানিকক্ষণ। তিনি বিপত্নীক। ওই সুকুমারই তাঁর একমাত্র সন্তান। বড় আশা করেছিলেন, সে এসে তার কাছেই উঠবে। কিন্তু এল না।

॥ দুই ॥

গভীর রাত্রি, থমথম করছে চতুর্দিকে। জিতেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

"বাবা—বাবা—"

দুয়ারের কড়া সশব্দে নড়ে উঠল।

তড়াক করে উঠে বসলেন জিতেনবাবু।

এত রাত্রে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে কে! তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন।

"এ কি, সুকু—!"

'আমি এইখানেই চলে এলাম। কমিশনার সায়েব যা-ই মনে করুক, আমি তোমার কাছেই থাকব—"

জড়িয়ে ধরলেন তাকে জিতেনবাবু। কেঁদে ফেললেন।

"এত রাত্রে কি করে এলি তুই—"

"হেঁটেই চলে এলাম।"

কোলকাতা থেকে মনিহারী যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে গাড়ি বদলাতে হবে। সাহেবগঞ্জে ঘাট-গাড়ি পাওয়া যায়, সেই গাড়িতে চড়ে যেতে হবে সকরিগলিঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে যেতে হবে মনিহারীঘাটে। মনিহারীঘাট থেকে মনিহারী যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যাবে।

সাহেবগঞ্জে নেবে দেখলাম, ঘাট-গাড়ি তখনও প্ল্যাটফর্মে আসে নি। কুলি বললে, গাড়ি 'সাইডিং'য়ে লাগানো আছে। সেখানে গিয়েই চড়া ভালো, কারণ সবাই সেইখানে গিয়েই চড়ছে। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসবার আগেই ভরতি হয়ে যাবে। সে আমাকেও সাইডিংয়ে গিয়েই চড়বার পরামর্শ দিলে। গিয়ে দেখলাম, থার্ড ক্লাশ প্রায় ভরতি হয়ে গেছে। একটিমাত্র ইণ্টার ক্লাস (তখন ইণ্টার ক্লাস উঠে যায় নি) আর তার ভিতরে দাড়িওলা ভীষণ-দর্শন লোক বসে আছেন একজন। দ্বিতীয় আর কোনও লোক নেই। কপাট খুলে ঢুকতে গেলাম, কপাট খোলে না।

বললাম, "কপাটটা খুলুন মশাই।"

"আমি তো কপাট লাগাই নি, আমি জানলা গলে ঢুকেছি, আপনিও পারেন তো ঢুকুন।"

মহামুশকিলে পড়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্ম নেই, অত নীচু থেকে জানলা গলে ঢোকা অসম্ভব মনে হল আমার পক্ষে। কুলিটা বললে, "আপনি বাবু, আপনার এই ট্রাঙ্ক আর বিছানার উপর দাঁড়িয়ে ওই হাতলটা ধরে ঝুলে পড়ুন। আমি পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছি, ঠিক উঠে যাবেন—"

তাই করেই উঠলাম। কনুয়ের কাছটা একটু ছড়ে গেল। আমি যখন ছিঁচড়ে জানলা গলে উঠছিলাম, তখন ওই দাড়িওলা ভদ্রলোক এতটুকু সাহায্য করেন নি, আমাকে যদি একটু ধরতেন, কনুইটা হয়তো জখম হত না। একটি বেঞ্চে নিজের জায়গাটা দখল করে বসে তাঁর দিকে চাইলাম একবার। দেখলাম, তাঁর চক্ষুদুটি অগ্নি-বর্ষণ করছে। মনে হল, এ রকম পাজি লোক আর দেখি নি। সমস্ত কামরাটা একলাই দখল করে থাকতে চায়।

একটু পরেই আর একদল যাত্রী এসে হানা দিলে আবার। আমাকে যে কুলিটা তুলে দিয়ে গেছে, দেখলাম, সে-ই এসেছে আবার এদের মাল-পত্র নিয়ে। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী, সঙ্গে গুটিতিনেক ছোট ছেলে। একটি ছ-সাত বছরের, একটি বছরচারেকের, আর ছোটটি বছরদুয়েকের বেশী হবে না। এদের পক্ষে জানলা গলে ঢোকা একেবারে অসম্ভব। কুলিটা আমার দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাবু, ছেলেদুটোকে তুলে নিন। তারপর আমি ভিতরে ঢুকে এঁদের টেনে তুলছি—"

দাড়িওলা ভদ্রালাক এতক্ষণ জ্বলন্তদৃষ্টি মেলে দেখছিলেন এদের দিকে। হঠাৎ স্বগতোক্তি করলেন—"যত ভাবি, একা থাকব, ততই জড়িয়ে পড়ি। পাপ, পাপ, পূর্ব-জন্মের পাপ সব !"

উঠে এলেন এবং দরজার ফাঁকে যে ছোট ইঁটের টুকরোটি গুঁজে রেখেছিলেন, সেটি খুলে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কপাট খুলে গেল। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ভদ্র-মহিলাটি আর ছেলেগুলি উঠে পড়ল গাড়িতে।

ভদ্রলোক এদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলেন, তা আমার আর দেখবার অবসর হল না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"মনিহারী যাচ্ছিস বুঝি—"

"হ্যাঁ—"

"আমার গাড়িতে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে একটু। কেস যোগাড় করেছি তোর জন্যে দুটো—" আমি ইন্‌সিওরেন্সে দালালী করি তখন। কেসের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

"জায়গা আছে তোর গাড়িতে ?"

"আছে।"

সেই কুলিটাকে দিয়েই জিনিসপত্র বইয়ে আবার অন্য একটা কামরায় হাজির হলাম গিয়ে।

সকরিগলিঘাটে গিয়ে আর দাড়িওলা ভদ্রলোকের খোঁজ পাই নি। প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে কে যে কোথায় চলে গেছে, ঠিক নেই।

স্টীমারে উঠে তাঁকে দেখতে পেলাম। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি গঙ্গায় স্নান করছেন, আর ওই তিনটি ছেলেকে স্নান করাচ্ছেন। সকরিগলিতে স্টীমার খানিকক্ষণ থামে, স্নান করে নেওয়ার সময় পাওয়া যায়। দেখলাম, দাড়িওলা ভদ্রলোক খুব স্নেহভরে স্নান করাচ্ছেন ছেলেগুলিকে। গামছা দিয়ে ঘসে ঘসে গায়ের ময়লা তুলছেন, মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, চোখের কোণ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। ছেলেগুলো আপত্তি করছে, কিন্তু তিনি শুনবেন না। দেখে বেশ অবাক লাগল। এই লোকই কিছুক্ষণ আগে ওদের ট্রেনে উঠতে দিচ্ছিল না !

...স্টীমারে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ওই ভদ্রলোক কি আপনার কোনো আত্মীয় হন ?"

"না। এই একটু আগেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হল ঘাট-ট্রেনে। উনি হিন্দু, আমি মুসলমান। এ কথা অবশ্য বলি নি ওঁকে। ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে—"

এই বলে মুচকি হাসলেন।

"ও।"

আর কিছু বললাম না।

ওপারে গিয়ে মনিহারীর ট্রেনে চড়বার সময় দেখলাম, দাড়িওলা ভদ্রলোক সেই ছোট ছেলেটিকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে আদর করছেন আর সে মুঠো করে তার দাড়ি চেপে ধরেছে।

"আরে দেবেনবাবু যে, কোথা চলেছেন—"

"দিনাজপুর যাব।"

দেখলাম, মনিহারীঘাটের একজন টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে দাড়িওলা ভদ্রলোকের কথা হচ্ছে। টিকিট-কালেক্টারটি আমারও চেনা। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাড়ি যাচ্ছেন না কি—"

"হ্যাঁ—"

আমি একটি কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। একটু পরে সেই টিকিট-কালেক্টার ভদ্রলোকও এলেন আমার কামরায়। একথা-সেকথার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— "আপনি ওই দাড়িওলা ভদ্রলোককে চেনেন না কি!"

"হ্যাঁ, খুব চিনি। পূর্ববঙ্গে আমাদেরই গ্রামে বাড়ি ওর। খুব নামী পরিবারের ছেলে—"

তারপর একটু থেমে বললেন, "গত রায়টে ওঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

"কি রকম—"

"ঘর-বাড়ি তো সব গেছেই, পুড়িয়ে দিয়েছে সব। ওঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েগুলোকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছে। কেউ নেই—"

নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম।

বিনোদ ডাক্তার

বরাবরই ধারণা ছিল, বিনোদ ডাক্তার খুব উঁচুদরের লোক। চিকিৎসক হিসাবে এ অঞ্চলে ওর জোড়া নেই, তা ছাড়া লোক চমৎকার। গরীবের মা-বাপ। বর্ধমানের কাছে এক পাড়াগাঁয়ে ওর বাড়ি। বছরচারেক আগে এখানে এসেছিল প্র্যাকটিশ করতে, এসেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে। শহরের মাঝখানে জমি কিনে বাড়ি করতে শুরু করছে। রূপে, গুণে সমান। বেশ সুপুরুষ চেহারা। ইয়া লম্বা, ইয়া বুকের ছাতি। মাথার সামনের দিকটা সামান্য একটু টাক আছে অবশ্য, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, বরং গাম্ভীর্য যেন বেড়েছে একটু। আমি যখনই খবর পেলাম যে, বিনোদ আমাদের পালটি ঘর, তখন থেকেই ওর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ল। বোনটির এখনও বিয়ে দিতে পারি নি। লোকের কাছে বলে বেড়াই বটে কুড়ি, কিন্তু ওর আসল বয়স পঁচিশ। আর বেশী দেরি করলে, চুলে হয়তো পাক ধরে যাবে। কিন্তু বিয়ের বাজারের যা অবস্থা। তার ওপর বোনটি আমার একটু কালো। চোখ, মুখের ছাঁদ খারাপ নয়, লেখাপড়াও শিখিয়েছি, কিন্তু এ পোড়া-দেশে রূপ আর রূপিয়ার যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে মেয়ের বিয়ে হয় না। এক জায়গায় প্রায় লেগে গিয়েছিল, কিন্তু কুষ্ঠি বাদ সাধল। ভৌম-দোষ বেরিয়ে গেল। কিন্তু বিনোদ ডাক্তারকে দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হল। শুনলাম, বিয়ে হয় নি, মা-বাবা নেই, কোনও বখেড়াবাজ অভিভাবক নেই। কৌশলে আলাপপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম, বিনোদের বয়স পঁয়ত্রিশ। বেশ মানাবে।

সুতরাং, লক্ষ্য স্থির রেখে আধুনিক যুগের কায়দা-অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিলাম। মেয়েদের সময়ে বিয়ে না দিলে, নানারকম ব্যাধি জোটে শরীরে। বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, ফিট। আমার বোন অমিতারও লেগে থাকত একটা না একটা। আমি এতদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধই দিতাম, নিজেরই বাক্স ছিল একটা। কিন্তু একদিন মনে হল, এই সূত্রে বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে অমিতার যদি পরিচয়টা করিয়ে দিতে পারি, আর বিনোদ যদি টোপটা গিলে ফেলে, তা হলে আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

বুক ধড়ফড় করছিল একদিন অমিতার। বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে আনলুম। অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলে সে। তারপর প্রেসক্রপশন লিখে দিলে। ফি দিতে গেলুম, বললে, "আগে ভালো হোক, তারপর ফি নেব।" শুনলাম, মধ্যবিত্ত বা গরীব বাঙ্গালীদের কাছ থেকে সে ফি নেয় না। ওষুধে ফল হল খুব। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালাম একদিন। তারপর থেকে প্রায়ই আসত, যেত। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। আমার সঙ্গে তো বটেই, অমিতার সঙ্গেও। তারপর একদিন কপাল ঠুকে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেললুম। শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মনে হল,

মুখটা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। তারপর হেসে বলল, "না, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন !"

"বাধা আছে।"

বলেই এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে, আমি আর বলতে সাহস করলাম না যে, বাধাটা অতিক্রম্য কি না। এরপর থেকে সে আমাদের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দিল। ভারি বেকুব হয়ে গেলাম। কি করতে কি হয়ে গেল।

তারপর সসঙ্কোচে গেলাম তার বাড়িতে একদিন। উদ্দেশ্য, পুনরায় তাকে নিমন্ত্রণ করে ভাব-সাব করা। গিয়ে দেখি, একটি অচেনা লোক বসে আছে আর তার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হচ্ছে।

"আপনাকে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু।"

"কোলকাতায় কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, সেখানে আমার যাবার তো কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু, তিনি আপনাকে ছাড়া আর কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। জ্বর হয় রোজ। কিন্তু, তিনি অন্য কোনো ডাক্তারকে কাছে ঘেঁসতে দেবেন না।"

"এর মানে কি—"

"সে আপনি গেলে হয়তো বুঝতে পারবেন। আমি তো জানি না। আমি চাকরমাত্র—"

"আচ্ছা, ঠিকানাটা রেখে যান। আজ না পারি, কাল যাব।" ভদ্রলোক ঠিকানাটা লিখে দিলেন একখানা কাগজে। আমিও দেখলাম ঠিকানাটা।

দিনসাতেক বিনোদ ডাক্তার আর ফিরলই না।

যখন ফিরল, তখন একটি মেয়ে সঙ্গে করে !

শুধু তাই নয়, মেয়েটির সঙ্গে বাস করতে লাগল !

তাজ্জব বনে গেলাম আমি ! গেল রুগী দেখতে, ফিরল একটা মেয়ে সঙ্গে করে। তারপর শুনলুম, মেয়েটাকে নিয়ে ধরমপুর স্যানাটরিয়মে যাচ্ছে। কোথা থেকে ভাগিয়ে নিয়ে এল এই ঘাটের মড়াটাকে ? কিন্তু সামনাসামনি এ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। দিনকয়েক পরে নিজেরই একটা কাজে কোলকাতা যেতে হয়েছিল। সেই ঠিকানাটা মনে হল। গেলাম সেখানে। দেখলাম, প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটে দারোয়ান রয়েছে। ভেতরে খবর পাঠালাম যে, বিশেষ প্রয়োজনে একবার দেখা করতে চাই। দারোয়ান আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। দেখলাম, দিব্যকান্তি একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। ধপধপে ফরসা রং, চোখদুটি টকটকে লাল।

"কি চান—"

"আমি বিনোদ ডাক্তারের খবর নিতে এসেছি।"

"কি খবর—"

"আমার বোনের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম, কিন্তু—"

"কিন্তু তিনি বিয়ে করেন নি, এই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"করলে, আমি হাতে স্বর্গ পেতাম।"

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।" আমি বসতেই ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে একটা চাকর কিছু খাবার আর চা দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের দেখা আর পেলাম না। কিন্তু আসল খবরটা যোগাড় করতে বিলম্ব হল না আমার। চা, জলখাবার খেয়ে পাড়াতেই আশেপাশে খোঁজ করলাম। যা শুনলাম, তাতে অবাক হয়ে গেলাম। বিনোদ ডাক্তার বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীকে এই ধনীর দুলালটি সম্মোহিত করে ভাগিয়ে এনেছিলেন। দিনকতক পর স্ত্রীটির হল যক্ষ্মা। এত বড় পাপের ফল ফলবে না? এই খবর পেয়ে বিনোদ ডাক্তার এল। এসে নিয়ে গেছে—।

তারপর কি হয়েছে, পাড়ার লোকেরা জানে না।

ফেরবার সময় একখানা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। তাতে চোখে পড়ল, একজন লোক তার বিশ্বাসঘাতিনী অসতী স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কতরকম মানুষই যে আছে এই পৃথিবীতে।

স্মৃতির খেলা

সব শক্তির মতই স্মৃতি-শক্তি ব্যাপারটাও একটু গোলমেলে। কখন যে কি খেলা খেলেন, বলা শক্ত। কখনও কৃপা করেন, কখনও করেন না। সেদিন আমার ভাগ্যে দুরকমই হল এবং দুবারই নাকাল হতে হল আমাকে।

…ফার্স্ট ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে যাচ্ছি। গাড়িতে উঠে দেখলাম, আর কোনও যাত্রী নেই। নটা বেজে গেছে, সুতরাং গাড়িটি ভিতর থেকে লক্' করে শুয়ে পড়ার কোনো বাধা ছিল না। প্যাণ্টটি খুলে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর লুঙ্গিটি পরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু 'লক্' করতে ভুলে গেলাম। ফল যা হল, তা মর্মান্তিক। গভীর রাত্রে দড়াম্ করে একটা শব্দ হল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দেখি, সামনের বেঞ্চে আধময়লা কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক অপ্রস্তুতমুখে বসে রয়েছেন আর গাড়ির মেজেতে একটা হাঁড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে। তার থেকে কালো, চটচটে একটা পদার্থ কামরার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে।

"কে আপনি মশাই, এ কি কাণ্ড!"

হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বললেন, "আলকাতরার হাঁড়িটা ওই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কিন্তু ট্রেনটা এমন ঘচাং করে থামল যে, হাঁড়িটা পড়ে গেল—"

আলকাতরা! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার ঝোলানো-প্যাণ্টের পা দুটোতে লেগেছে, বেঞ্চির নীচে স্যুটকেসটা ছিল, তাতে লেগেছে আর জুতো-জোড়া তো মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গার্ডকে ডাকলাম। দেখলাম, ট্রেন একটা বড় স্টেশনেই দাঁড়িয়েছে।

গার্ডসাহেব এসে সব দেখেশুনে বললেন, "আচ্ছা, আমি একটা মেথর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যতটা পারে পরিষ্কার করে দিক—"

গার্ডসাহেব চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টিকিট-কালেকটার এলেন। দেখা গেল, ভদ্রলোকের টিকিট, থার্ডক্লাসের।

টিকিট-কালেকটার তাঁকে জিগ্যেস করলেন –"কোথা যাবেন আপনি?"

"এখানেই নামব।"

টিকিট-কালেকটার তখন পকেট থেকে ছোট বই বার করলেন একটি। বইটি দেখে বললেন, "আপনাকে দশ টাকা সাড়ে পনর আনা এক্সেস্ ফেয়ার দিতে হবে।"

"আমার কাছে তো একটি পয়সা নেই। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারি নি, এটা কোন্ ক্লাস। আমাদের স্টেশনে ট্রেনও এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। সামনে যে গাড়ি পেয়েছি, তাতেই উঠে পড়েছি।"

টিকিট-কালেকটার বললেন, "ও সব কথা জেনে আমার লাভ নেই। এক্সেস্

ফেয়ার আপনাকে দিতেই হবে। আপনি শুধু যে বিনা টিকিটে এসেছেন তা নয়, রাত দুপুরে একজন ফার্স্ট্‌ক্লাস প্যাসেঞ্জারকে বিব্রত করে তাঁর গুরুতর ক্ষতি করেছেন। আসুন আমার সঙ্গে।"

টিকিট-কালেকটারের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক চলে গেলেন। দেখা গেল, আলকাতরার হাঁড়িটি ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিল না।

তারপর মেথর এল, জল আর ঝাড়ু নিয়ে।

সে সব দেখে শুনে একটি সদুপদেশ দিলে আমাকে।

"পাশের কামরাটাও একদম খালি আছে বাবু। আপনি সেখানেই চলে যান। এ আলকাতরা সাফ করা এখন মুশকিল। কেরোসিন তেল না হলে উঠবে না। আমি আপনার জিনিসপত্রগুলো একটু মুছে-টুছে দিচ্ছি।"

"ট্রেন কতক্ষণ থামবে এখানে ?"

"বহুৎক্ষণ থামবে হুজুর। অনেক মাল আছে। তা ছাড়া আর একটা ট্রেনের সঙ্গে ক্রশিং হবে এখানে। আধঘণ্টা দাঁড়াবে এখানে। ইন্‌জিনও বদলি হবে।"

মেথরটাই একটা কুলি ডেকে এনে পাশের কামরায় সব ব্যবস্থা করে দিলে আমার। বকশিশ দিলাম তাকে।

পাশের কামরায় যখন গুছিয়ে গিয়ে বসলাম, তখন আমার স্মরণ-শক্তি দ্বিতীয় খেলাটি খেললেন।

অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

তখন আমি কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশনে থার্ডক্লাস কামরায় বসে আছি। যদিও সেদিন ভিড় খুব, তবু ভাল জায়গাই পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে। জানলার ধারে বসেছিলাম মুখ বাড়িয়ে।

"কিরে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিস নাকি—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, প্রশ্নকর্তা সাহেবি-পোশাক-পরা মুখে-পাইপ একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম। বাবার বন্ধু একজন'। রেলের বড় অফিসার। প্রশ্ন করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

"থার্ডক্লাসের টিকিট বুঝি তোর। খুব ভিড় আজকে। ওহে রায়, শোন—"

একটি টিকিট-কালেকটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"এই ট্রেনে তুমিই কি সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে। ভিড়ে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে ফার্স্ট্‌ক্লাসে বসিয়ে নিয়ে যাও।"

"যে আজ্ঞে। আসুন আপনি।"

আমি থার্ডক্লাস থেকে নেমে পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করলাম, তারপর রায়মশায়ের অনুসরণ করে একটি ফার্স্ট'ক্লাসে গিয়ে চড়লাম।

একেবারে ফাঁকা গাড়ি।

বাবার বন্ধু আবার এলেন আমার কাছে।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যা। রায় তোকে সাহেবগঞ্জে উঠিয়ে দেবে।"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে আছি। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে কানুদা এসে হাজির। হাতে একটা হাঁড়ি।

"ও, তুই যাচ্ছিস এই ট্রেনে, যাক, বাঁচলাম। এই গুড়ের নাগরীটা মামাকে দিয়ে দিস তুই। খেতু আজ যাবে বলেছিল, তার হাত দিয়েই এটা পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দেখছি আসে নি, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আজকালকার ছোকরারা।"

কানুদা কামরায় উঠে গুড়ের নাগরীটি বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন।

"কোণের দিকে ঠেসিয়ে রেখে দিলাম, খুব সাবধানে নিয়ে যাস—"

গার্ডের হুইসল বাজল, কানুদা লাফিয়ে নেবে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে এবং খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল গভীর রাত্রে, এক মেমসাহেবের চিৎকারে। উঠে দেখি, একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে একটা। জিগ্যেস করলাম, ব্যাপার কি? শুনলাম, মেমসাহেব নাকি আমার কামরায় ঢোকবার জন্য দরজা খুলে একটি পা ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু সে পা-টি আর তুলতে পারেনি নি। তাঁর জুতো কামরার মেজেতে একেবারে সেঁটে গিয়েছিল। তিনি পা-টি কোনরকমে বার করে নিয়েছেন, কিন্তু জুতোটি উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর চিৎকারে চেঁচামেচিতে স্টেশনমাস্টার, গার্ড, টিকিট-কালেকটার সবাই এসে জুটে গেছেন। গাড়ির আলো জেলে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কানুদার সেই গুড়ের নাগরী কামরাময় গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়িয়েছে আর সমস্ত মেজেটা চট্‌চটে গুড়ে ভরতি হয়ে গেছে।

স্টেশনমাস্টার জিগ্যেস করলেন, "এ নাগরী কি আপনার?"

"না। আমি কিছু জানি না।"

স্টেশনমাস্টার তখন নিজেই হেঁট হয়ে মেমসাহেবের জুতোটিকে গুড়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর গদগদ বিনীতকণ্ঠে মেমসাহেবকে বললেন, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি, ম্যাডাম। এ গাড়িতে আপনার বসা চলবে না, পিছনের দিকে আর একটা ফার্স্ট'ক্লাস কামরা আছে, সেইখানে চলুন।"

সাহেব, মেমসাহেবকে নিয়ে স্টেশন মাস্টার, গার্ড সবাই চলে গেলেন।

তখন সেই টিকট-কালেকটারটি আমার কাছে দাঁড়ালেন এসে।

তাঁকে আমি নিম্নকণ্ঠে জিগ্যেস করলাম, "আমি কি নেবে যাব?"

"না, না, নাববেন কেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। ওরাই কি টিকিট কিনে যাচ্ছে

নাকি। ওরা প্ল্যানটার সায়েব, প্রায়ই যাতায়াত করে। এক নাগড়ী গুড় নষ্ট হল, এইটেই যা দুঃখের। আপনার সঙ্গে যে গুড় ছিল, তা তো জানতাম না—"

বললাম তাঁকে সব কথা।

"ও। তাই বুঝি। আচ্ছা, আমি মেথর ডেকে গাড়িটাকে ধুইয়ে দিচ্ছি। তা না হলে আপনার অসুবিধে হবে—"

মেথর এসে কামরাটি পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। আমি নির্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম।

উক্ত গল্পটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হতে লাগল, সেই সহৃদয় টিকিট-কালেকটারটি না থাকলে এ ভদ্রলোকের আজ যে দুর্দশা হয়েছে, আমারও সেই দশা হত। না হয়, ভদ্রলোক ভুল করে ফার্স্ট ক্লাসে চড়েই পড়েছেন, তা বলে হাজতে যেতে হবে তাঁকে! তাঁর অসহায় মুখচ্ছবিটা চোখের উপর ভাসতে লাগল। খচখচ করতে লাগল মনটা। পকেটে সদ্য-প্রাপ্ত ফি দু'শ টাকা ছিল। ভাবলাম, আমিই না হয় দিয়ে দি ভদ্রলোকের ভাড়াটা। কতদিকে কতই তো বাজে খরচ হয়—আমার স্মৃতিশক্তি অতীতের সেই ঘটনাটিকে বেশ উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল আমার মানসপটে।

নেবে পড়লাম।

স্টেশনমাস্টারের কামরার কাছে এসে শুনতে পেলাম, সেই টিকিট-কালেকটার ভদ্রলোক তারস্বরে বলছেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি ছাড়তে পারব না। চাকরি করি, চাকরির আইন মেনে আমাকে চলতেই হবে। হয়, ভাড়া দিয়ে দিন, না হয়, লক্-আপে থাকুন।"

"শুনুন—"

হাতছানি দিয়ে ডাকলাম আমি ভদ্রলোককে।

"কি বলছেন?"

"ছেড়ে দিন ভদ্রলোককে।"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

"আমি ওঁর ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছি।"

'আপনি দেবেন কেন, ও রকম লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

এমন সময় স্টেশনমাস্টার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"আবার কি হল? ঝামেলা মিটিয়ে ফেল না বাপু, তাড়াতাড়ি।"

"এই ভদ্রলোক ওঁর হয়ে ভাড়াটা দিয়ে দিতে চাইছেন।"

"কে—"

আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়েই কিন্তু স্টেশনমাস্টারের মুখের চেহারা বদলে গেল

তাঁর স্মরণ-শক্তি কৃপা করলেন তাঁকে। উদ্ভাসিতমুখে এগিয়ে এসে তিনি আমার পায়ের ধুলো নিলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আপনি কোথা থেকে—"

"একটা রোগী দেখে ফিরছি। এই লোকটিকে ছেড়ে দিন, এঁর ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

"আরে, ভাড়া দিতে যাবেন কেন? আপনি ছেড়ে দিতে বলছেন, তাই যথেষ্ট—"

মাস্টারমশাই যখন আমাদের স্টেশনে ছিলেন, তখন তাঁর ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

"শনটু কেমন আছে আজকাল—"

"হ্যাঁ মোটা হয়েছে। এখন দেখলে চিনতেই পারবেন না।"

ক্লিওপেট্রা

[শ্রীসুরেশ মল্লিকের ভাড়াটে বাড়ির অভ্যন্তর। সাধারণভাবে সজ্জিত। সুরেশ মল্লিক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বয়স ত্রিশ। পরিধানে আধ-ময়লা সাহেবি পোশাক। মুখের ভাব ক্লান্ত। হাতে যে চৌকো চামড়ার ব্যাগটি ছিল, সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া এদিক-ওদিক চাহিলেন। কাছে-পিঠে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাক দিলেন।]

সুরেশ। বীণু, বীণু, বীণা [অর্ধস্বগত] আজও আবার কোথাও বেরিয়েছে না কি ?

[ভৃত্য হারাধন প্রবেশ করিল]

হারাধন। মা বাইরে গেছেন। চাবিটা রেখে গেছেন। জলখাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

সুরেশ। কোথা গেছেন ?

হারাধন। সিনেমা, বোধ হয়। ঠিক জানি না। কনকবাবু দুপুরে এসেছিলেন।

সুরেশ। ও ! [কোটটা খুলিয়া আলনায় রাখিলেন।]

হারাধন। চায়ের জল চড়াব ?

সুরেশ। চড়িয়ে দে। বীণু কিছু বলে যায় নি তোকে ?

হারাধন। আলুর দম করতে বলে গেছেন। আলু কিন্তু নেই।

সুরেশ। সে কথা তাকে বলতে পার নি ?

হারাধন। বলেছিলুম। তিনি বললেন, আমার কাছে পয়সা নেই, বাবুর কাছে চেয়ে নিও।

[সুরেশ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলেন। হারাধন চটিজুতো আগাইয়া দিল।]

সুরেশ। আলুর জন্যে ক-পয়সা দিতে হবে ?

হারাধন। চার আনা।

সুরেশ। আর কিছু আনতে হবে ?

হারাধন। না।

[সুরেশ মানিব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিলেন।]

সুরেশ। আমার খাবারটা ঠিক করে দিয়ে তারপর বাজার যা।

হারাধন। খাবার কি এখানেই আনব ?

[সুরেশের মেজাজ ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতেছিল, তিনি অকারণে ধমকাইয়া উঠিলেন।]

সুরেশ। এখানে কি আমি খাই!

[হারাধন চলিয়া গেল। বাহিরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হইল। সুরেশ গিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন। ফতুয়া-পরা একটি লোক প্রবেশ করিল।]

লোকটি। মুদির দোকানের বিল এনেছি, বাবু। মা এই সময় আসতে বলেছিলেন।

সুরেশ। তিনি এখন বাড়ি নেই।

লোকটি। কখন আসব তা হলে?

সুরেশ। কাল সকালে এস।

[নমস্কার করিয়া লোকটি চলিয়া গেল। সুরেশ কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং যদিও ঘরে কেহ ছিল না, তবু কথা বলিতে লাগিলেন।]

আশ্চর্য মেয়ে দেখছি, বীণু। রোজই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। রেডিও কিনতে চাইলে, ধার-ধোর করে তা-ও কিনে দিলাম। তবু বাড়িতে মন বসছে না। টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে ভালোও লাগে। আশ্চর্য!

[ঘরের এক কোণে রেডিওটা ছিল, সেটার দিকে সুরেশ ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর, কি মনে করিয়া সেটা খুলিয়া দিলেন। সরোদে একটা চটুল গৎ বাজিতে লাগিল। সঙ্গীতের আবহাওয়ায় কামিজটা খুলিয়া তিনি পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরেই ফিরিলেন, তখন আর পরনে প্যাণ্ট নাই, লুঙ্গি। দুয়ারে আবার কড়া নড়িল। কপাট খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিল কনক, সুরেশের সমবয়সী এবং বন্ধু। সুশ্রী চেহারা। মাথার চুল উসকো-খুসকো।]

সুরেশ। সিনেমা শেষ হল? বীণা কই?

কনক। সিনেমা যাই নি। রেস খেলতে গিয়েছিলাম। হেরে ভূত হয়ে গেছি। কিছু ধার দিতে পারিস। একেবারে পেনিলেস আজ—

সুরেশ। আমারও ওই অবস্থা, আমার যা কিছু জমানো টাকা ছিল, তা বীণুর দুল কিনতে আর ওই রেডিও কিনতে শেষ হয়ে গেছে। রেডিওর সব দামটাও দিতে পারি নি এখনও। তোমার তবু চাকরি আছে, আমার তাও নেই। কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পাচ্ছি না। তুমি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাও, তবু তোমার একার কুলোচ্ছে না!

কনক। কুলোচ্ছে কই। খরচ যে অনেক। তোমার বীণাই তো আমাকে আরও ফতুর করলে। আজ থিয়েটার, কাল সিনেমা, পরশু হোটেল—লেগেই আছে একটা না একটা। তুমি ওকে সামলে রাখ ভাই, আমি আর পেরে উঠছি না।

সুরেশ। কুকুর হলে বেঁধে রাখতাম। কিন্তু ও মানুষ, শুধু মানুষ নয়, বিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্তা নারী। ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার শক্তি আমার নেই। এদিকে আমার গৃহস্থালীও অচল হয়ে উঠেছে—কিন্তু কি করি বল?

কনক। তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইছ কেন, বল তো। ও রকম বোহিমিয়ান মেয়েকে নিয়ে সংসার করা চলে না, হৈ-হৈ করা চলে।

সুরেশ। ভালোবাসি যে—

কনক। [মৃদু হাসিয়া] ও, বিয়ে না করলে বুঝি ভালোবাসা যায় না ?

সুরেশ। [অধীরভাবে] দেখ, ও সব তর্ক অনেক হয়েছে। আমি ওকে বিয়েই করব, ঠিক করেছি। [সহসা রুক্ষকণ্ঠে] তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন !

কনক। বাড়িতে এসে হাজির হলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব ? দেওয়া যায় কখনও, বিশেষতঃ বীণুর মতো মেয়েকে ? আমিও তো ওর সহপাঠি। তা ছাড়া [হাসিয়া] প্রথমে আমিই ওর প্রেমে পড়েছিলাম। আমি যদি ওকে প্রশ্রয় দিতুম, তুমি কলকে পেতে না।

[ইহাতে সুরেশের আত্মসম্মান বেশ ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু তাঁহার আহত আত্মসম্মান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত, যদি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু, তাহা তিনি করিলেন না।]

সুরেশ। 'যদি ওকে প্রশ্রয় দিতুম' এ কথা বলছ কেন ? প্রশ্রয় তখনও দিয়েছিলে, এখনও দিচ্ছ। আমি যদি ওকে ভাল করে না চিনতাম অন্যরকম সন্দেহ হত। কিন্তু ওকে আমি ভাল করে চিনি, কিন্তু আই মাস্ট সে—

[হঠাৎ থামিয়া গেলেন।]

কনক। চটেছ, মনে হচ্ছে। চললাম, তা হলে। বীণুকে বলে দিও, যে-রঙের শিফনের শাড়ি সে চেয়েছিল, সে রং পাইনি। আচ্ছা, চললুম।

[কনক চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশী রমণীমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক প্রৌঢ়, কিন্তু তবু বেশ ছিমছাম, কবি-কবি ভাব।]

সুরেশ। [ভদ্রতাসহকারে] আসুন রমণীবাবু, কি মনে করে ?

রমণী। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী কি ফিরেছেন ?

[কথাগুলি ওজন করিয়া খুব মোলায়েমভাবে বলিলেন।]

সুরেশ। না, কোনও দরকার আছে কি ?

রমণী। তিনি আমার সাইকেলটা নিয়ে গেছেন কিনা। আমাকে এখন একবার বেরুতে হবে।

সুরেশ। আপনার সাইকেল নিয়ে গেছে না কি ! কি অন্যায় ! এখনও ফেরে নি তো। সত্যি কি অন্যায়।

রমণী। তাতে কি হয়েছে, আমি না হয় অপেক্ষা করব। দুপুরে তো প্রায়ই নিয়ে যান উনি আমার সাইকেল।

সুরেশ। [বিস্মিত] তাই না কি ?

রমণী। তাতে কি হয়েছে, তাতে কি হয়েছে ?

[বীণুর প্রবেশ। সঙ্গে একটি আট-দশ বছরের ছেলে। হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-শার্ট পরা। সুশ্রী, সজীব চেহারা। তাহার হাতে একটি ব্যাট রহিয়াছে। বীণু

তন্বী, রূপসী। ববকরা চুল। রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু সে যে মোহিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হইতে হয়।]

বীণু। [রমণীবাবুকে] ও, আপনি এখানে। আমি আপনার সাইকেল নিচের ঘরে রেখে এলাম। আপনার অসুবিধে হয়েছে বোধ হয়। মাপ চাইছি—দেরি হয়ে গেছে সত্যি। রাগ করেছেন তো ?

[রমণীমোহন ভদ্রতার আতিশয্যে গলিয়া পড়িলেন।]

রমণী। না, না, কিছুমাত্র নয়। আমাকে এখুনি একবার একটু বেরুতে হবে, তাই খোঁজ করতে এসেছিলাম, আপনি ফিরেছেন কি না। যদি দরকার হয়, আবার নিতে পারেন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব। ছেলেটার জন্য ওষুধ আনতে হবে।

বীণু। ও, আপনার ছেলের অসুখ না কি। তা তো জানতুম না। চলুন, দেখে আসি [যাইতে উদ্যত।]

রমণী। [কৃতার্থ] যাবেন ? আচ্ছা, আমি ফিরে আসি, তারপর যাবেন। এখুনি ফিরব।

[রমণীমোহন চলিয়া গেলেন। সুরেশ নিষ্পলকদৃষ্টিতে বীণুর দিকে চাহিয়াছিলেন। বীণু সেদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। তাহার পর কথা বলিল।]

বীণু। [ছেলেটিকে দেখাইয়া] আমার নতুন বন্ধুটিকে দেখ।

সুরেশ। ও, নাম কি ?

বীণু। তোমার নাম কি বল। ইনিও আমার একজন বন্ধু।

[ছেলেটি নমস্কার করিল।]

ছেলেটি। আমার নাম শ্রীইন্দ্রজিৎ বসু।

বীণু। রাস্তায় একটা রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাকে ঘিরে হৈ-হৈ করতে লাগল, কেবল এ-ই দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে টিংচার আইয়োডিন, ছেঁড়া ন্যাকড়া, তুলো নিয়ে এসে পা-টা বেঁধে দিলে। ছড়ে গেছে খানিকটা।

[শাড়ি একটু তুলিয়া পা দেখাইল।]

সুরেশ। তাই না কি। বেশি লাগে নি তো, হাড়-টার—?

বীণু। কিচ্ছু না, লাভই হয়েছে বরং। অ্যাকসিডেন্ট না হলে এমন বন্ধুটি কি পেতুম ? ওকে একটা ব্যাট কিনে দিয়েছি। ইন্দ্রজিৎ কিছু খাবে না কি ?

ইন্দ্রজিৎ। না, আমার পেট ভরা আছে। আর একদিন আসব। দেরি হলে, মা ভাববে। চললুম এখন।

[এক ছুটে বাহির হইয়া গেল।]

বীণু। চমৎকার ছেলেটি, না ?

সুরেশ। ছেলেটি তো চমৎকার। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বল তো। একদিনও বাড়ি ফিরে দেখলাম না যে, তুমি বাড়িতে আছ।

বীণু। [বিস্মিত] তোমার অপেক্ষায় দিন-রাত ঘরে বসে থাকব। তাই তুমি প্রত্যাশা কর না কি। যা কখনও করি নি, তা করব কি করে?

সুরেশ। যদি গৃহস্থালী পাততে চাও—

বীণু। তা হলে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হবে?

সুরেশ। কনকের ওখানে বড্ড বেশী যাতায়াত করছ।

বীণু। কনকের কাছেও যাব না। [সহসা] আচ্ছা, তুমি কি হয়ে যাচ্ছ বল তো—! আমি কি একটা নির্জীব আসবাব যে, দিন-রাত ঘরের কোণে পড়ে থাকব?

সুরেশ। সাধারণ আসবাব নও। বহুমূল্য রত্ন। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকলে টপ করে তুলে নেবে কেউ।

বীণু। ইস্, নিলেই হল। দু-একজন চেষ্টা করেছে অবশ্য। ও, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি। ক্লিওপেট্রার ওপর তুমি যে থীসিসটা লিখেছ, সেটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন প্রফেসার মজুমদার। সত্যি খুব ভাল হয়েছে ওটা [একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সহসা] একটা কথা তোমাকে বলব? তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব? কিন্তু, চেঁচিয়ে বলতে লজ্জা করছে। সরে এস, কানে কানে বলি।

[সুরেশের কানে কানে গিয়া বলিতেই সুরেশ চমকাইয়া পিছাইয়া গেলেন। মনে হইল, তাঁহাকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল।]

সুরেশ। আমি সংযম করে আছি, আলাদা ঘরে শুই—আর তুমি বলছ—

বীণু। কি জানি, কোথা দিয়ে, কি করে, কি হয়ে গেল।

সুরেশ। আর সে কথা তুমি আমাকে বলছ!

বীণু। তোমাকে বলব না তো, কাকে বলব। তোমাকে যে আমি ভালবাসি। আমার সমস্ত বিপদ-আপদ, দোষ-ত্রুটি তোমাকেই তো সামলাতে হবে। আর, আমি জানি, তুমি তা পারবে। ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধে অমন দরদ দিয়ে যে থীসিস লিখতে পারে সে—

[দুয়ারের কড়া নড়িল। দ্বার খুলিতেই পিওন চিঠি দিয়া গেল।]

সুরেশ। [চিঠিটা পড়িয়া] যাক, এ চাকরিটাও হল না।

বীণু। তুমি কোথায় দরখাস্ত করেছিলে?

[সুরেশের চিঠিটা লইয়া দেখিল।]

আরে, আমিও যে এখানে দরখাস্ত করেছিলাম। আমি সিলেকটেড্ হয়েছি। আমার ইণ্টারভিউ ছিল আজ। সেখানেই তো গিয়েছিলাম। [লীলাভরে মাথা নাড়িয়া] আমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল মশাই, তোমার সেকেণ্ড ক্লাস—।

[সুরেশ বিবর্ণমুখে চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িলেন। বীণু সোজা গিয়া তাহার কোলের উপর বসিল এবং গলা জড়াইয়া ধরিল।]

ও কি, আমার দিকে চাও। অমন করছ কেন? সমস্যা তো মিটেই গেল, তুমিই চাকরি পাও বা আমিই চাকরি পাই, একই কথা। কালই চল, বিয়েটা সেরে ফেলা যাক।

সুরেশ। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের কি রাজ-যোটক হবে?

বীণু। কিন্তু, তুমি যে ডক্টরেট পাবে, শুনে এলাম। আমি বই মুখস্থ করে ফার্স্ট ক্লাস হতে পারি। কিন্তু ক্লিওপেট্রার ওপর অমন থীসিস লিখতে পারি কি? [সহসা] তুমি আমার অ্যানটনি—

[পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সহসা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল।]

রসময়ের অভিজ্ঞতা

বৃদ্ধ রসময় রক্ষিত একটু উত্তেজনাভরেই আমার ক্লিনিকে এসে সেদিন বললেন, "মাপ করবেন, ডাক্তারবাবু, সেদিন তর্কের মুখে আপনাদের বিজ্ঞানকে বুজরুকি বলে ফেলেছিলাম। আজ আমার ভুল ভেঙেছে, আমি আমার কথা প্রত্যাহার করতে এসেছি। আর একটা কথাও আপনাকে জানাতে এসেছি, যা আপনিও হয়তো জানেন না, কিংবা হয়তো জানেন, কারণ, আপনারা, ডাক্তাররা সর্বজ্ঞ।

"বসুন, কি কথা ?"

"উঃ, খুব বেঁচে গেছি ডাক্তারবাবু। আর একটু হলে গিন্নির নোয়া, সিঁদুর ঘুচে গিয়েছিল আর কি—"

রক্ষিত মশায় খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে।

"আপনি হাজারিবাগ গিয়েছিলেন না ?"

"হ্যাঁ। সেইখানেই তো ওই কাণ্ড। আমার মেয়েটা মানা করেছিল, বাবা জঙ্গলের ভিতর বেড়াতে যাবেন না, ওখানে বাঘ আছে, শুনেছি। কিন্তু, আপনারা ঘড়ি ধরে রোজ একঘণ্টা বেড়াতে বলেছেন, আর হাজারিবাগের সিনারিও চমৎকার। হাঁটতে ভালই লাগত বেশ। কিন্তু, একদিন ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম, ডাক্তারবাবু।"

"আপনি ইনস্যুলিন নিচ্ছেন আজকাল ?"

"আপনারা তো বলেই খালাস, কিন্তু অত পয়সা কোথায় আমার! ওইজন্যেই না, সেদিন আপনাদের বিজ্ঞানকে এক হাত নিলুম, কিন্তু এবার আমি মশাই, অপদস্থ হয়েছি। ইনস্যুলিন নিই নি বটে, কিন্তু ওই বিজ্ঞানের জোরেই বেঁচে গেছি সেদিন।"

"কি রকম ?"

"আপনার হুকুম-মতো সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরিয়েছি সেদিন। মেয়েটা সেদিনও মানা করলে, বাবা বেশীদূর যেও না, সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলাম! রবি ঠাকুরের গানের লাইনটা গুন্‌গুন্ করতে লাগল মনের ভিতর—ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে। পলাশে আর কৃষ্ণচূড়ায় চারিদিক লালে লাল। সূর্যাস্ত হচ্ছে, আকাশের মেঘে মেঘে আগুন লেগেছে। 'বউ কথা কও' পাখিও একটা ডাকতে লাগল থেকে থেকে। আর ওই পাখিটাই টেনে নিয়ে গেল আমাকে বনের মধ্যে। পাখিটাকে কখনও দেখি নি। ভাবলুম, যদি দেখতে পাই। ঢুকে পড়লুম জঙ্গলে। জঙ্গলে ঢুকে আবার মুগ্ধ। সেখানে যে কত রকমের ফুল, কত রকমের গাছ, কত রকমের পাতা, কত রকমের লতা, তার ইয়ত্তা নেই। 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল। কখনও মনে হচ্ছে, বাঁ দিক থেকে ডাকছে, কখনও ডান দিক থেকে, কখনও বা সামনে থেকে, কখনও আবার পিছন থেকে। আমি এদিক,

ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে চলেছি, হুঁশ নেই। অদ্ভুত নির্জনতা চারিদিকে, একটা অদ্ভুত গন্ধও পেতে লাগলাম। কাছেপিঠে বোধ হয়, মহুয়া গাছ ছিল। মনে হল, নেশা হয়েছে। নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনে হল, 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন সুরের ইঙ্গিতে স্বপ্নলোকের পথ দেখাচ্ছে আমাকে। ভাবতে লাগলাম, পাখিটা দেখতে কি রকম ? নীল কি ? ওই কি মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড ? কতক্ষণ চলেছিলাম, মনে নেই, সন্ধ্যার অন্ধকার যে গাঢ়তর হয়ে আসছিল, সেদিকেও খেয়াল ছিল না, হঠাৎ কিন্তু বজ্রপাত হল। চমকে উঠলাম, সামনে দেখি, দুটো বাঘ ! একটা প্রকাণ্ড বড়, থলথল করছে চর্বি, আর একটা রোগাগোছের। সম্ভবতঃ, আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি, বড় বাঘটা আমার মুখের কাছে মুখ এনে হ্যা হ্যা করে শুঁকছে। ভাবলাম, এইবার মস্তকটি কড়মড়িয়ে চর্বণ করবে। কিন্তু মশাই, করলে না ! কি করলে, জানেন ?"

"কি ?"

"সেই রোগা বাঘটার দিকে চেয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, এর নিঃশ্বাসে বেজায় অ্যাসিটোনের গন্ধ ছাড়ছে যে হে। তার মানে, রক্তে খুব বেশী চিনি আছে। একে খাব ?"

রোগা বাঘটা তখন ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখলে, সে-ও মুখটা শুঁকলে বারকয়েক।

তারপর বললে, "না, খাবেন না। আপনার শুগার কত এখন ?"

"পাঁচ পারসেণ্ট।"

"না, খাবেন না। আমারও খাওয়া চলবে না, আমারও তিন পারসেণ্ট আছে আজ। এ তো মানুষ নয়, মোরব্বা দেখছি। চলুন—"

'আমাকে খেলে না, মশাই। হেলে-দুলে চলে গেল দুজনেই ! তা হলেই দেখুন, বিজ্ঞানের কল্যাণেই বেঁচে গেলাম সেদিন। আর একটা কথাও মনে হল। বঙ্গ-বিহার পুনর্মিলনের প্রস্তাবে বেশ ফল হয়েছে, তা না হলে বিহারের বাঘ অমন পরিষ্কার বাংলা বললে কি করে, তার মানে, ওরাও বাই-লিঙ্গুয়াল হয়ে গেছে আর কি—"

কি আর বলব ! হাসিমুখে রসময় রক্ষিতের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ফ্রাড

"ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন ?"

"হ্যাঁ, এলুম।"

"কত নিলেন উনি ?"

"পাঁচ হাজার। দৈনিক হাজার টাকাই তো কথা হয়েছিল। পাঁচদিন ছিলেন।"

"আমাকে যদি বলতেন, কিছু সস্তায় করিয়ে দিতে পারতুম।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ আছে না কি ?"

"আছে।"

"কি সূত্রে—"

"সেটা আর না-ই শুনলেন।"

গদাধরবাবু মুচকি হাসলেন। তা দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ভোম্বল দাসের। পুনরায় প্রশ্ন করলেন গদাধর।

"কেমন হল ? আমি তো ছিলুম না।"

"অবর্ণনীয়।"

"খুব নাচলে, গাইলে—?"

"খুব। মাৎ করে দিলে একেবারে।"

"তা তো দেবেই। ক খানা গান গাইলে—"

"পাঁচদিনে তা কম করে খান কুড়ি হবে।"

"খুব গেয়েছো। আর নাচ ?"

"সকালে, বিকেলে। তার মানে পাঁচ দিনে, দশবার। তা কথক, ভারতনাট্যম্, মণিপুরী, জাভা, এমন কি পোয়ে পর্যন্ত। টাকা উশুল করে নিয়েছি আমরা। দশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করেছি—"

হঠাৎ ভোম্বল দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন।

"বুঝলেন গদাধরবাবু, মন ভরে গেছে, কানায় কানায় ভরে গেছে, উপচে পড়ছে। ধন্য হয়ে গেছি।"

"কোথা রেখেছিলেন ওকে ? নিজের বাড়িতে ?"

"আরে বাপস, সে সামর্থ্য কি আছে আমার ? ছিলেন উনি যোগেনবাবুর বাগান-বাড়িতে। তবে, ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে আমি হামে-হাল মোতায়েন থাকতুম সেখানে! এ রকম সৌভাগ্য ক জনের হয় বলুন।"

গদাধর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন আবার। একটু মৃদুহাসিও ফুটল তাঁর অধরে।

বললেন, "তা বটে—"

"আমার এত বেশী আনন্দ হয়েছে, কেন জানেন ? পয়সার বদলে উনি যা দিয়েছেন, তা সকলে আমরা সমানভাবে ভোগ করেছি। কিন্তু, আমাকে একটু ফাও দিয়েছেন—"

"কি রকম ?"

"যখন গাড়িতে তুলে দিয়ে বললুম, এখন তা হলে আসি দেবি। তখন কি মিষ্টি করেই যে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। ও হাসি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে চিরকাল—"

গদাধর আবার একটু হেসে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনি—হেঁটে বাড়ি যাবেন না, চলুন, আপনাকে আমি নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

প্রবন্ধ

উত্তর

উৎসর্গ

টুলুকে—

ভূমিকা

অনেক লোক চিঠির মাধ্যমে নানা প্রশ্ন করেন। প্রত্যেককে সব সময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন সাড়া জাগায় মনে। তারই ফলে এই 'উত্তর'গুলি। পুস্তক-আকারে প্রকাশ করবার সময়ে প্রত্যেক প্রবন্ধের আলাদা নামকরণ করেছি, কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এগুলো যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রত্যেক প্রবন্ধের উপর 'উত্তর' এই শিরোনামাই ছিল।

ভাগলপুর
১৬-৯-৫৩

"বনফুল"

তিক্তকথা

বাংলার বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর যে নিরপেক্ষ সমালোচনা তুমি চেয়েছ, তা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ, নিরপেক্ষ হবার উপায় নেই। নানারকম উলটোপালটা কথা কর্ণকুহরে ঢুকছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজ পড়েও কোনরকম নিরপেক্ষ ধারণা করবার চেষ্টা বৃথা। প্রত্যেকটি খবরের কাগজ এক একটি বিশেষ 'পলিসি' অনুসরণ করেন এবং প্রত্যেকটি খবরের অনুরূপ রং চড়ান। সুতরাং সত্য কি, জানবার উপায় নেই। একটি জিনিস কেবল বুঝেছি এবং সেই সম্বন্ধে দু'চার কথা বলছি।

জাতি হিসেবে আমরা যদি বাঁচতে চাই, তা হলে সত্যসত্যই এবার সে বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে। ব্যক্তিরই সমষ্টি জাতি। ব্যক্তি-চরিত্রই জাতির চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। যে কারণেই হোক, আমাদের চরিত্র শিথিল হয়ে পড়েছে। তার লক্ষণ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। যা শিথিল, তা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তার একটা অবলম্বন দরকার, 'ঠেক্‌নো' চাই। আমরা ক্রমাগত 'ঠেক্‌নো' খুঁজছি। কখনও সাহিত্যে, কখনও ব্যবসায়ে, কখনও বা অন্য কিছুতে আমরা নির্ভরযোগ্য এমন-একটা কিছু চাইছি, যা পেলে নাকি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওই 'এমন-একটা-কিছু'র রূপক-বর্জিত রূপ কিন্তু 'টাকা'। আমরা সকলে মনে করছি যে, যেন-তেন প্রকারেণ টাকা যদি রোজগার করতে পারি, তা হলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের মতো টাকা পেলেই যে আমরা সন্তুষ্ট থাকব, তা নয় , আমরা 'কেল্লা ফতে' করার মতো টাকা চাই প্রত্যেকে এবং যেন-তেন প্রকারেণ। তাই রাজনীতি, সাহিত্য, ব্যবসায়, চাকুরি সর্বক্ষেত্রেই ভিড়—আদর্শের জন্য নয়, অর্থের লোভে। আমরা প্রত্যেকেই পশুর মত লোভী হয়ে উঠেছি। কাড়াকাড়ি করছি, মারামারি করছি, গালাগালি করছি, আর সে সবের সমর্থন করছি নানারকম 'ইজ্‌ম্' এর সাহায্য নিয়ে। কিন্তু, তবু কিছু হচ্ছে না। রাজনীতিক্ষেত্রে অবাঙালীরাই আজ প্রধান, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যের চেয়ে অসাহিত্যকেই প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। যে-কোনও মাসিকপত্র খোল, এর প্রমাণ পাবে। সিনেমার খবর পাবে, রাজনৈতিক আলোচনা পাবে, প্রকৃত সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, তার নমুনা বড় একটা পাবে না। দু'চারজন নামজাদা গল্পলেখকের গল্প (অনেক সময়, তা বাজে গল্পও হয়) কেবলমাত্র তাঁদের নামের জৌলুষের জন্যই ছাপা হয়। কবিতার মৃত্যু হয়েছে। প্রবন্ধ কেউ পড়েও না, কোনও লেখক লিখতেও চান না, লিখলে, সাহিত্যিকসমাজেও তাঁর তেমন কদর হয় না, পাঠকসমাজে তো হয়ই না। সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্য-ধর্ম বর্জন করেও খুব যে সুবিধা হয়েছে, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। জাতও গেছে, পেটও ভরে নি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও অবাঙালীদেরই জয়জয়কার। ফলে, আমরা কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠছি, মনে করছি, ওই মুষ্টিমেয় বিড়লাদের যদি কোনওরকমে কাৎ করতে পারি, তা হলেই বুঝি আমরা বেঁচে যাব। ভুলে যাচ্ছি যে,

কম্যুনিষ্ট বিড়লার উদ্ভবও সম্ভব। কিন্তু, আসল গলদটা কোথায়, তা আগেই বলেছি—আমরা শিথিলচরিত্র। আমরা অসংযমী, পরশ্রীকাতর, শ্রমবিমুখ। কেবল যে, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরই বিশুদ্ধ চরিত্র প্রয়োজন, তা নয়, সংসারী কর্মীর পক্ষেও ও বস্তুটি অপরিহার্য। ওই মানুষের মূলধন। বলিষ্ঠ, সংযত চরিত্র অবলম্বন করে যদি আমরা দাঁড়াতে পারি, তা হলে বাইরের কোনও ঠেক্‌নোর দরকার হবে না। জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্যেই মানুষ একদা স্বকীয় চরিত্রে অ-পশু-সুলভ গুণাবলী ফুটিয়ে তুলেছিল অশেষ কৃচ্ছ্র-সাধন করে। প্রগতির জয়যাত্রায় মানব-মনীষার অস্ত্র-শস্ত্রই বড় আবিষ্কার নয়, আত্ম-আবিষ্কারই সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। সে বুঝেছিল যে, নির্ভয় হতে হলে, কেবলমাত্র বন্দুক, গোলা-বারুদ থাকলেই চলে না, সাহসই হচ্ছে আসল ব্রহ্মাস্ত্র এবং সে ব্রহ্মাস্ত্র প্রস্তুত হয় বিশুদ্ধ চরিত্রের ফ্যাক্‌টারিতে। জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করে জীবনকে উপভোগ করবার জন্যেই সংযম, উদারতা, কর্ম-প্রবণতা, অনাসক্তি, বিনয়—এক কথায় 'মনুষ্যত্ব'—প্রয়োজন। ও না হলে জীবনযুদ্ধে জয়লাভও করা যায় না—জীবনকে ভোগ করাও যায় না।

শিথিল-চরিত্র ব্যক্তিকে সবল-চরিত্র করবার উপায় কি? ভবিষ্যতে আমাদের দেশে বনিয়াদি শিক্ষা যদি প্রবর্তিত হয় এবং তা যদি সত্যি সত্যি সার্থক হয়, তা হলে হয়তো আমাদের বংশধরগণ মানুষের মত মানুষ হয়ে সুখী হবেন—কিন্তু এখন যাঁরা আছেন তাঁদের সুখী করবার কি উপায় আছে কোন? আমার মনে হয়, নেই। কারণ, প্রত্যেকের জামাই বা ছেলেকে চাকরি দেওয়া যাবে না, প্রত্যেকের নিজের লোককে প্রধানমন্ত্রী করা যাবে না। প্রত্যেকের লেখাকে সাহিত্য-মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়, প্রত্যেক লোকের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করবার উপায় নেই। হিতকথা বলে বা বক্তৃতা দিয়েও কোন উপকার হবে না। সে সব সিনেমার বিরতিতে চায়ের দোকানে কিম্বা বেকারদের বৈঠকে উপহাসের উপকরণ জোগাবে কেবল। আমরা কি কারও উপদেশ সহ্য করতে পারি? আমরা সব জানি যে।

সুতরাং, মনে হয়, 'লাঠিচার্জ' করা ছাড়া উপায় নেই। তাতেও যদি না কুলায়, 'কাঁদুনে গ্যাস' এবং অবশেষে, গুলি। ক্রমওয়েল এই করেছিলেন, নেপোলিয়ন এই করেছিলেন, লেনিন, স্টালিনও করেছিলেন—তুমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতে, তুমিও এই করতে।

কিন্তু, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল—দোহাই তোমার, এটা মনে কোরো না যে, আমি আচার্যের বেদীতে বসে বসে উপদেশবর্ষণ করছি, দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। দাড়ি আমার নেই, দোষ প্রচুর আছে। আমিও তোমাদেরই একজন, অসংখ্য দোষে দুষ্ট, লোভাতুর, অসহায়। আমিও নাটক দেখতে এবং নাটক 'করতে' ভালবাসি। বাঙ্গালীজাতির ওইটি একটি বিশেষত্ব। তারা ভারী নাটক-প্রিয়। সাধারণ লোকে বলে, হুজুগে। কিন্তু, ওই হুজুকের ঝোঁকে আমরা অনেক বড় বড় কাজ করেছি। ওরই ঝোঁকে আমরা বংশমর্যাদাহীন গোপালকে কাঁধে করে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলাম, সেই

কতকাল আগে শ্রীচৈতন্যের মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে মেতে কীর্তন করেছিলাম উদ্বাহু হয়ে, 'ফারসী' জবান দুরুস্ত করে মৌলভী হতে আমাদের বাধে নি, সিরাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপে পলাশী-প্রান্তরে ইংরেজের হাতে রাজ্য তুলে দিতেও আমরা ইতস্ততঃ করি নি। এখন, আবার সেই সিরাজের শোকে কেঁদে আকুল হচ্ছি আমরা, নাট্যশালার প্রেক্ষাগৃহে বসে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে। ইংরেজরা যখন এল, তখন নিখুঁত সাহেবীয়ানা করলে কারা? ইয়ং বেঙ্গল। আবার, ওই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহও ঘোষণা করলেন, নিখুঁত সাহেব সিভিলিয়ান সুরেন বাঁড়ুয্যে। পড়ে গেল বিদেশীবর্জন, রাখীবন্ধন, অরন্ধনের ধূম —বাংলাদেশের পথেপ্রান্তরে ধ্বনি উঠল বন্দে মাতরম্। বোমা পড়ল। হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করল দীনেশ, ক্ষুদিরাম, কানাইলালের দল। মহাত্মাজির অহিংস গঠনমূলক ব্যাপার আমাদের প্রাণে তেমন সাড়া তোলে না, কারণ, ওর মধ্যে নাটক নেই। যতটুকু নাটক, ততটুকুতে আমরা সাড়া দিয়েছি। সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে বাংলাদেশের দান বড় কম নয়। অনেক বাঙালী ছেলের মাথা ফেটেছে, অনেক বাঙালী ছেলে কারাবরণ করেছে, প্রাণও দিয়েছে অনেকে। কিন্তু সবচেয়ে মানিয়ে তুলেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন —ভোগের শিখর থেকে ঝট্ করে তিনি যখন দাঁড়ালেন এসে দেশের ধুলোর উপর। তাঁর নাটকীয়তা পাগল করে তুলেছিল আমাদের। সুভাষচন্দ্র যখন G. O. C. হয়ে কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিচালনা করলেন—ওফ্, তখনও সে কি উন্মাদনা। যখন তিনি দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন, আমরা নেচে উঠলাম, কিছুদিন পরে আবার যখন তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল আমাদের, পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে কাবুলি সেজে ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন যখন তিনি, তখন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম আমরা। এই করেছি আমরা চিরকাল। নাটক আমাদের প্রাণের জিনিস। এই সেদিনও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা কেমন চট করে থামিয়ে দিলাম। যাদের বুকে ছুরি মারছিলাম, তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আর কিছু না, নাটক। ওরই ঝোঁকে আমাদের বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিল, বৃদ্ধ দীপঙ্কর অতীশ তিব্বতে গিয়েছিল, রামমোহন রায় মিশনারিদের সঙ্গে লড়েছিল, যতীন মখুজ্যে বালা-শোরের জঙ্গলে প্রাণবিসর্জন করেছিল, কারাগারে অনশনে মরেছিল যতীন দাস, ইম্ফলে স্বাধীন ভারতের পতাকা গড়েছিল সুভাষচন্দ্র।

কালই রেডিওর সামনে বসে লক্ষ লক্ষ হুজুগে বাঙালীর চিৎকার শুনছিলাম, নানা অসুবিধা সহ্য করে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে সমবেত হয়েছে তারা, স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় জহরলালকে একবার দেখবে বলে। প্রাণ তুচ্ছ করে এসেছে সবাই। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল আমার—বাঙালীর গৌরবে বুক ভরে উঠেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আফশোসও হল, ভিড়ের চোটে পণ্ডিতজি বক্তৃতা দিতে পারলেন না! এ জাতের কিছুতেই কি চৈতন্য হবে না?

ছেলেমেয়েরা

আজকাল ছেলেমেয়েদের নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে আপনি যে বিলাপ করেছেন, তা খুবই সঙ্গত হয়েছে। একটু ভেবে দেখলে, বুঝতে পারবেন, স্বাভাবিকও হয়েছে। প্রবীণরা চিরকালই নবীনদের মধ্যে নানাবিধ দোষ দর্শন করে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন। কেন করেন, সে আলোচনা বড় জটিল। তা ছাড়া আপনি তা চানও নি আমার কাছে। কিন্তু আপনি যেটা চেয়েছেন, সেটা জটিলতর। তবু আমি যতটুকু বুঝি, বলছি।

বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের চারিত্রিক অধঃপতন কেন হয়েছে এবং তার প্রতিকার কি, এ চিন্তা সত্যই যদি আপনার চিত্তকে ব্যাকুল করে থাকে তা হলে প্রথমেই একটি প্রশ্ন আপনাকে করব। আপনি নিজে আপনার ছেলেমেয়েদের চারিদিকে অধঃপতন থেকে বাঁচাবার জন্তে সজ্ঞানে কতটুকু চেষ্টা করেছেন? এ প্রশ্ন করছি, কারণ মানব-চরিত্র কিভাবে বিকশিত হয় ভাবতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়, বংশ-বৈশিষ্ট্যের (Heridity) কথা—যার উপর কারও হাত নেই—(আমগাছে আমই ফলবে, কাঁঠাল ফলান যাবে না) এবং দ্বিতীয়তঃ মনে হয়, শিক্ষার কথা। শৈশবে এই শিক্ষা আমরা পাই পিতা-মাতার কাছে, পরিবারের কাছে, প্রতিবেশীর কাছে। শৈশবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা পিতামাতার আচরণ লক্ষ্য করি এবং অনুকরণ করি। যে শিক্ষা ছেলেমেয়ের চরিত্র গঠন করবে, তার প্রাথমিক বনিয়াদটা গৃহেই প্রস্তুত হয়। আমাদের মধ্যে ক'জন পিতা-মাতা আছেন যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, আদর্শ আচরণ দিয়ে ছেলেমেয়েদের জীবনে আদর্শ বনিয়াদপত্তনের সহায়তা করেছেন? ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা ভাববার আগে নিজেদের জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করা উচিত। শিক্ষা পাওয়ার দ্বিতীয় উপায়, আমাদের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়গুলি। সেগুলিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের চারিত্রিক উন্নতি করবার কোনও ব্যবস্থা আছে কি? আলুর দোকানে যেমন আলু পাওয়া যায়, সেখানে যেমন চারিত্রিক উন্নতির জন্য কেউ যায় না, তেমনি আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা যায় ডিগ্রী লাভ করবার জন্য, চারিত্রিক উন্নতির জন্য নয়। আপনি বলবেন, স্কুল-কলেজে বড় বড় শিক্ষকের সাহায্যে ভাল ভাল বই পড়ে ছেলেরা কি চরিত্রগঠনের উপকরণ খুঁজে পায় না? পায় বই কি। যে কোনও শিক্ষিত ছেলে বা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন, চরিত্রগঠনের উপকরণ কি কি, সে গড়গড় করে বলে যাবে। এমন সব তাক্‌লাগানো কথা বলবে, যা আপনিও জানেন না। কিন্তু, চরিত্র সম্বন্ধে কেতাবী জ্ঞানলাভ করা আর চরিত্রবান হওয়া এক কথা নয়। আদর্শচরিত্র গুরুর সঙ্গে শিষ্যের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ ঘটলেই তবে শিষ্যের চারিত্রিক উন্নতি হতে পারে। শুধু মুখের বুলিতেই চরিত্র বদলায় না। তোতার মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম শুনে ক'টা লোক বৈষ্ণব হয়েছে? লোহাকে স্পর্শ ক'রে সোনা করতে পারে, এ রকম স্পর্শমণি ক'টা

আছে আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ? গুরু-শিষ্যের সঙ্গে আজকাল টাকার সম্পর্ক, আত্মার নয়। সুতরাং, স্কুল-কলেজে পাঠিয়েও ছেলেমেয়েদের চারিত্রিক উন্নতির আশা নেই। সেখানে তারা যায় ডিগ্রী কিনতে। যার যেমন সঙ্গতি, সে তেমনি ডিগ্রী কেনেও। শিক্ষার তৃতীয় পথ—সাহিত্য। বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে যা বললাম, সাহিত্যের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। কেবল সাহিত্যের বাণী দ্বারাই চরিত্রগঠন করা সম্ভব নয়, যদি বাণী-বাহক নিজে চরিত্রবান না হন। সাহিত্যের বাণী লোককে মাতিয়ে দিতে পারে, রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে, কিন্তু, লোক-চরিত্র গঠন করতে হলে, বাণী-বাহকের কেবল কথার চাকচিক্য নয়, চারিত্রিক সম্বলও থাকা চাই। প্রতিভাবান লেখকের সব কিছুই নকল করতে চায়, এমন কি তার চুল, দাড়ি, কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত। সুতরাং, তাঁরা নিজেরা যদি আদর্শচরিত্র না হন, তা হ'লে কেবল বাণী দ্বারা তাঁরা দেশে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারবেন না। তাঁদের নিজেদের কলঙ্কিত চরিত্রের উদাহরণই তাঁদের শুভ্র বাণীকে মসীলিপ্ত করে দেবে। তা উন্নতির প্রেরণা যোগাবে, না উপহাসের খোরাক যোগাবে। সেইজন্যেই বোধ হয়, যাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, সেই অতীত যুগের ব্যাস-বাল্মীকি, হোমার, কালিদাসদের কাছ থেকেই আমরা উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা পাই। সমসাময়িক লেখকদের বহুবিধ চারিত্রিক দুর্বলতা তাদের বাণীকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে বলেই আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের কথায় আস্থাস্থাপন করতে পারছে না, তাদের লেখা থেকে লাভবানও হচ্ছে না। ব্যাস-বাল্মীকি, হোমার, কালিদাসের চর্চাও ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে। সুতরাং, সাহিত্যের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের যে চারিত্রিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা-ও বিনষ্টপ্রায় বললে সত্যের অপলাপ হবে না। চরিত্রগঠনের আর একটি সহায়ক (বা অন্তরায়) সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক পরিবেশ। বর্তমান যে সমাজে এবং রাষ্ট্রে আমাদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে, সেখানে অতি নিম্নস্তরের স্বার্থপরতাই জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র। আমরা বক্তৃতায় বড় বড় আদর্শের কথা বলি, হাততালির লোভে। কার্যক্ষেত্রে সে আদর্শকে পদদলিত করতে কুণ্ঠিত হই না, অন্য জিনিসের লোভে। আমরা সকলেই স্বার্থপর, লোভী হয়ে পড়েছি। সমাজে, রাষ্ট্রে, উদারতা নয়, পরশ্রীকাতরতাকেই চকচকে কথার রাংতায় মুড়ে আপাত-মনোরম করবার দিকেই আমাদের প্রবণতা। আমরা কি করে আশা করতে পারি যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা নির্লোভ, পরার্থপর হবে ?

তবু নির্লোভ পরার্থপরতা ওই ছেলেমেয়েদের মধ্যেই দেখেছি। যে কোনও মহৎ-কর্মে অগ্রণী হয়ে ওরাই লাঠি খেয়েছে, গুলি খেয়েছে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ওরাই করে। যে সব ঝানু বিজ্ঞের দল উপদেশবর্ষণ করে ওদের ভর্ৎসনা করেন, তাঁদের সদভিপ্রায় সাধু, সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সার্থকও হত, যদি তাঁরা নিজেরাও সাধু হতেন।

ছেলেমেয়েদের অনেক দোষ আছে, তা জানি, কিন্তু তাদের গুণের কথা এত জানি যে, দোষের কথা সব সময়ে মনে থাকে না। বন্যা যখন আসে, তখন অনেক ক্ষতি হয়

সত্য কথা, বন্যায় অনেক জঞ্জাল-আবর্জনার স্তূপ ভেসে বেড়ায়, এও মিথ্যা নয়, কিন্তু বন্যার মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। এই বন্যাই দেশের মাটিতে পলি বিছিয়ে দেয়, ভবিষ্যৎ ফসলের জন্য, এ কথাও ভুলতে পারি না।

খুব বেশি হতাশ হবেন না। মানবসমাজের প্রাণধারাকে যুগ থেকে যুগান্তরে নীত করেছে এই ছেলেমেয়ের দলই। আমাদের যুগেও তাই হয়েছে, ভবিষ্যৎ যুগেও হবে। আপনার, আমার কর্তব্য, এই প্রাণবন্যাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। কেবল উপদেশ দিয়ে নয়, উদাহরণ সৃষ্টি করে। বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধীজি, নেতাজি যে জনতার হৃদয়হরণ করেছিলেন তার রহস্য তাঁদের মস্তিষ্কে নিহিত ছিল না, ছিল তাঁদের চরিত্রে।

জনমত

জনমত সম্বন্ধে তুমি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছ, সেগুলি অস্বীকার না করেও আমি শুধু বলতে চাই যে, এর আর একটা দিকও আছে এবং সে দিকটা সম্বন্ধে যদি উদাসীন হও, তা হলে এর স্বরূপটা পরিস্ফুট হবে না। জনমত অবশ্য স্বীকার্য—এ কথা মানছি, কারণ জনমত না মেনে সমাজে বাস করা যায় না; কিন্তু জনমত সংগ্রহ করবার উপায় কি বলতে পার? এ কথা নিশ্চয়ই তোমার অবিদিত নেই যে, অনেক সময় যা জনমত বলে প্রচারিত হয়, তা একজনের বা একটা বিশেষ দলের মত। যার বা যাদের ঢাক বেশী শব্দায়মান, তার বা তাদের মতটাই জনমত বলে মনে নেওয়া যে ভুল, এ কথাও নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে। একটু যদি তলিয়ে দেখ, তা হলে বুঝবে যে, এই ভুলই আমরা প্রায় করি। যদিও গত্যন্তর নেই, তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ভোট নিয়েও সব সময়ে জনমত নির্ধারণ করা যায় না। অন্য দেশে কি হয়, তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, কিন্তু, এ দেশে ভোট টাকা দিয়ে কেনা যায়, অনুরোধের বিনিময়ে পাওয়া যায়, ভয় দেখিয়ে আদায় করা যায়, চক্ষুলজ্জার দুর্বলতায় জোগাড় করা যায়, স্বার্থের খাতিরে আকর্ষণ করা যায়, ভুলিয়ে হাতানো যায়, অহেতুক অন্ধ ভক্তির অঞ্জলি হিসাবে আহরণ করা যায়, আর যায় ধাপ্পা দিয়ে। ঠিক ন্যায়সঙ্গতভাবে দেশের এবং দশের হিত-চিন্তা করে বিবেকের তুলাদণ্ডে মেপে ভোট দিতে খুব কম লোককে দেখেছি। যদি কেউ দিতে ইচ্ছুকও হন, তা হলেও তিনি সুযোগ পান না অনেক সময়, কারণ, প্রত্যেক ভোট-প্রার্থীই এক বা একাধিক মুখোস পরে আছেন, কারও স্বরূপ চেনবার উপায় নেই।

তা ছাড়া আর একটা কথা। প্রকৃত জনমত সংগ্রহ করবার যদি নিখুঁত কোন উপায় থাকতও, তা হলে সে জনমত কি আমরা সবাই মানতাম? সর্ববাদীসম্মত দু'একটা জনমতের উল্লেখ করছি—'সদা সত্য কথা কহিবে', 'চুরি করা পাপ'। এ কি আমরা সবাই মানি? ভেবে দেখলে, বুঝতে পারবে, অধিকাংশ তথাকথিত জনমতের সঙ্গে

তখনই তুমি আন্তরিকভাবে সায় দাও, যখন সেটা তোমার নিজের মতের সঙ্গে মেলে। যখন সেটা তোমার নিজের মতের সঙ্গে মেলে না, তখন তুমি সায় দেবার ভাণ কর, অর্থাৎ ভণ্ডামি কর। প্রকাশ্যে তুমি সে জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করতে পার না ভয়ে। গোপনে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে তোমার আপত্তি নেই। তুমি, আমি সকলেই এ কাজ প্রত্যহই করছি। সুতরাং, শুধু উচ্চাদর্শবিশিষ্ট জনমত সংগ্রহ করলেই আমাদের দুর্দশা ঘুচবে না, সেই উচ্চাদর্শ-অনুযায়ী চলবার সামর্থ্য যদি আমাদের না থাকে।

তারপর, তৃতীয় আর একটা কথাও বিবেচ্য। জনমত অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের মত কি সব সময়ে সমর্থনযোগ্য? ইতিহাস পড়লেই দেখতে পাবে, যাঁরা স্বীয় মনীষা-বলে মানবসভ্যতার চেহারা বারম্বার বদলে দিয়েছেন, তাঁরা প্রায়ই জনমতের আনুকূল্য পান নি। জনমতের যূপকাষ্ঠে তাঁদের অনেককেই আত্মবলি দিতে হয়েছে। সক্রেটিস, গ্যালিলিও, রুসো, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী, যীশুখৃষ্ট, লেলিন, ট্রট্স্কি, আব্রাহাম লিংকন্ —এলোমেলোভাবে মাত্র কয়েকটা নাম মনে পড়ছে—এঁদের জীবনচরিত পড়লে মনে হয়, জনমতের কাছে নতিস্বীকার করেন নি বলেই এঁরা আজ পূজনীয়। আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে। জনমত জিনিসটা কি নিতান্ত সাময়িক মত নয়? এটা কি সবসময়ে নির্ভরযোগ্য? বাঙলাদেশের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্থান-পতনময় কাহিনী পড়লেই জনমতের স্বরূপ বুঝতে পারবে। গলস্ওয়ার্দির 'মব' (Mob) নামক নাটকটা যদি না পড়ে থাক, পড়ে দেখো, ডেমোক্র্যাটিক দেশের একজনা সেরা লিখিয়ের বিচারে জনমতের মূল্য কি। জন-গণ-নির্বাচিত নেতারাও যে তাঁদের নির্বাচনকারীদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁদের পুলিসরক্ষীদের বহর দেখে।

তবু, এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, বর্তমান জগতে জনমতকে মেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেইজন্যই জনমতের প্রকৃত মূল্যটা বিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নেওয়া উচিত। উচ্ছ্বাসের আবেগে এ কথাটা আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, জনমত নামক যানটি এখনও মত্তমাতঙ্গের মতোই দুর্বার, দুর্বিনীত এবং খামখেয়ালী। এ যে কখন কাকে রাজা করবে, কখন কাকে পায়ে দলবে, তার ঠিক নেই। এই মত্তমাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করেই যখন বর্তমান মানবসমাজকে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হবে, আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য হওয়া উচিত, মাতঙ্গটিকে সুশিক্ষিত করে তোলা। এর যে কোনও আচরণে সায় দিতে গেলে, প্রগতি পশ্চাদ্গতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং, অনেক সময় সায় না দিয়ে, শায়েস্তা করবার চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা করতে গিয়েই উপরোল্লিখিত মহাপুরুষরা প্রাণ দিয়েছেন। এখনও কিন্তু বাহনটি মনোমত হয়নি এবং সেইজন্যে এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এখনও শেষ হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অনিবার্যভাবে উঠে পড়বে যে, প্রগতি বলতে কি বুঝায়? বোঝায়, অনেক কিছু। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, আমাদের সকলেরই লক্ষ্য,

আনন্দ। জ্ঞানীরা বিচার করে এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছেন যে, এই আনন্দলাভের পথে বাইরের বাধার চেয়ে ভিতরের বাধাই প্রবলতর। এইগুলিকে তাঁরা শত্রু বলে গণ্য করেছেন এবং দমন করতে উপদেশ দিয়েছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের প্রকোপ থেকে যিনি যতটা মুক্ত, তিনি ততটা প্রগতির পথে অগ্রসর। জনমত মত্তমাতঙ্গকে যদি প্রগতির পথে চালিত করতে হয়, তা হলে তাকেও উক্ত রিপুগুলির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তুমি যদি প্রশ্ন কর, তা কি করে সম্ভব? তা হলে জ্ঞানীদের বচনেরই পুনরুক্তি করতে হয়—তুমি নিজে ভাল হও। অপরে কেন মন্দ, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। জনের সমষ্টিই জনতা এবং জনতার বিধানই যদি জনমত হয়, এবং সে জনমতকে আমরা যদি প্রগতিশীল করতে চাই, তা হলে প্রত্যেক লোককে প্রগতির মূল আদর্শ টাকে (যে আদর্শ বহু শতাব্দীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) মানতে হবে। অপরকে মানাবার আগে নিজে সেটা মানতে হবে। উপদেশের চেয়ে উদাহরণটাই বেশী কার্যকরী।

সুতরাং, জনমতের দোহাই দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোন বুদ্ধিমান লোকই সমর্থন করবে না। উচ্ছৃঙ্খল জনমতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাই সভ্যতার আদর্শ। তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে যে শক্তির প্রয়োজন, তার উৎস, সংযত চরিত্র, অসংযমের হুমকি নয়।

জনমতের কল্যাণের জন্যই সুতরাং, অসঙ্গত, আপাতমনোরোচক জনমত পরিহার্য। জনমতের ভবিষ্যতে যাঁরা আস্থাবান, তাঁরা এ কথা স্বীকার করেন, তুমিও আশা করি, করবে।

আদর্শ প্রসঙ্গ

সাহিত্যিকেরাই তো বিদ্রোহের ধ্বজাবাহক চিরকাল। কবির স্বপ্নই তো আজ সফল হতে চলেছে দেশে, দেশে, রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রে। সুতরাং বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা আজ যদি অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে জীবনপণ করে থাকে তা হলে কবিই তো জয়ধ্বনি করবে সর্বপ্রথমে। অন্যরকম ভাববার তো কোনও কারণ নেই। অন্যায়, অবিচার, জোচ্চুরি, উৎখাত করবার জন্যে যারা আত্ম-বলিদান করছে, তাদের নামে আর যে যাই বলুক, কবির কাব্যলোকে তাদের শ্রদ্ধার আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নেই। তুমি ভুল বুঝেছ।

তবে একটা কথা আছে, সেটাও মনে রাখা উচিত। আত্মত্যাগী, আদর্শবাদী যেমন পূজ্য, সুবিধাবাদী ভণ্ড তেমনি ঘৃণ্য। এই ভণ্ডদের মুখেই আদর্শবাদের কপচানি বেশী শোনা যায়। এদের ভিড়ে, এদের অনাচারে, আসল লোক, আসল আদর্শ চাপা পড়ে

যায় প্রায়ই। মুখোসহীন শয়তানকে শাসন করা সহজ, কিন্তু আদর্শের ফোঁট'-তিলক পরে বুলির নামাবলী গায়ে দিয়ে যারা লোক ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের কায়দা করা শক্ত। প্রগতির পথে এরাই বৃহত্তম বাধা। এরা ধূর্ত, এরা সংখ্যায় অধিক, যে কোনও আদর্শকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাতে এরা ওস্তাদ। এদেরই দাপটে ভদ্র, আদর্শবাদী সন্ত্রস্ত হয়ে বাস করেন, এদের ছোঁয়াচ লেগে আসল আদর্শটা পর্যন্ত অপাংক্তেয় হয়ে যায় লোকচক্ষে। 'বুজরুক্' কথাটার প্রকৃত অর্থ জ্ঞানী, ভণ্ডামির ছোঁয়াচ লেগে বাঙলায় এখন 'বুজরুক্', মানেই ভণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, অধুনা প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম—আদর্শে কেউ খাটো নয়, কিন্তু ভণ্ডদের অত্যাচারে এরা প্রত্যেকেই জর্জরিত। কাঠের গায়ে যেমন উই লাগে, আদর্শের গায়ে লাগে তেমনি ভণ্ডের দল। মনুষ্যত্বের বহু আদর্শকে যুগে যুগে এরাই ছারখার করেছে। সুতরাং, এদের বিরুদ্ধেও কবির রোষ উদ্দীপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবি কিন্তু ব্যঙ্গ করেন ভণ্ডকে, আদর্শকে নয়। মতলববাজ রাজনৈতিকের সঙ্গে কবির এইখানেই তফাৎ। সত্য, শিব, সুন্দরের আদর্শই কবির আদর্শ, যেখানে তা আছে, সেইখানেই কবির সহানুভূতি, যেখানে তার অভাব, সেইখানেই কবি বিমুখ। কবি ভণ্ডকে গাল দেন, কিন্তু ভণ্ডকে দেখিয়ে যারা আদর্শকে উপহাস করে, কবি তাদেরও সহ্য করেন না।

ভাল লোককে চেনবার উপায় কি ?—তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে। উপায়, সেই লোকটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা। কিছুদিন লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, লোকটি কি রকম। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তৃষ্ণার্তকে জলদান করা পুণ্যকর্ম। কেউ যদি জলসত্র খোলে, তা হলে তাকে প্রশংসা করবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু হঠাৎ যদি আবিষ্কার করি যে, লোকটা কেবল ব্রাহ্মণ বেছে বেছে অথবা বৈদ্য বেছে বেছে জল দিচ্ছে, তা হলে বাহবা দেবার উৎসাহ চলে যায়। কালোবাজারের মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে যাঁরা অস্ত্রচালনা করছেন, যদি দেখি, একটা বিশেষ ছাপ-দেওয়া মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধেই তাঁদের অস্ত্র উদ্যত, তা হলে স্বতঃই সন্দেহ হয়, ভিতরে একটা মতলব আছে। যাঁরা আদর্শবাদী, তাঁরা পক্ষপাতহীন, আদর্শই তাঁদের জীবনের একমাত্র প্রেরণা। কিছুদিন লক্ষ্য করলেই এঁদেরও চেনা যায়। ভালো লোক, মন্দ লোক, কেউ বেশীদিন আত্মগোপন করতে পারে না।

বাঙলাদেশ আজ যে দুরবস্থার পঙ্কে ডুবে যাচ্ছে, তার থেকে তাকে টেনে তোলবার জন্য যদি সত্যসন্ধী, আদর্শবাদী একদল যুবক-যুবতীর আবির্ভাব ঘটে থাকে, তা হলে তার চেয়ে আনন্দজনক সংবাদ আর কি হতে পারে ? সত্যিই তো, অন্যায়ে, অবিচারে ছেয়ে গেছে চতুর্দিক। ন্যায়পরায়ণ, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এমন একদল যুবক-যুবতীর এখন প্রয়োজন, যাঁদের আদর্শোজ্জ্বল আবির্ভাবে দেশের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা থাকবে, চরিত্রবল থাকবে, আর থাকবে উদার সত্যনিষ্ঠা, গভীর আত্মসম্মানবোধ। কেবল গোলাগুলি, বারুদ, বন্দুক আস্ফালন করলে অথবা অহিংসার বুলি আওড়ালেই

আমরা উদ্ধার পাব না, এ কথাটা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যোগ্যতাই জয়ী হয় শেষ পর্যন্ত, গুলি বা বুলি নয়। গুলি বা বুলির পিছনে যে মানুষগুলি থাকে, তাদের চরিত্র এবং মনীষাই জাতির মেরুদণ্ডকে দৃঢ় করে রাখে। যে ইংরেজ আমাদের উপর গুলি চালাত, সে আজ চলে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি আমাদের জাতীয় জীবন থেকে তাদের আমরা অপসারিত করতে পেরেছি? আজও তো সে সসম্মানে বিরাজ করছে। এখনও 'বিলিতি' জিনিস মানে ভাল জিনিস, 'দেশী' জিনিস মানে 'খেলো' জিনিস। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে, এখনও আমাদের বিদেশী বই ওলটাতে হচ্ছে, জীবনের অধিকাংশ জিনিসের জন্য এখনও আমরা তাদের দ্বারস্থ হচ্ছি এবং কতকাল যে হব, তারও ঠিক নেই। ইংরেজ আজও আমাদের কাছে জয়ী হয়ে আছে, তার কারণ, তাদের মনীষা এবং চরিত্রবল।

বাঙলাদেশও একদিন চরিত্র এবং মনীষাবলেই ভারতবর্ষের অগ্রণী হয়েছিল, আজ যদি সে পিছিয়ে পড়ে থাকে তা হলে স্বভাবতঃই মনে হবে, সে অযোগ্য হয়ে পড়েছে, তার চারিত্রিক বা মানসিক দৈন্য ঘটেছে। বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েরা হাতে-কলমে যদি দেখিয়ে দিতে পারে যে, তা ঘটে নি তা হলেই আবার আমরা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো। আজ বাঙলাদেশ, পরশ্রীকাতরতার কাৎরানিতে, দলাদলির খেউড়ে, আত্মনিধনের ঘূর্ণাবর্তে, নানাবিধ ইজমের প্যাঁচে মুমূর্ষু তা জানি, তবু আশা করি, এই বাঙলাদেশই ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে আবার।

কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল, রাধানাথ, রামতনু, মধুসূদন, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, যতীন, কানাইলাল, সুভাষ প্রভৃতি যে দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে দেশ কি এতো অনুর্বর হয়ে যাবে হঠাৎ?

হবে না। হতে পারে না। বাঙলাদেশের অসংখ্য দোষ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু সেই অসংখ্য দোষকে অসংখ্য গুণে পরিণত করবারও শক্তি আছে এই বাঙালী জাতের।

সুতরাং, তোমার চিঠিটা পেয়ে আশ্বস্ত হলাম, আশা করে রইলাম।

কাব্য ও সিনেমা

সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব গল্প বা উপন্যাস রসোত্তীর্ণ সিনেমার বেলায় সেগুলি তেমন ওতরায় না কেন, এর কারণ, আমার মনে হয়, একাধিক। প্রথমতঃ, সাহিত্যক্ষেত্রে একা কবিই সর্বেসর্বা, তাঁর সৃষ্টিতে আর কারও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই। কোনও কিছুর দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নন। তিনি যে রঙে, যে রসে তাঁর কাব্যকে চিত্রিত করেন, তা

রসিক পাঠকচিত্তে প্রতিফলিত করতে হলে কোনও বাইরের টেক্‌নিশিয়ন, ডিরেক্টর বা নটনটীর উপর নির্ভর করতে হয় না তাঁকে। তিনি নির্ভর করেন কেবল রসিক ব্যক্তির রসবোধের উপর। এই মনোভাব নিয়ে যে সব কাব্যসৃষ্টি হয়েছে সিনেমার ছাঁচে ফেলতে গেলেই তাদের অঙ্গহানি অনিবার্য। কারণ, সিনেমা-শিল্পী একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার ফল। বহুলোক সেখানে আপন আপন 'কেরদানি' দেখাবার জন্যে ব্যস্ত এবং আমাদের দেশে এঁরা প্রায়ই কাব্য-বুদ্ধি-বর্জিত। আমাদের ছেলেবেলায় দেখতাম, যাদের কোথাও কোনও গতি হত না, তারা হয় হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিশ করতে বসত কিম্বা ইনসিওরেন্সের দালালি করত। আজকাল এদের অনেকে দেখছি সিনেমায় ঢুকেছে, অনেকে কাগজ বার ক'রে সম্পাদক হয়েও বসেছে। কালোবাজারের কৃপায় যে সব এরণ্ড দ্রুম হয়েছেন, তাঁদের শাখা আশ্রয় করেছে এরা। কোনও রসোত্তীর্ণ কাব্যে এদের স্থূল হস্তাবলেপ সুতরাং, শোচনীয় হতে বাধ্য। এ ছাড়া আর এক মুশকিল, সিনেমা ব্যাপারটাই সীমাবদ্ধ। দু' ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শেষ করতেই হবে। যে কাব্যের স্রষ্টা কোনও সীমার দ্বারাই আবদ্ধ ছিলেন না, সেই কাব্যকে সীমায় বাঁধতে গেলে, তা নষ্ট হবেই। তৃতীয় বিপদ—এবং এইটেই চরম বিপদ—কবির লক্ষ্য, রসিক চিত্ত কিন্তু সিনেমার লক্ষ্য 'মাস্ মাইণ্ড'। আগে এই মাস্ মাইণ্ডের খোরাক জোগাত যাত্রা এবং কথকতা। অনেক লোক অনেকক্ষণ ধরে বসে চিরন্তন পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে বহু কলাবিদ্ গুণীর সহায়তায় যে রস উপভোগ করতেন, তা পরিবেশন করা আধুনিক সিনেমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু 'মাস্ মাইণ্ড' ওই ধরণের রসই চায়। তারা সিনেমা দেখতে যায়, যাত্রা, কথকতার রেওয়াজ উঠে গেছে বলে। যাত্রা, কথকতা উঠে গেছে তার কারণ, গুণী লোকের অভাব ঘটেছে দেশে। সত্যিকার গুণী না হলে যাত্রা জমানো যায় না। যাত্রার আসরে ফটোগ্রাফ, প্লে-ব্যাক বা সেটের চাকচিক্যে দর্শককে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। প্রকৃত গায়ক, বাদক এবং অভিনেতা চাই সেখানে। পোষাকেরও দরকার হত না ভালো অভিনেতাদের। নীলকণ্ঠকে খোঁচা খোঁচা পাকা গোঁফ, দাড়ি নিয়েই বৃন্দাদূতীর ভূমিকায় হাজার হাজার লোককে মাতিয়ে দিতে দেখেছি। ফাঁকির কারবার প্রথমে শুরু হল থিয়েটারে। সাজ, পোষাক, সিন, প্রপ্‌স্ প্রভৃতি তালি পড়তে লাগল গুণীদের অপটুতার ছিদ্র ঢাকবার জন্য। সিনেমায় ব্যাপারটা আরও বৈজ্ঞানিক হওয়াতে আরও অনেক বাজে লোক প্রশ্রয় পেল নাট্যশিল্পে। বিজ্ঞানের চমকপ্রদ টেক্‌নিকের সঙ্গে গুণীদের অলোকসামান্য প্রতিভার মিলন হলে যে মণিকাঞ্চনযোগ হত, তা হয়নি এখনও আমাদের দেশে। আমরা যে মনোভাব নিয়ে সার্কাস বা ম্যাজিক দেখতে যাই, সেই মনোভাব নিয়েই সিনেমা দেখতে যাই। নাট্যরসের অভাব সেখানে। সেকেলে যাত্রা-মনোভাব অনেকের মনে এখনও প্রবল বলে, যাত্রা-গন্ধী সিনেমায় এখনও ভিড় হয় বেশী। কিন্তু যাত্রার সেই উদাত্ত রস পরিবেশন করবার, সেই ভূরি-ভোজনের আয়োজন করবার সামর্থ্য আধুনিক সিনেমার নেই—তাই সে ক্ষেত্রেও হতাশ হতে হয় দর্শকদের।

এ কথা কিন্তু মানতেই হবে যে, আধুনিক যুগে ভাবের বাহক হিসাবে সিনেমার যোগ্যতা অনন্যসাধারণ, এর সম্ভাবনা অসীম এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, যেহেতু এটা অভিনব জিনিস, এর সহায়তায় যে রসবস্তু সার্থক হবে, তার নির্মাণ-কৌশলও অভিনব হওয়া চাই। পুরাতন সাহিত্যসৃষ্টিকে দুমড়ে, মুচড়ে, ছেঁটে, কেটে সিনেমা-নাট্যে রূপান্তরিত করলে উভয়েরই জাত যাবে। সিনেমার জন্যই আলাদা নাটক লিখতে হবে। সিনেমার জন্যে লেখা হলেও—তার আঙ্গিকে সময়-সংক্ষেপে সিনেমার বৈশিষ্ট্য থাকলেও—তা যথার্থ নাটক হওয়া চাই। প্রেম-গান-বক্তৃতার খিচুড়ি অথবা মহাপুরুষ-জীবনীর ঘণ্ট অথবা বিদেশী নাটকের চুরি অথবা কোনও শ্লোগানের খাপছাড়া বেসুরো কীর্তন করলেই সিনেমা-শিল্পের উন্নতি হবে না। বিদেশীদের হুবহু নকল করতে গেলেও বিপদ আছে। কারণ, যে কাহিনী, যে সংলাপ, যে বিষয়বস্তু বিদেশে শোভন, এ দেশে তা হাস্যকর অনেক সময়।

অর্থাৎ সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে যে কথা সত্য, সিনেমার পক্ষেও সেই কথাই সত্য। সেক্সপীয়র, কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সার্থক কাব্যসৃষ্টি করে গেছেন, যে প্রতিভা ভিন্নক্ষেত্রে তাজমহলের শিল্পীকে প্রবুদ্ধ করেছিল সেইরকম প্রতিভা সিনেমার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। নকল-নবীশ হয়ে সাময়িক হাততালি হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে শিল্পের অগ্রগতি হয় না।

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। নানারূপ বিশৃঙ্খলা যদিও আমাদের পথকে আপাততঃ দুর্গম করে রেখেছে, তবু আশা করে থাকব যে, সাহিত্য, স্থপতি, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ সুকুমার কলায় ভারতীয় প্রতিভা যেমন স্বকীয়তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, সিনেমাশিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি তার বৈশিষ্ট্য একদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

এখনও কিন্তু হয়নি, এবং এ কথাটা আমরা যেন না ভুলি।

সিনেমা-প্রসঙ্গ

সিনেমা সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন আপনি আমাকে করেছেন, তা আমাকে না ক'রে কোনও সিনেমা-ব্যবসায়ীকে করলে পারতেন। কারণ, সিনেমার সঙ্গে ব্যবসায়ের সম্পর্কটাই মুখ্য, সাহিত্যের সম্পর্ক নিতান্তই গৌণ, এত গৌণ যে, উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলতে রসিকসমাজ যা বোঝেন, তাকে বাদ দিয়েও সিনেমা-ব্যবসা চলে, এবং আমাদের দেশে ভালই চলে বোধ হয়। সকল দেশেই সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা কম, আমাদের দেশে আরও কম, কারণ, আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই কম। যে রসিকের সংখ্যা কোটিকে গোটিক, তাদের উপর নির্ভর করে এ দেশের সিনেমা-ব্যবসায়ীদের খাঁটি কাব্য-বিলাস করবার তাগদ নেই। সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে খাঁটি জিনিসে খিড়কি-

পথে তাঁরা ভেজাল মেশাচ্ছেন। মোড়ের দোকানে যে মুদিটা ঘিয়ে সাপের চর্বি অথবা দালদা মেশায়, তার সঙ্গে ব্যবসায়-নীতির দিক দিয়ে হোমরা-চোমরা সিনেমাওলাদের খুব যে বেশী তফাৎ আছে, তা নয়। আপাতদৃষ্টিতে ওই ঘি যেমন খাদ্য, এই সব ছবিও তেমনি সাহিত্য এবং শিল্প। যে সব জিনিস ভেজাল দিয়ে সিনেমার ছবি তৈরি হয়, তার ফর্দ অনেক লম্বা। সংক্ষেপে দু'চার কথা বলছি। একটা কথা কিন্তু আগে বলে নিই। দালদা এবং সাপের চর্বিরও যেমন রসায়ন-জগতে স্থান আছে, সিনেমার এই ভেজালগুলোরও তেমনি কাব্যজগতে স্থান আছে। ওগুলোও কাব্যের উপকরণ, সুপ্রযুক্ত হলে ওরাই অপরূপ রসসৃষ্টি করতে পারে।

যৌন-আবেদনটাই সিনেমা-ভেজালের প্রধান উপকরণ। নানা ছলে-ছুতোয় মানুষের এই পশু-প্রবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করাই যেন এদের লক্ষ্য। আইন বাঁচিয়ে যিনি যতটা তা করতে পারছেন, তিনিই যেন ততটা কৃতার্থ। ভেজালের দ্বিতীয় উপকরণ সুতরাং—প্রেম। সবরকম প্রেম। পিতৃপ্রেম, মাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুপ্রেম, শিশুপ্রেম, পশুপ্রেম, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম—ইত্যাদি নানারকম প্রেমের বকমফেরের সঙ্গে যুবক-যুবতীর স্বর্গীয় প্রেমও থাকা চাই। প্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি। এর আবেদন অব্যর্থ। এটাকে ভেজাল বলছি, কারণ অধিকাংশ সময়েই এটা সুপ্রযুক্ত নয়। সন্দেশে কামড় দিয়ে যদি কড়াং করে দাঁতে কাঁকর লাগে এবং সে কাঁকর যদি বহুমূল্য হীরের টুকরো বা খাঁটি সোনার দানাও হয়, তা হলেও সন্দেশের বেলায় সেটা ভেজাল। কোনও সন্দেশ-রসিক তা বরদাস্ত করবেন না। প্রেম থাকতেই হবে, অতএব যখন তখন, যেখানে সেখানে প্রেম আমদানী কর, কবি যদি তা করতে রাজি না হয়, মাইনে-করা কেরানীকে দিয়েও প্রেমের দৃশ্য লেখাও, এইটেই হল বেরসিক বণিক-মনোবৃত্তি। বণিককে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ চাহিদা-অনুসারেই তাকে মাল সরবরাহ করতে হবে। ভেজালের তৃতীয় উপকরণ হচ্ছে, প্রচলিত জনপ্রিয় ধুয়া অর্থাৎ শ্লোগান। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই (আর্থিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি) একদল থাকে অত্যাচারী, আর একদল থাকে অত্যাচারিত। দ্বিতীয় দলই সংখ্যায় বেশি। এই দ্বিতীয় দলের স্বপক্ষে এবং প্রথম দলের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যে সব ধুয়া ওঠে, সিনেমার বিষয় হিসাবে প্রায়ই সেগুলি জনপ্রিয়। এতে অত্যাচারীদের আঁকা হয় আলকাতরা দিয়ে, আর অত্যাচারিতরা হয় সব নিষ্কলঙ্ক। তা না আঁকলে সিনেমায় চলবে না। ভাল কাব্যেও অত্যাচারীরা নিন্দিত। কিন্তু, একটু তফাৎ আছে। প্রথম তফাৎ জীবনদ্রষ্টা কবি নানাদিক দিয়ে বিচার করবার প্রয়াস পান, কে প্রকৃত অত্যাচারী। তাঁর বিচারের অভিনবত্বে তিনি পুরাতন ধারণার মূল্য বদলে দেন। অনেক সময়ে স্নেহময়ী জননীই হয়তো নিষ্ঠুরা অত্যাচারিণীরূপে প্রতিভাত হতে পারেন কবি-দৃষ্টিতে। দ্বিতীয় তফাৎ, কবির কাব্যে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত, কেউ একরঙা নয়। শক্তিতে, দুর্বলতায়, ভালোয়, মন্দে, তারা প্রত্যেকেই বহুবর্ণসমন্বিত সার্থক সৃষ্টি, জনপ্রিয় মতবাদের প্রতিধ্বনি-

মাত্র নয়। তৃতীয় তফাৎ, কাব্যের বিচার অমোঘ। কবি অত্যাচারীর জয়গান করে না কখনও। কিন্তু ব্যবসায়ীদের তা করলে চলবে না। সংখ্যাধিক্যের মন রাখতে হবে তাদের। যদি কোনও কারণে অত্যাচারীদের সংখ্যাধিক্য ঘটে, তা হ'লে তাদেরই জয়ধ্বনি করতে হবে। তা না করলে ছবি চলবে না।

ভেজালের চতুর্থ উপকরণ হচ্ছে, গান। কারণে, অকারণে, যেখানে সেখানে, গান ঢোকানো হয়, গায়ক-গায়িকা বা সঙ্গীত-রচয়িতার সুনামের সুবিধা নেবার জন্য। 'অমুকের গান আছে, অতএব চল যাই'—এই মনোভাবের সুযোগ নেন সিনেমা-বণিকরা। সে গান যে অনেক সময় রসভঙ্গ করে, তা তাঁরা দেখতে পান না, কিম্বা দেখতে চান না, কারণ তাঁদের লক্ষ্য শিল্পের দিকে নয়, বক্স-অফিসের দিকে। নামজাদা লেখকদের বইও তাঁরা নেন লেখকের খ্যাতির খাতিরে, সাহিত্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, উঁচুদরের সাহিত্যসৃষ্টিকে ছবিতে রূপ দেবার ক্ষমতা এদের নেই, (রূপ দিতে হলে যে পরিমাণ অর্থব্যয় অনিবার্য, যে ধরণের অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক, পরিবেশক প্রয়োজন, তা প্রায়ই দুর্লভ এদেশে)—তাই নামের খাতিরে নামজাদা কাব্য নিয়ে এঁরা নিজেরাও বিব্রত হয়ে পড়েন, রসিকসমাজও পীড়িত হয়।

ভেজালের পঞ্চম উপকরণ হচ্ছে—মহাপুরুষ-চরিত। গান্ধীজি, নেতাজি, চৈতন্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতির নামে কে না বিচলিত হয়? এঁরা প্রত্যেকেই যুগস্রষ্টা। এঁদের প্রত্যেকের জীবনই মহাকাব্যের বিষয়। এঁদের মহজ্জীবনকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারে, তেমনি নৈপুণ্য এদেশের সিনেমা-শিল্পের হয়েছে কি না সন্দেহ। তাই যে ছবি আমাদের উদ্দীপ্ত করত, তা প্রায়ই বিরক্ত করে তোলে। যা সুখাদ্য, রন্ধনের দোষে তাই অখাদ্য পিণ্ডে পরিণত হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, যদিও সিনেমার সঙ্গে 'সাহিত্য' এবং 'শিল্প' কথা দু'টি প্রায়ই জড়িত থাকতে দেখা যায়, প্রকৃত সাহিত্য এবং শিল্পের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কত কম।

যে ব্যবসায়ের দিকটা এর মুখ্য অংশ, সে দিকটাও ক্রমশঃ হতাশাজনক হয়ে আসছে নাকি বাঙালীর ভাগ্যে। ভালগারিটির প্রতিযোগিতাতেও বাঙালী না কি হেরে যাচ্ছে অন্য প্রদেশবাসীর কাছে। খেলো জিনিসের প্রতি জুগুপ্সাই এর কারণ হলে একটা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পেতাম। বাঙলাদেশের ছবির পরদায় হিন্দি ছবির এত ভিড়ের কারণ, রাষ্ট্রভাষা শেখবার আগ্রহ নয়, অন্য প্রদেশবাসীদের প্রতি স্নেহও নয়। এর কারণ, লোভ এবং কাম। এই দু'টি রিপুর পাল্লায় পড়লে, আমরা ভুলে যাই যে, কখন কোন বক্তৃতায়, কখন কোন কবিতায়, কখন কোন প্রবন্ধে বা তর্কসভায় আমরা স্বাজাত্য-প্রীতির উচ্ছ্বাসে টগবগ করে ফুটে উঠেছিলাম, বাকী আর চারটে রিপুর প্ররোচনায়। ওই দু'টি রিপুর কবলে পড়লে আমাদের জ্ঞান থাকে না যে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে পয়সা ব্যয় করি, তার মধ্যে ক'টা পয়সা বাঙালীর পকেটে যায়।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে সিনেমার কি সম্পর্ক হওয়া উচিত, আপনি জানতে চেয়েছেন।

সম্পর্কটা একটা বিশেষ ধরণের হবে, এ কথা আপনি ভাবছেন কেন? দর্শক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান প্রভৃতি বহু লোকের সিনেমার সঙ্গেও যে সম্পর্ক, সাহিত্যিকের সঙ্গেও সিনেমার সেই সম্পর্ক হওয়া সম্ভব—অর্থাৎ টাকার সম্পর্ক। কারণ, এ কথাটা তো সুবিদিত যে, সাহিত্যিকেরাও মানুষ, তাঁদেরও বাঁচতে হবে। প্রাচীনযুগে সাহিত্যিকেরা রাজানুগ্রহে সাহিত্য-চর্চা করতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য রাজার মহিমা-কীর্তন করতে হ'ত তাঁদের। রোগা লোককেও শালপ্রাংশুমহাভুজ বলে বা ছোট জমিদারকেও সমুদ্র-মেখলা-ক্ষিতি-পতি আখ্যা দিয়ে তুষ্ট রাখতেন তাঁরা।
এখন জনগণই রাজা। সুতরাং জনপ্রিয় শ্লোগান কীর্তন করে এখন অধিকাংশ সাহিত্যিককে বাঁচতে হবে। সিনেমা যদি সেই ধুয়ার বাহন হয়, অর্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কবি নিশ্চয়ই সুর দেবেন তাতে। এতে যে তাঁদের সাহিত্য-ধর্মচ্যুতি ঘটবেই, এমনও কোন কথা নেই। বরং পারমার্থিক সাহিত্য-চর্চা করতে গেলে যে আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন, তা হওয়াতে এঁরা ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করবার অবসর পাবেন। তবে, অর্থের বিনিময়ে কোনও প্রকৃত সাহিত্যিক কোনওকালে যে আত্মবিক্রয় করবেন, তা মনে হয় না। কারণ কবিরা পাখির জাত, খাঁচাকে তাঁরা বড ভয় করেন।

বেকার-সমস্যা

তোমার চিঠি পেলাম। বেকার-সমস্যাটাই তো আজকালকার দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্য দেশেও। একটা জিনিস ভেবে দেখেছ কি কখনও? অন্যান্য অনেক অস্বাভাবিক সমস্যার মতো বেকার-সমস্যাটাও মানুষদেরই একচেটে। পশু-জগতে বেকার নেই। পশু-জগতে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হয় হয়তো সাময়িকভাবে, কিন্তু প্রকৃতি অনতিবিলম্বে তার সমাধান ক'রে দেন। সে সমাধানের নাম মৃত্যু। মনুষ্যেতর পশু-সমাজে বেকাররা আন্দোলন ক'রে সমস্যাসৃষ্টি করবার সুযোগ পায় না। মানুষদের মধ্যেও যারা পশু-স্তরের কাছাকাছি বাস করে, তারাও বেকার হলে মুখ বুঁজে নীরবে মারা যায়। আন্দোলনকারী বেকাররা ঠিক বেকার নয়, তারা খেতে, পরতে পায়। আন্দোলন করা তাদের পেশা। বুভুক্ষু বেকারদের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা করা কি উচিত নয়, তুমি প্রশ্ন করবে হয়তো। নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু, একটা মহৎ কার্যকে পেশাতে পরিণত করলে তার মহত্ত্ব বেশিদিন উজ্জ্বল থাকে না। নানারকম গ্লানি স্পর্শ করে তাতে ক্রমশঃ। ডাক্তারী, মাস্টারী, সাহিত্য, শিল্প পেশার পেষণে যে কি কদাকার হয়ে উঠেছে তা দেখতেই পাচ্ছ। পরের দুঃখে বিচলিত হওয়াটাই যাঁরা পেশায় পরিণত করেছেন তাঁদের পরোপকারচিকীর্ষা তাই আনন্দজনক না হয়ে আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে। তাই বেকারসমস্যা নামক যে আন্দোলনের

আলোড়নে আমরা মুহুর্মুহু সচকিত হয়ে উঠি, সে আন্দোলনের ধুয়া (Slogan) যদিও দরিদ্র জনসাধারণ, কিন্তু তার ফলভোগ করেন ওই মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীরা। দরিদ্র জনসাধারণ দারিদ্র্যের চাপে আগেও যেমন মারা যেতেন, এখনও তেমনি যাচ্ছেন। তাঁরা বক্তৃতা শুনছেন, উত্তেজিত হচ্ছেন এবং নিয়মিতভাবে মারা যাচ্ছেন। যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেশব্যাপী দারিদ্র্যের কারণ, তা দূর করতে হলে যে আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, তা নয় —প্রয়োজন খুবই আছে— কিন্তু আন্দোলনটাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখাই যদি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তো বড় ভয়ানক কথা। হচ্ছেও তো তাই দেখছি। দুঃখ-দারিদ্র্য কমছে না, আন্দোলন বেড়ে যাচ্ছে। একেবারে দীন-দুঃখী বেকারদের কথা ছেড়ে তোমাদের মতো বেকারের কথা ভাবলে একটা কথাই আমার মনে হয়, তোমরা বেকার নও, তোমরা বাবু। প্রকৃত বেকার হলে আন্দোলন করবার সুযোগ পেতে না তোমরা। হয়, বেকারত্ব ঘোচাবার জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে, না হয় মারা যেতে। যেমন করেই হোক, মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তোমরা করেছ, কিন্তু তাতে তোমরা সুখী নও, তাই চেঁচামেচি করছ। তোমরা বিয়ে কর না, কোনওরকম সামাজিক দায়িত্ব বহন করতে চাও না, এমন কি যে বাড়িতে থাক, খাও, সে বাড়িরও নাড়ির সঙ্গে তোমাদের সত্যিকার যোগ নেই, বেশি ফাইফরমাস করলেও বিরক্ত হও। ছিমছাম থাক, নিজেদের মনোমত গোষ্ঠীতে বিচরণ কর, সিনেমা দেখ, কাগজ পড় এবং মুখে রাজা-উজির মেরে এমন একটা কাণ্ড কর যে, যারা তোমাদের চেনে না, তারা অবাক হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে যারা সামান্য কিছু রোজগার করতে পার, তারা আবার মেসে গিয়েও থাকো দেখেছি, অন্য কোনও কারণে নয়, বাড়ির আওতা থেকে বাঁচবার জন্যে।

আসল কথা, তোমরা সুখী নও। তোমরা নিজেদের সুখী মনে কর না, অসুখী হওয়ার সেইটে একটা প্রধান কারণ। কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, সুখী হতে হয়। কি করে সুখী হওয়া যায় ? এ প্রশ্নের উত্তর হাজার লোক হাজার রকমে দিয়েছে। হাতের কাছে যা জুটেছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা, সুখী হবার একটা মস্ত উপায়। সারাজীবন 'হায় হায়' করে 'আরো আরো', করে ছুটে মরছে যারা, তাদের মধ্যে অধিকাংশই অসুখী। আমার সুখ যদি বাইরের বস্তু-সম্ভারের উপর নির্ভর করে এবং আমি যদি ক্রমাগত তা বাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, তা হলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি, যে সুখের সন্ধানে ছুটোছুটি করছিলাম, সেই সুখটাই অন্তর্ধান করেছে। নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে মানুষ কি তা হলে চেষ্টা করবে না ? নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু তা করতে গিয়ে আত্মবিক্রয় করবে না। সে যে মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, এ বোধটা তার সর্বদা জাগ্রত থাকা চাই। নিছক পশুত্ব-চর্চা করে পশু হয়তো আনন্দ পায়, মানুষ পেতে পারে না। তার সুখ-বোধটা এমন একটা জটিল জিনিস যে, ঐশ্বর্যের স্তূপের উপর বসে থাকলেও সে সুখী হয় না।

আর একটা কথাও ভেবে দেখবার মতো। যে জনসাধারণের দারিদ্র্যের অজুহাতে তোমরা বিদ্রোহের 'ঝাণ্ডা' উড়িয়েছ, সেই দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছ কি ভাল করে? করলে একটা জিনিস দেখতে পেতে—তারা আমাদের চেয়ে সুখী, আমাদের চেয়ে ভালো। দারিদ্র্যের নানা চাপে তারা বিড়ম্বিত, কিন্তু তবু তারা সুখী, কারণ তারা অলস নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যতটুকু পারে, ততটুকুই উপার্জন করে এবং ততটুকুই সানন্দে ভোগ করে সপরিবারে। তাদের মধ্যে অবিবাহিত যুবক নেই বললেই হয়—তাদের দাম্পত্যজীবন আমাদের অধিকাংশ লোকের দাম্পত্য-জীবনের মতোই কলহ-প্রণয়-সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত। তাদের স্ত্রীরা একটু নোংরা, নভেল-সিনেমা-রেডিওর সংস্কৃতিও তাদের নেই, কিন্তু তবু তারাই দেশের মেরুদণ্ড নির্মাণ করছে সন্তানের জননী হয়ে। আমাদের মতো গা বাঁচিয়ে, নাক সিঁটকে দূরে বসে বিলাস-মরীচিকার স্বপ্ন দেখছে না। তারা যদিও দারিদ্র্যজীর্ণ, তবু তারা সুখে আছে। তাদের মধ্যে অসুখের বীজ আমরাই বপন করছি, পরশ্রীকাতরতার বিষ ছড়িয়ে।

মনে কোরো না যে, আমি পুঁজিবাদ সমর্থন করি। দরিদ্র জনসাধারণ অভাবমুক্ত হোক, এ আমি সর্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু সর্বপ্রথম চাই মনুষ্যত্ব, তার বিনিময়ে আর কোনও জিনিসই চাই না। আধুনিকতাই তো কাম্য, কিন্তু জীবনের জয়-যাত্রায় অগ্রগতিই হবে সে আধুনিকতার মাপকাঠি। বলা বাহুল্য, সে অগ্রগতি মানে এরোপ্লেন-বাহিত গতি নয়, মানসিক অগ্রগতি। আধুনিকতা নিয়ে আমরা মাতামাতি করি বটে, কিন্তু আধুনিকতা আমরা বরদাস্ত করতে পারি কি? এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ব্যক্তিকে আমরা তো সেদিন খুন করে ফেললাম। একটা উন্মাদের কাজ বলে এটাকে উড়িয়ে দিতে পারছি না, কারণ, তার কাজকে প্রকাশ্যে সমর্থন করবার সাহস না থাকলেও, ভিতরে ভিতরে সমর্থন করছেন এ রকম লোক প্রচুর ঘুরে বেড়াচ্ছেন সমাজে এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই 'শিক্ষিত'। অধিকাংশ কেন, সবাই। অশিক্ষিত লোকেরাই মহাত্মাজির মাহাত্ম্যকে অনুভব করেছে প্রাণের মধ্যে। শিক্ষিত আধুনিকতা-অভিমানীরা পারেনি।

বেকারপ্রসঙ্গ নিয়ে চিঠিতে অনেক কথা লিখেছ, তাই উত্তরে আমিও দু'চার কথা লিখলাম। দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় সত্য, গভর্ণমেন্টেরও অনেক গলদ আছে, কিন্তু নিজেদের দিকেও তাকিয়ে দেখ। গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার জন্যে কাজের অভাব নেই দেশে। একটা রিক্সাওয়ালার কাছে খোঁজ নিও, সে দৈনিক কত রোজগার করে। কিন্তু, সে কাজ তুমি পারবে না, কারণ তুমি শিক্ষিত। তাই, তুমি কাজ না করে বেকার-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ। তোমার বেকারত্বের আসল কারণ, কাজের অভাব নয়, আত্মসম্মানের অভাব।

রাগ কোরো না। অকপট অভিমত চেয়েছিলে বলেই এত কথা লিখলাম এবং এটাও সম্ভব যে, আমার যুক্তি নিখুঁত নয়। তবু যা মনে হল, লিখলাম এবং আর যাই হোক, তা অকপট।

অন্যায়ের প্রতিকার

তুমি আমাকে যা করতে বলছ, বয়স আর একটু কম হলে হয়তো তাতে আমি মেতে উঠতুম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটুকু নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, কর্তৃপক্ষদের গালাগালি দিলে, নিজের মনের ঝাল ঝাড়া যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। এই ঝাল ঝাড়তে গিয়ে হয়তো বাহবা পেতে পারি, হয়তো দু' পয়সা গুছিয়ে নিতে পারি, এমন কি হয়তো বড়লোক-পদবাচ্যও হয়ে যেতে পারি। কারণ, অনেক ছোটলোক কেবল পরকে গাল দিতে দিতেই বড়লোক হয়ে উঠেছে, এমন দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়। কিন্তু ও সবে রুচি নেই। ওতে অন্যায়ের প্রতিকারও হবে না।

একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, অন্যায়কে আমরা সহ্য করছি বলেই অন্যায় আছে। আমরা চিৎকার করছি, এটা অন্যায়, ওটা অন্যায়, কিন্তু কার্যকালে সেগুলোকে মেনে নিচ্ছি। চালের দর এত বেশী, কাপড়ের দর এত বেশী, মাছের বাজারে আগুন, দুধের বাজারে সমুদ্র, কিন্তু বাজারে একটি জিনিস কি পড়তে পাচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সব। অমুকের লেখা অতি ট্র্যাশ (trash), অমুক সিনেমাটা অতি বাজে, অমুক নেতা অতি চোর, অমুক অভিনেতা অতি ওঁছা—এ সব অহরহই শুনি। আবার এ-ও দেখি যে, অতি-ট্র্যাশ লেখাই হু হু ক'রে বিক্রি হচ্ছে, বাজে সিনেমারও টিকিট পাওয়া ভার, চোর-নেতার নয়নগোচর হবার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত, ওঁছা অভিনেতার ছোঁচা দর্শকবৃন্দের সংখ্যা অগণ্য। চোরা-বাজারকে গালাগালি দিয়ে বই লিখে আমরা তা ছাপাচ্ছি, চোরা-বাজার থেকেই কাগজ কিনে। সমাজ-সংস্কারের বহুবিধ ফিরিস্তি আমরা সভায় আওড়াই, নিজের জীবনে তার একটাকেও রূপ দেবার চেষ্টা করি না। বরং, যারা করে, তাদের ঠাট্টা করি।

এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষকে গালাগালি দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখলে বা ব্যঙ্গ করে কবিতা-নাটক লিখলে কি কোনও সুফল হবে বলে মনে কর? কবিরা আবহমানকাল থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তো লিখে আসছেন, সেইগুলো পড়ে দেখ না. প্রেরণা পাবার মতো অনেক খোরাক পাবে। নতুন লেখা চাইছ কেন?

কেন চাইছ তা অবশ্য জানি। মুখ বদলাবার জন্য চাইছ। অজীর্ণরোগগ্রস্ত রোগী আচার খোঁজে যেজন্য। পুষ্টিকর দুধ, মাছ, মাংস হজম করার শক্তি তার নেই, তাই ও সবে রুচিও নেই। কে কোথায় হিং আর লঙ্কা দিয়ে ওল বা আমকে মুখ-রোচক করে তুলেছে তারই খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। আমাদেরও অবস্থা অনেকটা তাই হয়েছে! মানসিক অজীর্ণব্যাধিতে ভুগছি আমরা; পুষ্টিকর আহার হজম করবার সামর্থ্য নেই। মুখ-রোচক আচার, লজেনজ্, মোদকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি তাই উৎসুক-চিত্তে এবং মনে করছি, ওইগুলো খেলেই বুঝি স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। কিন্তু আসবে না।

যারা সুস্থ, সবল, পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে হজম করবার শক্তি যাদের আছে, ওই সব চুটকি, চটুল খাদ্য তাদের রসনা-বিলাসের জন্য, অসুস্থ লোকের পুষ্টি ওতে হবে না। শিল্পীরা ও রকম শৌখীন জিনিস চিরকাল প্রস্তুত করেছে, চিরকাল করবেও, কিন্তু, তুমি যে সমস্যার কথা তুলেছ, তার সমাধান ওতে হবে না। চিরন্তন সাহিত্যরসে যার চিত্ত পরিপুষ্ট, দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' বা ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ' পড়ে তার কিছু উপকার হবে নিশ্চয়, কিন্তু অপরিণত মন ও সবের ঠিক রসগ্রহণ করতে পারবে না এবং না পারলে ইষ্ট না হয়ে অনিষ্ট হবারই সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গানের প্রভাবে একদল ন্যাকার সৃষ্টি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনায় কি পৌরুষ, কি বলিষ্ঠতা দেদীপ্যমান। ভিত্তি মজবুত না হলে তার উপর তাজমহলই গড় বা অজন্তাশিল্পের নিদর্শনই ফোটাও, সমস্ত ধ্বসে গিয়ে ইঁট, সুরকির স্তূপ হয়ে দাঁড়াবে শেষকালে। ভিত্তি মজবুত করতে হলে সূক্ষ্ম জিনিসের দরকার নেই। মোটা মোটা মালমশলারই বেশী প্রয়োজন তাতে। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বর্ণপরিচয়ে যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, আমরা তাই ঠিকমতো পালন করতে পারি যদি, দেখবে চাল, কাপড় সস্তা হয়ে গেছে। কিন্তু খাঁটি দুধ হজম করবার শক্তি আমাদের নেই, চানাচুর খুঁজে বেড়াচ্ছি তাই। হ্যাঁ, সমস্ত অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে আমরাই বাঁচিয়ে রেখেছি। আমাদের সমস্ত প্রতিবাদ বাচনিক, আন্তরিক নয়, তাই অন্যায় টিকে আছে এখনও। আমরা কি কিছুদিনের জন্যও চাল, কাপড় কেনা বন্ধ করতে পারি না ? তুমি হয়তো বলবে—ওরে বাবা, তা হলে বাঁচব কি করে ? কিন্তু আমি ডাক্তার, আমি বলছি, নিছক জল খেয়েও বেশ কিছুদিন বাঁচা যায়। মহাত্মা গান্ধী তা প্রমাণ করে গেছেন, দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যতীন দাস। কষ্ট হয়, কিন্তু বাঁচা যায়। ছেঁড়া কাপড় পরে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে, এমন কি, উলঙ্গ হয়েও থাকা সম্ভব। যদি আমরা পারি, দেখবে, সব গরম বাজার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু, আমরা তা পারব না এবং সে কথা ওই জুয়াচোরগুলো জানে। তাই, তারা আমাদের দন্তসর্বস্ব মুখে লাথি মারছে আর বক্র-মেরুদণ্ড পিঠে চাবকাচ্ছে ক্রমাগত। আমরা নাকে কাঁদছি, কিন্তু অনতিবিলম্বে মুখ আর পিঠ পুনরায় পেতে দিচ্ছি সেই লাথি আর চাবুকের তলায়। অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে বেঁচেছিলেন সত্যাগ্রহী বীর গান্ধীজি, নিজের সারাজীবন দিয়ে যিনি দেখিয়ে দিয়েছেন অন্যায়ের সার্থক প্রতিবাদ কি করে করতে হয়।

সত্যাগ্রহই অন্যায়ের একমাত্র প্রতিকার, একমাত্র প্রতিষেধক। কিন্তু তার জন্য যে একতা, যে নির্ভীক নিষ্ঠা, যে ঋজু মেরুদণ্ড প্রয়োজন, তা আমাদের নেই, তা অর্জন করবার শক্তিও হয়তো হারিয়েছি। এই শক্তির অভাবের জন্য কাউকে লজ্জিত হতেও তো দেখি না। বরং ঈশপের গল্পে উচ্চস্থ আঙুরগুচ্ছকে লক্ষ্য করে শৃগালটা যেমন বলেছিল আঙুরগুলো টক, ও আমি চাই না, আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোকও তেমনি বলে বেড়ান, শুনতে পাই যে, মহাত্মাজির আদর্শ অতি বাজে জিনিস, ও আমরা

চাই না। হায়, ডিগ্রি-ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত বায়সের দল, তোমাদের কথাও ঈশপের গল্পে আছে, আর একবার পড়ে দেখ, যদি মনে না থাকে।

মোট কথা, যতক্ষণ দেশী দাম দিয়ে চাল, কাপড় আমরা কিনতে থাকব, ততদিন চাল, কাপড়ের দাম কমবে না। চাহিদা-অনুসারে বিক্রেতা চিরকাল জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে এসেছে, চিরকাল করবে।

মিনিস্ট্রি বদল করে, বর্তমান শাসন-পরিষদকে গালাগালি দিয়ে, ওজস্বিনী বক্তৃতার তুফান তুলে, স্টাটিসটিক্সের ফর্দ বানিয়ে, শ্রমিক ক্ষেপিয়ে বা ধনিকের পায়ে তেল দিয়ে, কবিতা লিখে বা প্রবন্ধ পড়ে কিছুতেই কিছু হবে না, যতক্ষণ না আমরা আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে একতাবদ্ধ হয়ে না বলতে পারছি—অন্যায় আমরা কিছুতে সহ্য করব না।

এ আত্মশক্তি নিজেদের মধ্যেই আছে সন্ধান করলেই পাবে। বাইরের কোন শক্তি এসে, কোন বিশেষ শাসন-পরিষদ মসনদে বসে আমাদের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে, এ দুরাশা-আলেয়ার পিছনে না ঘুরে আত্মশক্তি-সন্ধানের কাজে যদি আমরা লাগতে পারি, তা হলেই দুঃখ ঘুচবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

তোমার কবিতা ও গল্প ফেরৎ পাঠালাম। ভালো হয় নি। ওগুলো প্রবন্ধ হয়ে গেছে। প্রবন্ধ-আকারে ও দুটোকে যদি আবার লেখ, সুপাঠ্য হবে। সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে তুমি কিছু উপদেশ চেয়েছ। উপদেশ দেওয়ার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই, স্পর্ধাও নেই। তবে, তুমি ছোট ভাইয়ের মতো, তাই এ বিষয়ে যতটুকু বুঝেছি, তা বলছি।

প্রথম কথা হচ্ছে, লেগে থাকা চাই। অন্যান্য সাধনার ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি, একাগ্র নিষ্ঠা না থাকলে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। স্কুলে-কলেজে অনেক ছেলেই সাহিত্যচর্চায় মেতে ওঠে, অনেকের প্রতিভাও থাকে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাবে তারা থেমে যায় কিছুদূর গিয়ে। লেগে থাকবার মতো মানসিক ক্ষমতা অনেকেরই নেই। কোনও কিছুর সাধনা করবামাত্র সিদ্ধিলাভ হবে, এ আশা দুরাশা। অবিলম্বে না হলে যারা দমে যায়, সাহিত্যের পথ তাদের জন্য নয়। শুধু সাহিত্য কেন, যে কোনও বিষয়ের সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। ইতিহাসে যাঁরা কৃতী পুরুষ, তাঁদের জীবনের প্রথম দিকটা নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার ইতিহাস। অনেক কাঠ, খড় পুড়িয়ে বড় হতে হয়। উপনিষদের ঋষি একটু ঘুরিয়ে সংস্কৃত ভাষায় এই কথাই বলেছেন—আদিত্য-বর্ণ পুরুষকে আমি জেনেছি, কিন্তু তমসঃ পরস্তাৎ—অর্থাৎ তমসার পরে। অনেকক্ষণ অন্ধকার ভোগ করবার পর, তবে আদিত্যবর্ণ পুরুষের দেখা পাওয়া যায়। অন্ধকার দেখেই যাঁরা পালিয়ে আসেন, তাঁদের অন্ধকারভোগই হয় কেবল, আদিত্য-বর্ণ পুরুষকে

আর দেখা যায় না। সুতরাং, লেগে থাকাটাই প্রথম কথা এবং খুব বড় কথা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল একবার। তিনি বলেছিলেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ লেখার টেবিলে বসবে, মনে লেখার প্রেরণা থাকুক বা না-ই থাকুক।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যোগ্যতা। সাহিত্য একটা বিরাট ব্যাপার, তার নানা দিক আছে। তুমি কোন্ দিকটার উপযুক্ত, সেটা বেছে নিতে হবে। সকলেই কবি হতে চায়। কিন্তু কবি হতে চাইলেই কবি হওয়া যায় না, তার জন্যে একটা বিশিষ্ট প্রতিভা থাকা দরকার। সে প্রতিভা জন্ম-লব্ধ, অর্জন করা যায় না। সাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে—সৃষ্টি-ধর্মী, সংগ্রহ-ধর্মী এবং অনুবাদ। এর প্রত্যেকটিতেই কাব্য এবং প্রবন্ধের স্থান আছে। কাব্য মানে রসাত্মক বাক্য—কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, নানাবিধ রস-রচনা সবই কাব্য। এমন কি সৃষ্টি-ধর্মী প্রবন্ধও অনেক সময় কাব্যের পর্যায়ভুক্ত। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-গ্রন্থেও অনেক সময় কাব্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। কাব্যের আস্বাদ নেই, অথচ মৌলিক চিন্তাপূর্ণ রচনাকেও সৃষ্টিধর্মী বলতে হয়। এই সৃষ্টিধর্মী রচনা প্রতিভাবানদেরই একচেটে। যাদের প্রতিভা নেই, তারা ও পথে পা দিলে দুঃখ পাবে—রং-পাউডার-মাখা রূপহীনা রূপের আসরে নেমে যে ধরণের দুঃখ পায়, সেই ধরণের দুঃখ। কিন্তু রূপহীনা হলেই যে তার জীবন ব্যর্থ, প্রতিভাহীন হলেই যে সে অপদার্থ, এমন কোনও কথা নেই। রসের জগৎই নিখিল সাহিত্যসৃষ্টিতে একমাত্র জগৎ নয়, বিরাট-নগরীতে শিল্পশালা বা কাব্য-গ্রন্থাগারই যেমন মানব-মনীষার একমাত্র নিদর্শন নয়। সাহিত্যের যে অংশটা সংগ্রহধর্মী, সেই অংশেই জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং সে জ্ঞানভাণ্ডারে মাল সরবরাহ করবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। সে ভাণ্ডারের পরিধিও এত বিস্তৃত যে, সেখানে স্থানাভাব কখনও ঘটবে না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে তা এত বিরাট যে, যে কোনও শিক্ষিত লোক তার মধ্যে নিজেকে সারাজীবন নিযুক্ত রাখতে পারেন। আমাদের সাহিত্যে এ সব জিনিসের অভাবও প্রচুর আছে, কিন্তু সেদিকে মন দিয়েছেন অতি অল্পসংখ্যক লেখক। সকলেই কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখবার জন্যে ব্যস্ত। প্রায়ই দেখি, ওই সব কবিতা, গল্প বা উপন্যাসে প্রবন্ধের মালমশলা গজ গজ করছে। ফুলদানী সাজাতে বসে তাঁরা ফুলের বীজ, ফুলের চাষ, ফুলের সার প্রভৃতি সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ফুলদানীর গায়ে। ও সব নিয়ে প্রবন্ধ লিখলে মানাতো। প্রবন্ধ না লেখবার একটা মস্ত বড় কারণ অবশ্য আমাদের দেশে রয়েছে। ভাল প্রবন্ধেরও কদর নেই, বাজার-দর নেই। তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসেরও কাটতি বেশী। তাই সকলের ঝোঁক উপন্যাস লিখবার দিকে। আমাদের অন্তঃসারশূন্যতার এটা আর একটা প্রমাণ। আমরা সর্বক্ষণ একটা-না-একটা মজায় মজে থাকতে চাই, চিন্তা করবার সাহস, সামর্থ্য বা অবসর নেই আমাদের, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচি। তৃতীয়

শ্রেণীর সিনেমাও তাই জনপ্রিয়, বাজে ডিটেকটিভ উপন্যাস, খেলো ভূতের গল্প, প্রেমের পচা কাহিনীতেও তাই আমরা তৃপ্ত, যে কোনও হুজুগে মাতবার জন্যে তাই আমরা উন্মুখ হয়ে থাকি। যৌনবিষয়ক প্রবন্ধ পড়তে তাই আমাদের উৎসাহ। আসল কারণ অন্তঃসারশূন্যতা, নিজেদের ভুলে থাকতে চাই, অনেক মাতাল মদ খায় যে জন্যে! আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচতে কিছুদিন সময় লাগবে। আমাদের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এ বিষয়ে অবহিত হন, ভালো হয়। প্রতি বছর, তাঁরা ভাল প্রবন্ধকারদের পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত করুন। প্রত্যেক পাঠাগার এই নিয়ম করুন যে, প্রতি চারখানি উপন্যাসের পর একখানি করে প্রবন্ধের বই প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকে দেওয়া হবে। প্রত্যেক পাঠাগারেরও প্রবন্ধের বই কিনতে হবে, এ রকম নিয়মও থাকা উচিত। এই ধরণের প্রচেষ্টা কিছুদিন চললে হয়তো সুফল ফলবে। সংগ্রহধর্মী সাহিত্যের নানাদিক আছে, বহুরকম সুপাঠ্য প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে এবং একদিন না একদিন, সে সবের চাহিদা হবেই। সংগ্রহধর্মী সাহিত্যে কাব্যেরও স্থান আছে—রূপকথা প্রভৃতি এরই অন্তর্ভুক্ত। অখ্যাত, অজ্ঞাত কবিদের অনেক রচনা এখনও ছড়িয়ে আছে লোকের মুখে মুখে কিম্বা প্রাচীন পুঁথির পাতায়। সেগুলোকে কেউ যদি ঠিকমতো উদ্ধার করেন, তা হলে তা নূতন কাব্যসৃষ্টিরই মর্য্যাদা পাবে। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথা-সংগ্রহগুলি এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। সংগ্রহধর্মী সাহিত্যের আর একটা প্রধান দিক আছে—সমালোচনা। অপরের সৃষ্ট কাব্য নিয়ে শ্রদ্ধাসহকারে সম্যক আলোচনা করার নাম সমালোচনা। কবির হাতে পড়লে এ ধরণের সমালোচনা যে সৃষ্টিধর্মী কাব্য হয়ে উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লেই তা বোঝা যায়। এই সমালোচনা আবার অপটু লোকের হাতে বিশ্রী ডেঁপোমি হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে এটাকে নিজেদের অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করেন, অনেকে দর্পণস্বরূপ। সমসাময়িক সাহিত্য নিয়ে যে সব আস্ফালন বা প্রত্যাস্ফালন আমরা দেখি, তা অধিকাংশক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ এবং প্রায়ই পক্ষপাতদুষ্ট, হয় বিদ্বেষের বিষোদ্গিরণ, না হয়, চাটুকারের তৈলনিষেক। বর্তমান যুগের লেখকদের প্রকৃত মূল্য-নিরূপণ বর্তমান যুগের লেখকরা করতে পারবেন না। বর্তমান যুগের লেখকদের সম্বন্ধে খানিকটা সত্য ধারণা পাওয়া যায় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে। তাঁদের বিচার নিখুঁত না হতে পারে, কিন্তু অকপট। স্বার্থের নিক্তিতে ওজন করে তাঁরা স্তুতি, নিন্দা করেন না।

তৃতীয় বিভাগ, অনুবাদ। অতি সাবধানে অনুশীলনযোগ্য। অনুবাদ-ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। সৃষ্টিধর্মী মন না থাকলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ভাল অনুবাদ করা যায় না। অনুবাদকের শুধু ভাষাজ্ঞান থাকলেই চলবে না, রসবোধও থাকা চাই। বিদেশী ভালো ভালো বইয়ের কি অপাঠ্য অনুবাদই যে বেরুচ্ছে আজকাল। এ বিষয়ে আমরা যদি অবহিত না হই, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, বাঙ্গলার মাধ্যমে তারা বিদেশী প্রতিভাবান লেখকদের যে পরিচয় পাবে, তা অত্যন্ত

অসম্পূর্ণ, ইংরেজির মারফৎ আমরা যা পেয়েছি, তার চেয়ে ঢের বেশী নিকৃষ্ট। তুমি যদি অনুবাদে হাত দাও, কবিতা, গল্প বা উপন্যাসে হাত দিও না, দোহাই তোমার। প্রবন্ধ অনুবাদ কর, ভ্রমণকাহিনী অনুবাদ কর। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে মাত্রাজ্ঞান থাকাটা সাহিত্যচর্চার প্রধান অঙ্গ। অহঙ্কারে নাক ফুলিয়ে মাতামাতি করাটা যাত্রার আসরে ভীমের ভূমিকায় মানায়, রসের আসরে ওটা অত্যন্ত বেমানান। তোমার ক্ষমতা কতটুকু, তা নিজেই ঠিক করতে যদি না পারো, কোন রসিক বন্ধুর শরণাপন্ন হয়ো—তিনি যদি সত্যিই তোমার বন্ধু হন, তোমাকে সৎপরামর্শ দেবেন। সাহিত্যজগতে এই জাতীয় বন্ধুরা অনেক সময় মহদুপকার করে থাকেন—শুধু লেখকের নয়, পাঠকেরও।

শিক্ষার লাভলোকসান

শিক্ষা বিষয়ে তুমি যে মন্তব্য করেছ, তা এক হিসেবে ঠিক বই কি। আজকাল ছেলেরা স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা পাচ্ছে তাতে কোনও 'লাভ' নেই। বলা বাহুল্য, 'লাভ'টা তুমি আর্থিক মানদণ্ড দিয়েই মাপছ। 'আত্মিক' মানদণ্ড দিয়ে মাপলে আরও হতাশ হতে। একটা কথা শুনলে তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে যে, গত কয়েক শতাব্দী থেকে প্রকৃত শিক্ষা আমরা মোটেই পাইনি। আমরা নানাবিধ সংবাদ-সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছি, সংবাদ-বিদ হয়েছি, শিক্ষিত হইনি। নানা বই ও মুখ থেকে নানা সংবাদ আহরণ করে কণ্ঠস্থ করার নামই আমরা ভুলক্রমে দিয়েছি 'শিক্ষালাভ করা'। এভাবে শিক্ষিত লোককে আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত খাতিরও করেছি, তার স্মৃতি-শক্তির জন্য নয়, উক্ত স্মৃতি-শক্তির প্রভাবে সে চাকরি করবার সুযোগ পেয়েছে বলে। আমরা সত্যবাদী, নিরক্ষরকে মূর্খ, চাষা বলে অবজ্ঞা করে ধূর্ত, স্বার্থপর ডিগ্রীধারীকেও বিদ্বান বলে পূজা করেছি তার কারণ, সে ডিগ্রীর বেশ বাজার-দর ছিল। এখন আর নেই। তাই আমরা বলতে আরম্ভ করেছি, শিক্ষা দিয়ে আজকাল কোন 'লাভ' নেই। চাকুরি পাওয়া যাবে না। ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের সন্দেশ-বিদ্‌দের মূল্য অনেক কমে গেছে, আইনবিদ্‌দেরও খুব দুরবস্থা। চিকিৎসা-বিষয়ক সংবাদ কণ্ঠস্থ করেও আমরা আর আশানুরূপ ফল (অর্থাৎ মূল্য) পাচ্ছি না। বিদ্যুৎ বিষয়ে সংবাদ-সংগ্রহের আগ্রহ হয়েছে আজকাল। কারণ ওটার 'ভবিষ্যৎ' আছে না কি এখনও। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতি বৎসর যে হারে নানা ছাপের সংবাদ—ফেরিওয়ালা বাজারে ছাড়ছেন, তাতে তাদের দর, আদর, কদর কোনটাই বজায় রাখা সম্ভব হবে না হয়তো অদূর ভবিষ্যতে। সংবাদ কণ্ঠস্থ করবার জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় অনিবার্য, তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। সত্যি, 'লাভ' নেই। লাভের কথা ভাবতে গেলেই বিক্রেয় মাল এবং তার চাহিদার কথা স্বতঃই মনে হয়। চাহিদার সঙ্গে প্রয়োজন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খাদ্য, পরিধেয়, ঘর-বাড়ি,

অসুখের চিকিৎসা প্রভৃতির মতো কতকগুলি প্রয়োজন মানবসমাজে চিরকাল থাকবে। সুতরাং, এই সবের ব্যবসায় অথবা এই সব বিষয়ের সংবাদের চাহিদাও থাকবে বরাবর। এ সব ছাড়া অন্যান্য যে সব বিষয়ের সংবাদ আমাদের ছেলেরা কণ্ঠস্থ করে, সেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন। কিন্তু ইতিহাস, দর্শন, বা সাহিত্য-বিষয়ক সংবাদ শুনে পুলকিত হচ্ছেন এবং পুলকিত হয়ে তা পয়সা দিয়ে কিনছেন, এ রকম ঘটনা খুব বেশী ঘটছে না। এর কারণ, সব সময়ে এ নয় যে, সাধারণ লোকেরা উক্ত বিষয়গুলির দ্বারা বিনোদিত হতে অনিচ্ছুক অথবা অপারগ। আসল কারণ, বোধ হয়, এই সব সংবাদ-ফেরিওয়ালারা যে মাল ফেরি করছেন, তা খরিদ্দারদের চিত্ত-বিনোদন করতে পারছে না ঠিকমতো। সেইজন্যেই তাঁরা আমল পাচ্ছেন না। যিনি ইতিহাসের সংবাদ ফেরি করছেন, তাঁর সঙ্গে ইতিহাস-বিষয়ক আলোচনা করে খরিদ্দারদের আনন্দ হচ্ছে না, রাগ হচ্ছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এই একই ব্যাপার। মাল খারাপ হওয়াতে মাল কাটছে না। সকলেই তো চিত্তবিনোদন করবার জন্য উৎসুক। এটাও মানুষের প্রয়োজন একটা। এর জন্যে প্রত্যেকে সাধ্যমতো অর্থব্যয়ও করে থাকেন। সুপথে করতে না পেলে, কুপথে করেন। বাসনাকে উত্তেজিত ও তৃপ্ত করে সাধারণতঃ লোকে আনন্দিত হন। মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ ও ও তৃপ্ত করে যে শুদ্ধতর ও উচ্চতম আনন্দ পাওয়া যায়, তা উপভোগ করতেও সাধারণ লোক গররাজি নন, তার জন্যে তাঁরা পয়সা খরচ করতেও প্রস্তুত, কিন্তু ঠিক মালটি পাচ্ছেন না। তোতাদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনে কারও তৃপ্তি হচ্ছে না। তোতাদের মধ্যে বেকারসমস্যা বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং। বাড়বেই, কারণ যে সব গুণ থাকলে উপার্জন করা যায়, তা ওদের মধ্যে নেই। যে কোনও রাজমিস্ত্রী, যে কোনও ছুতোরমিস্ত্রী, যে কোনও ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী তোমার বাড়িতে এলে দৈনিক তিনটাকা, চারটাকা বা পাঁচটাকা মজুরী দাবী করে এবং তুমি তাতে রাজি হয়ে যাও, কারণ ওরা অপরিহার্য। কোনও এম-এ পাশ যুবকের এ দাবী তুমি গ্রাহ্য করবে কি? করবে না, কারণ মজুরির পরিবর্তে এমন কিছুই সে দিতে পারবে না, যা তোমাদের জীবনযাত্রায় অপরিহার্য। যদি এ রকম দেবার কিছু থাকে তার, নিশ্চয় তার দাবী তোমাকে মানতে হবে, মানিয়ে তবে সে ছাড়বে কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সন্দেশ নামক যে জিনিসটা সে তোমাকে গছাইতে চাইছে, তাতে ছানা বা মিষ্টতা কিছু নেই, আছে কেবল 'সন্দেশ' লেবেলটা। এ ব্যবসা বেশী দিন চলে কি? সুতরাং কেবলমাত্র লেবেল সংগ্রহ করবার চেষ্টা আর না করাই উচিত। ওতে আর 'লাভ' নেই। ব্যবসা করে অর্থ অর্জন করবার আগে তার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সে যোগ্যতার অর্থ যা বিক্রয় করে তুমি টাকা রোজগার করতে চাও, প্রথমতঃ, সে বিষয়ে অন্ততঃ চলনসইগোছ খানিকটা জ্ঞান থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ, থাকা চাই সাধুতা। ঘিয়ের বদলে সাপের চর্বি বা সাহিত্যের বদলে চালিয়াতি বেশীদিন চলবে না। সাধারণ লোকদের আমরা যতটা বোকা মনে করি, ততটা বোকা তারা নয়। মহাকালের কষ্টিপাথর সম্ভবতঃ ওদের হাতেই আছে।

এতক্ষণ যা বললাম, তা হল নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা অর্থাৎ লাভলোকসানের কথা, খাওয়া, পরার কথা। এগুলো প্রয়োজনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু, এগুলোই মনুষ্যজীবনের শেষ কথা নয়। মনুষ্যত্বলাভ করাই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য। যে পদ্ধতিতে এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারি, তাই অনুশীলন করার নাম প্রকৃত শিক্ষা। এ শিক্ষা থেকে আমরা বহুকাল বঞ্চিত। এ শিক্ষালাভ করার আগ্রহ এখনও আমাদের নেই। কারণ, আমরা ধনী হতে চাই, মানুষ হতে চাই না। মনুষ্যত্বলাভ করলে যা পাওয়া যায়, তার আর্থিক মূল্য কিছু নেই। ভারতবর্ষে সেকালে মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট লোকদের ব্রাহ্মণ বলা হত। এই ব্রাহ্মণরা দরিদ্র ছিলেন এবং দারিদ্র্যসত্ত্বেও বলতে পারতেন—বিদ্যাবিক্রয়ং ন করোমি। এদেশে বিদ্যা বলতে একটি জিনিসই বোঝাতো—ব্রহ্মবিদ্যা। মাড়োয়ারি বা মুনাফা-খোরেরা এ বিদ্যার খরিদ্দার হতে পারেন না। হতে চাইলেও হতে পারতেন না। সুতরাং ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণকে দরিদ্রই থাকতে হত চিরকাল। এর জন্য তাঁরা যে অসুখী ছিলেন, তা-ও নয়। কারণ, যে পদ্ধতি অনুশীলন করে তাঁরা ব্রাহ্মণত্বলাভ করতেন, সেই পদ্ধতিই তাঁদের চরিত্র ও মনকে এমন উঁচু পরদায় বেঁধে দিত যে, ঐহিক ঐশ্বর্যের প্রতি লোভই আর থাকত না তাঁদের। সমাজ তাঁদের অর্থ দিতে সাহসই করত না। যাঁরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁদেরই কথা বলছি অবশ্য। অর্থ না দিলেও সমাজ তাঁদের এমন আর একটা জিনিস দিত, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জিনিস কোনও মানুষ কোনও মানুষকে দিতে পারে না। শ্রদ্ধা। সমাজের কাছ থেকে এই ছিল তাঁদের প্রাপ্য। এরই বিনিময়ে তাঁরা সমাজের কল্যাণচিন্তা করতেন।

আজকাল প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম। যে দু' একজন আছেন, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি না। আমরা ধনীকেই শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। তাই, সবাই ধনী হবার চেষ্টা করছে। জীবনের প্রতি পদপাতে, সবাই লাভলোকসান খতাচ্ছে। সেদিন একজন দুঃখ করছিলেন আমার কাছে যে, ভদ্র পরিবারের অনেক মেয়ে সিনেমা-অভিনেত্রী হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ, কুলবধূদের চেয়ে সিনেমা-অভিনেত্রীরা আজকাল বেশী খাতির পাচ্ছেন। কেবল নাচগানের আসরেই নয়, সামাজিক আসরেও। সুতরাং, বিক্রয় করবার মতো বা প্রদর্শন করে খাতির পাবার মতো রূপ, গুণ যে সব সতীলক্ষ্মীদের আছে, তাঁরা সে সব সংবরণ করে আঁস্তাকুড়ে বসে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দারিদ্র্য ভোগ করবেন কেন, যদি তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকুতে টান পড়ে? নিশ্চয়ই তাঁরা সিনেমা-অভিনেত্রী হবেন। অধুনা প্রচলিত নীতিই তো এই। সিনেমা-অভিনেত্রী হতে দোষ কি, সমাজ যদি তার বদলে তাকে অর্থ এবং সম্মান দেন।

দেখ, জোর করে কিছু হয় না। সমাজ মনুষ্যত্বকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিলেই দেখবে, ধীরে ধীরে সমাজে মনুষ্যত্বের উদ্ভব হচ্ছে। যেদিন আমরা বুঝব, প্রকৃত শিক্ষার প্রকৃত মূল্য কি এবং জাতীয় জীবনী-শক্তির তা কতখানি, সেইদিনই প্রকৃত শিক্ষার কদর হবে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন মুদি, মিস্ত্রিদেরই হুড়োহুড়ি চলবে।

বুনিয়াদি শিক্ষা

বুনিয়াদি শিক্ষা আমাদের দেশে অবিলম্বে কেন প্রচলিত হচ্ছে না, এ নিয়ে তুমি যে সব উষ্ণ আলোচনা করেছ, তার উত্তরে প্রথমেই একটি কথা বলতে চাই। 'ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট'-এর কর্তব্যের উপর যে জোরটা তুমি দিয়েছ, তার উত্তরে প্রথমেই আমি বলব, সত্যিকার 'ন্যাশনাল' গভর্ণমেণ্ট এখনও আমাদের হয়নি। যাঁরা এখন দেশের শাসনবিভাগের কর্তা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই 'কোট-ওলটানো' ন্যাশনাল। অনেকেরই মুখোসটা বদলেছে খালি, জাত বদলায় নি। অত চট করে জাত বদলায় না। নূতন মন্ত্রিদল গঠনের চেষ্টা করেও কোনও সুফল হবে না, আর একদল 'কোট-ওলটানো' আসবেন। আমরা সবাই যে ওই। সুতরাং, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শক্তি বেশী অপব্যয় করো না। আন্দোলন কর, সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা কর, কিন্তু নির্ভর কর আত্মশক্তির উপর এবং তাদের উপর, যাদের ভালো তোমরা করতে চাইছ। এটা অবশ্য ঠিক যে, গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ছাড়া এত বড় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে না। কিন্তু যে জনসাধারণ দেশের প্রকৃত মালিক, তাদের যদি স্বপক্ষে টানতে পার তা হলেই তোমাদের আন্দোলন সফল হবে। তাদের স্বপক্ষে আনতে হলে বুনিয়াদি শিক্ষার উপযোগিতায় তাদের আস্থাবান করে তুলতে হবে। এর মূল ব্যাপারটায় কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। শিশুর সহজাত গুণাবলীকে স্বাভাবিক পন্থায় উন্মেষের সুযোগ দিয়ে তাকে নিপুণ, সুস্থ, চরিত্রবান কর্মীতে পরিণত করবার পদ্ধতিকে কেউ নিন্দা করবে না। ওইটেই যে শিক্ষার মূল কথা, তা সর্বদেশে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে যখন অক্ষর ছিল না, তখনও যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হত, তা বুনিয়াদি শিক্ষারই প্রাচীন সংস্করণ। প্রত্যেক আর্য-সন্তানকে বলিষ্ঠ, কর্মঠ, সামাজিক মানবে পরিণত করাই ছিল তার লক্ষ্য। তখন যে শিল্পকে অবলম্বন করে তাঁরা কিশোরচরিত্র গঠনের প্রয়াস পেতেন, তা ছিল মুখ্যতঃ কৃষিশিল্প। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে যে সব শিল্প আজ মানবসভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সব শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না তখন। গুরুগৃহ ছাড়া অন্য কোনও-প্রকার বিদ্যায়তনও ছিল না, সুতরাং, তখন দেশের সমস্ত আর্য-সন্তানকে বাধ্য হয়ে গুরুগৃহে যেতে হত। আর একটা কারণেও যেতে হত, যা স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দেখিয়ে দিয়েছেন। গুরুগৃহ থেকে আর্যসন্তানগণ উপবীত নিয়ে ফিরে আসতেন সমাবর্তনের পর। উপবীত না দেখাতে পারলে, বিবাহ হওয়াই অসম্ভব ছিল তখন। আর, বিবাহ না করলে, গার্হস্থ্য আশ্রম আরম্ভই করা যেত না। সুতরাং, বিয়ে করবার জন্যও অন্ততঃ সেকালের ছেলেদের বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে (সেকালে নাম ছিল গুরুগৃহ) যেতে হত এক-গাছা উপবীত-সংগ্রহের জন্য। বেশ সঙীনরকম ব্যবস্থা ছিল তখন শিক্ষাপ্রচারের। এখন যুগ বদলেছে, রুচি বদলেছে, সমাজ-সংহতির প্রতি

লোকের তেমন নিষ্ঠাও নেই, সমস্ত ঝোঁকটা পড়েছে আজকাল টাকার উপর। টাকার মানদণ্ডেই যখন জীবনযাত্রার ছন্দ নির্ধারিত হচ্ছে, তখন বুনিয়াদি শিক্ষাকেও উক্ত মানদণ্ডে মাপতে চাইবে সকলে। জানতে চাইবে, আমার ছেলেকে যদি বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া যায়, ভবিষ্যতে তার উপার্জনক্ষমতা কতটা হবে। বুনিয়াদি শিক্ষার মূলনীতিকে মেনে নিয়েও লোকে এ প্রশ্ন করবে, এবং করলে, তা নিতান্ত অসঙ্গতও হবে না।

দেশের ধনীসম্প্রদায় সাধারণতঃ ছেলে-মেয়েদের ভারতবর্ষের বাইরে পঠান শিক্ষার জন্য। যতক্ষণ তাঁদের সামর্থ্য থাকবে, ততক্ষণ তাঁরা পাঠাবেন। ভারতবর্ষের বাইরে যে শিক্ষাব্যবস্থা আছে, শুনেছি, যতদিন না আমাদের বুনিয়াদি শিক্ষালয়গুলি তার সমকক্ষ হচ্ছে, ততদিন এ দেশের ধনীপুত্ররা সেখানে যাবে না, এটা নিশ্চিত।

তারপর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—তথাকথিত শিক্ষিত-সম্প্রদায়। এঁরাও তাঁদের ছেলে-মেয়েদের তথাকথিত শিক্ষালাভের জন্য তথাকথিত শিক্ষামন্দিরেই পাঠাবেন। উক্ত শিক্ষামন্দিরগুলি কেরানী তৈরি করবার কলমাত্র, এ কথা জেনেও পাঠাবেন। এর প্রথম কারণ, এটা পরিচিত পথ। অপরিচিত পথে চলবার দুঃসাহস মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পিতৃমাতৃস্থানীয়দের প্রায়ই থাকে না। দ্বিতীয় কারণ—উক্ত শিক্ষামন্দিরগুলি কেরানি তৈরির কল হতে পারে, কিন্তু ওই কল থেকেই এদেশে যে সকল কৃতী পুরুষ গত শতাব্দীতে এবং বর্তমান শতাব্দীতেও আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের কীর্তিকলাপ আমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেছে যে, আমাদের আকাঙ্খা জেনেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এ দুরাশা পোষণ করেন এবং রেস-খেলোয়াড়রা যে মনোভাব নিয়ে ঘোড়ায় বাজি ধরে, সেই মনোভাব নিয়ে বর্তমান স্কুল-কলেজগুলির নানা গলদ জানা সত্ত্বেও সেইখানেই ছেলেদের পাঠাবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁরা জিতেও যে যান, এ কথা আশা করি, তুমি অস্বীকার করবে না। এ মনোবৃত্তি আমি সমর্থন করছি না, কিন্তু মনোবৃত্তিটা যে কি, তাই শুধু বলছি। তৃতীয় একদল আছেন, যাঁরা কেরানী হতেই চান। বাজারে কেরানীর চাহিদাও যে নেই, তা নয়। সুতরাং, কেরানী তৈরি কলেরও প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদের যদি তোমাদের বুনিয়াদি শিক্ষালয়ে নিয়ে যেতে হয়, তা হ'লে বর্তমানের স্কুলগুলি বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

তার পরের স্তর হচ্ছে দেশের জনসাধারণ। এরাই সংখ্যায় বেশী। এরাও কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষালয়ে যে খুব উৎসাহভরে যাবে, তা মনে হয় না। এরা কিন্তু নিরুৎসাহ হবে ভিন্ন কারণে। তুমি নিশ্চয় জান, সাধারণ গরীব লোকের ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়স থেকেই উপার্জন করতে শুরু করে। স্কুলে ছেলে পাঠালে সে উপার্জন তো বন্ধ হবেই, উপরন্তু তাদের ছেলেরা বুনিয়াদি শিক্ষালয় থেকে এমন কিছু শিখবে না, যা ভাঙিয়ে তারা তাদের অবস্থা আগের চেয়ে বেশী সচ্ছল করে ফেলতে পারবে। মনে হবে চাষবাস আর চরখা তাদের তাঁতশেখার জন্যে সাত বছর ছেলেটাকে স্কুলে আটকে রাখা কেন। ও তো ঘরে বসেই শিখতে পারে, শিখছেও। চরিত্রের অন্যান্য যে গুণাবলী

বিকাশ হবে বলে তোমরা বলছ, গরীবের ছেলেদের তা অনেকটা আছে, আর না থাকলেও তার জন্তে লালায়িত নয় তারা। আর পাঁচজনের মতো তারাও ওই শিক্ষার আর্থিক সম্ভাবনাটাই বড় করে দেখবে।

তোমাদের বুনিয়াদি শিক্ষালয়গুলিতে যদি মোটরের কাজ, রেডিওর কাজ, ইলেকট্রিকের কাজ শেখবার সুযোগ থাকে, তা হলে সেখানে ভিড় করবে সবাই। বাজারে একজন তাঁতী বা চাষীর চেয়ে মোটরমিস্ত্রি, রেডিওমিস্ত্রি, ইলেকট্রিকমিস্ত্রির মজুরি বেশী। বর্তমান জগতে ও সব জিনিস অপরিহার্যও হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। বুনিয়াদি শিক্ষালয়গুলি অবিলম্বে যদি আধুনিক শিল্পকলার আধুনিক জ্ঞানদানে সমর্থ হয়, তা হলে সাধারণ লোকেরা সেখানে ছেলে পাঠাতে প্রলুব্ধ হবে। বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনায় এ সবের স্থান আছে জানি, পল্লীগ্রামে আধুনিক শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করা ব্যয়সাধ্য তাও মানি, কিন্তু আধুনিক যুগে বুনিয়াদি শিক্ষাকে যদি দেশগঠনের ভার নিতে হয়, তা হ'লে কেবল চরখা এবং চাষের উপর জোর দিলেই চলবে না, বর্তমান যুগের বহুবিধ অর্থকরী শিল্পের বহুমুখী অনিবার্য দাবীকে মেনে নিয়ে তাকে চলতে হবে। আধুনিক বুনিয়াদি শিক্ষালয়কে হতে হবে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বাহক: অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিক্ষালয় হবে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানাদ্রব্য প্রস্তুত করবার ছোট ছোট ফ্যাকটারি, যেখানে দেশের ছেলেমেয়েরা হাতেকলমে এমন সব জিনিস শিখবে, যার মূল্য আধুনিক সমাজে ক্রমবর্ধমান এবং যার সম্ভাবনা অসীম।

অর্থাৎ, কেবলমাত্র এর নৈতিক দিকটা নিয়ে আলোচনা করলেই জনসাধারণের মন পাওয়া যাবে না, এর অর্থকরী দিকটাও মনোরম করে তুলতে হবে।

পরশ্রীকাতরতা

তোমার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলাম না। পরশ্রীকাতরতা নামক বদগুণটি যে বাঙ্গালীদের মধ্যে আছে, তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ওটা যে আমাদেরই একচেটে সম্পত্তি, তা আমি মানতে রাজি নই। অল্পবিস্তর সকলেরই ওটা আছে। ওটা আমাদের মানে, মানবমাত্রেরই বহু প্রাচীন সম্পত্তি। নখদন্তের মতো এ উত্তরাধিকার আমরা আদিমকাল থেকেই বহন করছি। জীবনযুদ্ধে নখদন্তের মতোই ওটা একটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র। ওই প্রবৃত্তিটির সহায়তায় আমরা নিজেদের অক্ষমতা সম্বন্ধে মর্মান্তিকরূপে সচেতন হই। জীবনযুদ্ধের নীতি-অনুসারে পরের শ্রীবৃদ্ধির অর্থ, নিজের পরাজয় কিংবা পরাজয়ের সূচনা। এতে বিচলিত হয়ে কাতরতাপ্রকাশ করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। পশু-স্তরের আইন-অনুসারে ওটা সজীবতারই লক্ষণ। আমাদের মধ্যে ক'জন লোক পশু-স্তরের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছি বল? সুতরাং, সকলেরই মধ্যে কিছু না কিছু আছে ওটা। যাঁরা

বুদ্ধিমান, তাঁরা এই আয়ুধটি বুদ্ধিমানের মতই ব্যবহার করেন এবং বুদ্ধিমানের মতই বিপক্ষের আয়ুধের আঘাত থেকে আত্মরক্ষাও করতে পারেন। আমাদের যে অক্ষমতা সম্বন্ধে ঈর্ষা আমাদের চেতন করে, সেই অক্ষমতাটি দূর করবার জন্যে যদি আমরা সচেষ্ট হই, তা হ'লেই ঈর্ষা নমক পশু-প্রবৃত্তিটিকে বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগানো হল। নিছক পশুর মতো পরের বিত্তহরণ ক'রে আত্মসাৎ করার মধ্যেও যে পাশবিক বিক্রম আছে, তারও স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক রাগবিস্তার ক'রে খানিকটা ওকালতি করা সম্ভব, কিন্তু যাঁরা পরের ঐশ্বর্য দেখে বৈঠকখানায় নিম্নকণ্ঠে বা আড়ালে-আবডালে, ঠারে-ঠোরে, ইশারায়-ইঙ্গিতে নিন্দা ক'রে বিষোদ্গিরণ ক'রে বেড়ান, তাঁরা বড়ই করুণার পাত্র। যে আত্মোন্নতির জন্যে প্রকৃতি আমাদের এ প্রবৃত্তিটি দিয়েছেন, সে আত্মোন্নতির ধার দিয়েও তাঁরা যান না, অন্তর্দাহে জ্বলে মরেন খালি। একজন পণ্ডিত বলেছেন যে, সবরকম পাপের বদলেই আমরা কিছু না কিছু সুখ পাই, একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে, পরশ্রীকাতরতা। ওতে জ্বলুনিটাই লাভ হয় কেবল। এরা বুদ্ধিমান মানুষও নয়, বলিষ্ঠ পশুও নয়। নির্জীব, বিষাক্ত, পচা জিনিসের মতো এরা কেবল দুর্গন্ধই ছড়িয়ে বেড়ায়। মানবসমাজে এ রকম লোকের অভাব নেই, বাঙালীসমাজে তো নেই-ই। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানু-সারে এরা নিঃশেষে নির্মূল হয়ে যাবে একদিন। কারণ, অক্ষমকে প্রকৃতি কখনও ক্ষমা করেন না। জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্যে যে সব অস্ত্র তিনি আমাদের দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার না করলে, মৃত্যু অনিবার্য। শ্বেতসার নামক খাদ্য পরিপাক করবার জন্যে তিনি আমাদের মুখে লালা দিয়েছেন, শ্বেতসার পরিপাকের কাজে সেটাকে না ব্যয় ক'রে আমরা যদি সেটাকে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াই, তার ফল হবে দু'টি। চতুর্দিক হয়ে উঠবে লালায়িত, ক্লেদাক্ত, আর আমাদের হবে মৃত্যু। ঈর্ষা নামক প্রবৃত্তিটির সদ্ব্যবহার না করলেও, ওই একই ফল।

নিজের সহজাত ঈর্ষাকে কি ক'রে আত্মোন্নতির কাজে লাগিয়ে সদ্ব্যবহার করা যায়, এ কথা শুনে নিশ্চয়ই তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে "আমি না হয় আত্মোন্নতির চেষ্টা করলাম, কিন্তু অপরের ঈর্ষার হাত থেকে বাঁচবার কি উপায় আছে কোনও?" আছে বই কি। যা অপরের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে, তা যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। জীবনধারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে কারও ঈর্ষা-ভীমরুলের চাকে খোঁচা না লাগে। চাক চতুর্দিকেই আছে, তোমাকে যথাসম্ভব সামলে চলতে হবে। আত্মপ্রচার, আত্মপ্রশংসা এইজন্যেই নিন্দনীয়। তোমার ঐশ্বর্যের ঝনংকারটা অপরের কানে যত কম যায়, ততই তোমার পক্ষে শুভ। এইজন্যেই জীবনের বহিঃপ্রকাশটা যত অনাড়ম্বর হয়, ততই ভালো। অন্তরকে যত পার ঐশ্বর্যমণ্ডিত কর, সাধারণ লোক তাতে তত ঈর্ষান্বিত হবে না। সাধারণ লোক চটে যাবে, যদি তুমি তার গায়ে কাদা ছিটিয়ে তার পাশ দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলে যাও। ক্ষুধিত, দরিদ্র লোকের চোখের সামনে যদি তুমি ভূরিভোজনে প্রবৃত্ত হও, তা হলেই তার রাগ হবে।

আমাদের দেশে অনেকে সেইজন্যে পাঁচজনের সামনে খেতে চায় না। দেহের পুষ্টির জন্য যে খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজন, তাও হয়তো অনেকের জোটে না। যার জোটে, সে সেটা লুকিয়ে খেতে চায়, লোলুপদৃষ্টির গ্লানি এড়াবার জন্য। সবাইকে সমানভাবে দিয়ে খাবার সামর্থ্য যার নেই, তার পক্ষে এ নিয়ম ভালই বলতে হবে। ঐশ্বর্যের আধিক্য হলে পাঁচজনের সঙ্গে সমভাবে সেটা ভোগ করলেই আর দুর্ভোগ থাকে না। ব্যাপারটা আনন্দজনক হয়ে ওঠে বরং। তত ঐশ্বর্য যার নেই, গোপনতার আশ্রয় নিলেই সে নিরাপদে থাকবে। অন্তরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধেও ওই একই নিয়ম। সাধারণ লোক অন্তরের ঐশ্বর্য নিয়ে মাথা ঘামায় না যদিও, কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হন, এ রকম অসাধারণ লোকও আছেন। প্রকৃত সাধু যাঁরা, তাঁরা নিজেদের অন্তরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে প্রায়ই নীরব। অন্তরের ঐশ্বর্যে যাঁরা সমৃদ্ধ, আস্ফালন করা তাঁদের স্বভাবই নয়। গভীর জলের রোহিত তাঁরা, শফরীর মতো ফর ফর করতে লজ্জিত হন। একটা স্বাভাবিক বিনয় কবচের মতো রক্ষা করে তাঁদের। অনন্ত বিশ্বের অসীম ঐশ্বর্যের আভাস পেয়ে তাঁরা নিজেদের সামান্য ঐশ্বর্যের তুচ্ছতা এমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন যে, সে কথা উল্লেখ করতেও সঙ্কোচ হয় তাঁদের। বস্তুতান্ত্রিক ঐশ্বর্যবানদের সঙ্গে এঁদের এখানেই তফাৎ। ওঁরা মুখর, এঁরা নীরব। সেইজন্যে এঁদের শত্রু কম।

ঐশ্বর্য অন্তরেরই হোক বা বাইরেরই হোক, তা নিয়ে আস্ফালন করলেই সমস্যার সৃষ্টি হবে। তোমার নিকটতম আত্মীয়রাই সেইজন্য তোমার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষান্বিত। তারা নিকটে থাকে বলেই তোমার ঐশ্বর্যের খবর পায়। নিজের চতুর্দিকে একটা স্বাতন্ত্র্যের আবরণ রাখাও তাই প্রয়োজন। এই স্বাতন্ত্র্যের আবরণ নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে, গাম্ভীর্য দিয়ে, চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করতে হয়। মনের একটা অবলম্বন না থাকলে, এ স্বাতন্ত্র্য সৃজন করা যায় না। যাঁরা যোগী, যাঁরা কবি, যাঁরা ভাবুক, যাঁরা কর্মী, তাঁরা সহজেই আপন স্বতন্ত্র জগতে থাকেন। মনের অবলম্বনের জন্য তাঁদের আড্ডা দিতে যেতে হয় না। আড্ডায় মানুষের স্বকীয়তা নষ্ট হয়, গাম্ভীর্য নষ্ট হয়, স্বাতন্ত্র্যের গোপনতা থাকে না। আড্ডায় নিজের ঐশ্বর্যের বার্তা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ছড়িয়ে মানুষ শত্রুসৃষ্টি করে। ঈর্ষার হাত থেকে বাঁচতে হলে স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন।

ঐশ্বর্য প্রত্যেক মানুষকেই আহরণ করতে হয়, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে হয় গোপনতা দিয়ে। গোপনতার অন্তরালেই ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি। ভ্রূণের স্থান তাই মাতৃগর্ভের অন্ধকারে, লক্ষ্মীর বাহন পেচক তাই নিশাচর।

যন্ত্র-মহিমা

দেখ, চিঠিতে তুমি 'যন্ত্রদানব' কথাটা বারম্বার এমন জোর দিয়ে ব্যবহার করেছ, 'যন্ত্রসভ্যতা'র বিরুদ্ধে এমন সব ভাষা প্রয়োগ করেছ যে, এ সম্বন্ধে দু'চার কথা না বলে পারছি না। আমাদের একটা মহদ্দোষ যে, আমরা যখন কাউকে ভক্তি করি, তখন আমাদের আর দিগ্বিদিকজ্ঞান থাকে না। চৈতন্যকে যখন ভক্তি করেছিলাম, তখন কোদাল দেখেও কেঁদে আকুল হয়ে পড়তাম, কারণ, কোদাল দিয়ে যে মাটি কাটা হয়, তাতেই হয় মৃদঙ্গ এবং সেই মৃদঙ্গ বাজিয়ে হয় হরিনামসঙ্কীর্তন। বলা বাহুল্য, চৈতন্যদেব কোদাল নিয়ে মাতামাতি করতে বলেন নি। গান্ধীজিও যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী ছিলেন না ঠিক, তিনি যন্ত্র-অসভ্যতার বিরোধী ছিলেন। যন্ত্রসভ্যতার নামে মানুষ পৃথিবীতে যে অশিষ্টতা, যে কলহ, যে অশান্তির প্রবর্তন করেছে, তারই প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। তুমি শাঁসটুকু বাদ দিয়ে খোসাটা নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছ। তুমি এটা ভুলে গেছ যে, মানব-সভ্যতার বহিরঙ্গের প্রকাশ ঘটেছে যন্ত্রের ভিতর দিয়েই। বন্য মানব যেদিন পাথর থেকে অস্ত্র তৈরি করতে শিখল, সেইদিনই শুরু হল তার প্রগতির জয়-যাত্রা, বহির্জগতের বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে। তোমার চরখা, তাঁত এবং তকলীও যন্ত্র, মিলেরই পূর্বতন সংস্করণ ওরা। যন্ত্রের উপর নির্ভর করেই বস্তুজগতের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে আজ আমাদের পক্ষে। যন্ত্রকে অস্বীকার করাও যাবে না, কারণ, মানব-মনীষা যতদিন সক্রিয় থাকবে, ততদিন অনিবার্যভাবে যন্ত্রের নিত্যনব আবির্ভাব ঘটতে থাকবে। আমাদের আসল সমস্যা, যন্ত্র নিয়ে নয়, আমাদের আসল সমস্যা, যন্ত্রের পিছনে যে মানুষটা আছে, তাকে নিয়ে। সেই মানব যখন দানব হয়ে ওঠে, তখনই তার চালিত যন্ত্রও দানবীয় মূর্তি পরিগ্রহ করে। সে যদি দেবতা হয়, তা হ'লে সে বরদান করবে। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রত্যেকেরই হাতে এক বা একাধিক অস্ত্র বা যন্ত্র আছে। তা তাঁরা ব্যবহার করেন বিশ্বের কল্যাণের জন্য। অস্ত্রহীন বা যন্ত্রহীন দেবতা আমরা কল্পনা করতে পারি না। সুতরাং, বর্তমান যুগে আমাদের অভিযান হওয়া উচিত, যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, অসাধু যন্ত্রচালকের বিরুদ্ধে। সুতরাং, তোমরা যন্ত্র-লোপ করবার অসাধ্য-সাধনে শক্তিব্যয় না ক'রে আদর্শ মানুষ তৈরি করবার কাজে লেগে পড়। মানুষ যদি অসাধু হয়, তা হ'লে যে কোনও জিনিস নিয়েই সে অনর্থসৃষ্টি করতে পারে। তোমার ওই চরখা এবং খদ্দরকে অবলম্বন করেই কতকগুলো মতলববাজ, অসাধু লোক যে কি কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। সুতরাং, ঘরে ঘরে চরখার প্রবর্তন হলেই যে রামরাজ্য ফিরে আসবে, তা মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেবার আগে আর একটা কথাও ভেবে দেখা উচিত। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রত্যেক স্বাধীনতারই মূল লক্ষ্য, যন্ত্রের সহায়তায় মানুষ

সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতালাভের সুযোগ পেয়েছে। জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের জন্য আমাকে যদি গ্রামের লোকের উপর নির্ভরশীল হতে হয়, তা হ'লে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাকে ওই গ্রামের লোকের মন জুগিয়ে চলতে হবে। যতক্ষণ বিবেকানুমোদিতভাবে আমি তা করতে পারব, ততক্ষণ বিরোধ বাধবে না, কিন্তু, গ্রামের লোকের বিবেকের সঙ্গে আমার বিবেকের যদি সংঘর্ষ ঘটে, তা হ'লেই আমার বিপদ। ধোপা, নাপিত, তাঁতী, চাষী সকলেই যদি আমাকে বয়কট করে, তা হ'লে আমাকে হয় আত্মবলিদান, না হয় বিবেক-বলিদান করতে হবে। এ রকম সামাজিক নির্যাতনের চাপে যে বহু আদর্শবাদী মহাপুরুষ বিপন্ন হতেন, ইতিহাস খুঁজলেই তার নজির পাওয়া যাবে। আদর্শবাদী মহাপুরুষরা এখনও অবশ্য বিপন্ন হন, কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার সহায়তায় আত্মরক্ষা করবার অনেক সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা আজকাল। ধোপা-নাপিত, হুঁকো বন্ধ ক'রে কাউকে জব্দ করবার উপায় আর নেই। কোনও গ্রামে কারও জীবন দুর্বহ হয়ে উঠলে, সহজে অন্যত্র চলে যাবার সুযোগও পাওয়া যায় আজ-কাল, যন্ত্রসভ্যতার প্রসাদে। যে নির্বিঘ্ন, একক সত্তা, প্রত্যেক সভ্য, স্বাধীন মানুষের কাম্য, যন্ত্রসভ্যতার সাহায্যেই তা সহজে লাভ করার আশা আমরা করতে পারি আজকাল। দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতেই আগেকার লোকের অনেক শক্তি ব্যয়িত হত। সমাজের তাড়নায় ভালো লোকেরা অনেক সময় বনে পালাতেন। আজকাল বনে পালাবার দরকার নেই, শহরে চলে গেলেই হ'ল। বড় শহরে শুধু যে ধনীরাই কেবল থাকতে পারেন, তা মনে করবার কোনও হেতু নেই, গরীবদেরও যথেষ্ট স্থান আছে সেখানে। যাঁরা সন্ন্যাসীপ্রকৃতির, শহরেই তাঁরা একক হবার বেশী সুবিধা পাবেন। অপরিচিত জনতা প্রায় নির্জনতারই সমতুল্য। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে পড়ল। আজকাল একটা ধুয়ো উঠছে—গ্রামে ফিরে যাও। কিন্তু, কেউ ফিরছে না। গ্রামের নানারকম সুখসুবিধা দেখিয়ে অনেক কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতা তোমরা করছ, তবু কেউ যাচ্ছে না। এর কারণ কি? চমৎকার জুতোজোড়া তবু পায়ে দিচ্ছে না কেন কেউ? এর সহজ উত্তর. পায়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলেই কেউ দিচ্ছে না। আঁট হচ্ছে কিম্বা ফস্ ফস্ করছে। গ্রামে নানাবিধ অসুবিধা আছে বলেই লোকে গ্রামত্যাগ করছে। সে সব অসুবিধা দূর হলে লোকে আপনিই সেখানে ফিরে যাবে। গ্রামে স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, কাজ ক'রে টাকা রোজগার করবার সুযোগ নেই, গুণীর আদর নেই। আছে পচা পুকুর, ঘেঁটুবন আর দলাদলি। খুব বড়লোকদের পক্ষেই গ্রামে বাস করা সম্ভব টাকার জোরে। গরীব বা মধ্যবিত্তের পক্ষে গ্রামে বাস করা অসম্ভব। এই দুই সম্প্রদায়কেই উপার্জনের জন্য শহরে ছুটতে হবে। গ্রামের উন্নতি হলে অর্থাৎ গ্রাম শহরে পরিণত হলে তাঁরা গ্রামে ফিরতে পারেন। অস্যার্থ, গ্রামেও যন্ত্রসভ্যতার পত্তন করতে হবে। যে যন্ত্রসভ্যতা বনবাসী মানুষকে গ্রামবাসী করেছিল, সেই যন্ত্রসভ্যতাই গ্রামবাসীকে আজকাল শহরবাসী করেছে, এ সত্যটা মনে রাখতে হবে। শহরকে এবং

যন্ত্রসভ্যতাকে গালাগালি দিলে অনেকে হয়তো বাহবা বাহবা করবে খুব (কারণ ভণ্ডামিটা অনেকের মজ্জাগত স্বভাব) কিন্তু কার্যকালে তারা সবাই শহরে গিয়ে মোটরে চড়ে বেড়াবে, যদি সুযোগ পায়। সুতরাং আত্মহারা না হয়ে মূল কথাটা মনে রেখ— আসল সমস্যা, যন্ত্র নয়, আসল সমস্যা, মানুষের মন। সমাজ সংস্কার করতে হলে এই মনেরই সংস্কার করতে হবে এবং তাই আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা নিহিত আছে আমাদের ভবিষ্যৎ বিদ্যায়তনগুলিতে। যে সংস্কৃত মন অ্যাটম বম এবং এরোপ্লেনকে সার্থকভাবে কল্যাণকর্মে নিযুক্ত করতে পারবে, সেই মনই হবে ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার বাহক এবং ধারক।

ধর্ম

ধর্ম সম্বন্ধে তুমি যে আলোচনাটা করেছ, তাতে চিন্তার খোরাক আছে। তুমি একাধিক ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে দেখিয়েছ যে, ধর্মের নামে হেন দুষ্কার্য নেই যা মানুষ করেনি। ক্রুসেড, ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্টদের রক্তারক্তি, কারবালা, হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ সবই ধর্মের নামে হয়েছে। অর্থগৃধ্নু খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের অখৃষ্ট-জনোচিত আচরণ, বৌদ্ধ জাপানের যুদ্ধলিপ্সা, পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি, হিন্দুধর্মের অসংখ্য কুসংস্কার ও অমানুষিক বর্বরপ্রথার উল্লেখ ক'রে তুমি অবশেষে স্থির করেছ যে, ধর্ম আমাদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। 'সত্যের ভানে ধর্ম অসত্যকে আশ্রয় ক'রে আছে'— এই বাক্যটি লিখে কিন্তু তুমি ধর্মের স্বপক্ষে খানিকটা ওকালতিও ক'রে ফেলেছ।

এ সম্বন্ধে প্রথমেই এই স্পষ্ট ধারণাটা করা প্রয়োজন যে, ব্যাকরণ অনুসারে আমরা সকলেই ধার্মিক। মন যাকে বা মনকে যে ধারণ বা অবলম্বন ক'রে থাকে, তাই ধর্ম। অবলম্বনহীন মন কল্পনা করা শক্ত। সকলেই একটা-না-একটা-কিছু অবলম্বন ক'রে আছে, সুতরাং সে হিসেবে সকলেই আমরা ধার্মিক। কেউ টাকা, কেউ ভগবান, কেউ শিল্প, কেউ রাজনীতি, কেউ নাস্তিকতা প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে আমরা প্রত্যেকেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি এবং তা নির্বিঘ্নে। অসঙ্কোচে হয়তো ক'রে যেতে পারতাম, যদি না আমরা সমাজবাসী জীব হতাম। সামাজিক জীব হওয়ার ফলে আমাদের সমাজ-ধর্মও মানতে হচ্ছে। সমাজধর্ম যদি আমার নিজের ধর্মের অনুরূপ হয়, তা হ'লে কোনও গোল থাকে না। কিন্তু সমাজ-ধর্ম যদি আমার ধর্মের বিরোধী হয়, তা হ'লে আমাকে হয় ভণ্ডামি, না হয় দুঃখবরণ করতে হবে। যদি প্রশ্ন কর, এই সমাজ-ধর্ম কি? তা হ'লেও সেই একই উত্তর—যে নীতি অবলম্বন ক'রে সমাজ টিকে থাকে, তাই সমাজ-ধর্ম। স্থূলভাবে বলতে গেলে, তা জৈবিক ধর্ম। খাদ্য-লিপ্সা, শারীরিক ক্রমোন্নতি, বংশবৃদ্ধি, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতনতা প্রভৃতি যে সব ধর্ম জীবকে জড় থেকে পৃথক করেছে,

প্রত্যেক সমাজেরই উদ্দেশ্য, সমাজের অধিকসংখ্যক লোককে সেই সব জৈবিক ধর্মগুলি অদ্রোহে সমবেতভাবে পালন করবার সুযোগ দেওয়া। সমাজ ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সম্বন্ধে উদাসীন। একটিমাত্র পত্নী বা পতিতে যদি কারও আপত্তি থাকে, বর্তমান সমাজে সে আপত্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। একাধিক পতি, পত্নী বা যৌথবিবাহে আপত্তি ছিল যাদের, তাদেরও চুপ ক'রে থাকতে হয়েছিল অতীত সমাজে। যে প্রয়োজনের চাপে আজকাল মেয়েরা গৃহলক্ষ্মী না হয়ে আপিস-লক্ষ্মী, থানা-লক্ষ্মী বা সিনেমা-লক্ষ্মী হচ্ছেন, সেই প্রয়োজনের চাপেই তাঁরা দেবদাসী হয়েছিলেন বা হচ্ছেন। যে সামাজিক প্রয়োজনের চাপে আমেরিকা তার বাড়তি গম পুড়িয়ে ফেলছে, নিগ্রোদের লিন্‌চ্ করছে, সেই সামাজিক প্রয়োজনের চাপেই ইংলণ্ড একদা ডাইনি পুড়িয়েছিল, আরবরা জীবন্ত মেয়েদের কবর দিয়েছিল। সেই একই সামাজিক প্রয়োজন এদেশের লোক-কেও প্ররোচিত করেছিল সতীদাহে। আত্মরক্ষার জন্য হেন নিষ্ঠুর কাজ নেই যা সমাজ করেনি বা করতে পারে না। যীশু বা গান্ধিকে হত্যা করতেও ইতস্তত: করে না সে। যে সব নিষ্ঠুর ঘটনার তালিকা তুমি দিয়েছ, তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জৈবিক ধর্মের প্রেরণায়, ওর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। আধ্যাত্মিকতাটা মুখোস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে অনেক জায়গায়। আধ্যাত্মিকতাটা মুখোসরূপেই বা ব্যবহৃত হল কেন? তার কারণ আছে। প্রত্যেক মানুষেরই মনে অত্যাশ্চর্যের সম্বন্ধে মোহ আছে একটা। যখনই তারা ষড়-রিপু-বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ মহামানবের আবির্ভাব দেখে, তখন তাকে ঘিরে মেতে ওঠে সবাই। তার বাণীকে জীবনে মূর্ত করবার জন্যে সকলেই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। চিরাচরিত যুগধর্ম মোড় ফেরে হঠাৎ যেন। ভোগী পশু ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়াটাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করে। হিংসার পরিবর্তে প্রেম, আসক্তির পরিবর্তে নিরাসক্তি এই সব অজৈবিক অদ্ভুত মন্ত্রই সে তখন জপ করে কিছুদিনের জন্য। ওই মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করাটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ায় ক্রমশ:। কারণ, ইচ্ছে করলেই তো সাধারণ মানুষ সত্যি-সত্যি মহামানবে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু, মহামানব হওয়াটা যখন ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ায়, সমাজে যখন তার একটা বিশিষ্ট মূল্য হয়, তখনই নকল মহামানবে সমাজ ভরে ওঠে। ওঁদের নামে দল গঠিত হয় এবং সেই দল সেই মহামানবের নামটিকে মূলধন করে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে বেড়ায়। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, গান্ধী, লেনিন প্রভৃতি মহাপুরুষদের এই দুর্দশাই হয়েছে মানব-সমাজে। মানুষ যতদিন সঙ্কীর্ণমনা পশু থাকবে, ততদিন হবেও। এঁদের প্রত্যেকের নাম নিয়ে যে 'ন্যাশনালিজম্' আমরা আজকাল আস্ফালন করে বেড়াই, তাও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতারই আধুনিক রূপ। এর জন্যে মহামানবরা দায়ী নন, দায়ী আমাদেরই জৈবিক ধর্ম, যার উর্ধ্বে আমরা অনেকেই উঠতে পারিনি এখনও। ধর্মের যে সংজ্ঞা ব্যাকরণসম্মত, সে সংজ্ঞা অনুসারে আমরা অধিকাংশই জীব-ধর্মী। কিন্তু উচ্চতর আর একটা ধর্ম যে

আছে, তার আভাসও আমরা পাই মাঝে মাঝে। প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন সময়ে এমন একটা ক্ষুধা অনুভব করে, যা জীব-ধর্ম মেটাতে পারে না। সেই ক্ষুধাই মানুষকে যোগী করেছে, কবি করেছে, দার্শনিক করেছে, বিজ্ঞানী করেছে। সেই ক্ষুধার জন্য যে সুধা চাই, তা বস্তুর বাজারে মেলে না। সেই সুধার সন্ধানই ধর্ম এবং তা সন্ধানের পথও অসংখ্য। সেই সুধালাভ করবার জন্যেই সুরাসুরে দ্বন্দ্ব চলেছে অনাদিকাল থেকে, সমুদ্রমন্থন চলছে অহোরাত্র। এই অমৃতের স্বপ্ন তোমাকে মাঝে মাঝে উতলা করে বলেই তোমার মনে প্রশ্ন জাগছে—এই সব তথাকথিত ধর্ম কি তবে আমাদের আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? প্রকৃত ধর্মবোধ আছে বলেই নকল-ধর্ম দেখে তোমার মনে সন্দেহ জাগছে। ওই সন্দেহই ক্রমশঃ আলো হয়ে পথ দেখাবে তোমাকে। ক্রমশঃই বুঝতে পারবে, মানুষের মনের একমাত্র চিরস্থায়ী অবলম্বন যে ধর্ম, তা তথাকথিত লোকাচার বা দেশাচার নয়, তা কোনও সঙ্কীর্ণ ইজ্‌ম্‌ও নয়, তা সত্য, শিব এবং সুন্দরের অপূর্ব সমন্বয়। দল বেঁধে সে ধর্ম লাভ করা শক্ত। নির্জনে তার সাধনা, নির্জনে তার সিদ্ধি।

আর্ট

আমার মনে হয়, আর্ট-এর সঙ্গে ইংরেজি 'আর্টিফিসিয়্যাল' কথাটির নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। মানব-মনীষার শিল্প-সৃষ্টি কৃত্রিম, এই কৃত্রিমতাই ওকে অনন্য করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর্ট নয়, এমন কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হুবহু নকলও বড় আর্ট নয়। প্রথম শ্রেণীর ফটোগ্রাফারের অনেক উর্ধ্বে। সিনেমা-জগতেও বাস্তবের ছবির চেয়ে ওয়ালট্ ডিস্‌নের অবাস্তব ছবি রসিক-চিত্তকে বেশী বিস্মিত করে। বাস্তবে যা ঘটে, তার হুবহু বর্ণনা ক'রে কেউ যদি পারদর্শিতা দেখাতে পারেন, তাঁকে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক বা পরিদর্শক বলতে পারি, কিন্তু, প্রথম শ্রেণীর শিল্প-স্রষ্টা তাঁকে তখনই বলব, যখন তিনি প্রথম শ্রেণীর 'সৃষ্টি' করতে পারবেন। তুমি হয়তো প্রশ্ন করবে, 'সৃষ্টি' বলতে কি বোঝায়? 'সৃষ্টি'র প্রথম লক্ষণ অনন্যতা। যার জোড়া পৃথিবীতে কোথাও নেই, যা থাকে কেবল স্রষ্টার মানসলোকে, তা যখন প্রকাশিত হয়, তখনই তাকে সৃষ্টি বলব। প্রকৃতির সৃষ্টিতেও এই। প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টি অনন্য। জবাফুলের জোড়া কোথাও নেই, গোলাপফুলের জোড়াও নেই। খঞ্জন যেমন অনন্য, ধনেশ বা শকুনিও তেমনি। অথচ প্রত্যেকেই উপাদান সংগ্রহ করছে একই মাটি থেকে। এই উপমাটা যদি প্রণিধান কর, তা হলেই বুঝতে পারবে, এই মানব-সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খাকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন প্রতিভা বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে কি করে মানব-সভ্যতাকে অলঙ্কৃত করেছে। প্রকৃতির সৃষ্টি স্বাভাবিক, কিন্তু প্রতিভার সৃষ্টি কৃত্রিম। পিরামিড, তাজমহল, মোনালিসা, আলমগীর,

রামায়ণ, আরব্য-উপন্যাস প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে দেশলাই-বাক্সর উপরে নক্সা, সাবান বা সিগারেটের ছবি পর্যন্ত সর্বত্রই এর উদাহরণ। অকৃত্রিম প্রকৃতির সৃষ্টি যেমন আমাদের অভিভূত করে, তা যেমন আমাদের পক্ষে অপরিহার্য, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা তার উপর যেমন নির্ভরশীল, প্রতিভার কৃত্রিম সৃষ্টিও তেমনি আমাদের অভিভূত করে, মানবসমাজের পক্ষে তাও কম অপরিহার্য নয়। কৃত্রিম বলেই তা যে হেয়, তা নয়, কৃত্রিমতাই ওর একটা লক্ষণ। কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির বেলায় আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলব। শিল্প-সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ হওয়া চাই। তুমি যদি প্রশ্ন কর রস কি, তা হলেই কিন্তু উত্তর দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। তোমার যদি সূক্ষ্ম রসবোধ থাকে, তা হলে এ প্রশ্ন তুমি করবেই না, আর যদি না থাকে, তাহলে তোমাকে বোঝান শক্ত হবে। যার শ্রবণ-শক্তি নেই, তাকে যেমন শব্দ কি কথা বলে বোঝান যায় না, তেমনি বেরসিককে রস কি, বোঝান অসম্ভব। সূক্ষ্ম রস-বোধটা একটা বিশেষ বোধশক্তি, সকলের ও জিনিসটা থাকে না, যাদের থাকে না, দুঃখের বিষয়, তাদের সংখ্যাই বেশী পৃথিবীতে এবং বেশী বলেই 'আর্ট' জিনিসটা ধান-চালের মতো জনপ্রিয় নয়। জনপ্রিয় না হয়েও যে আর্ট বেঁচে আছে, তার কারণ সূক্ষ্ম রস-বোধ না থাকলেও একটা স্থূল রস-বোধ সম্ভবতঃ প্রত্যেক মানুষেরই আছে, ওটা বোধ হয় মনুষ্যত্বেরই একটা লক্ষণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য মানুষও আর্টের চর্চা করত। এই স্থূল রস-বোধ আছে বলেই মানব-সমাজে স্থূল আর্টের একটা চাহিদা আছে এবং মানুষ সহস্ররকম কাজে লাগিয়েছে তাকে। মুশকিল হয়েছে সূক্ষ্ম রসের ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম রসের রসিক কম। পদ্মবন-বিদলনকারী মত্ত-মাতঙ্গদের বাধা দেবার শক্তিও এঁদের নেই। সেইজন্য উঁচুদরের শিল্পীরা অনেক সময় সম্যক আদৃত হন না মানবসমাজে।

প্রকৃত রসিকরাই শিল্প-সৃষ্টির প্রকৃত সমালোচক হতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়েও একটা গোলযোগ আছে। প্রকৃত রসিকরা যে মানুষ হিসাবে খাঁটি লোক হবেন, এমন কোনও কথা নেই। মনে করুন, 'ক' একজন প্রকৃত রসিক এবং 'খ' একজন প্রকৃত শিল্পী ; কিন্তু যদি তাঁরা সমসাময়িক হন এবং 'ক'য়ের সঙ্গে 'খ'য়ের যদি কোনও কারণে মনোমালিন্য থাকে, তা হ'লে 'খ'য়ের শিল্পবিষয়ে 'ক'য়ের অভিমত নিরপেক্ষ শিল্প-সমালোচনা হবে না, যদি না 'ক' খাঁটি মানুষ হন। সেইজন্যে অনেক সময় সমসাময়িক শিল্পীদের সম্বন্ধে প্রকৃত রসিকেরও মতামত মূল্যবান নয়। স্বার্থ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা-প্রীতি, মুখরোচক-নিন্দা-ফেরি ক'রে অর্থোপার্জনপ্রবৃত্তি প্রকৃত রসিককেও বিভ্রান্ত করতে পারে। সুতরাং, সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে সমসাময়িক সমালোচকদের অভিমত সব সময়ে নির্ভুল নয়। প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধেও নয়। কারণ, প্রকৃত রসিক হলেও যিনি অমানুষ, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যিনি দিনকে রাত বলতে ইতস্তত: করেন না, কোন কিছুর সম্বন্ধেই তাঁর অভিমত নির্ভরযোগ্য নয়।

সুতরাং, সমালোচনার ক্ষেত্রে শুধু রসবোধ থাকলেই চলে না, সাধুতাও থাকা চাই।

অসাধু রসিকরাও ভালো সমালোচনা করেছেন, এমন নিদর্শন খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু, তা পেলেও অসাধু ব্যক্তির সমালোচনা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়।

অসাধু চরিত্রের শিল্পী অনেক সময় প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি করেছেন, এ রকম দৃষ্টান্ত কিন্তু বিরল নয়। সৃষ্টি-রহস্যটা সত্যিই এখনও রহস্য। আমার মনে হয়, শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণায় স্রষ্টা যখন উদ্বুদ্ধ হন, তখন তিনি এমন একটা জগতে গিয়ে উত্তীর্ণ হন, যা সামাজিক পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দর অনেক উর্ধ্বে, যে লোকে তিনি নিজের বিশিষ্ট প্রতিভার আলোকে নিজের কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করেন, যে লোকের নাম আনন্দ-লোক, সত্য-লোক। সেখানে মিথ্যাবাদী শিল্পীও সত্যের সম্মুখীন হন অদ্ভুত উপায়ে। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে সেটা রসিকের চেতনায় প্রতিফলিতও করতে পারেন।

শিল্প এবং শিল্প-রসিক সম্বন্ধে আমার যেটুকু ধারণা, তা সংক্ষেপে বললাম, কিন্তু তুমি আর একটা যে সমস্যার সমাধান চেয়েছ, তা দিতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ বা রম্যা-রলাঁর বইয়ের পাশে, ঠিক একই ধরণের পোষাক পরে যে বইটি পুস্তক-বিক্রেতার তাকে শোভা পাচ্ছে, সেটি তৃতীয় শ্রেণীর রাবিশ, না প্রথম শ্রেণীর অবজ্ঞাত কোহিনূর, তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন কাজ। হংসের মধ্যে বককে চেনা যায়, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলে এবং মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে যে সব পুস্তক-বক জ্যাকেট-মুখোস পরে হংসমধ্যে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের স্বরূপ এক নজরে চেনা শক্ত। এ ক্ষেত্রে ঠেকে শিখতে হয়, দেখে শেখবার উপায় নেই। যাঁরা ঠেকে শিখেছেন, এ রকম রসিক অনেক আছেন। তাঁরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অকপটে কোথাও তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন, তা হলে এর একটা সুরাহা হলেও হতে পারে। আমাদের দেশের লাইব্রেরীগুলিও ইচ্ছা করলে ছাকনির কাজ করতে পারেন। পেশাদারী সমালোচকদের নিন্দা-প্রশংসায় আর আস্থা নেই—তা কখনও দায়-সারা, কখনও মন-রাখা, কখনও নিজেকে জাহির করা, কখনও ব্যবসাদারী, কখনও মিথ্যা-ভাষণ, কখনও নিবুর্দ্ধিতা, বা আরও অনেক কিছু, কিন্তু প্রকৃত সৎ সমালোচনা নয়। মহা মুশকিল সত্যি।

স্বাধীনতার পর

আপনি যে কথা লিখেছেন, তা তো ঠিকই। স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে হিন্দু বাঙালীরাই সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে। আরও হবেন হয়তো। কিন্তু, এর মূল কারণটা আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। বর্তমান গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিলে আমাদের দুঃখ ঘোচবার কোনও আশা নেই। আমাদের দুঃখের মূলটা কোথায়, তা আবিষ্কার করে যদি প্রতিকারের চেষ্টা করি, তা হলে হয়তো সুফল ফলতে পারে।

ইংরেজ এদেশে যখন এসেছিল, তখন আমরা, মানে হিন্দু বাঙালীরাই, তাদের অভ্যর্থনা করেছিলাম। তাদের সংস্পর্শে এসে, তাদের ভাবে প্রভাবিত হয়ে, আমরা তাদের রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করেছিলাম সোৎসাহে। ইংরেজরাও আমাদের মতো বুদ্ধিমান জাতকে নিজেদের দলে পেয়ে তাঁদের শাসনযন্ত্রের নানা বিভাগে আমাদের বসিয়েছিলেন। সে যুগের হিন্দু বাঙালীর বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল ইংরেজেরই অনুগ্রহে। হিন্দু বাঙালীরাই সে যুগে মুৎসুদ্দি, কেরানী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাব্রতী, মাস্টার, ডাক্তার, উকীল, হাকিম—সব। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী তখন হিন্দু বাঙালীরই হাতে। ভারতবর্ষে ইংরেজ যখন যেখানে গেছে, হিন্দু বাঙালীকে নিয়ে গেছে। হিন্দু বাঙালীর আধিভৌতিক উন্নতির মূলে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা, এই ইংরেজি রাজনীতি। কিন্তু এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলেই আর এক কাণ্ড ঘটেছিল। ইংরেজি শিক্ষার আলোকে কতকগুলি হিন্দু বাঙালীই আত্ম-আবিষ্কার করেছিলেন সেদিন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ইংরেজ রাজত্বের মহিমা-ছত্রের তলে তাঁদের যত সুখ-সুবিধাই থাকুক না কেন, তাঁরা আসলে পরাধীন। স্বর্ণ-পিঞ্জরে বন্দী বিহঙ্গের সুখের মতোই তাঁদের সে সুখ অলীক। প্রকৃত সুখের ভিত্তি স্বাধীনতা। একার স্বাধীনতা নয়, সকলের স্বাধীনতা। কেবল হিন্দু বাঙালীর স্বাধীনতা নয়, নিখিল ভারতের স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা যা করেছিলেন, তাই আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস। বলা বাহুল্য, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয়। এখনও যেমন অধিকাংশ লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করাটাই পরমার্থ মনে করেন, কোনরকম হাঙ্গামা, হুজ্জৎ, গোলমাল, আন্দোলন, যুদ্ধ, বিদ্রোহ পছন্দ করেন না, তখনও তেমনি ছিল। ছেলেরা বোমার দলে যোগ দিক, এ কেউ চাইত না। কিন্তু, না চাইলেও ছেলেরা বোমার দলে যোগ দিয়েছিল, বরণ করেছিল জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, নির্যাতন। স্বাধীনতাকামী মুষ্টিমেয় হিন্দু বাঙালীর আদর্শ মাতিয়ে তুলেছিল সেদিনের নবযৌবনকে। ইংরেজদেরও টনক নড়ল। তাঁরা দেখলেন, তাঁদেরই শিল, তাঁদেরই নোড়া নিয়ে আমরা তাঁদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙতে উদ্যত হয়েছি। এ কি সহ্য করা যায় ? আইনের পর আইন, অত্যাচারের পর অত্যাচার করে তাঁরা আমাদের প্রতিরোধ করবার যে চেষ্টা করেছিলেন, তার কাহিনী আজ সুবিদিত! তার পর থেকেই শোনা যেতে লাগল, বঙ্গ-ভঙ্গের কথা, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার কথা, কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের কথা। তখন থেকেই তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে, প্রদেশে যে সব বৃক্ষের বীজ বপন করে গেছেন, তা যে বিষবৃক্ষ, তার প্রমাণ আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। হিন্দু বাঙালীর বিরুদ্ধে, মুসলমানকে, বিহারীকে, আসামীকে, বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার মন্ত্র ইংরেজই সৃষ্টি করেছেন প্রতিশোধ-কামনায়। আদর্শবাদী হিন্দু বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চান তাঁরা—কারণ, এই হিন্দু বাঙালীই প্রথমে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিল স্বাধীনতালাভ করবার জন্য।

এ কথা ভুললে চলবে না যে, সে যুদ্ধ এখনও চলছে, আমরা যে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ঐহিক সুখ, শান্তি বিসর্জন দিয়ে বহু লাঞ্ছনা, বহু বিপদ বরণ করে বহু অমূল্য জীবন আহুতি দিয়ে এগিয়ে চলেছি, সে স্বাধীনতা এখনও আমরা পাইনি। লক্ষ্যে পৌঁছইনি এখনও আমরা। যে কষ্ট, যে লাঞ্ছনা আমরা ভোগ করছি, তা পথের কষ্ট, যে মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে, তা আদর্শ নিষ্ঠার মূল্য। এতে হতাশ হলে চলবে না। আমাদের লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে, হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে চাই আমরা, পথের দুঃখে নেতিয়ে পড়লে চলবে কেন? ইংরেজ চলে যাবার আগে যে সব ফাঁদ পেতে গেছে, তাতে জড়িয়ে পড়ে যদি আমরা গগনভেদী আর্তনাদ করে নিজেদেরই গালাগালি দিতে থাকি, তা হলে সেটা কি খুব শোভন হবে? অথচ আমরা তাই করছি। দুঃখের আসল কারণ সেইটেই। ইংরেজদের চালে মাৎ হয়ে আমরা সঙ্কটজয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছি। এ অবস্থায় সাধারণ লোকের পক্ষে কান্নাই হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু জগতের কাছে আমরা অসাধারণতার দাবী করেছি, আমাদের কবি সেদিনও গেয়ে গেছেন—বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়, সুতরাং, আমাদের আচরণও অসাধারণ হওয়া চাই, তা না হলে আমরা খেলো হয়ে যাব, যাচ্ছিও বোধ হয়।

দাদামশাই

দাদামশাই সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছ। কি লিখি, তাই ভাবছি। ভাবছি, সত্যই কি তাঁকে জেনেছিলাম? কাউকে জানা এত শক্ত! তবু মনে হয়, আভাসে হয়তো চিনেছিলাম মানুষটিকে। আর একটা কথা ভেবেও আশ্চর্য লাগছে। মনে হচ্ছে, তিনি এখনও আছেন। পূর্ণিয়ায় তাঁর সেই দুগ্ধ-শুভ্র বিছানাটিতে বসে এখনও গল্প করছেন আগের মতো। কিন্তু, নিদারুণ সত্যকে মানতে হবে। বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারের দাদামশাই কেদারনাথ মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর সাহিত্য-কীর্তির যে বৈশিষ্ট্য, তার মূল্য নিরূপণ বিদগ্ধজন করেছেন, করবেনও ভবিষ্যতে। মানুষ কেদারনাথের সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, তাই বলছি। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয়, যে কোনও দিন, যে কোনও লোক পেতে পারবেন কিন্তু মানুষ কেদারনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি, তাঁরা সেই নিরহঙ্কার রসিক সাধুচরিত্র পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিটির পরিচয় আর পাবেন না। যাঁরা তাঁর কাছাকাছি থাকতেন, তাঁরাও যে তাঁর বিশিষ্ট রূপটি ধরতে পেরেছিলেন এও আমার মনে হয়না, কারণ দাদামশাই সর্বদাই নিজেকে সংবরণ করে রাখতেন সসঙ্কোচে। আমি তাঁর যতটুকু দেখেছি, যতটুকু বুঝেছি, তা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছি। তাঁর জীবদ্দশায় সাহস পাইনি।

আমি তাঁকে প্রথম দেখি মনিহারিতে। আমারও বাড়ি মনিহারি। দাদামশাই

তখন দিদিমাকে নিয়ে চেঞ্জে গিয়েছিলেন। আমার ভাই টুলু তখন মনিহারি হাসপাতালের ডাক্তার। তারই কোয়ার্টার্সে দাদামশাই থাকতেন, টুলুর সেখানে থাকবার দরকার ছিল না, কারণ সে বাড়িতেই থাকত। ভাগলপুর থেকে আমি গেলাম দাদামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সকালে পৌছলাম। দাদামশাইয়ের বাসায় যেতেই একটা চাকর আমাকে বললে যে, দাদামশাই পূজো করছেন। ঘণ্টা দুই পরে দেখা হবে। আমি চাকরটাকে বললাম—বেশ, দু'ঘণ্টা পরেই আসব, তুমি তাঁকে বলে দিও যে, বলাই ভাগলপুর থেকে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাচ্ছি, হঠাৎ পাশের জানালাটা খুলে গেল। দেখি, দাদামশাই স্বয়ং।

"বলাই না কি, এস ভাই, এস।"

আমি তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে গিয়ে প্রণাম করলাম।

"আপনার পূজোয় বাধা দিলাম না কি ?"

"আরে না, না, আমার আবার পূজো কি! বাজে লোকে এসে বিরক্ত করে বলে পূজোর নাম করে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকি!"

দিদিমাও এলেন। গল্প শুরু হয়ে গেল। তারপর দিদিমা চা তৈরি করে খাওয়ালেন। চমৎকার চা তৈরি করতেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যে ওঁদের আপনজন হয়ে গেলাম আমি। দাদামশায়ের আর একটি বিশেষত্বও লক্ষ্য করলাম সেই সময়ে। তাঁর পরিচ্ছন্নতা। তাঁর বিছানা ধপ ধপ করছে, টেবিলে চিঠিপত্র, কলম, লেখবার সরঞ্জাম, সিগারেটের বাক্স, দেশলাই নিখুঁতভাবে সাজানো, কোথাও কিছু এলোমেলো নেই। তাঁর পায়ের তলাটি ছোটছেলের পায়ের তলার মতো টুকটুক করছে।

সেদিন দাদামশাই যখন বলেছিলেন—'আমার আবার পূজো কি' তখন কথাটা তলিয়ে বুঝিনি। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি হয়তো পূজোই করছিলেন সে সময়, কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রকাশ করতে চাননি। জীবনের সাধনাকে বা গভীর আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করলেই যে সেটা খেলো হয়ে যায়, এঁটো হয়ে যায়, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এর প্রমাণও একটা পেয়েছি। বিবেকানন্দের জীবনচরিত নিয়ে একটি নাটক লেখবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল এবং সে সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যে কয়েকজনকে আমি পত্রও লিখেছিলাম। দাদামশাইকেও লিখেছিলাম। দাদামশাই উপকরণ কিছু পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও দিয়েছিলেন—"ভায়া, সঙ্কল্পের কথা বেশী লোককে বলে বেড়িও না আগে থাকতে। বলে ফেললে ফিকে হয়ে যাবে। কাজ করবার উৎসাহ চলে যাবে। মন্ত্রগুপ্তি, সাধনার পথে একটা মস্ত জিনিস।"

বিবেকানন্দের জীবনচরিত অবলম্বন করে নাটক লেখবার উৎসাহ সত্যিই আমার চলে গিয়েছিল। আবার তা ফিরে আসবে কি না জানি না।

দাদামশাই সত্যিই খুব উঁচুদরের সার্থক ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। একবার তাঁর জন্মতিথিতে তাঁকে ভাগলপুরে নিয়ে আসার প্রস্তাব করে এখানকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষদের তরফ থেকে তাঁকে নিমন্ত্রণ করি। উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন, তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি—

পূর্ণিয়া
৭ই জানুয়ারী, ৪৬
রাত্র ঠিক ৮টা

প্রিয় বলাই,

বাজে কথা কওয়াটা একটা বড় রোগের মধ্যে। পত্রের উত্তর দেওয়াটাও আমার ব্রতের মধ্যে। শরৎবাবু বলেছিলেন—"ও কাজটি ছেড়ে দিন, না হয় সাহিত্যসেবা ছেড়ে দিন। সাহিত্যিকের ওটি পরম শত্রু।"

আমি অত বড় বিচক্ষণ বন্ধুর কথা রাখতে পারিনি। ১৫ বছর পর সেটার অর্থ বুঝলুম—বহু ক্ষতির পর। অর্থাৎ, আরো তিন চার খানা রাবিস্ বাড়াতে পারতুম—তারা সেটা হবার সময় দেয় নি। এক হিসেবে ভালই করেছে,—উপকার করেছে, বললুম না, কারণ এ বাজারে রাবিসেরও চাহিদা যথেষ্ট দেখছি।

যাক্, পত্রলেখাটা সামর্থহীন হয়ে আপনিই কমেছে! তুমি লিখেছ "অনেক দিন" পত্র পাওনি—তাই লিখলুম। তার ওপর শীতটাও কম অভদ্রতা করছে না। এ গেল লেখাদির কথা। আবার "হাতের" লেখার কথাও আছে। সেটাও শত্রুতা করছে কম নয়। দেখে কেহ বিশ্বাস করে না যে আমি রোগ বা বয়োজীর্ণ, অক্ষম। ওটা যে অভ্যাস-বশে—আমার কেরাণীজীবনের কলঙ্করূপে কাজ করছে, সেটা আর কি করে বোঝাব—এই আমার অবস্থা।

আর নয়, স্বভাবকে সম্মান দেবার জন্যে দুটো বাজে কথা কয়ে নিলুম, স্বস্তিও পেলুম!

এইবার যে কি লিখব, জানি না। বরাবরই লিখে চলেছি একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে:—না ধর্ম, না নীতি, না জ্ঞান, না উপদেশ, কেবলমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকত যদি, কাকেও একটু আনন্দ দিতে পারি; সারাদিন পশুর খাটুনি খেটে দুর্ভর জীবন নিয়ে, শুষ্কমুখে বাসায় ফিরে, দুটি মুড়ি মুখে দেবার পর তার আর স্বরাজের কথা, কি জ্ঞান বা নীতির কথা পড়বার শখ থাকে না, পত্নীর সঙ্গে কথার সাহস পায় না। সে সব পড়বার লোক আছে। আমি সেই অর্ধাশন-ক্লিষ্ট ভায়েদের জন্য বাজে কথা, রহস্যচ্ছলে দুঃখের কথা লেখবার ব্যর্থ প্রয়াস পেতুম মাত্র। তাই আমার জন্মতিথির কোন সার্থকতা বুঝি না, বলাই। শরীর সত্যের দিকে, মানে, যাবার দিকে, ঝুঁকে রয়েছে। এমন সময়, তোমার সত্যিকার সদুদ্দেশ্য আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে। যশের কথা সিদ্ধ সাধুদেরও অরুচিকর নয়। আমি যে কি লিখব, ভেবে পাই না। সেদিন ডায়ারিতে লিখেছি—"না" কথাটি তার জন্মাবধি "কটু", কাকেও তুষ্ট করে না, যিনি বলেন ও যিনি শোনেন, উভয়েই অসুখী হন। সত্য হলেও শিষ্টতাবর্জিত।

বিশেষ, যাকে অভিন্ন, আপন বলে ভাবি তার অনুরোধ! আমার স্বগ্রামের

ছেলেরা ওই অনুরোধটি প্রতি বৎসরই করছে। এবারেও করেছে। বলেছি—"আমার অবস্থায় এত পূর্বে কোন কথা বলা উচিত নয়, পরে লিখব"। কিন্তু যাঁর আশায় বলি, তিনি সাহায্য করছেন না,—মজা দেখছেন। দিনে একপ্রকার মন্দ থাকি না, রাত্রে তাঁকে অনেকটা কাছাকাছি পাই, যেন সঙ্গে নিলেন বলে। সেটা নিত্য নয়—এক একদিন। দিনে অনেকটা সহজ থাকি—ইত্যাদি। যাক…

আরও অনেক কিছু লিখেছিলেন। কিন্তু যতটুকু উদ্ধৃত করলাম, ততটুকুতেই যেন প্রকৃত সাধকের রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। আজকাল যে সর্বনাশা আত্মপ্রচার-কামনা অনেক সাহিত্যিককেও বস্তুতান্ত্রিক ব্যবসায়ীতে পরিণত করেছে, দাদামশাই তার অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করতেন। তা ছাড়া আর একটা জিনিসও তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম। যখন তাঁর কাছে যেতাম, তখন কিছু বলার চেয়ে শোনার জন্যই তিনি যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন। তাঁকে শোনাবার মতো কিই বা বলতে পারতাম, কিন্তু যা বলতাম, তাই অতি আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। পলিটিক্সের চেয়ে সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গই বেশী পছন্দ করতেন দাদামশাই। সাহিত্যিকদের জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, তাদের বাড়ির কথা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা, তাদের আর্থিক সঙ্গতির কথা, তথাকথিত রাজনীতি-চর্চার চেয়ে প্রিয়তর ছিল তাঁর কাছে। অনেক গরীব সাহিত্যিককে গোপনে তিনি অর্থসাহায্যও করতেন, শুনেছি। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণদাদার কাছে (শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) একটা গল্প শুনেছিলাম। হরেকৃষ্ণদাদা বলেছিলেন—"আমার সঙ্গে দাদামশাইয়ের একবার কোলকাতায় দেখা হয়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকান থেকে দাদামশাই তাঁর প্রাপ্য টাকাগুলি নিয়ে আমাকে বললেন, একটা রিক্‌শা ডাক, চল, রিক্‌শায় চড়ে যাই দু'জনে। রিক্‌শা ডাকলাম। কিছুদূর গিয়ে দাদামশাই বললেন - হরেকেষ্ট, এই টাকা থেকে তুমি কিছু নাও। তোমার টানাটানি যাচ্ছে, শুনেছি। যা নেবার, এখান থেকেই নিয়ে নাও, এ টাকা বাক্সয় ঢুকলে, সব খরচ হয়ে যাবে সংসারে। তুমি যা নেবার, এই রাস্তা থেকেই নিয়ে নাও। আমি তো অবাক! আমি যত আপত্তি করি, দাদামশাই তত নাছোড় হয়ে ওঠেন। শেষকালে আমাকে নিতে হল কিছু!" আরও দু'একজনের কাছে এ ধরণের গল্প আমি শুনেছি। 'উত্তরা'র সম্পাদক সুরেশও বোধ হয় জানেন কিছু। দাদামশাই যা কিছু সৎকার্য করতেন, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক, অতি গোপনেই করতেন। আর একটা গল্প মনে পড়ছে। পাটনায় যেবার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী হয়, সেবার দাদামশাই সেখানে গিয়েছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। ফিরবার পথে, দাদামশাই ভাগলপুরে আমার বাসায় নেবেছিলেন। ছিলেনও কয়েকদিন। আমার বড় মেয়ে কেয়ার তখন পুতুলখেলার বয়স। আমরা যেদিন এলাম, তার দু'একদিন পরে, কেয়ার পুতুলের বিয়ে। কেয়ার মেয়ে এবং পাশের বাড়ির আর একটি মেয়ের ছেলে। দাদামশাই এসেই কেয়ার সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছিলেন। অল্প-বয়স্কদের সঙ্গেই তাঁর জমতো বেশী। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরাই বেশী অন্তরঙ্গ ছিল তাঁর। বয়োবৃদ্ধ বা

সমবয়স্কদের তিনি যেন সমীহ ক'রে চলতেন। আমি সকালে উঠেই কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, এসে শুনলাম, দাদামশাইও কোথায় বেরিয়েছেন। একাই হেঁটে বেরিয়েছেন। শুনে, চিন্তিত হলাম একটু। বুড়োমানুষ কোথায় গেলেন একা। খুঁজতে বেরুলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে তাঁকে বাজারে আবিষ্কার করলাম! দেখি একটা মনোহারি দোকানে কি সব কেনা-কাটা করছেন।

"দাদামশাই, আপনি এখানে কি করছেন?"

"কি করি, আসতে হ'ল, কেয়া যে বিপন্ন।"

"কেয়া? কি হয়েছে কেয়ার!"

"তার যে কন্যাদায়! তুমি তো কোনও খবর রাখ না, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কত যে ঝঞ্ঝাট—"

দেখি, দাদামশাই কেয়ার মেয়ের জন্য এসেন্স, সাবান প্রভৃতি বহু উপহার কিনেছেন! এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে তিনি খুব আনন্দিত হতেন। বিচলিতও হতেন কম নয়। ভাগলপুরে থাকতে তিনি একটি মশারি তৈরি করতে দিয়েছিলেন পূর্ণিয়ায় নিয়ে যাবেন বলে। কিন্তু আমাদের যা হয়—পই পই ক'রে বলে দেওয়া সত্ত্বেও দোকানদার ঠিক সময়ে মশারিটি এনে পৌঁছে দিতে পারলে না। মশারি যখন এল, তখন ট্রেন ছেড়ে গেছে। যাই হোক, সাইকেল ক'রে সেটি বরারি স্টীমারঘাটে পৌঁছে দিলাম। তারপর যা ঘটেছে, তা দাদামশায়ের চিঠি থেকেই শুনুন।

Purnea, 5. 1. 38.
11 A.M.

প্রিয় বলাই ভায়া,

একটা অপ্রিয় কথা লিখতে হাত সরছে না, মন তো নয়ই, তবু লিখতে বাধ্য হচ্ছি। বরারি পৌঁছে দেখি, একটি ছোকরা মশারির মোড়ক নিয়ে দাঁড়িয়ে। প্রাণটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। মেয়েটা তয়েরি মশারি পেয়ে ভারি খুশী হবে। আমার চির-অকেজো অপবাদটা ঘুচে যাবে। খবরের কাগজে মোড়া ও টাইট-কোরে বাঁধা বাণ্ডিলটি নিজের হাতে-হাতেই রাখলুম, কারণ তার মধ্যেই আমার যশোভাগ্য অপেক্ষা করছে। গাড়িতেও নিজের পাশে রইল—"ক্ষণিক না অন্তর হোয়ে।" বাড়িতে পৌঁছে "এই নাও" বলে গর্বের উল্লাস অনুভব করলুম। তারা আনন্দে খুলে মাপতে বসলো। তারপরই ৫।৭ স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রবেশের পথ আবিষ্কার কোরে, নাতনী তার মাকে বললে, "সব জেনেশুনে দাদামশাইকে আনতে বলো কেনো!" ইত্যাদি বহু বিশেষণ! রামের রাজ্যাভিষেক শেষ হোলো!

দেখলুম, তার সংস্কার আমাদের সাধ্যাতীত। সত্যই ইচ্ছা হল, পুড়িয়ে কণ্টকমুক্ত হই। সামনে সর্বক্ষণের কলঙ্কের মত না থাকে। মেয়েটা অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল, "থাক" বলে নীরব হোলো। ঐ ছোট্ট "থাক্" বলাতেই আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল।

ভাবলুম—বাবুর (দোকানীর নাম ছিল এখানে) শুভানুধ্যায়ী আমলারা পুরাতন থানটা চালিয়ে মনিবের উপকার করেছে। তারা জানে, দেশান্তরে পাচার করে দিতে পারলে কাপড়টার গতি হবে, তারপর বাড়ির মেয়েরা রিপু করে নেবে, তারা খঞ্চেপোষ বোনে। যাক—ভাবতে পারেন, পথে ইঁদুরে কেটেছে। বাণ্ডিল আমার অভিন্ন সঙ্গী ছিল, রেলে আমি ঘুমাই না, বসেই ছিলাম এবং সে আমার পাশে ছিল। বাড়িতে বাণ্ডিল খোলার দশ মিনিটের মধ্যে বা সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ভাগ্যের আবিষ্কার। আমলাদের প্রভু-প্রীতি ছাড়া আর কোন কৈফিয়ৎই নাই।...বাবু একবার দেখেনও নাই, সময়াভাবে দর্জির মর্জির উপর নির্ভর করে আমার অবস্থা দুর্ভর করেছেন।

নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণটা সামনে রাখতে পারব না বলেই পাঠাচ্ছি। নূতন থান কেটে যদি করে দিতে পারেন দেবেন, এখানে ওটাকে আর না দেখতে হয়। এই আমার প্রার্থনা। বেশী যা পড়বে, bill পেলে পাঠিয়ে দেব! চারটি কোণে যেন আরও আধ হাত করে কাপড় দেওয়া হয়। দৃশ্যকটু, আমার কাজে আসবে না।

এখন, সকলকে ভালবাসা জানাই।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—যদি পাঠান···বাবু যেন স্বয়ং তা দেখে approve করে পাঠান।

[এর নীচে ইংরেজিতে সই।]

আজ সকালে যে পত্র পোস্ট করেছি, তাতে এ সব কথা লেখবার স্থান ছিল না।

বলা বাহুল্য, নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করিয়ে ভাল একটি মশারি তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি যে কত শিশু-প্রকৃতির ছিলেন, তা যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরাই জানেন। কত অল্পে কত খুশী হতেন। পুরানো চিঠির ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে অজস্র প্রমাণ পাচ্ছি তার। একটা পোস্টকার্ড থেকে কিছু উদ্ধৃত করলাম।

পূর্ণিয়া

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫০

কল্যাণীয়

প্রিয় বলাই, আজ আমার ৮২ বর্ষে প্রবেশ। আমি সামর্থ্যহীন, মা আমাকে চরণে রাখুন, গন্তব্যপথ বাধামুক্ত, সহজ ও সরল করে দিন। সকলকে যেন আনন্দে ও শান্তিতে দেখে যেতে পারি। তোমরা সুখী হও, উন্নতি কর, যশস্বী হও।

তোমার প্রীতি-প্রেরিত পেয়ালায় আজ চা খেলুম, আহারের সময় পাঁপড় উপভোগ করলুম। দুটি উপহারই দুর্লভ, Deputy Magistrate বহন করে এনেছেন। এ ভাগ্যের দাবি কেহ করতে পারেন কিনা, জানিনা। জ্যোতিবাবু হালকা হাকিমও নন, খেতাবী হাকিম। ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে আলাপে ভারী আনন্দ পেলুম। ..ইত্যাদি।

বন্ধু জ্যোতিদা (জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়, তখন রায়সাহেব হয়েছিলেন) তখন

ভাগলপুর থেকে বদলী হয়ে পূর্ণিয়া যাচ্ছিলেন। বাজারে তখন ভাল চায়ের কাপ পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই দাদামশায়ের জন্মদিনে বিশেষ করে ওই জিনিসটিই জোগাড় ক'রে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ওই সামান্য জিনিস পেয়ে তাঁর কি আনন্দ দেখুন। অসামান্য মানুষ না হলে এমনটা সম্ভব নয়।

সত্যিই তিনি অসামান্য মানুষ ছিলেন, এবং তাঁকে চিনেছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, আমাদের দিদিমা। এ সম্বন্ধে তাঁর মুখে যা শুনেছিলাম, তা তখন হাস্যোদ্রেক করেছিল বটে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমরাই ভুল করেছিলাম, তিনিই ঠিক চিনেছিলেন। দাদামশাই সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে যে দু'চারজন সন্ধ্যার সময় তাঁর কাছে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তাঁরা চলে যাবার পর আর এক কাপ চা খেয়ে জুৎ ক'রে লিখতে বসতেন প্রায় আটটা, সাড়ে-আটটা নাগাদ। লেখা শেষ ক'রে উঠতে অনেক সময় রাত্রি দশটা, এগারোটা হয়ে যেত। নিজের বিছানাটিতে বসেই লিখতেন তিনি। একদিন এইসময় আমি হঠাৎ গিয়ে দেখি, দিদিমা মাটিতে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছেন। আমাকে দেখে দিদিমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। সবিস্ময়ে বললাম— "দিদিমা, আপনি মেজেতে শুয়ে কেন, এতবড় বিছানা থাকতে!"

"ওকে বুঝিয়ে একটু বল তো ভাই, যতক্ষণ আমি লিখব, ও কিছুতেই বিছানায় উঠবে না।"

"চা ক'রে আনি"—বলে দিদিমা ঈষৎ হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

তার পরদিন দিদিমাকে আড়ালে আমি প্রশ্ন করেছিলাম "আচ্ছা দিদিমা, সত্যি ক'রে বলুন তো, দাদামশাই যখন লেখেন, তখন আপনি বিছানার উপর শোন না কেন"। দিদিমা হেসে বললেন শিবের তপস্যায় কি বিঘ্ন করতে আছে ভাই, তুমিই বল না?"

আমিও হেসে ফেলাতে দিদিমা কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর চুপি চুপি নিম্নকণ্ঠে বললেন, "ও কি মানুষ? ও দেবতা!"

দিদিমার সেই নিম্নকণ্ঠস্বর যেন এখনও শুনতে পাচ্ছি আমি। দিদিমার মৃত্যুর পর দাদামশাই লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু

প্রিয় বলাই, নূতন কিছু ঘটে নি ভাই। এ প্রবাস থেকে নিজের বাড়ি যাবার ওইটাই রাজপথ। তোমার দিদিমা দীর্ঘদিন রোগভোগ কোরে গেলেন। তিনি চলে গেলে তার কারণটা বুঝতে পারলুম। কখনো সংসারের কোন ভার বা চিন্তা বহন করতে আমাকে দেন নি। আনলা থেকে গামছাখানা পেড়ে নিলে রাগ করতেন, বলতেন— 'যখন দেখতে আসব না, তখন যা ইচ্ছে হয় কোরো, থাকতে আমার অধিকারে হাত দিও না।' শেষে বুঝেছিলেন, আমাকে কতটা পঙ্গু ও অসহায় কোরে রেখে যাচ্ছেন। তাই, নিজে দীর্ঘদিন ভুগে একটা উপায় করে গেলেন। ভগবান কৃপা করবার পথ পেলেন,—তাঁকে অবলম্বন কোরে দিনে দিনে আমাদের অজ্ঞাতে ষাট বৎসরের অধিক

বন্ধন এমন কৌশলে শিথিল করে আনলেন যে, শেষে আমাকে তাঁর শাস্তির জন্য প্রার্থনা করিয়ে ছাড়লেন। আমার নালিশ করবার পথ রাখলেন না। কৌশলীর এ রহস্যের লীলা একেবারে Ist class first !

…অনেক পত্র এসেছে, কিন্তু পত্রলেখার সামর্থ্যও যেন খুইয়েছি। গা বয় না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। এবং, এই বিশ্বাসটা যে একটা অমূল্য সম্পদ, তা-ও তিনি জানতেন, তাই এ নিয়ে আস্ফালন করতে সঙ্কুচিত হতেন। তাঁর মধ্যে ধর্মের কোন ভড়ং কখনও দেখি নি। কোনও বিশেষ মতের উগ্রতা ভীতিকর বা বিরক্তিকর করে তোলেনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে। প্রকৃত হিন্দুর মতো সকল ধর্মেরই যে শেষ লক্ষ্য এক, তা তিনি সহজভাবেই মানতেন। মানবতার পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে জন্ম তাঁর, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ওতপ্রোত করে রেখেছিল তাঁর জীবনকে। ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা করতে চাইতেন না। সে আলোচনা করবার সুযোগও আমার হয়নি তেমন। কিন্তু, যখন তাঁর কাছে যেতাম, তখনই একটা অপূর্ব আনন্দে সারা মন ভরে উঠতো, বাগানে ঢুকলে, ফুলের রূপে, গন্ধে মন যেমন ভরে ওঠে। কিছু বলতেন না, তবু মনে হত, যেন অনেক কিছু পেলাম। এটি মহাপুরুষের একটি লক্ষণ শুনেছি। একটি কথা দাদামশাই একবার বলেছিলেন, সেটি না উল্লেখ করে পারছি না।

বলেছিলেন—"দেখ ভায়া, সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। ওই ধর্ম, ওই ভগবান। জীবনে যদি একটা প্রতিজ্ঞা কর যে, মুখ দিয়ে কিছুতেই মিথ্যাকথা বার করব না, আর সে প্রতিজ্ঞা যদি রাখতে পার, তা হলেই বাস, মেরে দিলে। আর কিছু করতে হবে না!" তারপর বললেন—"তারপর তোমার অজ্ঞাতসারে ভুলেও যদি তোমার মুখ দিয়ে মিথ্যাকথা বেরিয়ে পড়ে, তোমার মান রাখবার জন্যে ভগবান তাও সত্য করে দেবেন।"

"তাই না কি! মিথ্যাও সত্য হয়ে যাবে?"

আমার চোখে অবিশ্বাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল বোধ হয়। দাদামশাই বললেন—হ্যাঁ, হয়ে যাবে। নিজের জীবনেই প্রমাণ পেয়েছি যে। যৌবনকালেই মানুষের দুঃসাধ্য কাজ করবার প্রবৃত্তি জাগে, উৎসাহও হয়। একজন সাধুর কাছে ওই কথা শুনে আমারও ছেলেবেলায় একবার ইচ্ছে হয়েছিল যে, মুখ দিয়ে কিছুতেই মিছেকথা বার করব না। তা পালনও করেছিলাম কিছুদিন। পরে অবশ্য আর পারিনি। সেই সময় অর্থাৎ আমার যখন সেই ব্রত চলছিল, তখন একদিন আমরা ক'জন মিলে একজনদের বাড়ির পিছনের পোড়ো মাঠে হাডুডুডু খেলছিলাম। খেলা শেষ হয়ে যাবার পর সবাই বসে গুলতানি করছি, এমন সময় আমাদের মধ্যেই এক ছোকরা একটা কেলে হাঁড়িকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে লাগল। কেলে হাঁড়িটা বাড়ির পিছনে দেওয়ালের কাছে উপুড় করা ছিল।

সেইটেকে তাক করে করে ক্রমাগতই ঢিল ছুড়তে লাগল ছোকরা। নিজের হাতের টিপ পরীক্ষা করছিল, বোধ হয়। আমার আর সহ্য হল না। আমি বললাম—"মিছিমিছি ঢিল ছুড়ছিস কেন, কাউকে লেগে যাবে।"

"ওই কেলে হাঁড়ির ভিতর আবার কে আছে যে লাগবে"···ছোকরা উত্তর দিলে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—কেন যে বেরিয়ে পড়ল তা জানি না— ওর ভিতর কাছিম আছে একটা।" পরমুহূর্তেই ইঁট লেগে ভেঙে গেল হাঁড়িটা এবং আমরা সবাই দেখলাম, সত্যিই তার ভিতর কাছিম রয়েছে একটা। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমি ইয়ার্কি করে যে কথাটা বলে ফেলেছিলাম, তা তিনি সত্য করে দিলেন।

আর একবার, আমাদের পাড়ায় একজনের বাড়িতে জামাই এসেছিলেন। জামাইবাবুর যে ট্রেনে ফেরবার কথা, তার অনেক পূর্বে জামাইবাবু স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন দেখে আমি তাঁকে বললাম—"ট্রেনের যে এখনও অনেক দেরি, আপনি এর মধ্যে চলেছেন কোথা ? আসুন, গল্প করা যাক।"

"আপনি ট্রেনের টাইম ঠিক জানেন ?"

"জানি বই কি"।

"ট্রেনের যে সময় আমি ঠিক বলে জানতাম, তাই বললাম তাঁকে। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে গল্প করলেন খানিকক্ষণ। তারপর তাঁকে তুলে দিয়ে এলাম স্টেশনে। আমি যে সময় বলেছিলাম, ট্রেন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সেই সময় এল। ট্রেন চলে যাবার পর শুনলাম, ট্রেনের টাইম নাকি এগিয়ে গেছে। সেদিন ট্রেনটা নাকি 'লেট' ছিল।"

দাদামশাই যদিও বলেছিলেন—"পরে কিন্তু আর পারিনি"—কিন্তু আমার ধারণা, পরেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন সত্য আশ্রয় করে থাকতে। কথার খিলাপ প্রায়ই করতেন না। একটা চিঠির গোড়ার দিকে দেখছি—

প্রিয় বলাই ভায়া, ৬ই মার্চের পত্রে লিখেছি—"পত্রের জবাব কাল দেব। মিথ্যা-কথা না হয়, তাই লিখতে বসেছি, কিন্তু, যে বিষয়ে লিখবো তা এখনও অনিশ্চিত"···

দাদামশাইয়ের কিন্তু বিশেষত্ব ছিল নিজের এই আধ্যাত্মিক জীবনটাকে গোপন করে রাখা। বাইরে হালকা-রসের আলাপ করতেই ভালবাসতেন, মিশতেন হালকা-বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। চিঠিপত্র যা লিখতেন, তাতে ধর্মকথা নয়, সাহিত্যপ্রসঙ্গ থাকত, আর থাকত রসের প্রসঙ্গ। ব্যক্তিগত অনেক কথা আছে বলে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক চিঠিগুলি থেকে কিছু উদ্ধৃত করলাম না। কিন্তু, তাঁর নাতি সাহিত্যিকদের সঙ্গে যে কি রকম রসিকতা করতেন, ব্যক্তিগত হলেও তার নমুনা একটু উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না। আমি তখন মধুপুরে আমার শ্বশুরালয়ে। দাদামশাই লিখছেন—

"আমাদের সময়ে মধুপুর একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, এখন আর সে খেতাব

না কি নাই, তবু মরা হাতি! × × সকলে ভালই থাকবে। জানিনা, সৈন্তদের ভিড় হয়েছে কি না। গিরিডিতেও বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাস করছেন। দেওঘরের তো কথাই নাই। বাঙালীদের দৌলতে তীর্থস্থানগুলি গুলজার,—অবশ্য ধর্মের খাতিরে নয়, আহার্যের প্রাচুর্য হেতু। পথে ধুলাও কম নয়। লেখার ফাইল সঙ্গে আছে কি? তা হলে ভুল করেছ। ও কাজ ও ক্ষেত্রেও জন্য নয়। ওখানে আহারের ফর্দ, গল্প, আমোদ আর ভ্রমণই ব্যবস্থা। ঠাকুরঘরে স্টোভ জেলে ডিম সিদ্ধ করা চলে না…"

এই ধরণের অনেক চিঠি তাঁর পেয়েছি। সবগুলো যত্ন করে রাখি নি বলে এখন দুঃখ হচ্ছে।

আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। অনেক লোক তাঁর কাছে অনেক সময় যেতেন, কিন্তু তাঁর নাগাল বোধ হয় কম লোকই পেয়েছেন। তিনিও বোধ হয় সকলকেই প্রাণ ভরে পেতে চাইতেন, কিন্তু পেতেন না। আমরা সবাই মিলে শেষবার যখন তাঁকে পূর্ণিয়ায় সম্বর্ধনা করতে যাই, তারপর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

Purnea
24.8.48

কল্যাণীয় ও প্রিয়

বলাই, আমি এখন সত্যই একা। না বন্ধুবান্ধব, না সাথী। পূর্বেও ছিল না,—পছন্দও করতুম না—selected few ছাড়া। সত্য বলতে ভগবানের কৃপায় কেবল তোমাদের পেয়েছিলুম। সেখানে ভেদাভেদ বা আত্ম, পর বলে কখনও কিছু মনেও উদয় হয় নি। সত্যবাবুকে সহোদরের মতো আর তোমাদের প্রিয় বন্ধুর মতোই দেখি। যুবকেরাই চিরদিন আমার বন্ধু, সেখানে আমার বয়সে ও তাদের বয়সে প্রভেদ অনুভব করি না। যাক্…

সবার ওপর ছিল লেখাই আমার বন্ধু (ভালোমন্দ বিচার ছিল না)। আনন্দই ছিল। সেটা নিজে পেতুম, আর তা কাকেও দিতে পারলে তো কথাই ছিল না। সেই আনন্দ পাওয়া ও দেওয়ার মধ্যেই আমার যে সুখ ছিল, সেই আমাকে সাহিত্যসেবক করে রেখেছিল। এর বেশি সাহিত্য-সম্বন্ধে দাবি আমার কিছুই ছিল না।

সেদিন তোমরা আমার সম্বর্ধনাদি যা করে গেলে তার আরাধনা আমার মধ্যে কোনোদিন ছিল না ভাই। কোন্ গুণেই বা থাকবে। আমি তোমাদের (আমার প্রতি) ভালবাসাকে উৎসবরূপে উপভোগ করেছিলুম। এখন মনে হয়, বড়রা লেখাপড়ার জোরে বড় হন নি, ভগবানের কৃপাই প্রধানতঃ তাঁদের বড় করেছিল। থিয়েটারের গিরিশবাবু আমাকে বলেছিলেন, "ব্যস্ত হ'য়ো না, তুমি বড় হবে, সকলে তোমাকে চাইবে, ভালবাসবে, যশস্বী হবে। তোমার লেখার নমুনায় তা রয়েছে। ভূদেববাবুও ওইরূপ কি সব বলেছিলেন, আজ মনে পড়ে। তাঁরা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের মনে হচ্ছে, প্রণাম করি।…"

এ চিঠিটাতে দাদামশায়ের কেমন যেন অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। আমরা যে সম্মান তাঁকে দিয়েছি, তা নিতে যেন তাঁর বাধছে, মনে হচ্ছে, তাঁর যেন ও জিনিস নেবার যোগ্যতা নেই, দাবি নেই। শেষকালে সেটাকে মেনে নিয়েছেন ভগবানের কৃপার দান বলে। যাঁরা ত্যাগী, প্রেমিক তাঁরা কেবল দিতেই চান, তাঁদের নিতে কেমন যেন বাধে। তাঁরা যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, তাঁরাও কিছু পাবার যোগ্য।

দাদামশাই বাংলাদেশকে যে কত ভালবেসেছিলেন, তার অজস্র নিদর্শন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে বর্তমান। আমার কাছে কীটদষ্ট একটি পত্রেও তার সাক্ষ্য রয়েছে দেখছি। এ পত্র পাওয়ার কিছুদিন আগেই আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম। সেই প্রসঙ্গে আনন্দপ্রকাশ করে এক জায়গায় লিখেছেন—"তাঁর কাজকর্ম, উৎসাহ, উদ্যম দেখে অবাক হয়েছি। 'সময়হারা' যারা বলে, তারা আমাদের কি দিচ্ছে ? তারা একটা "রাজপুতানা"ই লিখুক না। আজো তাঁর দান অফুরন্ত। এখন দেখছি, সকল বিষয়েই কথা কইছেন। সেদিন "বিশ্বভারতী সম্মিলনী" সভায় বাংলার বর্তমান রাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে সব পাপ ঢুকেছে, তা নিয়ে দুঃখ করে অনেক কথা বলেছেন। একটি কথা আমাকে ব্যথা দিলে। শেষে বলেছেন—"এমন কি, ভগবানের কাছে জানিয়েছি, যেন বাংলাদেশে আর না জন্মাই !" যে বাংলাদেশের জন্যে তিনি কি চিন্তা না করেছেন ও করছেন, তার উপর এ অভিমান স্বাভাবিক হতে পারে, আমি সেটা ভালবাসারই নামান্তর বলে মানতে বাধ্য হয়েছি। স্বাধীন দেশে জন্মটা সকলেরই কাম্য, কিন্তু দেখেশুনে তাতেও অরুচি আসছে। তিনি কোন্ দেশে জন্মাতে চান, জানতে ইচ্ছা হয়। গত দু' বৎসরে (চিঠিটা ১৯৩৯ ফেব্রুয়ারিতে লেখা) কোনো দেশের পরিচয় পেতে তো আমাদের বাকি নেই। শরীর আর বয় না, তা না হলে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যেতুম। দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।…"

হয়তো স্বর্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং এ নিয়ে ঝগড়াও করেছেন তিনি।

দাদামশাইয়ের সম্বন্ধে কত কথাই যে মনে হচ্ছে, কত কথার টুকরো, কত ছবির টুকরো, তাঁর হাস্যদীপ্ত চোখদুটি যেন দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, যেন বলছেন—"কি ও সব হাবিজাবি লিখে যাচ্ছ, তার চেয়ে একটা কবিতা শোনাও—"

অনেকদিন আগে তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে তাঁকে যে কবিতাটি শুনিয়েছিলাম, সেইটি উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম—

ধরণীর ধূলি-ঘূর্ণা, আকাশের জ্যোতিষ্ক উৎসব
যে দর্শনে সমমূল্য, যে বিচারে সমতুল্য সব ;
মিতবাক্, নম্র, নত, শুদ্ধচিত্ত, আড়ম্বরহীন
আত্মার ঐশ্বর্য যেথা অন্তরের গুহাতলে লীন
নির্বাক মহিমা যেথা ব্যর্থ করে বাক্যের বিক্রম,

নির্বিরোধে জীবনের দীর্ঘপথ করে অতিক্রম
শান্তমুখে যে সাধনা স্মিতহাস্য বিকিরণ করি,
সে সাধনা ভারতের সমস্ত অন্তর মন ভরি
এ উৎসব-সভাতলে তাহারেই আজি নমিলাম
ভারত-প্রতীক-পদে হৃদয়ের অর্ঘ্য সঁপিলাম।

ছাত্রদের প্রতি

স্বাধীনতালাভের পর আজ বোধ হয় তোমাদের প্রথম সাহিত্য-সভা। সাহিত্যিকেরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন, সে স্বাধীনতা হয়তো এখনও অনেক দূরে, তবু যা আমরা পেয়েছি, তা তুচ্ছ করবার মতো নয়, তারও অনেক সম্ভাবনা আছে। সে সম্ভাবনাকে বাস্তবে মূর্ত করবার দায়িত্ব তোমাদেরই। আমরা আশা করে আছি, এ যুগের অসম্পূর্ণতাকে আগামী যুগের তোমরা সম্পূর্ণ করবে। তোমাদের নবীন প্রেরণা, অদম্য উৎসাহ, নির্ভীক আচরণ, সম্ভব করবে অসম্ভবকে! এখন, আমাদের চারিদিকে নানাবিধ দুর্যোগ। কিন্তু দুর্যোগ দেখে হতাশ হলে চলবে না।

জাতির জীবনে, ব্যক্তির জীবনে দুর্যোগ আসেই, ইতিহাসের পাতা খুললেই তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাবে। যে জাতি, যে মানুষ সেই দুর্যোগকে বীরত্বসহকারে অতিক্রান্ত করতে পেরেছে, তারাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তারাই অমর হয়ে আছে। বিপদে পড়ে হা-হুতাশ করা মূঢ়তা, বিপদকে অতিক্রম করবার সাহস-সংগ্রহ করাই মনুষ্যত্ব। দিনের পর অনিবার্যভাবে রাত্রি আসে, রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে যারা ভীত হয়, হাহাকার করে, তারা মানুষ নয়, রাত্রির অন্ধকারকে বিদূরিত করবার জন্যে যারা আলো জ্বালে, তারাই মানুষ। আমাদের দেশ জুড়ে আজ অন্ধকার নেবেছে, হয়তো সে অন্ধকার আরও গাঢ়তর হবে, তোমাদের প্রাণ-প্রদীপের শিখা যেন ম্লান না হয়। তোমাদের সাহস, তোমাদের মনুষ্যত্ব, তোমাদের শিক্ষা সমস্ত বিপদের উর্ধ্বে সগৌরবে যেন তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আজ সর্বান্তঃকরণে সেই প্রার্থনা করি।

আমি জানি, আমার এ প্রার্থনা নিষ্ফল হবে না। তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি অনেককেই বলতে শুনেছি—তোমরাও হয়তো শুনেছ—আগেকার যুগের ছেলেরা, আগেকার যুগের শিক্ষকেরা এখনকার চেয়ে সব বিষয়ে ঢের, ঢের বেশি ভাল ছিল—এখনকার যুগের শিক্ষক, ছাত্র সবাই না কি খুব খারাপ। এটা মিছেকথা। সব যুগের বুড়োরা ছেলেদের সম্বন্ধে ওই কথা বলে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাবাও বিদ্যাসাগরকে ওই কথা বলতেন। ও সব কথার কোন মূল্য নেই। সব যুগেই ভাল ছেলে ছিল এবং থাকবে। রামমোহন রায়ের অনেক পরে বিদ্যাসাগর

এসেছেন এবং তারও অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পর যে আর কেউ আসবেন না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, তোমাদের মধ্যেই মহামানব আবার আবির্ভূত হবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছেলেদের সম্বন্ধে যে কথা অনুপম ছন্দে বলে গেছেন, সর্বান্তঃকরণে আমিও সে কথা সমর্থন করি—

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ববিদ্যাশিক্ষালয়ে
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে।
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে, নূতনেরও আদর জানে,
ওই আমাদের ছেলেরা সব—নেইকো দ্বিধা ওদের প্রাণে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব, ঘুচিয়ে অগৌরবের রব,
দেশ-দেশান্তে ছুটছে আজি, আনতে দেশে জ্ঞানবিভব।
মার্কিনে আর জার্মানীতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচিতে আগুন জেলে শিখছে ওরা কব্জা-কল।
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে, সকল কালে, উৎসাহ, তেজ, অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

ওদের অনেক দোষ আছে, স্বীকার করি—অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

তবু, ওরাই আশার খনি,
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি, ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল।
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলেদের দল।

আজকাল ছেলেরা লেখাপড়া করছে না, বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন ফল দেখাতে পাচ্ছে না বলে যাঁরা দুঃখ করেন, একটা কথা তাঁরা ভুলে যান। ডিগ্রির বাজার দর আগে যত ছিল, এখন আর তত নেই। ডিগ্রিলাভ করবার আগ্রহও তাই কমে গেছে। শুধু ছেলেদের কাছেই কমে যায় নি, ছেলেদের বাপ-মায়ের কাছেও কমে গেছে। এ যুগের বাপ-মারাও তাই ছেলেদের ডিগ্রি সম্বন্ধে ততটা আগ্রহশীল নন, আগেকার যুগের বাপ-মারা যতটা ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ছেলের পড়াশোনার সম্বন্ধে যতটা অবহিত ছিলেন, আজকাল ক'জন পিতা ততটা অবহিত? এর সঙ্গত কারণও তখন ছিল। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পেলে চাকরি একটা পাওয়া যাবেই, এই নিঃসন্দিগ্ধ ধারণা সকলের ছিল—তাই প্রাণপণ করে সবাই উপাধি-লাভ করবার চেষ্টা করত, সফলও হত। শুনেছি, রামতনু লাহিড়ী স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে ডেভিড হেয়ারের পালকির পিছনে অনেকদিন দৌড়েছিলেন। এই দৌড় কি নিছক

জ্ঞান-পিপাসার জন্যে ? স্কুলে ভর্তি হওয়ার পিছনে যদি নির্ভরযোগ্য একটা অর্থকরী আশ্বাস না থাকত, তা হলে কি তিনি এত কষ্ট করতেন ? আমার মনে হয়, করতেন না। অর্থকরী আশ্বাস পেলে এ যুগের ছেলেরাও কৃচ্ছ্রসাধন করতে পশ্চাৎপদ হবে না নিশ্চয়। সে ভরসা নেই, তাই ডিগ্রির প্রতি মোহ তাদের কমে গেছে।

এই প্রসঙ্গে কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলা উচিত। ডিগ্রি পাবার জন্যেই লেখাপড়া করবার প্রয়োজন যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, জ্ঞানলাভের জন্যে লেখাপড়া করবার প্রয়োজন ফুরোয় নি, কোনকালে ফুরোবে না। কারণ, জীবনযুদ্ধে জ্ঞানই মানুষের প্রধানতম অস্ত্র। অশিক্ষিত মানুষ সত্যিই অক্ষম। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে নয়, জীবনযুদ্ধে বীরের মতো জয়লাভ করবার জন্যেই তোমাদের জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং তা যদি করতে পার, তা হলে দেখবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ফেলেছ। সার্টিফিকেটগুলো যদি কাজে নাও লাগে, ক্ষতি নেই, সত্যিকার শিক্ষা যদি লাভ করতে পার, তা হলে তোমাদের বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বই তোমাদের জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কোন আপিসের বড়বাবুর খোসামোদ করতে দেবে না তার জন্যে।

আমিও একদিন তোমাদের মতো ছিলুম, তখন অনেক ভুল করেছি, অনেক দোষ করেছি, তাই আজ সভাপতির আসনে বসে তোমাদের উপদেশ দিতে সঙ্কোচবোধ করছি। এখনও আমি নির্দোষ, নিখুঁত নই, কিন্তু, আমি তোমাদের চেয়ে বয়সে বড়, অন্তর থেকে যে কথাটা বারবার সত্যি বলে অনুভব করছি, তাই আজ তোমাদের বললাম। শিক্ষিত হও, বড় হও, সত্যিকার মানুষ হও, নিজেকে সম্মান করতে শেখ। যার আত্মসম্মান নেই, সে কিছু নয়। সে শিক্ষিত হয়েও মূর্খ, ধনী হয়েও দরিদ্র। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সযত্নে যেমন অগ্নিকে রক্ষা করে, তোমরাও তেমনি রক্ষা কর আত্মসম্মানকে।

তোমরা যে কত বড়, তা যেদিন জানতে পারবে, সেইদিনই নিজেকে সম্মান করতে শিখবে। আমাদের দেশের ঋষিরা তাই বলে গেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। আত্মপরিচয় পেলেই আর কোনও অলীক ভয়ের কাছে মাথা নত করবার প্রবৃত্তি হবে না। সত্য-শিব-সুন্দরকে নিজের জীবনে, দেশের জীবনে, সমগ্র মানবজাতির জীবনে প্রতিফলিত করবার শক্তি পাবে। সাহিত্যসাধনার ওই এক লক্ষ্য।

মহাত্মাজির মৃত্যু

মহাত্মাজির মৃত্যু সমস্ত জাতির আত্মসম্মানকে আঘাত করেছে। প্রমাণ হয়ে গেল, আমরা বাঁদর, মুক্তোর মালার কদর জানি না, মালাটা ছিঁড়ে ফেললাম। শুধু ওই ঘাতকটাকে দোষী করে আমরা ভণ্ডামি করছি। ঘাতক একটা উপলক্ষমাত্র। মহাত্মাজিকে মেরেছি আমরাই। আমাদের অক্ষমতা, আমাদের ভীরুতা, আমাদের হিংসা, আমাদের পরশ্রীকাতরতা, আমাদের ভণ্ডামি, আমাদের বিলাসিতা, সংক্ষেপে আমাদের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য-পূর্ণ পশুত্বেরই প্রতীক ওই ঘাতকটা। আমরাই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ওকে প্রত্যহ প্ররোচিত করেছি। স্থিরচিত্তে একটু আত্মবিশ্লেষণ করুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।

আমরা সভায় যা বলে হাততালি কুড়িয়েছি, বাড়িতে তা করিনি, আমাদের বুলির বহর যত লম্বা, কাজের বহর তত ছোট। জঘন্যতম উপায়ে ঘৃণ্যতম স্বার্থসিদ্ধি করতেও আমরা পশ্চাৎপদ হই না। আমরা চরিত্রবান সাধুকে খাতির করি না, করি বুদ্ধিমান ধনীকে, ধর্মকে নয়, অর্থকে, দেবতাকে নয়, পশুকে, প্রেমকে নয়, ঘৃণাকে, বীরত্বকে নয়, হিংসাকে। মহাত্মাজির মতো লোক আমাদের কাছে কখনও থাকতে পারেন ?

আমরা প্রায়ই 'হিন্দুস্থান' 'হিন্দুস্থান' বলে গলাবাজি করি, কিন্তু চারিদিকে চেয়ে দেখুন তো, হিন্দু কই। একটাও আছে কি ? হিন্দুই নেই, তার আবার স্থান থাকবে কি করে ! নানা রঙের ফোঁটা আছে, নানা ঢঙের তিলক আছে, নানা দৈর্ঘের টিকি আছে, নানা মাপের গুরু আছে, নানা ছাঁদের ইজ্‌ম আছে, নানা সুরের বুলি আছে—হিন্দু নেই। উদার, মহৎ, আত্মার বলে বলীয়ান, প্রেমে সমুজ্জ্বল, নিষ্কলুষ-চরিত্র, নির্ভীক হিন্দু আছে কি একজনও ? বিবেকানন্দের ছবি আছে, বিবেকানন্দ নেই, বিদ্যাসাগরের প্রস্তরমূর্তি আছে, বিদ্যাসাগর কই। রামমোহনের নামে আস্ফালন করবার লোক আছে, রামমোহন নেই। রবীন্দ্রনাথের বই আছে, জয়ন্তী আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণী কাউকে সত্যি সত্যি মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করে হিন্দুত্বের মর্যাদা বাড়িয়েছে, এ রকম উদাহরণ তো চোখে পড়ে না। সমস্ত দেশ জুড়ে মহত্ত্বের শ্মশান আর সমাধি, জীবন্ত মহৎ লোক কই ? মহাত্মাজি আমাদের কাছে থাকবেন কেন !

দেশে যাঁরা শিক্ষিত বলে পরিচিত, তাঁরা মনুষ্যত্ব-চর্চা করেন না, করেন স্বার্থচর্চা, অশিক্ষিত জনসাধারণকে নানাভাবে ঠকিয়ে, নাচিয়ে করেন আত্মবিনোদনের বিবিধ আয়োজন। চরিত্রবান সাধুলোক তাঁদের কাছে উপহাসাস্পদ। দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই নিরক্ষরা, অধিকাংশই নির্যাতিতা, অধিকাংশই প্রতারিতা। তবু, তাঁদের কাছেই ভারতের সনাতন মহৎ আদর্শ কিছু সম্মান পেয়েছে। মহাত্মাজির মৃত্যুসংবাদে তাঁদেরই চোখের জল ফেলতে দেখেছি। তথাকথিত উচ্চশিক্ষার বাসনাকলুষিত সংস্পর্শে এসে একদল মহিলা বিলাসিনী হাবভাবকুশলা হয়েছেন, সনাতনীদের তথাকথিত

হিন্দুয়ানীর প্রকোপে আর একদল সতীসাবিত্রী সাজতে গিয়ে সর্বাঙ্গে হলুদ, কালি মেখে. হয় ছাই-গাদায়, না হয়, রান্নাঘরে গৃহলক্ষ্মী সেজে বসে আছেন এবং সামান্যতম সুযোগ পেলেই উক্ত হাবভাবকুশলা বিলাসিনীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিনেমায় গিয়ে আসর জমানোর চেষ্টা করছেন। মহাত্মাজি আমাদের কাছে থাকতে পারেন কখনও ?

শ্মশান-বৈরাগ্য-পীড়িত হয়ে আপনি প্রশ্ন করেছেন, এখন আমাদের কর্তব্য কি ? কর্তব্য কি, তা কি আপনি জানেন না ? প্রথম কর্তব্য এবং এখন বোধ হয়, একমাত্র কর্তব্য, নিজের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন, আপনি কি বস্তু ! কি হতে পারতেন, কি হয়েছেন ! সত্যিই এবার উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, ধন নয়, মান নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, প্রতিভা নয়, প্রতিপত্তি নয়, চরিত্রই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। চরিত্রবান মানুষই মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, চরিত্রবান হওয়াই মনুষ্যজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। টিকি নয়, ফোঁটা নয়, গুরু-সেবা নয়, কর্তা-ভজা নয়, সুগঠিত বলিষ্ঠ চরিত্রই হিন্দুত্বের লক্ষণ। প্রকৃত হিন্দু হবার চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

মহাত্মাজি মরেন নি, মহাত্মাদের মৃত্যু নেই। তিনি মানব-পশুদের নখদন্তে নিজের নশ্বর দেহটাকে সমর্পণ করে আত্মরক্ষা করেছেন। মানে, বেঁচেছেন।

আমরা যেদিন আবার তাঁকে পাবার উপযুক্ত হব, আবার আবির্ভূত হবেন তিনি।

পয়লা বৈশাখ

তোমাদের পয়লা বৈশাখের সভায় সভাপতিত্ব করতে যেতে পারব না। সত্যিই যদি উৎসবের আনন্দ জেগে থাকে তোমাদের মনে, তা হলে উৎসব নিশ্চয় জমবে, সাহিত্যিক সভাপতির ঠেকনো দরকার হবে না। আর যদি না জেগে থাকে, স্বয়ং সরস্বতী এসেও কিছু করতে পারবেন না, আমি তো কোন ছার।

আজকাল দেশে কলেরা, বসন্তর মতো সভারও এপিডেমিক হয়েছে দেখছি। মাঝে মাঝে এ রকম সভায় যেতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু গিয়ে সুখী হই নি।

মনে হয়েছে, কর্মকর্তারা আত্ম-আস্ফালন করবার জন্যেই যেন বেশি ব্যস্ত। অমুক সভাপতি, অমুক প্রধান অতিথি, অমুক গান গাইবেন, অমুক নাচবেন, বড় বড় অফিসাররা আর তাদের পরিবারবর্গ সভার সামনেটা জমকে বসবেন, গাঁক গাঁক করে মাইক বাজবে,—এ সবের মধ্যে উৎসবের রস পাই নি।

সেকালে পূজার আসরে, বিয়ের আসরে এই রকম ঐশ্বর্যের আস্ফালন হত শুনেছি। নামজাদা ময়রা, নামজাদা বাজনদার, নামজাদা রাঁধুনীরা সব আসতেন, যাত্রা-ঢপ-কীর্তনের রেসারেসি চলত, আসতেন নামজাদা বাইজিরা সব, নামজাদা খেমটার দল, নামজাদা পালোয়ান, নামজাদা খাইয়ে…।

বর্তমান যুগের সভাসমিতিগুলো যেন ওই সবেরই নূতন সংস্করণমাত্র। কিন্তু আরও অন্তঃসারশূন্য বলে, রসিকের মন ভরে না ও সবে। তাই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গত বৎসর এক সভায় যেতে হয়েছিল। সেখানে নববর্ষ সম্বন্ধে ছোট নিবন্ধ পড়েছিলাম একটি। ভাষাটা গুরু-গম্ভীর। যে ভাষায় চিঠি লিখছি, তার সঙ্গে খাপ খাবে না। তবু, যখন অনুরোধ করেছ, কিছু একটা পাঠাতে, ওইটেই পাঠালুম।

মহাবিষুব-সংক্রান্তি শেষ হইয়াছে। তুঙ্গী সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করিয়াছেন। পুনরায় আমাদের নববর্ষ আরম্ভ হইল।

মনে হইতেছে, সূর্য যেন আজ পৃথিবীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, আমার অগ্নিবর্ষী কিরণজাল লইয়া তোমার সমীপবর্তী হইতেছি, তুমি প্রস্তুত আছ তো? তোমার শ্যামতনুর অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে, তোমার জলে-স্থলের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, তোমার বৃক্ষে, লতায়, জড়ে, জীবে, সমুদ্রে, পর্বতে, তোমার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে, জ্বলন্ত তেজের যে প্রদীপ্ত বাণী অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে আসিয়াছি, তাহার জন্য প্রস্তুত আছ তো তুমি? তোমার নদী, তড়াগ বিশুষ্ক হইবে, তোমার শ্যামল প্রান্তরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিবে তৃষ্ণার হাহাকার, ছলনার জাল বিস্তার করিবে মায়াময়ী মরীচিকা, ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে ছুটিয়া আসিবে উন্মাদিনী কালবৈশাখী, চতুর্দিকে চাহিয়া তোমার ব্যাকুল অন্তর দুঃসহ প্রদাহ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না—এই অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আছ তো কন্যা?

পৃথিবীর উত্তর শুনিতে পাইতেছি।

বৃক্ষে, বৃক্ষে, স্বর্ণশ্যাম কিশলয়ের সমারোহে, বহুবিধ ফলের সম্ভাবনায়, রঙ্গন, করবী, বেলা, জবা, যূথিকার বর্ণসৌরভসম্ভারে, দহিয়াল, পাপিয়া, টুনটুনি, বুলবুলি, কোকিল, নীলকণ্ঠের সঙ্গীত-বৈচিত্র্যে, অঙ্কুরিত অসংখ্য বীজের ঊর্ধ্বমুখী প্রেরণায়, স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছতর জলধারায়, আকাশের নীলকান্ত প্রশান্তিতে পৃথিবীর সে উত্তর অদ্ভুত।

তাহার কোন শঙ্কা নাই। অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে সে নির্ভীক।

বিচিত্র ভাষায় মনোমোহিনী ভঙ্গিতে অনির্বাণ প্রাণের অনন্ত প্রকাশে সে যেন বলিতেছে, তাম্রবর্ণের অধিপতি হে রক্তশ্যাম ভাস্কর, স্বাগত। হে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তেজঃপুঞ্জ-প্রদীপ্ত আদিত্য, বহু কোটি বৎসর ধরিয়া বারম্বার তোমার অগ্নিস্রোতে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইয়াছি, হে ধ্বান্তারি, এবারও তুমি সমীপবর্তী হইয়া প্রসন্নমনে আমার সর্বাঙ্গে তোমার অগ্নিধারা বর্ষণ কর, আমি প্রস্তুত আছি।…

ভাবিতেছি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, আসন্ন অগ্নিপরীক্ষাকালে আমরাও কি পৃথিবীর মত বলিতে পারিব—আমরা প্রস্তুত আছি?

শিক্ষার ভিত্তি

উৎসর্গ

অধ্যাপক ডাক্তার

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি. লিট.

শ্রীচরণেষু

ভাগলপুর

১০. ৫. ৫৫

শিক্ষার ভিত্তি*

॥ এক ॥

সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের সহিত এই সভায় মিলিতে পারিয়াছি এই সামান্য ঘটনাটুকু মানবজাতির অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে অসামান্য বলিয়া মনে হইবে। একদা যে মানব-পশুরা দেখা হইলেই পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া নিজেদের শৌর্যপ্রকাশ করিতে অভ্যস্ত ছিল, কোন্ শিক্ষাবলে, কিসের প্রেরণায়, তাহারা মিলিত হইবার শক্তিলাভ করিল? বস্তুতঃ, মিলিত হইবার শক্তি অর্জন করিয়াই মানব প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। নানা রূপে, নানা ভঙ্গিতে, নানা সুরে, নানা প্রয়োজনে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মিলনের সাধনা করিয়াছে, এবং অবশেষে এমন এক মিলনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, যাহা সুলভ নহে, যাহা সভা-সমিতিতে মেলে না, যাহা তপস্যাসাধ্য। ইহার জন্য, কবি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তপস্বী কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন। এই মিলনের নাম কেহ দিয়াছেন মুক্তি, কেহ নির্বাণ, কেহ পরম মিলন, কেহ উপলব্ধি। এই মিলনের আগ্রহ যখনই যাহার মনে জাগে, তখনই এই বাহিরের বিশ্ব, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক প্রয়োজনের উপকরণ-সম্ভার তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়, এমন কি, অনেক সময় বাধাও মনে হয়। সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ মানব-মনীষা যে মিলনের জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাহা বহুর সহিত মিলন নয়, তাহা একের সহিত মিলন। তাহা সত্যের সহিত মিলন। কথাটা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যে মিলনের বাসনা একদিন বহুলোককে একত্রিত করিয়াছিল, সেই মিলনের যখন চরম অভিব্যক্তি ঘটিল, তখন তাহা হইতে 'বহু'টা বাদ পড়িয়া গেল। শ্রেষ্ঠ মনীষা তখন বহুর মধ্যে সেই একক প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, যাহা শাশ্বত, যাহা অবিনশ্বর, যাহা বন্দী করে না, যাহা মুক্তি দেয়। মানবের মধ্যে যতক্ষণ পশু প্রবল থাকে, ততক্ষণ তাহার বিভিন্ন সামাজিক প্রচেষ্টা তাহাকে যে ভোগস্বর্গ রচনায় প্রবৃত্ত করে, তাহার মনীষা আর একটু উন্নত হইলেই সেই স্বর্গ কারাগারে পরিণত হয়।

আমরা অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। এই মিলনের প্রকৃত মর্ম আমাদের অনেকেরই নাগালের বাহিরে। আমরা অনেকের সহিত মিলিত হইয়াই আনন্দলাভ করিতে চাই।

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি বক্তৃতা'

কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, আনন্দলাভ করিতে পারি কি ? আমরা হাটে-বাজারে মিলি, সভা-সমিতিতে মিলি, ট্রেনে-জাহাজে মিলি, ধর্মক্ষেত্রে মিলি, রাজনীতিক্ষেত্রে মিলি, সাহিত্যক্ষেত্রে মিলি, বিদ্যামন্দিরে মিলি। মিলনের নানা ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু মিলনের প্রকৃত আনন্দ আমরা লাভ করিতেছি কি ? আমাদের জীবন কি আনন্দময়, শান্তিময় ? যদি সত্যকথা বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—না, আমরা সুখী নই, আমাদের জীবন আনন্দহীন, অশান্তিপূর্ণ। আমরা বাহিরে একটা সুখের ভান করিতেছি মাত্র, ভিতরটা আমাদের পুড়িয়া যাইতেছে ; যখন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাও পড়িতেছে, তখনও আমরা দন্ত বিকশিত করিয়া বলিতেছি—চমৎকার লাগিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তো বটেই, আমাদের ধর্মক্ষেত্রেও এই ভান, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাই, সর্বত্রই আমরা মুখোস পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মুখোসের প্রয়োজনে কাঁদিতেছি, হাসিতেছি, অপমানিত বা সম্মানিত হইতেছি। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর নিকটও সর্বতোভাবে হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

তাই, আমাদের শিক্ষার কথা যখনই চিন্তা করি, তখনই মনে হয়—শান্তি এবং আনন্দই যদি জীবনের কাম্য হয়, তাহা হইলে শিক্ষার বনিয়াদটা কিরূপ হওয়া উচিত ? আর একটা প্রশ্নও মনে জাগে—শিক্ষার লক্ষ্য আত্মবিকাশ, না, সামাজিক উন্নতি ? প্রতিটি ব্যক্তিকে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলেই যে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে, এমন কোন কথা নাই। সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি ঘটিলে, প্রতিটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে সম্যকরূপে সম্মানিত হইবে না, ইতিহাসেই তাহার বহু প্রমাণ আছে। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি আধুনিক সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই—সক্রেটিস্, জোয়ান অব আর্ক, পদ্মিনী, রাণা প্রতাপ, নেপোলিয়ন লেনিন, বাঙলাদেশের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বীরেরা, মহাত্মা গান্ধী, আব্রাহাম লিংকলন্, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। ব্যক্তির সহিত সমাজের বিরোধ যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সমাধান না করিতে পারিলে শান্তির আশা নাই। এ সমস্যা যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, কারণ শত শত শতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষা অধিকাংশ মানুষের পশুত্বকেই নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়াছে। এখনও মানবসমাজের অধিকাংশ লোকই পশু-স্তরের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। বস্তুবিজ্ঞান-চর্চার ফলে যে প্রগতি আমরা অর্জন করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য, এই পশুত্বেরই প্রসাধন ও বিনোদন, এতদপেক্ষা মহত্তর কোনও লক্ষ্যে সমগ্রভাবে এখনও আমরা পৌঁছিতে পারি নাই। বিজ্ঞানচর্চার আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্বিঘ্নে পশুজীবন-যাপন করিবার জন্যই একদা সমাজ স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই সমাজের সুখসুবিধা বর্ধনের জন্যই বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। সেই অতীত যুগেও ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ছিল। যে কোনও দ্বন্দ্বে শক্তিরই জয় হয়। সে সমাজেও যাহারা বুদ্ধিমান, শক্তিমান ছিল, তাহারা দলপতি, যাদুকর, চিকিৎসক, পুরোহিত প্রভৃতি হইয়া অন্য সকলের উপর

আধিপত্য করিত। এই যাদুকর,-পুরোহিতের দলই কালক্রমে সমাজপতি, দিগ্বিজয়ী বীর, রাজা-মহারাজা-সম্রাট-ফারাও, সিজার-জার-ডিকটেটারে রূপান্তরিত হইয়া, দীর্ঘকাল মানবসমাজকে শাসন করিয়াছে, এখনও করিতেছে। এখন নামটা শুধু বদলাইয়াছে, সাধারণ লোককে সাময়িকভাবে মুগ্ধ অথবা সন্ত্রস্ত করিবার মন্ত্রেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে; মূল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে। ডেমোক্র্যাসিও বহুর উপর কয়েকটিমাত্র লোকের আধিপত্য ছাড়া কিছু নয়। জনগণ যে সব ব্যক্তিকে শাসনকর্তারূপে নির্বাচন করেন, তাঁহারা সব সময়ে নির্বাচন-যোগ্য ব্যক্তিও নহেন, নানারূপ কায়দা-কৌশল করিয়া শক্তি ও বুদ্ধির নানাবিধ জটিল জাল সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা নির্বাচিত হন।

এই সব আধিপত্যকে মানুষ কিছুদিন মানিয়া লইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু এ জাতীয় আধিপত্যে সে সুখে থাকে না। তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত ইহার অহরহঃ বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফলে হয় সে পরাজিত হয়, না হয় বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া, অবাঞ্ছিত আধিপত্যের অবসান ঘটায়। ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব আমাদের অশান্তির একটা প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে? ব্যক্তিত্বকে নিষ্পিষ্ট করিয়া একরঙা একটা সমাজস্থাপন করাই কি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হইবে? না. প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আমরা শিক্ষার আয়োজন করিব? ব্যক্তি ও সমাজের ঐক্য ঘটিলেই কি শান্তি সুলভ হইবে? এ সব সমস্যা আলোচনা করিবার পূর্বে, ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কি তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রতিটি মানুষই একটি বিশেষ সত্তা, আলাদা জগৎ। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে দ্বিবিধ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। প্রথম সংগ্রাম, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে। এ সংগ্রাম, জীবন-মরণ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে পরাজয় মানে মৃত্যু। তাহার দ্বিতীয় সংগ্রাম, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে। এই উভয়বিধ কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা, অথবা অযোগ্যতা সে মাতৃজঠর হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনে। শুধু পিতামাতার নয়, বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা শক্তি দুর্বলতারও উত্তরাধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। যে বংশে তাহার জন্ম, দেহে, মনে, চরিত্রে সেই বংশের ছাপ লইয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই ছাপ এড়াইবার উপায় নাই—আমড়ার বীজ হইতে আমড়াগাছ হইবে, আম বা আপেলগাছ হইবে না; অ্যালসেশিয়ান দম্পতীর বংশে অ্যালসেশিয়ানই জন্মিবে, বুলডগ্ জন্মিবে না। বংশের বৈশিষ্ট্য লইয়াই প্রত্যেককে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার এই উত্তরাধিকার বিনষ্ট হইতে পারে, সমৃদ্ধ হইতে পারে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইতে পারে, কিংবা যেমন ছিল, তেমনি থাকিতে পারে। কিন্তু, এই উত্তরাধিকারের প্রভাব অতিক্রম করিবার উপায় নাই। জুঁইগাছে গোলাপ কখনও ফুটিবে না। একদল বিজ্ঞানী অবশ্য বলেন যে, শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাবে বংশ-

বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব ; কিন্তু, অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এ বিশ্বাস পোষণ করেন না, কারণ, পরীক্ষাদ্বারা তাহা সমর্থিত হয় নাই। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বংশের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নয়। হয়তো ইহাই প্রারব্ধ বা fate ; এই প্রারব্ধ প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র। বিচিত্র উপায়ে প্রতিটি প্রাণী এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। সহোদর ভ্রাতাভগ্নীরাও বংশের উত্তরাধিকার সমভাবে লাভ করে না, কারণ, যে genes পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া জন্মকালে ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহারা প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রতিবারই বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়, প্রতিবারই তাহাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য থাকে। তাই সহোদর ভ্রাতাভগ্নীদের ভিতর স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্য দুইই প্রতীয়মান। যমজরাও সম্পূর্ণরূপে এক নয়, তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট সত্তা লইয়া আমরা প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করি, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজ ও প্রকৃতি আবার প্রত্যেকটি সত্তাকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলিয়া নূতন রূপ দান করে। একই কাদার তাল, কেহ হয় হাঁড়ি, কেহ হয় সরা, কেহ হয় মূর্তি। মানব-সমাজের যত বয়স বাড়িতেছে, আমাদের তথাকথিত সভ্যতার জটিলতাও তত বাড়িতেছে এবং প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আরও জটিল, আরও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। মনঃসমীক্ষণ করিয়া মানবমনের বিভিন্ন স্তরের যে সব খবর সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড আমাদের দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর এবং আতঙ্কজনক। প্রতিটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, রুচি-আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়বোধ এত বিভিন্ন, এত বিচিত্র, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে এত স্বতন্ত্র যে, কোনও একটি বাঁধাধরা নিয়মাবলীর খাঁচায় সুখেশান্তিতে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি আপনার স্বতন্ত্র কল্পনায় মনে মনে এক একটি আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করিয়া রাখে, এবং বাস্তবে তাহা মূর্ত দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করে। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেই অশান্তি। এই অশান্তির চিহ্ন আমরা সমাজে সর্বদা নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্তমানের নিন্দায় সকলেই পঞ্চমুখ। কেহ অতীতের দিকে চাহিয়া হা-হুতাশ করিতেছেন, ভবিষ্যৎকে মনোমত করিয়া গড়িবার জন্য কেহ বৈধ, কেহ বা অবৈধ উপায় অবলম্বনে উদ্যত, অনেকে আবার মনের প্রবল ভাবসমূহকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মানসিক রোগাক্রান্ত হইয়াছেন।

অশান্তি দূর করাই যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই সব বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যদৃচ্ছভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দিলেও কিন্তু শান্তির আশা নাই। কারণ, প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যদি স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে চায়, সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, এবং সমাজের কোন অস্তিত্ব না থাকিলে সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না। দুই একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো পারিবেন। শান্তিলাভের

আশাতেই সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির সহায়তা লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যক্তিগত সুখ খানিকটা বিসর্জন দিই. কিন্তু মুশকিল হইয়াছে, বিসর্জন দিয়া সুখী হই না। ব্যাপারটা অনেকটা যেন tax দেওয়ার মতো হইয়া দাঁড়ায়। এই অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, স্বার্থবিসর্জনের বিনিময়ে যে পরিমাণ সুখসুবিধা লোকে প্রত্যাশা করে, সে পরিমাণ সুখসুবিধা তাহারা পায় না। মিউনিসিপ্যালিটিতে আমিও tax দিই, মিউনিসিপ্যালিটির মেয়রও দেয়। আমার বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তা কিন্তু মেরামত হয় না, নালা পরিষ্কার হয় না, মেয়রের বাড়ির চতুর্দিক কিন্তু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। তখন মন বিষাইয়া ওঠে, এবং সুযোগ পাইলে নিজেই মেয়র হইবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইলে অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়! সমাজের ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। সমাজেও দেখি, কয়েকটি বিশেষ ধরনের লোক বিশেষ নীতি, বা কৌশল অবলম্বন করিয়া বেশি সুবিধালাভ করিতেছেন। অধিকাংশ লোকই তখন সেই বিশেষ কৌশল, বা নীতি আয়ত্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। বর্তমান যুগে তো বটেই, অতীতের পুরাণ-ইতিহাসেও ইহার বহু প্রমাণ মিলিবে। পুরাণের গল্পে দেখি, দানবেরা দেবত্বলাভের জন্য সমুৎসুক, ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য লোলুপ, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র হইতেছেন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম-বুদ্ধ হইয়া ধর্ম-প্রচার করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম যখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, তখন দেখি, বেদপন্থীরা দলে দলে বৌদ্ধ হইতেছেন, বৌদ্ধধর্ম যখন অধঃপতিত হইল, মুসলমানরা আসিলেন, তখন দেখিলাম, এই বৌদ্ধরাই আবার ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছেন। মুসলমান রাজত্বের অবসানে আমাদের দেশে যখন ইংরেজের আগমন ঘটিল, তখন আমরা মৃৎসুদ্দি হইলাম, খ্রীষ্টান হইলাম, ইয়ং বেঙ্গল হইলাম ওই একই প্রেরণায়। তাহার পর কেরানিকুল সৃষ্টি করিবার জন্য যখন এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হইল—যে শিক্ষার মূল-মন্ত্রটি বাঙালীর ছড়ায় আজও অমর হইয়া আছে—'লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই'—তখন আমাদের মনে এই ধারণাটা পুরাপুরি বসিয়া গেল যে, অর্থোপার্জনের জন্যই শিক্ষালাভ করিতে হইবে, শিক্ষার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। এই অর্থকরী শিক্ষার রূপও যখন যেমন বদলাইয়াছে, আমরাও তখনও তেমনি ঝুঁকিয়াছি। প্রথম যুগে, যখন কয়েকটা ইংরাজী শব্দ জানিলেই চাকরি মিলিত, তখন আমরা ডিকশনারি মুখস্থ করিতেও ইতস্ততঃ করি নাই। তাহার পর আসিল ডিগ্রীর যুগ, ধুয়া উঠিল কোনক্রমে বি. এ. পাশ করিলেই জীবনসমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, আমরা দলে দলে গ্র্যাজুয়েট হইলাম। তাহার পর ঝোঁক পড়িল আইনশিক্ষার উপর, চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার উপর, টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর। পূর্বে আমরা কেরানি, হাকিম, অধ্যাপক হইয়াছিলাম, এইবার দলে দলে উকিল, ডাক্তার ও এনজিনিয়ার হইতে লাগিলাম, দেশী ডিগ্রীর উপর বিলাতি ডিগ্রীর অলঙ্কার ছড়াইয়া সামাজিক পশার-প্রতিপত্তিও বাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, মনে হইতেছে, এ মোহও কাটিয়া আসিতেছে। এখন আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দি শিখিয়া নেতা এবং

আধ্যাত্মিক ভেল্‌কি দেখাইয়া গুরু হইবার যুগ। দেখা যাইতেছে, এ বাজারে রাজনৈতিক নেতা অথবা আধ্যাত্মিক গুরু হইতে পারিলে নানাপ্রকার সুখসুবিধা পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, আধিভৌতিক সুখ-সুবিধার জন্য যুগে যুগে আমরা নানারঙের আলেয়া, অথবা নানা ঢঙের মরীচিকার পিছনে ছুটিতেছি, কিন্তু, আমাদের সুখও মিলিতেছে না, শান্তিও নাই। এই অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যে আজই আবির্ভূত হইয়া আমাদের দগ্ধ করিতেছে, তাহা নয়, এ আগুন বরাবরই আছে। একটা কালের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩০৬ সালে—চুয়ান্ন বৎসর পূর্বে—যে কালের দিকে চাহিয়া আমরা এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া থাকি,—"আহা, সে সময় কি সুখই ছিল"—সেই সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "আমাদের সমাজে একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরা বড় একটা আশায় বুক বাঁধিয়া এতকাল আশ্বস্ত ছিলাম, যেন আশা আমাদের চূর্ণ হইয়াছে। আমরা এতদিন ধরিয়া যাহার মুখ চাহিয়াছিলাম, সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। এখন, কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অস্ফুটভাবে সমুদ্গত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্যের মূল কি ?" বলা বাহুল্য, এই নৈরাশ্যের মূল কারণ. ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ। আমরা অশান্তি যে কেবল সজ্ঞানে ভোগ করিতেছি তাহা নহে, আমাদের নির্জ্ঞান মনও নানারূপ অশান্তির হেতুকে আত্মসাৎ করিয়া নানাভাবে ভারাক্রান্ত হইতেছে। আধিভৌতিক অভাবও এই অশান্তির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে এমন লোক মোটেই বিরল নহেন, যাঁহাদের কোনও অভাব নাই, যাঁহারা যশস্বী, ধনী, পদস্থ, কিন্তু যাঁহাদের জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পারিপার্শ্বিকের সহিত কেহই যেন খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিতেছি না, প্রত্যেকেই যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি।

সমাজের ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তিকে খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা সমাজ-পত্তনের কিছুকাল পরেই আরম্ভ হইয়াছে। সমাজপতি ও রাষ্ট্রনেতারা অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন, ব্যক্তির সহিত সমাজ বা রাষ্ট্র একমত না হইলে, সে সমাজ বা রাষ্ট্র বেশিদিন টেঁকে না। এই খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ দ্বিবিধ রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। একদল সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিকে তদনুসারে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া সমাজ-চেতনা, রাষ্ট্রচেতনা অথবা বিশেষ-কোনও-উদ্দেশ্য-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন; তজ্জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন; একজন নিয়ন্তার নির্দেশে সমস্ত সমাজ বা রাষ্ট্র ক্রীতদাসের মতো কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয় দল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মতানুসারে গঠন করিতে চাহিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট লিংকলনের ভাষায় এই দলের আদর্শ—Government of the people, by the people, for the people. কিন্তু কোনও ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি,

সমাজ বা রাষ্ট্রের সুখশান্তি পাওয়া যায় নাই। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে, আমরা যেন ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নই আমাদের মালিকরা আমাদের কপালে যেন Free Citizen এই লেবেলটা নিজেদের আত্মপ্রসাদের জন্য কেবল আঁটিয়া দিয়াছেন। বহুকাল পূর্বে সমাজে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীরা টাকা দিয়া বাজার হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দাসদাসীও কিনিয়া আনিতেন। মানবতার শোচনীয় অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া আমরা এ প্রথা অবলুপ্ত করিয়াছি। এখন কিন্তু, আমাদের ভুল ভাঙিয়াছে, এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, যন্ত্রসভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই দাস-প্রথা নব-কলেবরে আবির্ভূত হইয়া আমাদের মানসিক শান্তি হরণ করিয়াছে, আমাদের আত্মসম্মানও আর নাই। সেই প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অপেক্ষাও আমরা যেন বেশি অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায়, আমরা কেহই আর সুস্থ, সবল, প্রাণরসে সঞ্জীবিত, স্বাধীনচেতা মানব নহি, আমরা একাধিক যন্ত্রের এবং যন্ত্র-নায়কের আজ্ঞাবহ ভৃত্য-মাত্র। এই যন্ত্র আমাদের শক্তি, স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান, সমাজ, সম্পদ সমস্ত নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু, ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্যটুকুও আমাদের নাই, আমাদের বুদ্ধিও বিকৃত হইয়াছে, যান্ত্রিক অত্যাচারের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করিয়া আস্ফালনও আমরা করিতেছি বটে, কিন্তু নির্জ্ঞান মন এই সব অপমান, ক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে, এবং আমাদের নানারূপ উৎকট, অভব্য, অসঙ্গত আচরণে তাহা প্রায়শঃই প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন দাস-প্রথা যেমন নূতনরূপে আসিয়াছে, যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে আমাদের পুরাতন সমাজও তেমনি নব-রূপ ধারণ করিয়াছে। কবি Cowper বলিয়াছেন—Man in society is like a flower blown in its native bud. এ-রকম সমাজ আমাদেরও হয়তো একদিন ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। আমাদের সে সমাজ ছিল পল্লীতে, সে সমাজের কিছু কিছু আভাস প্রবীণ লেখকদের লেখা হইতে পাই। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনেন্দ্রনাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাতে সে সমাজের রমণীয় চিত্র আঁকা আছে। শরৎচন্দ্র যে পল্লীসমাজের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহারও বাহিরের রূপটা বদলাইয়া গিয়াছে। প্রকৃত সমাজ বলিতে যাহা বোঝায়, সে সমাজ বহুপূর্বেই অবলুপ্ত হইয়াছে। এখন সমাজপতি নাই, সামাজিক নিয়মও কেহ মানে না। দশবিধ সংস্কারের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি, বিবাহও আজকাল সামাজিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় না, বয়স্ক যুবকদের খেয়ালখুশী অনুসারে হয় এবং প্রায়শঃই নিয়ন্ত্রিত হয় আর্থিক মানদণ্ডে। তথাকথিত সভ্যসমাজে কিশোরী কন্যার বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনুর বিধান বহুপূর্বেই অচল হইয়াছে। বয়স্ক যুবকেরা বিবাহ করিতে চান না, কিন্তু, তাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া যান নাই। বিবাহ করিলে যে সব সুখ-সুবিধা-আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারা কোনও দায়িত্ব বহন না করিয়াই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখা আজকাল প্রয়োজন মনে করি না। প্রতিবেশীও আমাদের খবর রাখা অনেক সময় অপছন্দ করেন। যে সব ছোটছাটো সামাজিক উৎসব পুরাকালে আমাদের পরস্পরকে নানা বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত, সে সব উৎসব সভ্যসমাজ হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। যে সব দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বে আমরা মিলিত হইতাম, সে সব দেবতা এখন অন্তর্হিত, বহু হিন্দুঘরে, আজ-কাল ঠাকুরঘর পর্যন্ত নাই। কয়েকটি উৎসব এখনও অবশ্য সাড়ম্বরে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু, সেগুলিতে সামাজিকতার কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। দেখি, অহঙ্কারের আস্ফালন, টাকার মহিমা, দরিদ্রের সঙ্কুচিত অপ্রতিভতা, পরশ্রীকাতর অক্ষমের ক্ষোভ; দেখি, অকারণ অপব্যয়, অশ্লীল উন্মাদনা, অসংযত আচরণ। বহুকাল পূর্বে বড় দুঃখে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে লিখিয়াছিলাম—

"দিবসে নিশীথে যাহার স্বপ্ন
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি,
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া
যাহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি,
যাহার পূজায় কত বলিদান,
কত না আরতি, মন্ত্র কত,
কত ঋত্বিক, কত পুরোহিত,
কত আয়োজন লক্ষ শত,
আকার তাহার যেমনই হউক,
নানাভাবে করি টাকারই পূজা,
হোক না তাহার যেমন চেহারা—
বংশীবদন বা দশভূজা।
অয়ি মৃন্ময়ি, অতসী-বরণি,
ভিখারী-ঘরনি শিবানি, অয়ি,
রূপার তলায় চাপা পড়ে গেছ,
তোমার পূজার মন্ত্র কই?
টাকার পূজায় মত্ত সবাই—
তোমার পূজাও টাকার পূজা,
লক্ষ্য নহ গো, উপলক্ষ্যই,
ওগো মৃন্ময়ি, হে দশভুজা।
সুদখোর ওই হারু-পোদ্দার,
বাড়িতে তাহার পূজার ধূম,
গর্জন করে লাউডস্পীকার—
পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম।

তাহার নিকট কর্জ করিয়া
 পূজার বাজার করেছি সব,
অর্থ নহিলে জমে কি, জননি,
 তোমার পূজার এ উৎসব ?
অর্থ পুড়িছে আতসবাজিতে,
 আলোকমালায় জলিছে টাকা,
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে—
 প্রণাম না করে যায় কি থাকা ?
বড় সাহেবেরে সেলাম বাজাই,
 রাজারাজড়ায় প্রণাম করি,
হারুর বাড়িতে তেমনি, জননি,
 তোমারেও নমি, হে শঙ্করি।
অর্থাৎ কিনা, হারুকেই নমি,
 কারণ, তাহার টাকা যে আছে,
দুর্গা, কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে,
 আমরা নমিব তাহারই কাছে।"

দুর্গাপূজায় তিনদিন ধরিয়া অনাবিল আনন্দে ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে এখন আর আমরা মিলিতে পারি না। সকলে পাশাপাশি বসিয়া এক পূজামণ্ডপে মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হই না। গ্রামের পুরোহিত, গ্রামের শিল্পী, গ্রামের গোয়ালা, গ্রামের ময়রা, গ্রামের কবিরা সে পূজায় অংশ লইবার সুযোগ পায় না। ট্রেনে বা এরোপ্লেনে করিয়া আমরা কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে মিষ্টান্ন ও প্রতিমা, শান্তিনিকেতন অথবা বোম্বাই হইতে গায়ক-গায়িকা আমদানি করি এবং তাহা অসম্ভব হইলে রেকর্ড বাজাই। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের গ্রামকে ধ্বংস করিয়াছে। সে গ্রাম আর নাই, সে গ্রাম্য-সমাজও আর নাই। গ্রামের ধনীরা আজকাল শহরে আসিয়াছেন। গ্রামে তাঁহারা গণ্যমান্য ছিলেন, শহরে তাঁহারা নগণ্য, তবু আসিয়াছেন। সুযোগ পাইলে, অনেকে ইউরোপ, আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন।

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রাচীন সমাজের মাধুর্যকে অবলুপ্ত করিয়াছে, কিন্তু, ভিতরের গলদগুলিকে দূর করিতে পারে নাই ; পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা এখনও ঠিক তেমনি আছে, যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে তাহার বাহিরের ঢংটা কেবল বদলাইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ নাই, কিন্তু খবরের কাগজ আছে, ক্লাব আছে, পার্টি আছে, সভা-সমিতি আছে এবং ইহাদের মধ্যে বেণী ঘোষালরাও আছেন। পরনিন্দা, পরচর্চা এখন পল্লীসমাজেই নিবদ্ধ নাই, তাহা বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখি না, কিন্তু, কোরিয়ার খবর রাখি, আমেরিকা, ইংলণ্ডের খবর রাখি, চীনের, রুশিয়ার খবর

রাখি, ফরেন পলিসি লইয়া উত্তপ্ত আলোচনা করি। গ্রামের বা স্বদেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদের ততটা লজ্জিত করে না, কিন্তু বিদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে দুই চারিটা বুকনি ছাড়িতে না পারিলে, বর্তমান সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হইতে হয়। বুকনি সংগ্রহ করিবার সুযোগও আজকাল মেলে, আজকাল প্রকৃত পণ্ডিত দুর্লভ, কিন্তু, পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের অভাব নাই।

অর্থাৎ, যন্ত্রসভ্যতা আমাদের সমাজের বাহিরের রূপটা বিনষ্ট করিয়াছে, কিন্তু, আমাদের চিত্তকে উন্নত করিতে পারে নাই, বরং তাহা নীচাশয় স্বার্থপর ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে বৃহত্তর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইবার সুযোগ দিয়াছে। যে 'ঘোঁট' পূর্বে সঙ্কীর্ণ সমাজে নিবদ্ধ থাকিত, তাহা এখন নানাবিধ আন্দোলনের জয়ঢাক বাজাইয়া পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে। আমরা কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। স্থির থাকিবার উপায়ও নাই। প্রত্যহ খবরের কাগজের উত্তেজক হেড লাইন, দৈনিক তিনচারবার সিনেমায় চিত্তচাঞ্চল্যকর নৃত্যগীতের এলাহি আয়োজন, রেডিওর শূন্যপথে আক্রমণ, আমাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

যে শিক্ষা আমাদের স্বস্থ করিতে পারিত, সে শিক্ষাও আর নাই। শিক্ষক এখন আর শিক্ষক নন, তিনি বেতনভোগী মজুরমাত্র। সাহিত্যও আজকাল ব্যবসায়ের পণ্য।

যাঁহারা সাহিত্য-সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের সহিত রসিক-সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর নাই। যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন গ্রন্থকর্তা নিজের পুস্তক স্বহস্তে সযত্নে লিখিয়া রসিক পণ্ডিতসমাজকে পড়িয়া শুনাইতেন। পুস্তক ভাল হইলে, লোকে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত, টুকিয়া রাখিত, পূজা করিত। ছাপাখানার কল্যাণে আজকাল ভাল বই, খারাপ বই একই বেশে সজ্জিত হইয়া বাজারে বাহির হয়, তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকও সমালোচকদের প্রশংসালাভ করে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে প্রথম শ্রেণীর পুস্তকের পাশে সম-গৌরবে স্থান পায়। সমাজেও দেখি, আজকাল গণিকা ও সতীসাধ্বী একই বেশে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছেন। যন্ত্রসভ্যতার সাম্যবাদ মুড়ি-মিছরিকে একাসনে বসাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম—ছাপাখানা হওয়াতে এ যুগের সাহিত্যিকদের আর একটা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্বে কবির সহিত রসিকদের সরাসরি যোগ ছিল। কবি নিজের লেখা রসিককে পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা লইয়া রসিকের সহিত সামনাসামনি আলোচনা করিতেন, লেখা ভাল কি মন্দ, কোথায় সুর জমিয়াছে, কোথায় বেসুরা বাজিয়াছে, সহৃদয় আলোচনার দ্বারা তাহা স্পষ্ট হইত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে এক মহা আপদ জুটিয়াছে, সমালোচক বলিয়া একদল স্বয়ম্ভু পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বেরসিক, কিন্তু ইহারা রসের ক্ষেত্রেই মুরুব্বিয়ানা করিয়া বেড়ান। কাহার লেখা সংবেদনপূর্ণ, কাহার লেখায় দরদ আছে, কাহার লেখায় প্রগতির পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোন্ লেখক প্রতিক্রিয়াশীল, সাহিত্যরাজ্যে কে সম্রাট, কে মন্ত্রী, কে উজির, কে গোমস্তা, এই সব

লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামান এবং বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন। শুনিয়াছি, ইঁহাদের সুনজরে পড়িবার জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থব্যবসায়ীদের নাকি বহুবিধ কসরৎ করিতে হয়, পুস্তক ভেট দিতে হয়, খোসামোদ করিতে হয়, আরও অনেক কিছু করিতে হয়, তবে নাকি তাঁহারা সদয় হইয়া তাঁহাদের রচনার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, এই সব একদেশদর্শী আত্মম্ভরিতাপূর্ণ রচনা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইত না। প্রকৃত রসিকরাই তখন কাব্য-সাহিত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। এখন, সে ভার পড়িয়াছে কতকগুলি মতলববাজ ব্যবসায়ীর উপর। সুতরাং এই ধরণের প্রবন্ধ ছাপা হয়, রেডিওতে নিনাদিত হয়। ফলে, বহুলোক সৎসাহিত্যের সন্ধান হইতে বঞ্চিত হন।

সাহিত্যিকের তৃতীয় বিপদ, প্রকাশক। প্রকাশক মুখ্যত: ব্যবসায়ী। যে বই বেশি বিক্রয় হয়, তিনি সেই বই-ই ছাপিতে চান। উত্তেজক যৌন-কাহিনী, গরম্ গরম পলিটিকাল প্রপাগ্যাণ্ডা, ডিটেকৃটিভ কাহিনী, সরস গালগল্প প্রভৃতিরই চাহিদা বেশি; ভাল প্রবন্ধ, কবিতা বা ছোটগল্পের বই বাজারে চলে না শুনিয়াছি। অভিনীত না হইলে নাটকও চলে না। যাঁহারা নাটক অভিনয় করেন বা করান, তাঁহারাও ব্যবসাদার এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধু। কোন ভদ্র নাট্যকারের পক্ষে তাঁহাদের ব্যবহার বরদাস্ত করা কঠিন। সুতরাং, যাঁহাদের নাটক লিখিবার প্রতিভা আছে, তাঁহারা নাটক লিখিতেই চান না। সাহিত্য-সাধককে বাধ্য হইয়া তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হয়, এমন বই লিখিতে হয়, যাহা প্রকাশক-গ্রাহ্য। বলা বাহুল্য, সে সব পুস্তক সব সময় সুসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। ইহাতে প্রকৃত সাহিত্যসাধকের ক্ষোভ হয়, রসিক-সমাজও ক্ষুণ্ণ হন। সাহিত্য সমাজের যে কল্যাণ সাধন করিতে পারিত, তাহা পারে না।

যন্ত্র-সভ্যতার আরও দুইটি 'অবদান' বর্তমান সভ্যসমাজের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে—সিনেমা ও রেডিও। সুপ্রযুক্ত হইলে, হয়তো ইহারা মানব-সভ্যতার কল্যাণ-সাধন করিতে পারিত, কিন্তু, বর্তমান যুগে তাহা হইবার উপায় নাই। কারণ, প্রত্যেক যন্ত্রের পিছনে যে যন্ত্রপতিরা বর্তমান, মানবজাতির কল্যাণ-সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, নিজেদের স্বার্থসাধন। অধিকাংশ মানবকে শোষণ করিয়া তাঁহারা নিজেরা শক্তিমান হইতে চান। পূর্বে খাইবার পাস দিয়া বহিঃশত্রুরা আসিয়া এ দেশ জয় করিয়াছিল, এখন তাহারা আসিতেছে যন্ত্রের ভিতর দিয়া। মানুষ পশুকেই জয় করিতে পারে, মানুষকে পারে না। এই সব যন্ত্র তাই অধিকাংশ মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দিতে চায়। পূর্বে পাশ্চাত্ত্য বণিকরা চীনাদের অকর্মণ্য করিবার জন্য জোর করিয়া তাহাদের আফিঙের নেশা ধরাইয়াছিল, আমাদের দেশের চাষীকে দরিদ্র করিয়া ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কারণ, নেশাগ্রস্ত বা দরিদ্র জাতিকে শোষণ করা বা শাসন করা সহজ। শোষণ এবং শাসন করিবার জন্য এখন তাহারা নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে—যন্ত্রের পন্থা। আর্ট পরিবেশনের ছলে, সিনেমা এবং রেডিওর মারফৎ তাহারা যাহা পরিবেশন করিতেছে, তাহা সেই আর্ট নয়, যাহা আমাদের সত্য-

শিব-সুন্দরের সন্ধান দেয়, তাহা সেই আর্ট, যাহা আমাদের কামনাকে মোহিনীবেশে সাজাইয়া আমাদের সর্বনাশ করে। পূর্বে দুইচারিজন ধনী কামুক বাইজী-বিলাসের সুযোগ পাইতেন। যন্ত্রের কল্যাণে সকলেই এখন সে সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সকলেই ক্রমশঃ অক্ষম, কামুক, পশু হইয়া যাইতেছি। শাসক ও শোষকদের সুবিধা বাড়িতেছে।

এই সব যন্ত্র আমাদের আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইতেও বঞ্চিত করিতেছে। মহৎকে, সুন্দরকে, শ্রেষ্ঠকে, গুণীকে শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা সভ্য মানবচরিত্রের একটি প্রধান সম্পদ। যন্ত্রযুগের পূর্বে মহৎ, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ করা সহজ ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তাই সাধারণ লোকের ঔৎসুক্য ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। প্রকৃত জিজ্ঞাসুরা, অকপট ভক্তেরা তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। যন্ত্র এখন সমস্তই সুলভ করিয়া দিয়াছে। তাই দেখি, রেডিওতে যখন কোন গুণী সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন, বা কোনও বিখ্যাত পণ্ডিত সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়িতেছেন, তখন আমরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সে সব শুনি না. রেডিওটা খুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে হাসি-গল্প-তামাসায় মাতিয়া উঠি। যদি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া, বহু সাধনা করিয়া উক্ত গুণীদের সমীপবর্তী হইতে হইত, তাহা হইলে, তাঁহাদের সম্মুখে আমরা এতটা বেসামাল হইতাম না। ইহাতে উক্ত মনীষীদের বিশেষ ক্ষতি হয় না, হয় আমাদের। সব কিছুকেই যন্ত্রের সহায়তায় অতি সহজে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া আমরা কিছুই ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না যে, পাইলেই গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করিবার জন্য সাধনা দরকার. পল্লবগ্রাহিসুলভ একটা মিথ্যা অহঙ্কারের মুখোস পরিয়া আমরা সবজান্তা সাজিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, আমাদের নির্জ্জন মনে কিন্তু, আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানি এবং তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের অশান্ত করিয়া তোলে।

যন্ত্র-সভ্যতার অর্থনৈতিক দিকটা তো আরও ভয়ঙ্কর। পল্লীসমাজ ভাঙিয়া গিয়াছে, ভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা শহরে আসিয়াছি, কুটিরশিল্প অবলুপ্ত, পেশা এখন আর বংশগত নাই, ব্রাহ্মণ জুতার দোকান খুলিয়াছে, মুচি অধ্যাপনা করিবার চেষ্টায় পরীক্ষা পাশ করিতেছে, ময়রার ছেলে ডাক্তার হইতে চায়, বৈদ্যের পুত্র এন্‌জিনিয়ার হইয়াছে, তবু কিন্তু, কাহারও অন্ন জুটিতেছে না, ঘরে, বাহিরে, দোকানে, ফ্যাক্টরিতে সর্বত্রই অশান্তি। সকলেই আমরা ছটফট করিতেছি—পূর্বযুগে দাসচালকদের চাবুকের আঘাতে ক্রীতদাসরা যেমন ছটফট করিত, নূতন যুগের অভিনব ক্রীতদাস আমরা ঠিক তেমনিভাবেই ছটফট করিতেছি—অনেকে হয়তো বুঝিতে পারিতেছি না, এক অদৃশ্য Simon Legveo আমাদের চাবকাইতেছে। পূর্বে ক্রীতদাসরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত, কোনও কোনও সহৃদয় প্রভু ক্রীতদাসকে স্বাধীনও করিয়া দিতেন, এখন কিন্তু দাসত্বের যে নাগপাশে আমরা আবদ্ধ, তাহা হইতে মুক্তির আশা সুদূর-

পরাহত। তাই, অশান্তি আরও বাড়িয়াছে। কোনরকম 'ইজ্‌মে'ই আর মন প্রবোধ মানিতেছে না। সমাজ, রাষ্ট্র সমস্তই যেন কারাগাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রতিবেশীকে মনে হইতেছে শত্রু, ধার্মিককে মনে হইতেছে ভণ্ড, পণ্ডিতকে মনে হইতেছে বেকুব, ধনীকে মনে হইতেছে শোষক। কোথাও শান্তি নাই।

আধুনিক অশান্তির চেহারাটা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম। পরবর্তী প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিব, আমাদের শিক্ষার দ্বারা এ অশান্তিনিবারণ সম্ভব কি না। নূতন কিছু বলিবার স্পর্ধা করি না। নূতন বলিয়া কিছু আছে কি? আমরা পুরাতনকেই বারংবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করি। বেদান্তকে, সাংখ্যকে, থিওরি অব রিলেটিভিটির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া চমকিত হই। অতি আধুনিক আণবিক বোমার স্বরূপ যে বেদব্যাসের কল্পনাতে অন্ততঃ ছিল, তাহার প্রমাণ পাই ব্রহ্মশির বা পাশুপত-অস্ত্রের বর্ণনায়।

অশান্তি মানবসমাজের অতি পুরাতন ব্যাধি। অতীতকালে যাঁহারা চিন্তানায়ক ছিলেন, তাঁহারাও এ ব্যাধির প্রতিকার-চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রয়াস যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ, অতীতের গৌরবময় ইতিহাস। আধুনিক যুগে আমাদের শিক্ষার বহুবিধ সংস্কারের কথা শুনি—উড সাহেবের ডেস্‌প্যাচ, গোখলের বিল, স্যাড্‌লার কমিশন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার, স্বাধীন-ভারতেও শিক্ষার নানাবিধ সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, আসল ব্যাপারটার উপর যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। খাদ্যদ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়-প্রাচীন বলিয়া এ সত্য আমরা বর্জন করি নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অশান্তিনিবারণেরও একটা প্রতিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরবর্তী প্রবন্ধে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার প্রয়াস পাইব।

॥ দুই ॥

আমরা এখন স্বাধীনতালাভ করিয়াছি। শুনিয়াছি, আমাদের জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করাই বর্তমান রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গরিমায় যখন সত্যই বড় ছিল, যখন সে সত্যই স্বাধীন ছিল, তখন তাহার শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়াই আলোচনা আরম্ভ করি। তিনি বলিতেছেন—কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা, সাহিত্য-শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা বা টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত

হইয়াছে এবং কোন্ শিক্ষা ভাল, কোন্ শিক্ষা মন্দ, এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে, আমরা কেবল একটা-মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া ওঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে, তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না।" অর্থাৎ, সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয়, তাহার নামই শিক্ষা। পূর্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, আজকাল সমাজ বলিয়া কিছু নাই। আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডিতে স্বাধীনতার আস্ফালন করি বটে, কিন্তু, আসলে আমরা সকলেই দাস। যন্ত্রপতিরাই পৃথিবীর মানবসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহারাই আমাদের প্রভু, ভর্তা এবং শাসনকর্তা। আমাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের দিকে তাঁহাদের উৎসাহ নাই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ যাহাতে না হয়, সকলেই যাহাতে বিরাট যন্ত্রের নাট্‌ বা বল্টুতে পরিণত হয়, সেইদিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য। আমেরিকার বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার Alexis Carrel তাঁহার *Man, the Unknown* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিতেছেন—Modern Society ignores the individual. It only takes account of the human beings. It believes in the reality of the universals and treats men as abstractions. The confusion of the concepts of individual and of human being has led industrial civilisation to a fundamental error, the standardisation of men. If we were all identical, we could be reared and made to live and work in great herds like cattle. But, each one has his own personality. He cannot be treated like a symbol. Children should not be placed, at a very early age in schools, where they are educated wholesale.

As is well-known, most great men have been brought up in comparative solitude or have refused to enter the mould of the school...Education should be the object of unfailing guidance. Such guidance belongs to parents. They alone, and more especially the mother, have observed since their origin, the physiological and mental peculiarities, whose orientation is the aim of education. Modern society has committed a serious mistake by entirely substituting the school for familial training. The mothers abandon their

children to the kindergarten in order to attend to their careers, their social ambitions, their sexual pleasures, their literary or artistic fancies or simply to play bridge, go to the cinema and waste their time in busy idleness. They are thus responsible for the disappearance of the familial group where the child was kept in contact with adults and learned a great deal from them. He learns little from the children of his own age···The neglect of individuality by our social institutions is likewise responsible for the atrophy of the adult······In the immensity of modern cities, he is isolated and, as if lost. He is an economic abstraction, a unit of the herd. He gives up his individuality. He has neither responsibility nor dignity. Above the multitude stand out rich men, the powerful politicians, the bandits. The others are only nameless grains of dust......"

এই প্রবন্ধটি একটু বেশি করিয়াই উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, ইহাতে আধুনিক শিক্ষার যে সব গলদ এবং তাহার জন্য ব্যক্তিত্ববিলোপের যে চিত্র ডাক্তার ক্যারেল অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং যাহা এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে ; পুরাকালে, আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল, এই সব গলদ এড়াইয়া চলা।

সে শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার পূর্বে তখনকার সামাজিক গঠন জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন যে, সে যুগের বিজয়ী আর্যগণ যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা নিজেদের জন্য, বিজিত অনার্যদের জন্য নহে। অনার্যদের প্রথম প্রথম তাঁহারা অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। নিজেদের সুবিধার জন্য যোগ্যতা-অনুসারে তাঁহারা নিজেদের তিন বর্ণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ইহার মধ্যে কোনরূপ জোর জবরদস্তি ছিল না। অধ্যাপক Altaker তাঁহার *Education in India* পুস্তকে লিখিয়াছেন—"There is a general impression that Hindu educationists suppressed personality by prescribing a uniform course of education and enforcing it with iron discipline. Such, however, was not the case. The caste-system had not become hidebound down to 500 B. C., and till that time, a free choice of profession or career was possible both in theory and practice......"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনের আদর্শ কি হইবে, তাহা নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট ছিল। সারা জীবন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিক চর্চা ছিল ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ছিল শক্তির সাধনা এবং বৈশ্যের আদর্শ ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। প্রত্যেকেই দ্বিজ ছিলেন, এবং প্রত্যেককেই উপনয়নের পর গুরুগৃহে জীবনের প্রথম

আশ্রম অতিবাহিত করিতে হইত। নিজের নিজের গুণ বা প্রবৃত্তি-অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য হইতেন। এখন যেমন, একই বাড়ির ছেলে কেহ অধ্যাপক, কেহ সৈনিক, এবং কেহ দোকানদার, কেহ বা অন্য কিছু হন; অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার *Ancient Indian Education* পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

In the sphere of economic life and interests, the free choice of occupations or the movement of labour, horizontal or vertical was subordinated to the choice of the ideals and ends of life···Some occupations were approved for certain castes and condemned for others.

এই সব ব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল না। আর্যসংস্কৃতির মহত্বকে ম্লান করিবার জন্য অনেকে শূদ্রদের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়হীন ব্যবহারের উল্লেখ করেন, এ সম্পর্কে 'শোষক', 'শোষিত' ইত্যাদি নানা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর্যদের শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ তাঁহাদের উদার সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেজন্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

যাহাদের তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন, তাহারাই ছিল শূদ্র অর্থাৎ দাস। তখন বিজিত দেশের লোকেরা দাস বলিয়াই সাধারণতঃ গণ্য হইত, তখন সর্বদেশে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আমরা যেমন গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়ার স্বাধীনতাস্বীকার করি না, তখনও মানবসমাজ তেমনি দাসদিগের স্বাধীনতাস্বীকার করিতেন না। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতায় যে নূতন দাসত্ব-প্রথার প্রচলন হইয়াছে, তাহাতেও দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। ভারতবর্ষীয় আর্যদের স্বপক্ষে তবু একটা কথা বলিবার আছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দাসদের উপর যে বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা আমরা পাই, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তাহা পাই না। পুরাণে, কাব্যে, রামায়ণ-মহাভারতে, মাঝে মাঝে আছে বটে, মুনিরা দাসদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, অথবা শুনঃশেফকে যজ্ঞে বলিদান দিবার জন্য কিনিয়া আনা হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডবের অনার্যদলন, খাণ্ডবদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুকবধ প্রভৃতি ঘটনাকেও যদি দাসনির্যাতনের পর্যায়ে গণ্য করি, তবু অন্যান্য দেশের তুলনায়, এমন কি আধুনিক সভ্যযুগেরও দাস-দলনের তুলনায়, সে সব নগণ্য। জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা, বিয়াল্লিশের অত্যাচারের কথা, এমন কি আজকাল কেনিয়ায় যাহা হইতেছে, তাহার কথা স্মরণ করুন।

আর্যগণ এদেশে আসিয়াই মহাপুরুষ বা দার্শনিক হইয়া ওঠেন নাই। তাঁহারাও এদেশে আসিয়াছিলেন বিজেতাসুলভ মনোভাব লইয়া। কিন্তু, এদেশে কিছুকাল বাস করিবার পর, তাঁহারা যে ধর্ম, যে সভ্যতার পত্তন করেন, যে আদর্শ তাঁহাদের পরবর্তী সমাজ-জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, যে আদর্শ সনাতন ভারতীয় আদর্শ নামে পরিচিত,

তাহাতে শূদ্রদের প্রতি ঘৃণার আভাসমাত্র নাই। পুরাণে, কাব্যে এ রকম নিদর্শন হয়তো দুই-একটা আছে, কিন্তু প্রেমের নিদর্শনও কম নাই। রামায়ণের যুগে, শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে, তাড়কাকে, রাবণকে, বালীকে এবং আরও অনেক রাক্ষস-রাক্ষসীকে বধ করিয়াছেন সত্য, লক্ষ্মণ স্থূর্পণখার নাকও কাটিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ওই রামায়ণযুগেই আমরা পাই গুহক চণ্ডালকে, শবরীকে, রামভক্ত হনুমানকে। মহাভারতের যুগে তো একেবারে পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং মহাভারতকার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই পুরাপুরি আর্য নহেন, তিনি লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর। পাণ্ডুজননী তাঁহাকে দেখিয়া মূর্ছা গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পিতা ঋষি পরাশর হয়তো আর্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জননী সত্যবতী ধীবরকন্যা। এই সত্যবতী পরে রাজা শান্তনুর ধর্মপত্নীও হইয়াছিলেন। এই মহাভারতেই দেখি, ভীম হিড়িম্বাকে, এবং অর্জুন উলুপীকে, চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিতেছেন। রাজা নহুষ রাক্ষস, উরগ প্রভৃতিকে পালন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেও দেখি, উভয়পক্ষেই অনার্য নৃপতিরা রহিয়াছেন, হীন দাসরূপে নহে, নির্ভরযোগ্য বন্ধুরূপে। গন্ধর্ব, কিন্নর, পন্নগ, দৈত্য, দানব, নাগগণ যদি অনার্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মহিমায় পুরাণ-মহাভারত পরিপূর্ণ। একলব্য, অধিরথসুত কর্ণ, দাসীপুত্র বিদুর, জতুগৃহের নির্মাতা-শিল্পী পুরোচন, মায়াবী অঙ্গারপর্ণ প্রভৃতি যে সব চরিত্র মহাভারতকার উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই হেয়চরিত্র নহেন। মহর্ষি নারদ কুবের-সভার, বরুণ-সভার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে অনার্যদেরই আধিক্য দেখিতে পাই। এ কথা অবশ্য ঠিক, ভীম বক, কির্মীর প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ, শাল্বকে এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরা বহু অনার্যকে ধ্বংস করিয়াছেন; কিন্তু ইঁহাদের মহিমা, ইঁহাদের শৌর্য, বীর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না, রাবণের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনা, কুবেরের অলকাপুরীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় না, তাঁহারা তাঁহাদের ছোট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাল্ব যে আকাশগামী সৌভপুরীতে চড়িয়া পৃথিবী হইতে প্রায় এক ক্রোশ উর্ধ্বে থাকিয়া শরসন্ধান করিতে পারিতেন, এ কথা বেশ সাড়ম্বরেই বর্ণিত হইয়াছে।

মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় যে, অনার্য-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াই হয়তো অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের কল্পনা আর্য ঋষিদের চিত্তে প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ, আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই অনার্যগণ সর্বভূতে – এমন কি, সর্পে, ব্যাঘ্রে, সর্বপ্রকার হিংস্র, অহিংস্র জীবজন্তুতে, বৃক্ষে, প্রস্তরখণ্ডে, আলোকে, অন্ধকারে, সর্বত্র দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন, দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই হয়তো পরবর্তী যুগে আমরা মূর্তিপূজক হইয়াছি, দেবদেবীদের সহিত সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃষ, হংস, পেচক প্রভৃতিরও পূজা করিতেছি।

এই সব হইতে মনে হয়, কালক্রমে আর্যদের সহিত অনার্যদের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রীতির সম্পর্ক সত্ত্বেও শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। তাহারও কারণ, ঘৃণা নয়, সাবধানতা। আর্য ঋষিদের বিশ্বাস ছিল, বেদমন্ত্রের উচ্চারণ যদি নির্দোষ

না হয়, বিশ্বের অমঙ্গল হইবে। যেহেতু শূদ্রদের মাতৃভাষা বৈদিক ভাষা নয়, সেইহেতু তাঁহাদের ভয় ছিল, শূদ্রেরা বৈদিক মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করিবে এবং তাহা হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে তাঁহারা খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। প্রথমে, আর্য রমণীগণের বেদপাঠে অধিকার ছিল। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, বিশ্ববারা প্রভৃতি অনেকেই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। কিন্তু এ-দেশে বহুকাল বাসের পর আর্য রমণীগণের আর্যত্ব যখন কমিতে লাগিল, আর্যগণও যখন অনার্য-রমণী বিবাহ করিতে লাগিলেন, তখন ঋষিরা রমণীদের এবং পতিত আর্যদেরও বেদ-পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। বেদ তখন তাঁহাদের সভ্যতা, শক্তি ও সংহতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল, বেদের পবিত্রতা রক্ষা করা সে যুগে সমস্ত জাতির আত্মরক্ষারই নামান্তর ছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে এখন যে কারণে মৃত্যুদণ্ড হয়, বেদের পবিত্রতা নষ্ট করিলেও সে যুগে ঠিক সেই কারণেই মৃত্যুদণ্ড হইত। ইহাই তখন নিয়ম ছিল, এ নিয়ম পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা রাজারও ছিল না। এইজন্যই শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু, অনার্যদের সম্পর্কে আসিয়া কিছুদিন পরে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, পরে দেখিতে পাই, অনার্য রাজারাও যজ্ঞ করিতেছে। অনার্য দানবরাজা বৃষপর্বা কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাক-সন্নিধানে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞেরই দ্রব্যাদি লইয়া অনার্য ময়দানব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে চমকপ্রদ সভানির্মাণও করিতেছেন, এমন কি অর্জুনের দেবদত্ত নামক শঙ্খটিও বৃষপর্বার যজ্ঞস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পরে দেখি, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ একজন শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত বলিয়া কীর্তিত, নাগরাজ বাসুকি একজন প্রথমশ্রেণীর তপস্বী বলিয়া সম্মানিত, পুরাণকার তাঁহার মস্তকে সমস্ত পৃথিবীর ভার অর্পণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। পরে দেখি, সমস্ত বলশালী অনার্যগণ আর্যসভ্যতার দীপ্তিতে দীপ্যমান, পুরাণের প্রায় সমস্ত প্রতাপশালী দৈত্যদানবেরা তপস্বী, মহর্ষি উশনা দৈত্যদের গুরু-পদে আসীন হইয়া শুক্রাচার্য নামে খ্যাত। আর্যসভ্যতার প্রথম যুগে দেখি, আর্যরা শূদ্রদের ছোঁওয়া অন্নজল গ্রহণ করিতেছেন না। ইহারও কারণ, সম্ভবতঃ ঘৃণা নয়, সাবধানতা। শূদ্ররা পরাজিত, শূদ্ররা অপরিচিত, তাহাদের সামাজিক আচার-আচরণও অদ্ভুত, তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করা তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্যই সমীচীন মনে করিতেন না। প্রথম প্রথম, অপরিচিত অনার্যপরিবেশে তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধানে চলা-ফেরা করিতে হইত। এমন কি, মহাভারতের যুগেও দেখি, পাণ্ডবজননী কুন্তী পুত্রদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন, ভাবিতেছেন, কোনও মায়াবী নিশাচর তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিল না তো। বলা বাহুল্য, মায়াবী নিশাচর মানে অনার্য।

প্রথম প্রথম, কিছুদিন তাঁহারা অনার্যদের বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাই, সম্ভবতঃ তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। আধুনিক কালেও তো দেখি, ট্রেনে নোটিশ দেওয়া রহিয়াছে—"অপরিচিত লোকের নিকট হইতে খাদ্য, পানীয়, এমন কি বিড়ি,

সিগারেট পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন্ না।" আধুনিক সামরিক আইনও এ সব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। এই সতর্কতা কি ঘৃণা ?

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে ঈষৎ অবান্তর হইলেও আর্যদের সহিত শূদ্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ, অনেকে মনে করেন, আর্যরা শূদ্রদের ঘৃণা করিতেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্যরূপ। প্রথম প্রথম, বিজেতাসুলভ মনোভাব হয়তো তাঁহাদের ছিল, কিন্তু, কিছুকাল এদেশে বাস করিবার পর, যে ধর্ম, যে সংস্কৃতির পত্তন তাঁহারা করিয়াছিলেন, যে শিক্ষার আদর্শ তাঁহাদের চিত্তকে ও সমাজকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহাতে ঘৃণার স্থান নাই। জোরজবরদস্তি বা ঘৃণার শাসন স্বল্পায়ু। ন্যায়ের শাসন, প্রেমের শাসন, উদারতার শাসন দীর্ঘজীবী। যে ধর্মের ভিত্তিতে আর্যগণ এ দেশে সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন, তাহা চারি হাজার বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এখনও সগৌরবে টিকিয়া আছে। অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার *The Hindu View of Life* পুস্তকে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মিস্টার ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের যে অভিমত *Oxford History of India* হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—India, beyond all doubt, possesses a deep fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or political superiority. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sect. এই unity, বৈচিত্রের মধ্যেও এই একত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল, কারণ, তাঁহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্রই ছিল একত্বের সন্ধান। ঘৃণার স্পর্শে এই সন্ধান ব্যাহত হইত।

বর্ণাশ্রমধর্মে প্রত্যেক আর্যসন্তানের জীবন চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচর্য-আশ্রম, আর্যজীবনের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে আর্যজীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত। ব্রহ্মচর্যাশ্রম উত্তীর্ণ না হইলে, কোন আর্যসন্তানই পরবর্তী গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। কোনও ভদ্র গৃহস্থ তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদানই করিতেন না। ভিত্তি মজবুত না করিয়া, তাহার উপর হর্ম্য-নির্মাণের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। সত্য ও ধর্মই সে ভিত্তির প্রধান উপকরণ। সত্যের সন্ধান এবং সে সন্ধানের উপযোগী চরিত্র-নির্মাণই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এ কথা তাঁহারা বলিতেন না যে, 'লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই'—কোনও মিথ্যা আশ্বাস বা অলীক মোহের উপর সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমান যুগের দার্শনিক পণ্ডিতগণও আজকাল বলিতেছেন যে, শিশুর মনে, শিক্ষার ছলে, এমন কোনও জিনিস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত নয়, যাহা মিথ্যা, যাহা জীবনের নিকষে যাচাই করিলে মূল্যহীন প্রতিপন্ন হইবে। Alfred North Whitehead তাঁহার *The Aims of Education* প্রবন্ধে এই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে বলিয়াছেন। সে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল, তাহা ব্রহ্মচর্য এই নামের মধ্যেই স্পষ্ট। ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মকে জীবনে উপলব্ধি করাই মানব-

জীবনের চরম পরিণতি, সেই পরিণতিলাভ করিবার জন্ম যে প্রস্তুতি—তাহাই শিক্ষা। কারণ, ব্রহ্মই সত্য, পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র সেই একই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথিবীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা তাহার সত্য রূপ নয়, তাহা মায়াময় রূপ, তাহা মিথ্যা, তাহা ক্ষণস্থায়ী। বহুরূপী, বিচিত্র মায়াযবনিকার অন্তরালে যে সত্য, যে ধ্রুব, যে অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড শক্তি বিরাজমান, তাহার নাম ঈশ্বর, ভগবান ব্রহ্ম, God, Primordial, Energy, যাহাই দিন, তাহাকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ব্রহ্মকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে উপলব্ধি করিতে হয়—এই উপলব্ধির কোন বাঁধাধরা একটা পথ নাই, প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের পথ নিজেই আবিষ্কার করেন, গুরু তাঁহার সহায়কমাত্র। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই—মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য, মুক্তি-লাভ, চাকরি-লাভ নয়, ডিগ্রি-লাভ নয়, কোন-প্রকার ঐহিক সুখ নয়। ঐহিক সুখদুঃখ, ঐহিক জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য পরিণাম, এ কথা তাঁহারা জানিতেন, কিন্তু, তাই বলিয়া তাঁহারা বলেন নাই—Eat, drink and be merry, to-morrow you die. কারণ, ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই দেহটাই মরণশীল, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা অনুভব করি, তাহাই নশ্বর—আত্মা কিন্তু অমর। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মানুসন্ধানই মানবজীবনের একমাত্র শ্রেয়ঃ, আত্মানং বিদ্ধি, তাই আর্য-শিক্ষার প্রধান উপদেশ। Eat, drink করিয়া merry হইতে তাঁহারা মানা করেন নাই, জীবনকে উপভোগ করায় তাঁহাদের সম্মতি ছিল, রাজসিক জীবনের বিবিধ বিলাসকে কেন্দ্র করিয়া বহুপ্রকার শাস্ত্র ও গ্রন্থ তাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের জীবন যে বহুবিধ ক্ষুধায় কাতর, এ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল। কিন্তু, তাঁহারা এই সব ক্ষুধাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং, এই ক্ষুধাপ্রসঙ্গে যে উপদেশ তাঁহারা দিয়াছেন, তাহাই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মূলমন্ত্র। তাঁহারা বলিয়াছেন—জীবনকে ভোগ কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু, আসক্ত হইও না। আসক্তি মানেই বন্ধন, এবং বন্ধনের পরিমাণই দুঃখ। যে অনন্ত পথের তুমি যাত্রী, সে পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে, যদি আসক্তির শৃঙ্খল প্রতি পদক্ষেপে তোমার গতিরোধ করে? সুতরাং আসক্তি ত্যাগ কর, যে কোনও প্রকার আসক্তিই, এমন কি, ব্রহ্মের প্রতি আসক্তিও দুঃখদায়ক। ভোগ কর, কিন্তু ভোগাসক্ত হইও না। আসক্তি তোমার মুক্তিলাভের বাধা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলিতেছেন—The Hindu Gode of practice links up the realm of desires with the perspective of the Eternal. It links together the kingdoms of Heaven and Earth.

এই perspective of the Eternal, ভূমার পটভূমিকায় জীবনকে দর্শন, আর্যসভ্যতার মূল সুর। আর্যঋষি বলিতেছেন—দেহের অবসান ঘটিবে, তোমার বিত্ত, তোমার প্রতাপ, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার অলঙ্কার, অহঙ্কার সমস্তই লুপ্ত হইবে, কিন্তু, তুমি লুপ্ত হইবে না, তুমি অমর, তুমি অনন্ত পথের যাত্রী, তোমার পার্থিব জীবন তোমার

অনন্ত যাত্রাপথের অংশমাত্র, এই অংশটুকুর সম্বন্ধে মোহ-পোষণ করিও না, আত্মবিস্মৃত হইও না, হইলেই কষ্ট পাইবে।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
কামং, ক্রোধং, লোভং, মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবং কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ;
বিদ্ধিব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥

শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর আর্যশিক্ষার সারমর্ম। জীবন সম্বন্ধে সত্যদর্শন এবং দুঃখ-নিবারণের প্রকৃত উপায় যে শিক্ষার লক্ষ্য, সেই শিক্ষাই তাঁহারা জীবনের প্রথম আশ্রমে আর্যসন্তানগণকে দিতেন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন—Of all the peoples of the world, the Hindu is the most impressed and affected by Death as the central fact of Life. He cannot get away from the fact that while man proposes, God disposes. Therefore, he feels, he cannot take life seriously and scheme for it without a knowledge of the whole scheme of creation.

যাঁহারা মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকের অভিমত, মৃত্যুই সম্ভবতঃ আমাদের প্রথম ধর্মশিক্ষক। মৃত্যুই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়—ইহাই কি শেষ? উপনিষদের ঋষি সত্যসন্ধানের নিমিত্ত তাই নচিকেতাকে যমের নিকটে লইয়া গিয়াছেন।

নচিকেতা যমকেই প্রশ্ন করিতেছেন—

মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই,
কেহ বলে থাকে কিছু, কেহ বলে নাই ;
হে যম, তৃতীয় বরে, আজিকে তোমার কাছে
সত্যকথা শুনিবারে চাই।

যম তাহাকে এই সত্যকথা, সনাতন গূঢ় ব্রহ্মকথা পরে বলিয়াছিলেন, প্রথমে কিছুই বলেন নাই। নচিকেতা সত্য-লাভের প্রকৃত অধিকারী কি না, তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাকে প্রলুব্ধ করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—

শতজীবী পুত্র, পৌত্র করহ প্রার্থনা,
পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ দিব চাও যত,
বিশাল রাজত্ব লও,
নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছামত,
এর তুল্য অন্য বর যথা ইচ্ছা, নচিকেতা, করহ প্রার্থনা,

লও বিত্ত, অমরত্ব, রাজা হও বিশাল রাজ্যের —
পূর্ণ কর সকল কামনা ;
মর্ত্যলোকে দুর্লভ যা, সেই সব কাম্য বস্তু
যাহা ইচ্ছা মাগ মোর কাছে,
ওই যে রথের পরে বাদ্যযন্ত্রসহ রমণীরা আছে
মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত ইহারা —
মোর বরে ভোগ কর ইহাদেরও পরিচর্যা-সুখ,
মৃত্যু-বিষয়েতে শুধু, নচিকেতা, হ'য়ো না উৎসুক।

নচিকেতা কিন্তু ভুলিবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন—

অনিশ্চিত মৃত্যুশীল এই সব ভোগ্য বস্তু
জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সুখ,
জীবনই তো ক্ষণস্থায়ী ; বাহন বা নৃত্য-গীত
চাহি না কো, তোমারই থাকুক।

তখন যম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সত্যের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন—

নচিকেতা, তুমি প্রিয়, প্রিয়রূপী কামনাসকল
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়া,
যে বিষয়াকীর্ণ মার্গে বহুলোক হ'ল নিমজ্জিত
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়া ;
অবিদ্যা ও বিদ্যা এরা অতি ভিন্নমুখী
বহমান বিপরীত ধারে,
নচিকেতা, তুমি জানি বিদ্যা-অভিলাষী,
প্রলুব্ধ করেনি শত কামনা তোমারে।
'অবিদ্যা অন্তর-মাঝে সদা বর্তমান
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জ্ঞানবান
অন্ধ-নীত অন্ধসম মূঢ় জেনো তারা
ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রাম্যমান।

কামনা, বিষয়, অবিদ্যা ও অহঙ্কার ইহারা সত্য-জ্ঞানের, ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপন্থী। 'ব্রহ্ম' কথাটা শুনিবামাত্র অনেকে চমকাইয়া ওঠেন, মনে মনে বলেন—ও বাবা। অনেকের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া ওঠে, ভাবেন, এইবার ভণ্ডামির পালা শুরু হইল। ইহার কারণ, ব্রহ্মকে লইয়া সত্যই অনেক ভণ্ড যুগে যুগে বহু লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে,

এখনও করিতেছে। ব্রহ্ম শব্দটাকেই তাহারা অশুচি, অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্ম না বলিয়া যদি বলি Truth, তাহা হইলে, অনেকে হয়তো সম্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। কারণ, আমরা সকলেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে Truth-এর সন্ধানই করিতেছি। এই Truth—এই সত্যই ব্রহ্ম। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বস্তুতঃ, মানব-মনীষার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার একটিমাত্রই উদ্দেশ্য—Truth, সত্য, ব্রহ্ম। মুনি, ঋষি, সত্যদ্রষ্টারা যে কেবল পুরাকালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নয়, এ কালেও তাঁহারা আছেন। এ কালের সত্যদ্রষ্টাদের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের দর্শনের সহিত সেকালের মুনি, ঋষিদের দর্শনের বিশেষ কোন তফাৎ নাই। যম নচিকেতার নিকট ব্রহ্মের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।

আকাশেতে হংস তিনি, অন্তরীক্ষে বসু তাঁর নাম,
বেদীতে তিনিই হোতা, গৃহে তিনি অতিথি ও দ্বিজ—
মানবে, দেবেতে, সত্যে, আকাশেতে তাঁর অবস্থান,
জলজ, ভূমিজ তিনি, সত্যজ, অদ্রিজ—
মহাসত্য তিনি সুমহান্।

একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।
একই বায়ু ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।
সর্বলোক-চক্ষু-সূর্য অশুচিদর্শনে যথা
না হ'ন মলিন
সর্বভূতস্থিত আত্মা নির্লিপ্ত তেমনি
জাগতিক দুঃখমাঝে স্বতন্ত্র অ-লীন।

বাসনাকামনা-রহিত হইয়া এই ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা। কারণ, আর্যঋষিগণের মতে সুখশান্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ করা। ওই যমই নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

সর্বভূত অন্তরাত্মা, এক যিনি, নিয়ন্তা সবার
আপনার একরূপে করেন বহুধা,

তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়—তাঁরা পান নিত্য-সুখ-সুধা।
অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের চৈতন্য-স্বরূপ,
সকলের মধ্যে এক কাম্য যিনি করেন বিধান
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়—তাঁরা পান নিত্য-সুখ-সুধা।
অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের চৈতন্য-স্বরূপ,
সকলের মধ্যে এক কাম্য যিনি করেন বিধান
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়, তাঁহারাই চির-শান্তি পান।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই আমরা আমাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি জানিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সাহায্য করে। এই ব্রহ্মজ্ঞান পুস্তক পড়িয়া অথবা বক্তৃতা শুনিয়া লাভ করা যায় না। ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন, কিন্তু, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে, সাধনা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within, by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrine or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details.

এই ধর্ম-অভিমুখে চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তাহার জন্য ব্রহ্মচারীকে প্রস্তুত করাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের লক্ষ্য।

এখন দেখা যাক, এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিত্বের উন্মেষই ছিল এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, সেইজন্য গুরুর সহিত শিষ্যের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম এবং প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যই গুরুকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবে এবং গুরু যদি শিষ্যকে উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করেন, তবেই তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। এই অধিকার-বিচার সে যুগে একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। এখন যেমন টাকা দিয়া যে কোনও ছাত্র যে কোনও স্কুলে ভরতি হইতে পারে, তখন সে উপায় ছিল না। গুরু শিষ্যকে নির্বাচন করিয়া লইতেন। সে নির্বাচনের মানদণ্ড থাকিত তাঁহার মনে, তাঁহার নিজস্ব বিচারে, বাহিরের কোনও নিয়ম দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হইতেন না। গুরু অসাধু হইলে, এরূপ নিয়মে অনেক

শিষ্যের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে যুগে গুরুরা প্রায়ই অসাধু হইতেন না; যে যে কারণে লোকে সাধারণতঃ অসাধু হয়, সে সব কারণ তাঁহাদের জীবনে আসিবারই সুযোগ পাইত না, তা ছাড়া, বিদ্যাদানে সেকালে অর্থকরী ব্যবসায় ছিল না। যদিও মনুতে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, স্মৃতিচন্দ্রিকাতে লেখা আছে, শিষ্যের ধনদানের ক্ষমতা তাহার অন্যতম যোগ্যতা* কিন্তু, ধনদানটা শিক্ষাব্যাপারে কখনও প্রাধান্য পায় নাই। বিদ্যা বিক্রেয় পণ্য নহে, ইহাই ছিল আদর্শ। আধুনিক যুগেও যাঁহারা বিশেষ কোন গুণীর নিকট বিশেষ কোন বিদ্যা শিখিতে যান, তাঁহাদেরও নির্ভর করিতে হয়, গুরুর নির্বাচনের উপর। অর্থ বা ডিগ্রী সেখানে কোনই কাজে লাগে না। শিষ্য সেই বিদ্যালাভের অধিকারী কি না, তাহাই তাঁহারা বিচার করেন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে একটা উপমা প্রচলিত আছে। গুরুর অন্তর যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ; শিষ্য নিজের অন্তর-প্রদীপটিকে গুরুর প্রদীপের শিখা হইতে জ্বালিয়া লইবে। কিন্তু, প্রদীপ যতই চাকচিক্য-শালী বা বহুমূল্য হোক না কেন, ভিতরের তৈল বা সলিতা না থাকিলে, সে প্রদীপ জ্বলে না। প্রদীপে তৈলসলিতা আছে কি না, তাহার বিচারই অধিকার-বিচার। বীজ বপন করিবার পূর্বে কৃষক যেমন জমির গুণাগুণ বিচার করে, শিষ্যকে গ্রহণ করিবার পূর্বে গুরুও তেমনি শিষ্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। শিষ্য হইবে শ্রদ্ধাবান, সংযতেন্দ্রিয়, শুশ্রূষু; সে হইবে সাধু, শুচি এবং মেধাবী। মনুতে, ছান্দোগ্যে, গীতায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণে শিষ্যের কি কি গুণ হওয়া উচিত, তাহা নানাস্থানে, নানাভাবে, নানা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। বিদ্যার্থীর পাঁচটি লক্ষণ একটি বহুপ্রচলিত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে—

কাকচেষ্টঃ বকধ্যানী শ্বাননিদ্রস্তথৈব চ।
অল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণঃ॥

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয় ১৩৫১ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে 'প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করিয়াছেন।

সেকালে শিষ্য-মনোনয়নের ব্যাপারে আর একটি জিনিসকে তাঁহারা প্রাধান্য দিতেন —সেটি শিষ্যের বংশ-পরিচয়। এ যুগে, এ নিয়ম হয়তো অচল। কিন্তু, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার *Ancient Indian Education* গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরাও এখন এই বংশ-বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন—

"The Investigations of Haggerty. Nash, and Goodenough show further that the educational status and vocation of the parents have a significant co-relation with the level of capacity of the children, as indicated by the Intelligence Quotient. For instance, the children of the professional parents or of those of a higher

*প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি—শ্রীবিমলাচরণ দেব (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫১)

academic standing, possess, on the whole, a higher value of I. Q. The implications of such facts cannot be ignored in the scheme of National Education.

পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ নানারূপ মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া সেকালের আচার্যদের মতোই ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে, সকলে সকলরকম বিদ্যার অধিকারী নহেন। ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণত্বলাভে অধিকারী হইবেন, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কিন্তু হইবার সম্ভাবনা যে বেশি, তাহাও স্বীকার করা শক্ত। তবে, এ কথাও ঠিক যে, বর্তমান সমাজের সর্বস্তরেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্তমান। যাহারা ব্রাহ্মণপ্রকৃতির, যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত, তাহাদের বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার নির্দেশও পাশ্চাত্য মনীষীরা আজকাল দিতেছেন। Dr. Alexis Carrel বলিতেছেন যে, বর্তমান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অবাঞ্ছিত দুর্বল লোকদের মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া সমাজকে এক শোচনীয় অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে। পূর্বে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দুর্বল লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সুস্থ সবলদের জন্য স্থান করিয়া দিত, এখন বিজ্ঞানের জন্য তাহা হইবার উপায় নাই। তিনি বলিতেছেন—Many inferior individuals have been conserved through the efforts of hygiene and medicine. We cannot prevent the reproduction of the weak when they are neither insane nor criminal, or destroy sickly or defective children, as we do the weaklings in a litter of puppies. The only way to obviate the disastrous predominance of the weak is to develop the strong. Our efforts to render the unfit normal are evidently useless. We should, then, turn our attention toward promoting optimum growth of the fit. By making the strong still stronger, we could effectively help the weak. For, the herd always profits by the ideas and inventions of the elite. Instead of levelling organic and mental inequalities, we should amplify them and construct greater men. We must single out the children who are endowed with high potentialities and develop them as completely as possible···Such children may be found in all classes of society, although distinguished men appear more frequently in distinguished families than in others····· ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ডেমোক্র্যাটিক আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকও অধিকারী-বিচারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক কলেজে ভরতি হইবার সময় এখনও ছাত্রদের গুণাগুণ বিচার করা হয়, কিন্তু সে বিচার সাধারণতঃ হয় পরীক্ষার নম্বর হইতে। তাহার

চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুই জোর দেওয়া হয় না। তাই, বোধ হয়; এতদিনের সর্বজনীন শিক্ষাসত্ত্বেও আমরা সমাজে দেখিতেছি—

কবি সে ডাক্তারি করে, ডাক্তার দোকানী,
দোকানী সেতার সাধে,
সেতারী লাঙল কাঁধে
কৃষকের লয়েছে ভূমিকা,
প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।

তাই দেখি—

আমাদের জীবনে প্রচুর
একই ক্ষেতে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।
একটানে পান করি সুরা আর সাবু
নানাবিধ বাবু,
আতরের ছিটা দিই ময়লা কাপড়ে
শতকরা আশী জন গড়ে।

আর্য-সভ্যতার যখন পতন আরম্ভ হইয়াছিল, তখনও হয়তো ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শ ঠিকমতো অনুসৃত হইত না, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ তালিকা হইতেই তাহা অনুমিত হয়। এইবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

গুরুর সম্মতি পাইলে, গুরু-সমীপে শিষ্যের গমনের নাম উপনয়ন—ইহা ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের প্রথম সোপান। গর্ভের মধ্যে জননী যেমন শিশুকে গ্রহণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যকে নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের অধ্যাত্মসাধনা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম দান করেন। তাই, ব্রহ্মচারীমাত্রেই দ্বিজ এবং গুরু পিতৃ-স্থানীয়। শুধু পিতৃস্থানীয় নয়, শিষ্যের জীবনে গুরুই সব। শঙ্করাচার্য তাঁহার গুরুস্তোত্রে বলিতেছেন—

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিষ্যের আদর্শ। তিনি তাঁহার চরিত্র দিয়া, উপদেশ দিয়া, শিষ্যের মনে যে অনুকূল পরিবেশসৃষ্টি করিতেন, সেই পরিবেশে শিষ্য তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইত। সে যে হুবহু গুরুকে নকল করিত, তাহা নয়, গুরু তাঁহার

বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ধর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার চিকাগো বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—The seed is put in the ground and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water ? No. It becomes a plant, it develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water and converts them into plant-substance and grows into a plant.

গুরুও তেমনি শিষ্যের অন্তরে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশসৃষ্টি করিতেন মাত্র। সে পরিবেশের মূল সুর ছিল সত্যান্বেষণ—সত্যের প্রতি, ব্রহ্মের প্রতি মনকে উন্মুখ করিয়া তোলা। শিষ্য নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের মতো করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি করিবে, গুরু তাহাকে সে উপলব্ধির পথে পাথেয় দেবেন মাত্র। ইহা ছাড়া, পরিচ্ছন্ন, সুসভ্য জীবন, সুগঠিত স্বাস্থ্য, নিঃস্বার্থ কর্ম, স্বাবলম্বন, অহঙ্কারত্যাগ, বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃত সাম্য-অর্জনের প্রচেষ্ট' প্রভৃতিও সে পরিবেশের অঙ্গ ছিল। সে পরিবেশের আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল প্রকৃতি। লোকালয় হইতে দূরে শান্ত প্রকৃতির কোলে গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইত। তাহার নাম ছিল তপোবন। রবীন্দ্রনাথ এই তপোবন-বিষয়ের একটি সুরম্য আলোচনা করিয়াছেন। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা, নদী, সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,—ঠেলাঠেলি ছিল না। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে, সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন, সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভ'রে তোলে, তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়—"

উক্ত প্রবন্ধেই তিনি আর একটু পরে বলিতেছেন—"মানুষকে বেষ্টন ক'রে এই যে জগৎ-প্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা, সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশঃ কলুষিত, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা ক'রে মরে..."

এই সব কারণে গুরুগৃহ লোকালয় হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হইত। আর্যসন্তানগণ শৈশবে এই শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে আদর্শচরিত্র গুরুসন্নিধানে শিক্ষার জন্য উপনীত

হইতেন। মনুসংহিতায় আছে,- গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের, গর্ভ-একাদশে ক্ষত্রিয়ের, এবং গর্ভ-দ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া কর্তব্য। অতি শৈশবকালে নিজ নিজ গৃহে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে তাহারা থাকিবে। ডাক্তার Alexis Carrel এবং অন্যান্য অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ যে পারিবারিক শিক্ষাকে শিশুর মানসিক গঠনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়াছেন, সে শিক্ষাকে আর্যগণও প্রাধান্য দিয়াছিলেন। শৈশবকালে নিজ নিজ পরিবারে অতিবাহিত করিয়া তবে তাঁহারা গুরুগৃহে গমন করিতেন। সে গুরুগৃহ আধুনিক স্কুল বা হোস্টেলের মতো ছিল না। তাহাও ছিল তাহাদেরই গৃহের মতো গৃহ। সেখানে আদর্শ-চরিত্র গুরুদেব গৃহকর্তা, জননী-সদৃশা গুরুপত্নী গৃহকর্ত্রী, সেখানেও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, সন্তানসন্ততি, গৃহপালিত পশুপক্ষী যে পরিবেশসৃষ্টি করিয়াছে, তাহা গৃহেরই পরিবেশ। মাতৃ-অঙ্কচ্যুত হইয়া সে হোস্টেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বা বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের কবলে পড়িত না। আর একটি স্নেহকোমল মাতৃ-অঙ্কে স্থানলাভ করিত। গার্হস্থ্য-জীবনের সমষ্টি লইয়া সমাজ। সেইজন্য শিষ্যকে একটি আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া তাহাকে সেই পরিবারের আপন-জন করিয়া লইয়া তবে শিক্ষা শুরু হইত। তাই, অতি বাল্যকাল হইতেই সে পরকে আপন করিতে শিখিত। গুরু ও গুরুপত্নী নিঃস্বার্থভাবে পুত্রবৎ তাহাকে পালন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার মনে এই সত্যটি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে, পরের জন্যই সংসার, অনাত্মীয় অতিথিই সংসারে পূজ্যতম ব্যক্তি, অনাত্মীয় শিষ্যেরাও গুরুগৃহে পরম স্নেহভাজন। গুরুর গৃহ তাহারই গৃহ। প্রতিদিন গুরুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে গুরু তাহার মানসিক প্রকৃতির সেই স্বরূপটি জানিতে পারিতেন, যাহা না জানিলে, প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এক শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ, প্রত্যেকটি শিষ্যের মনের গঠন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। সেকালে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিয়া সমাজের কল্যাণে তাহাকে নিয়োগ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে সকলেই বুঝি জটাজুটধারী কমণ্ডলু-পাণি সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়া আসিত। মোটেই তাহা নয়। সমাজের সর্বস্তরের লোকের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। রাজা, প্রজা, বণিক্‌, ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা, সাধারণ গৃহস্থ, সবরকম লোকই সমাবর্তন-শেষে সমাজে আসিয়া প্রবেশ করিত। সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীর সংখ্যা বেশি ছিল না। যাহারা ছিল, তাহারা প্রকৃতই আধ্যাত্মিক মার্গে বিচরণের যোগ্য; তাহাদের ব্যক্তিত্বই সন্ন্যাস-প্রবণ। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করাই ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইত একটি বিশেষ পটভূমিকায়, সমস্ত আর্যসভ্যতাই এই পটভূমিকার উপর অঙ্কিত। সে পটভূমিকা ব্রহ্মজ্ঞান, ইংরেজি করিয়া বলিলে বলিতে হয়—The Ultimate Reality, The Eternal Truth. বাল্যকাল হইতেই এই জ্ঞান তাহার মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইত যে, বাহিরের পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, প্রত্যেকটি সৃষ্টি, প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র, এই

স্বাতন্ত্র্যেই তাহার মহিমা, তাহার সার্থকতা, কিন্তু, এ কথা ভুলিও না যে, সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছেন ব্রহ্ম, তিনিই নানারূপে নিখিল বিশ্বে নিজেকে বিকশিত করিয়াছেন, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আছেন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হইলেও আমরা সকলেই সেই এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের প্রকাশ। সমস্ত বিশ্ব যেন বহু বিচিত্র শাখাপত্রবিশিষ্ট একটা বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ, কিন্তু, তাহার মূল উর্ধ্বে—ব্রহ্মে।

সনাতন এ অশ্বত্থ নিম্নে শাখা প্রসারিয়া
উর্ধ্বমূল রহে,
ইনি শুক্র, ইনি ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত
সর্বশাস্ত্রে কহে;
অতিক্রম কেহ এঁরে না করিতে পারে
সর্বভূত স্থিত এ আধারে।

শৈশব হইতে প্রকৃত সাম্যবাদের পটভূমিকায় প্রতিটি চরিত্র বিকশিত হইত বলিয়া, ধন, জন, জীবন, যৌবন সমস্তই নশ্বর, ব্রহ্মই শুধু শাশ্বত, অহরহঃ এই সত্যকে সত্যদ্রষ্টা ঋষির সহায়তায় উপলব্ধি করিতে হইত বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সম্যক্ বিকাশ সত্ত্বেও বিরোধ বাধিত না, অশান্তির সম্ভাবনা কম থাকিত। অন্তরের সাম্যভাবই শান্তির মূলকথা। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনেকদিন পূর্বে (কার্তিক, ১৩৩০) 'সাম্যদর্শন' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—"যিনি চিৎ—যিনি পুরুষ—তিনিই আত্মা। তাঁহার সাম্যই সাধনীয়। কে সাধক আছ, সেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পার? কে সাধক আছ, অন্তরের সহিত, কেবল কথায় নহে, কেবল বাহ্যিক আচারে নহে, অন্তরের সঙ্গে সেই সাম্যে আত্মসমর্পণ করিতে পার? আমি জানি, বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ যুবক বলিবেন 'আমি আছি' 'আমি আছি'—কিন্তু তাহা কি প্রকৃত? যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে সংসার অনেকাংশে স্বর্গতুল্য হইত, আত্মদ্রোহ থাকিত না, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব, প্রকৃত নহে। সাম্য উত্তম। ধূর্ততায়, ভণ্ডতায়, বাকচাতুর্যে সে উত্তম বস্তু লাভ হয় না। যাহা উত্তম, তাহা পাইতে হইলে, উত্তম ভাব, উত্তম সাধনা চাই। সকল জাতি মিশিয়া একত্র পান-ভোজন করা, আদান-প্রদান করা, মুখে 'ভাই' 'ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করা, ইহা তো বাহ্য আচরণ, অন্তরের ভাবের বিপরীত বাহ্য আচরণই ভণ্ডতা। অন্তর সাম্যের প্রতি ধাবিত হইলে বৈষম্য স্বয়ং হীনবল হয়, যেমন সাম্যের প্রতিষ্ঠা, তেমনি বৈষম্যের বিসর্জন—যতটুকু সাম্যের বৃদ্ধি, ততটুকুই বৈষম্যের ক্ষয়, এই অনুপাতে যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে প্রথমে অন্তর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রাকৃত বৈষম্যে যাহার মন পূর্ণ, সে ব্যক্তি বাহ্য আচরণে যতই সাম্য-দর্শনের পরিচয় প্রদান করুক, তাহার তাহা ভণ্ডতামাত্র, তাহা সাম্য-সাধনা নহে। সাম্যদর্শন বৈষম্যের ভিতর দিয়াই করিতে হয়, বৈষম্যসমূহকে একত্র করিয়া অন্তরে আবদ্ধ করিতে হয়, অন্তরেই তাহাকে বিলীন করিতে হয়

তাহাতে অন্তরেই সাম্যের নির্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যতদিন বৈষম্য অন্তরে বিলীন না হইতেছে, ততদিন সাম্যের ছায়াদর্শনও ঘটে না। সাম্যের একটা নকলমাত্র লোককে দেখান হয়, যেমন বাঙ্গালার বারবণিতা সীতা, সাবিত্রী সাজিয়া থাকে, সেইরূপ সাম্যদর্শনের একটা সাজ পৃথিবীতে চলিয়াছে। যে সাম্য মহৎ, উচ্চ, পবিত্র, সে সাম্য এই নকল সাম্য নহে……।"

অন্তর পরিষ্কার করিয়া প্রকৃত সাম্য-সাধনাই ছিল সেকালের শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ছিল বলিয়াই শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। আজকাল শিক্ষার লক্ষ্য আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা—লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার জন্য আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ডিগ্রিলাভ করিতে যাই, ডিগ্রিলাভ করিয়া দেখি, গাড়ি-ঘোড়া তো দূরের কথা, অন্নবস্ত্রের সংস্থান পর্যন্ত করিতে পারিতেছি না। সকলেই চাকুরি চাই। বহুকাল পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'সভ্যতার সোপানে, না জাহান্নমের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে বাঙালীজাতির চারিত্রিক দোষ-বিশ্লেষণ করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় অর্থার্জনের সকলরকম পথই বাঙ্গালী নিজের অকর্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে। বাহির হইতে দেশে ধনাগম হইতেছে না। অথচ, অপব্যয় করিতে বাঙ্গালীর কুণ্ঠা নাই…"

দোষ বাঙালীর নয়, দোষ শিক্ষার। যে শিক্ষার বনিয়াদ জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার এই পরিণতি অনিবার্য। সেকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কোনও বস্তু বা বিষয়-সম্পত্তিলাভ নয়, ব্রহ্মলাভ। শৈশব হইতেই গুরু এই আকাঙ্ক্ষাটা শিষ্যের মনে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মলাভের জন্য ডিগ্রির প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চরিত্রের, পুঁথিগত বিদ্যাও অপ্রয়োজনীয়। উপনিষদের ঋষি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন—

অসংযমী, দুশ্চরিত্র অস্থির, অসমাহিত
অধীর অশান্তচিত্ত যিনি,
জ্ঞানী হইলেও এঁরে পাবেন না তিনি।

গুরু যখন দেখিতেন, শিষ্য সংযমী, চরিত্রবান হইয়াছেন, তখনই তাঁহাকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এই অনুমতিই ছিল সমাবর্তন, ইহাই ছিল তখন সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র।

ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করিয়া সমাজের সহিত সেই ব্যক্তিটি যাহাতে খাপ খায়, এ বিষয়েও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সামাজিক অশান্তির মূলে থাকে অহঙ্কার, কামনা, এবং তজ্জনিত অসাম্যবোধ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, এমন কি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিলেও, অহঙ্কার, কামনা, অসাম্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া বা সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগরিত হওয়া সহজসাধ্য নয়, সারাজীবন সাধনা করিলেও অজ্ঞানতার তিমির দূর হয় না। তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অহঙ্কার দূর করিবার একটা সহজ পন্থা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে হইত, গৃহস্থের

নিকট ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিতে হইত যে, অপরের দাক্ষিণ্য ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। এই বিনয়, এই সকৃতজ্ঞ নম্র মনোভাব না থাকিলে সমাজ-সংহতি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

আজকাল ভিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও একটা কুসংস্কার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ যে ভিক্ষা-পরাঙ্মুখ, তাহা নহেন। আমরা বই চাহিয়া পড়ি, সুপারিশ ভিক্ষা করি, 'কন্‌সেসন' ভিক্ষা করি, ধার লইবার ছুতায় টাকাও ভিক্ষা করি—একটু মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, জীবনের প্রতি পদেই "I have the honour to beg"—ইহাই আমাদের জপমন্ত্র, কিন্তু ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার বেলায় আমাদের ইকনমিক্ তত্ত্বজ্ঞান জাগিয়া উঠে আমরা তখন idleness-কে প্রশ্রয় দিতে চাই না। কিন্তু, আমরা ভারতবর্ষের যে সভ্যতাকে লইয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াই, সেই সভ্যতায় ভিক্ষা হীনবৃত্তি নহে, চরিত্রগঠনের এবং মুক্তিলাভের উপায়। আমাদের দেশের মহাপুরুষরা সকলেই ভিক্ষুক। একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, বর্তমান যুগে আমরা খুব কম লোকই মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছি, কিন্তু, যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রায় সকলকেই হীনতম ভিক্ষুকের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই বোধ হয়, একজন ভিক্ষুক আর একজন ভিক্ষুকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

বর্ণাশ্রমধর্মে ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু নিজের জন্য নহে, আশ্রমের জন্য। গৃহস্থগণও ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষা দেওয়া গার্হস্থ্যজীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখনও গৃহস্থেরা যে কর গভর্ণমেণ্টকে দেন, তাহারই একটা অংশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়। সে নির্দেশের উপর দাতা বা গ্রহীতার কোন হাত থাকে না। দেশের শাসনপরিষদ অনেক সময় নিজের খেয়ালখুশী-অনুসারে বাজেট করিয়া শিক্ষার জন্য অর্থ-বরাদ্দ করেন। এ ব্যবস্থায়, সব সময় যে সুফল ফলে না, সব সময় যে সুবিচার হয় না, তাহা আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছি। সেকালে গৃহস্থেরা শিক্ষার জন্য যাহা দিতেন, তাহার কিছুটা অংশ শিক্ষার্থীদের হাতেই দিতেন। ভিক্ষা দ্বারা আর একটা উপকারও হইত। যে গার্হস্থ্য-আশ্রমে ব্রহ্মচারীকে পরে প্রবেশ করিতে হইবে, প্রতিদিন কয়েকটি গৃহস্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহার সুখ, দুঃখ, আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। সে সংসারের সহিত নির্লিপ্ত থাকিয়াও বুঝিতে পারিত, সাংসারিক ব্যাপারে, কত ধানে কত চাল হয়। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমেও এ ধারণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহারা পাইত, কারণ, আশ্রমের সমস্ত কাজই তাহাদের নিজের হাতে করিতে হইত। স্বাবলম্বন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষা ছিল।

বন হইতে কাঠ কাটিয়া, যজ্ঞাগ্নির জন্য সমিধ-সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া গো-সেবা, আশ্রমকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, কৃষিকর্মের সমস্ত কাজই ব্রহ্মচারীকে করিতে হইত। তাহার দিনচর্যাই ছিল কর্মময়। Dignity of Labour, Self-help প্রভৃতির

উপকারিতা বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইবার প্রয়োজন হইত না। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া, প্রকৃতির নানা রহস্যের আভাস পাইয়া, প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারে নিজেই নিত্য নব আবিষ্কার করিয়া, সে সেই উপায়ে আনন্দময় জ্ঞান আহরণ করিত, যাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। রুশো বলিয়াছেন—Don't hurt him by the various sciences, but give him a taste of them and the methods for learning them···Let him not be taught science, but discover it. If you ever substitute authority for reason in his mind, he will no longer reason; he will be nothing but the playing of other people's opinion.

আচার্য কৃপালনী মহাত্মা গান্ধি-প্রবর্তিত বুনিয়াদি-শিক্ষাপ্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন—From Bacon, Montaigne, John Locke, the Encyclopaedists up to the present day philosophers and educationists, it has been one long protest against scholasticism and its divorce from Nature and Reality.

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছিল, তাহার সবটাই ছিল Nature এবং Reality। প্রকৃতির ক্রোড়েই তাহার শিক্ষা হইত এবং যে Reality-র সম্বন্ধে সে উপদেশলাভ করিত, তাহাই একমাত্র Reality, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইত বলিয়া যে মোহ সর্বপ্রকার অনর্থের মূল, সে মোহ তাহার চরিত্রে প্রভাববিস্তার করিবার অবকাশ পাইত না। Alexis Carrel বলিয়াছেন, বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষ আত্মসম্মানহীন, অসহায়, nameless grains of dust। কিন্তু, শিক্ষা যদি সত্য আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে হয়, শিক্ষা যদি বারংবার আশ্বাস দেয়—তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি মহতো মহীয়ান্, তুমি অক্ষয়, অমর, তুমিই ব্রহ্ম, সাধনা করিলেই তুমি তোমার স্বরূপকে উপলব্ধি করিবে, তোমার বিকশিত বৈশিষ্ট্য তোমাকে যে পথেই চালিত করুক না কেন, তুমি একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিবে তোমার লক্ষ্য—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে"। এই শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থী যদি বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, অহঙ্কারশূন্য হইতে পারে, তাহা হইলে নিজেকে কিছুতেই সে আত্মসম্মানহীন, অসহায় nameless grains of dust মনে করিবে না। তাহার বরং মনে হইবে—আমি তুচ্ছ নই, সোঽহম্। মনে হইবে—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
    ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু
    শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করিবেন, আর্যদের শিক্ষাবিধি যদি এমনই চমৎকার ছিল, তাহা হইলে আর্যসভ্যতার পতন হইল কেন? ইহার ঐতিহাসিক একাধিক কারণ আছে, সে সব বিবৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না। উত্তরে, একটি কথাই শুধু বলিব, আদর্শচরিত্র মানবের জীবনেও যেমন উত্থান-পতন আছে, আদর্শ সভ্যতার জীবনেও তেমনি উত্থান-পতন আছে। ইহা অনিবার্য। আধিভৌতিক মানদণ্ডে বিচার করিলে মনে হইতে পারে, আর্যসভ্যতার পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু, তাহার আদর্শের মৃত্যু হয় নাই। চারি সহস্র বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও এ সভ্যতা এখনও সজীব আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"Sect after sect arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundation, but like the waters of the sea-shore in a tremendous earthquake, it receded only for a while, only to return in an all-absorbing flood, a thousand times more vigorous and when the tumult of the rush was over, these sects were all sucked in, absorbed and assimilated into the body of the mother faith…"

এই mother faith বহু বিচিত্ররূপে এখনও ভারতের সর্বত্র বিদ্যমান। বারট্রাণ্ড রাসেল, জোয়াড, আলডুস্ হাক্স্লি, রম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের লেখা পড়িলে মনে হয়, ভারতের বাহিরেও ইহার মহিমা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। এ দেশের মুষ্টিমেয় ট্যাস্-মার্কা কিছু লোকের মধ্যে এই faith-এর মহত্ব হয়তো কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তরে আর্যধর্মের মহত্ব, আর্যসভ্যতার আদর্শ আজও দেদীপ্যমান। মূর্খতম ভারতীয় হিন্দুর সহিতও আলাপ করিয়া দেখুন, দেখিবেন, তাহার অন্তরের অন্তরতম তন্ত্রে এই সভ্যতার সুরটি ঠিক বাজিতেছে।

আমি অবশ্য এ কথা বলিতে চাহি না যে, এই আর্যধর্মের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করিলে, প্রত্যেকটি মানুষ মহাপুরুষ হইয়া উঠিবে। কোনও শিক্ষার আদর্শই সমস্ত মানুষকে একযোগে মহাপুরুষে পরিণত করিতে পারিবে না। মানুষ বড় জটিল জীব। প্রত্যেককে নিজের সাধনার নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে ধীরে ধীরে জটিলতা-মুক্ত হইতে হয়। যে মহাভারতে আমরা আর্যসভ্যতার একটা চিত্র দেখিতে পাই, সেই মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র কি মহাপুরুষ-চরিত? হিংসাজর্জরিত কৌরবদের সহিত ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদের যুদ্ধই তাহার বিষয়বস্তু। কিন্তু পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব-কীর্তনই মহাভারতের চরম বক্তব্য নহে। মহাভারতের চরম বক্তব্য শান্তিপর্বে, যেখানে রাজ্যলাভ করিয়াও যুধিষ্ঠির অনুতপ্তচিত্তে আত্মীয়-নিধন-শোকে আকুল হইয়া সংসারত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট লইয়া গিয়াছেন, যেখানে পিতামহ তাঁহাকে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে নানা গল্প বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—"রাজা প্রথমে ইন্দ্রিয়জয় করিয়া আত্মজয়ী হইবেন, তাহার পর শত্রুজয় করিবেন। সর্বপ্রকার

ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম," যেখানে তিনি বলিতেছেন—"জীবের বিনাশ নাই, দেহ নষ্ট হইলে জীব দেহান্তরে গমন করে। কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার পর অগ্নি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীরত্যাগের পর জীবও সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কার্যনির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন। সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে।"

এই সত্যধর্মই আর্যধর্ম, ইহারই উপর সেকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু, ইহাও সত্য যে, এ শিক্ষা সত্ত্বেও সেকালে দুষ্ট লোকের বা অসুখী লোকের অভাব ছিল না। শিক্ষা বা ধর্ম একটা আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারে। সেকালে শিক্ষার আদর্শ কি ছিল, তাহাই আমি এ প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অনেকে বলেন, এই বৈরাগ্যমূলক মনোবৃত্তিকেই আধুনিক যুগে escapism বলে। এই পলায়নী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?

আর্যশিক্ষা যে বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে, গীতায়, উপনিষদে যে বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত, তাহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে, তাহা সুস্থ, সবল কর্মীর মনোবৃত্তি, তাহা অপরাজেয় যোদ্ধার মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্মকথা পুস্তকে বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। আর্যসভ্যতার মর্মবাণী সে আলোচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"কর্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই, আসক্তি ত্যাগ কর, অর্থাৎ, কর্তব্যবোধে কর্মাচরণ কর, ফলকামনা করিও না, কর্মত্যাগে কিন্তু তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল, সেকালের বৈরাগ্য, সেকালের কর্মসন্ন্যাস। সে কালের যে কালে মনুষ্যজীবনের মূল্য ছিল, মনুষ্য নির্ভীকচিত্তে বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত; জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা আত্মার ঈশিত দ্বারা আবৃত এই মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুদ্ধজ্ঞান এই বৈরাগ্যের প্রসূতি, ভক্তি, তৃপ্তি ও মুক্তি এই বৈরাগ্যের ফল।····সংসারের শোণিত-কর্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষালাভ হয়, তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি···"

এই মনোভাব পলায়নী মনোভাব নহে।

শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় কিছুকাল পূর্বে "বেদ-সংহিতায় নৈতিক আদর্শ" নামক চমৎকার একটি প্রবন্ধে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতি হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, প্রাচীন আর্যগণের জীবনদর্শন কত সুস্থ, কত সবল, কত প্রাণ-দীপ্ত ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তির আভাসমাত্র তাহাতে নাই। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল "পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্"—আমরা যেন শত শরৎ দেখি, আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি। জীবনের বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহারা পলায়নপর হন নাই, নির্ভীক-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং
বীরয়ধ্বং এ তরতা সখায়ঃ।

প্রস্তরসঙ্কুল জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। বন্ধুগণ সংহতশক্তিতে অগ্রসর হও, বীরের মতো চল। এ নদী উত্তীর্ণ হও।

দেবতার নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল—

তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও,
তুমি বীর্যস্বরূপ, আমাকে বীর্য দাও,
তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বল দাও,
তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজঃ দাও,
তুমি মন্যুস্বরূপ, আমাকে মন্যু দাও,
তুমি সাহসস্বরূপ, আমাকে সাহস দাও।

জীবনযুদ্ধে তাঁহারা বীরের মতো অগ্রসর হইয়া জয়কামনা করিতেন—

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ
যুদ্ধন্তে যস্যামা ক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ
সা নো ভূমি এ নুদতাং সপত্না ন সপত্নং
মা পৃথিবী কৃণোতু।

যাহাতে মানবেরা কলরবের সহিত গায়, নৃত্য করে, যাহাতে তাহারা যুদ্ধ করে, যাহাতে রণগর্জন হয়, দুন্দুভি বাজে, সে ভূমি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সরাইয়া আমাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী করুক। বলা বাহুল্য, ইহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে। কিন্তু. তাঁহারা যে পাপপুণ্যবোধহীন বিষয়ী ছিলেন না, তাহার প্রমাণও ওই ঋগ্বেদেই আছে। মানুষ পৃথিবী ভোগ করিবে, সত্যের পথে, ধর্মের পথে থাকিয়া, ওই বৈদিক ঋষিগণই প্রার্থনা করিতেছেন—"যাহা ভিন্ন কোন কর্ম করা যায় না, আমার সেই মন মঙ্গলেচ্ছাযুক্ত হোক। হে পূজ্য দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা যাহা কল্যাণময়, তাহা শুনি, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা যাহা কল্যাণময়, তাহা দেখি।"

সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে প্রাচীন আর্যগণ যে জীবন-দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শান্তি ও আনন্দের সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু নমুনা দিতে গিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। পরিশেষে, একটি কথা শুধু বলিতে চাই। কেহ যেন মনে না করেন যে, অতীতকে ফিরাইয়া আনিয়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপক্ষে আমি ওকালতি করিতেছি। সে প্রয়াস যে হাস্যকর, তাহা আমি জানি। ইহাও আমি জানি, বর্তমানই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। বর্তমানের সমস্যা, বর্তমানের জীবন-স্পন্দন, বর্তমানের সুখ-দুঃখ-জটিলতার একটা বিভিন্নতা আছে, অতীতের মহিমাকীর্তন করিয়া বর্তমানের সে বৈশিষ্ট্য আমি ভুলিয়া যাইতে চাহি না। কিন্তু এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনভূমি বর্তমান। অতীতের অভিজ্ঞতাকে বর্তমান ত্যাগ করিতে পারে না,

যে সব শাশ্বত সত্য অতীতকালে আবিষ্কৃত হইয়া মানবকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল, তাহা অতীতকালে হইয়াছিল বলিয়াই বর্জনীয় নহে। বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকেও অতীত অভিজ্ঞতা দিয়াই সমাধান করিতে হইবে। অতীতকালে লব্ধ জ্ঞানকেই বর্তমান কালোপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমাদের বারংবার এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে কথা আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বহুপূর্বে বলিয়াছেন যে, ধর্মই আমাদের জীবনপথের প্রধান পাথেয়। এ যুগের মনীষীরাও ঠিক ওই কথাই বলিতেছেন। Joad-এর *God and Evil* পুস্তক হইতে দুইচারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—Men, in short, require to be comforted and reassured, and, for this purpose, they invoke forces of reassurance which are felt to be both eternal and unchanging. From this conflict of and combination between these various factors, God emerges to satisfy our desires and fulfil our needs. আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্ম চাই, ভগবান চাই—এ তথ্য চিরপুরাতন, চিরনূতন।

কি করিয়া ধর্মবোধকে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে জাগ্রত করা সম্ভব, আদৌ তাহা সম্ভব কি না, তাহার বাধা কোথায়, পরবর্তী প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিব।

॥ তিন ॥

বর্তমানে কি করিয়া ধর্মকে আমাদের শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তাহার অনুকূল কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে যে সব মনীষী আমাদের নব্যভারতের নির্মাতা, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত, আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রামমোহন রায় যে প্রাচীন বেদান্ত ও উপনিষদ্‌কেই আমাদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, এ কথা সুবিদিত।

বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্বে তাঁহার ধর্মতত্ত্ব নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—ধর্ম বলিতে ভারতবাসীর মনে যে ভাবের উদয় হয়, ইংরেজী 'রিলিজন' শব্দটি সে ভাবের বাহক নয়। তিনি বলিয়াছেন, সংক্ষেপে ধর্মের অর্থ পূর্ণ-বিকশিত মনুষ্যত্ব। উক্ত পুস্তকেই তিনি গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"আমিও সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে যাইতেছি। তিন-চারি হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, 'না, তাহা চলিবে না। আমাদের বিধিগুলির সর্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া যদি এখন চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ হইবে।' হিন্দুধর্মের

সেই মর্মভাগ অমর ; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি।...কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্যজাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ, সকল লইয়াই ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময় ধর্ম কি আছে ?"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাহিত্য ও সাধনা এই ধর্মেরই মহিমা প্রচার করিয়া জগতের শিক্ষিতসমাজে ভারতের বৈশিষ্ট্যকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তিনি এই ধর্মের মাহাত্ম্য-বিশ্লেষণ নানা দৃষ্টিকোণ হইতে করিয়াছেন। কিন্তু, শিকাগো-বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের সারমর্মটি তিনি বলিয়াছিলেন। "Unity in Variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas and tries to force the society to adopt them...The Hindus have discovered that the absolute can only be realised or thought of or stated through the relative and the images ; crosses and crescents are simply so many symbols, so many pegs to hang the spiritual ideas on.

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাশতদল বিকশিত হইয়াছে এই ভারতীয় ধর্মের মৃণালশীর্ষে। ভারতীয় ধর্মই যেন আধুনিক যুগে রবীন্দ্রসাহিত্য- রূপে নূতন মূর্তিতে, নূতন বর্ণে, নূতন ছন্দে, নূতন দ্যোতনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ধর্মই তাঁহার কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, প্রার্থনায় ওতপ্রোত হইয়া আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার সম্মুখে সনাতন অথচ অভিনব বিস্ময়লোকের সন্ধান দিয়াছে। বস্তুতঃ, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে শাশ্বত দেবতাকে তিনি ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারই আরতি তিনি সারাজীবন করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গাহিয়াছিলেন

অহরহঃ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার-বাণী
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসীক, মুসলমান, খৃষ্টানী
পূরব, পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেম-হার হয় গাঁথা
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে, ভারতভাগ্য-বিধাতা।

এই ভারতীয় ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে তিনি যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা আপনারা পড়িয়াছেন, তবু এই প্রসঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

হে ভারত, পতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে,
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার ,
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছে তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব দুঃখে-সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

এই ব্রহ্মময় সনাতন ধর্ম মহাত্মা গান্ধীরও জীবনের প্রেরণা। ইহার মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, আত্মশক্তিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, একমাত্র শক্তি। এই সনাতনধর্মই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, প্রেমই সভ্য-মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। গীতার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "I learnt Sanskrit to enable me to read the Gita. To-day the Gita is not only my Bible or my Koran—it is my mother. I lost my earthly mother who gave me birth long ago, but this eternal mother has completely filled her place by my side ever since. She has never changed, she has never failed When I am in difficulty or distress, I seek refuge in her bosom,

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা হইয়াছেন এই ধর্মেরই প্রভাবে। তাঁহার সমস্ত জীবন এই জননীর নির্দেশেই পরিচালিত হইয়া বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহাদেরও জীবনাদর্শ ভারতীয় সনাতন ধর্মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার কিছু কিছু আমেজ হয়তো কাহারও কাহারও চরিত্রে লাগিয়াছে, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাঁহাদেরও চরিত্রের মূল সুরটা যে ভারতীয়, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদিও তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন—I am an exotic plant : neither of the East nor of the West, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত চিন্তার উৎস ভারতীয় ধর্মেরই মর্মবাণী। তাঁহার *Discovery of India* গ্রন্থে লক্ষ্য করি উপনিষদের মহিমা তাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে বারংবার বিচলিত

করিয়াছে। উপনিষদ্ সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদের অভিমত তিনি সাগ্রহে এবং সগর্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শোপেন-হাওয়ার যেখানে বলিতেছেন—"From every sentence of the Upanishads deep, original and sublime thoughts arise and whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit. In the whole world, there is no study so beneficial and elevating as that of the Upanishads. They are products of the highest wisdom. It is destined sooner or later to become the faith of the people, The study of the Upanishads has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

যেখানে তিনি Max Muller-এর মত উদ্ধৃত করিতেছেন, "The Upanishads are to me, like the light of the morning, like the pure air of the mountains, so simple, so true, if once understood..."

যেখানে তিনি আইরিশ কবি A. E.-র অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন—"The Bhagavat Gita and Upanishads contain such godlike fullness of Wisdom on all things that I feel the authors must have looked with calm remembrance back through a thousand passionate lives, full of feverish strife for and with shadows, ere they could have written with such certainty of things which the soul feels to be sure..."

সেখানে তাঁহার মনও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষির সহিত সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে, চরৈবেতি, চরৈবেতি। পথিক চল, চল।

যেখানে তিনি বলিতেছেন—I have loved life and it attracts me still and in my own way, I seek to experience it, though many invisible barriers have grown up which surround me. But, that very desire leads me to play with life, to peep over its edges, not to be a slave to it, so that we may value each other all the more. Perhaps, I ought to have been an aviator, so that when the slowness and dullness of life overcame me, I could have rushed into the tumult of the clouds and said to myself—

'I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath
A waste of breath the years behind,
In balance with this life, this death.'

সেখানে তিনি সত্য-সন্ধী ভূমা-উন্মুখ ভারতীয় সাধকেরই সমগোত্র। কারণ, ভারতীয় ধর্ম

negation of life নহে, তাহা নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে জীবনকে অবলম্বন করিয়াই সত্যান্বেষণ।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সত্য, আমাদের বর্তমান যুগের অন্য নেতাদের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। পণ্ডিত নেহেরুই তাঁহার *Discovery of India* পুস্তকে শ্রদ্ধেয় সি. রাজাগোপালাচারীর উপনিষদ্ সম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজাগোপালাচারী বলিতেছেন—"The spacious imagination, the majestic sweep of thought and the almost reckless spirit of exploration with which, urged by other compelling thirst for truth, the Upanishad teachers and pupils dig into the 'open secret' of the universe, make this most ancient world's holy books still the most modern and most satisfying."

আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বর্তমানে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সারাজীবন তিনি ভারতীয় ধর্মেরই মহিমাকীর্তন করিয়াছেন, উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম মানব-ধর্ম, জীবন-ধর্ম। তাহা কোন doctrine বা dogma-র কারাগারে আবদ্ধ শুষ্ক নিয়মাবলী-মাত্র নহে।

আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও বিশুদ্ধ ভারতীয় ধর্মেরই সাধক। শুধু, তিনি কেন, উত্তরপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী (ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল প্রবীণ পণ্ডিত আণে, আচার্য নরেন্দ্রদেব, এমন কি, ভিন্নধর্মাবলম্বী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খাঁ, মহম্মদ আসফ আলি, বাঙলার ভূতপূর্ব রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের জীবনাদর্শ ও রচনাবলী হইতে প্রমাণ করা খুবই সহজ যে, ভারতের সনাতন ধর্ম—যাহাকে রবীন্দ্রনাথ মানবধর্ম বলিয়াছেন—যাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—It is the same light coming through glasses of different colours—সেই ধর্ম ইঁহাদেরও প্রত্যেকেরই জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। সে ধর্ম সুস্থ, সবল, অনাসক্ত স্বাধীন মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। কিন্তু, অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, যখন এই সব মনীষীর প্রাণপণ প্রয়াসে ভারতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন যে ধর্ম ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড, সেই ধর্মটাই শিক্ষা হইতে বাদ পড়িয়া গেল।

আমাদের কন্স্টিটিউশনের ২২ নং আর্টিকেলে বলা হইয়াছে—

(১) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds.

(২) No person attending any educational institution recognised by the state or receiving aid out of state funds shall be required to

take part in any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given a consent thereto.

ইহাই বর্তমান আইন। Religion সম্বন্ধে এ আইন অন্যায় নহে, কিন্তু যে ধর্মের স্বরূপ আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা religion নহে, তাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়া সত্য-সন্ধান, তাহা সুস্থ মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা। এক হিসাবে, এই এক-পেশে শিক্ষার মাধ্যমেও আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই ধর্মই অনুসরণ করিতেছি। রসায়নে, পদার্থবিদ্যায়, জীব-বিজ্ঞানে, গণিতে, সাহিত্যে, দর্শনে আমরা সত্যকেই অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু সেই সত্য জীবনের চরম সত্যের সহিত অসংলগ্ন বলিয়া আমাদের জীবনে তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আমরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য মুখস্থ করিয়া ডিগ্রিলাভের কাজে তাহাকে নিয়োগ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেছি। যাহার মূল্য অন্তরের আনন্দিত উপলব্ধিতে, যে উপলব্ধি ব্যতীত সুস্থ, সুন্দর, জীবন অসম্ভব, তাহার মূল্য বাহিরের বাজারে খুঁজিতে গিয়া হতাশ হইতেছি। এই ধর্মহীন শিক্ষাই আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি।

এ কথা মিথ্যা নয় যে, রিলিজনের নামে পৃথিবীর সর্বত্র বহু রক্তপাত হইয়াছে, ইহাও সত্য যে, এই রিলিজনের ওজুহাতেই মাত্র কিছুদিন পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের পাশবিকতা ঘৃণ্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু, আমি যে ধর্মের কথা বলিতেছি, তাহা এ ধরণের religion-এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।

আমাদের স্বাধীনতালাভের পর যে University Education Commission গঠিত হইয়াছিল (১৯৪৮-৪৯), অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ যে কমিশনের নেতা ছিলেন, সে কমিশনও এ বিষয়ে সচেতন।

কমিশন বলিতেছেন—What is responsible for the communal excesses is not religion as such but the ignorance, bigotry and selfishness with which religion gets mixed up. Selfish people in an attitude of cynical opportunism use religion for their own sinister ends. In his thirty-second year, Napoleon professed himself ready to adopt any religion which might serve his purpose.

তাঁহারা বলিতেছেন যে, রিলিজনের এই দ্বন্দ্ব-প্রবণতার জন্যই অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মতো আমাদের রাষ্ট্রও ধর্ম-নিরপেক্ষ secular হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের পার্লামেন্টে যখন বিতর্ক হইতেছিল, তখন ডাক্তার আম্বেদকার বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সমস্ত রিলিজনের সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবার সামর্থ্য রাষ্ট্রের নাই। একটি রিলিজনকে

রাষ্ট্রধর্মের প্রাধান্য দিয়া অন্যান্য রিলিজনকে ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছাও রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়, তাই, তাঁহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়াছেন। নিরপেক্ষতা যে রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হওয়া উচিত, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ধর্মের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইলেও ভাষার ক্ষেত্রে তাঁহারা নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই, একটি ভাষাকেই তাঁহারা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধেই করিয়াছেন এবং হিন্দিকে নির্বাচন করিয়া তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন তাহাও আমি বলিতেছি না, আমার বক্তব্য যে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাঁহারা যেমন একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলেন, তেমনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই উদারতম ভারত-ধর্মের অনুশীলনকেও শিক্ষা-ব্যবস্থায় অন্ততঃ স্থান দিতে পারিতেন। Religion ও secular state সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া University Commission অবশ্য ভারতের উদারধর্মের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন যে, আমাদের রাষ্ট্র যদিও ধর্ম-নিরপেক্ষ, কিন্তু "It dose not mean that nothing is sacred or worthy of reverence. It does not say that all our activities are profane and devoted to the sordid ideals of selfish advancement. We do not accept a purely scientific materialism as the philosophy of the state. That would be to violate our nature, our 'Svabhava', our characteristic genius, our 'Svadharma'. Though we have no state religion, we cannot forget that a deeply religious strain has run throughout our history like a golden thread. Besides, in the preamble to our constitution, we have the makings of a national faith, a national way of life, which is essentially democratic and religious."

অর্থাৎ, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ধর্মের উদার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

এ কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন—"The adoption of the Indian outlook on religion is not inconsistent with the principles of our constitution."

ইহার পর তাঁহারা Indian Outlook on Religion সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতিশয় চমৎকার। তাহাতে এ কথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে—"If religion is a mother of realisation, it cannot be reached through a mere knowledge of dogmas. It is attained through discipline, training, Sadhana. What we need is not formal religious education, but spiritual training…"

কিন্তু, এই spiritual training কি করিয়া লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। কেবল নিজের চেষ্টায়—যাহাকে তাঁহারা self-effort বলিয়াছেন—আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া শক্ত।

কোনও শিক্ষার পথেই কেবলমাত্র self-effort দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন কি, চুরি-বিদ্যা, পকেটকাটা-বিদ্যার জন্যও গুরু চাই। দুই-একজন অসাধারণ ছাত্র হয়তো self-effort দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ছাত্রেরা তাহা পারিবে না। University Commission যে শৃঙ্খলা, যে সংযম, যে সাধনার মহিমাকীর্তন করিয়াছেন, যে স্বাধীন জিজ্ঞাসু সত্তার উদ্ভব, তাঁহারা ছাত্রদের মধ্যে মূর্ত দেখিতে চাহিয়াছেন, অন্য ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব তাঁহারা প্রতি ভারতবাসীর নিকট প্রত্যাশা করেন, তাহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না, যদি ছাত্রদের বাল্যকাল হইতে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশে মানুষ না করা হয়। সেকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই পরিবেশ ছিল। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই। University Commission অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আলোচনায় ভারতবর্ষের আদর্শকে তাঁহারা মুখ্য স্থান দিয়াছেন, এ কথা সত্য, কিন্তু, শিক্ষার যেটা আসল ভিত্তি—সুস্থ, সবল চরিত্র-নির্মাণ, সেখানেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গলদ রহিয়া গিয়াছে। University Commission dogma এবং competitive indoctrination-এর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু, এই dogma এবং competitive indoctrination কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ বিভিন্ন-রূপে মূর্ত হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করিতেছে না? আমরা প্রত্যেকেই আজ এক বা একাধিক ইজ্‌মের কবলে পড়িয়া বা স্কন্ধে চড়িয়া আত্মভ্রষ্ট হইয়াছি। শুধু কমিউনিজ্‌ম্ নয়, গান্ধী-ইজ্‌ম্‌ও আজ আমাদিগকে কম বিব্রত করিতেছে না। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ কেহ অনুসরণ করেন না, কিন্তু, তাঁহার নামে দল পাকাইতে অনেকেই উৎসুক। সত্যশিক্ষার ভিত্তিতে চরিত্রগঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ যে কোনও মহৎ আদর্শকে লোকে dogma ও doctrine-এ পরিণত করিবে। University Commission truly religious man-এর স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—The truly religious man is the enemy of the established order, not its spokesman. He is the man of alien vision. He throws existing things into confusion. He is a revolutionary, who is opposed to every kind of stagnation and hardening. He is the advocate of the voice which society seeks to stifle, of the ideal to which the world is deaf.

ভারতবর্ষের ধর্মজগতের ইতিহাসে এরূপ truly religious man-এর বারংবার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু, কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়া এরূপ truly religious man সৃষ্টি করা যায় না, প্রত্যেক বালককে বাল্যকাল হইতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে হয়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রে সে সুযোগ আপাততঃ নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম চিরকাল-প্রগতিশীল। তাহা কোনওকালে stagnation-কে প্রশ্রয় দেয় নাই। বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড যখন সমস্ত জাতির প্রাণসত্তাকে আবিল করিয়াছিল, তখন আমরা পাইয়াছিলাম উপনিষদের ঋষিদের, গৌতম বুদ্ধকে। বৌদ্ধধর্মের যখন অধঃপতন ঘটিল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় যখন "বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া উঠিল" তখন আবির্ভূত হইলেন কুমারিল ভট্ট, তাহার পর শঙ্করাচার্য, তাহার পর রামানুজ। মুসলমানের আমলে আমাদের নৈতিক জীবন যখন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমরা পাইয়াছিলাম শ্রীচৈতন্যকে। যে কয়জনের নাম করিলাম, ইঁহারা প্রত্যেকেই শৈশবকালে আর্যধর্মের আদর্শ-অনুসারে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে ইংরেজের আমলে জড়বাদের কবলে আবার যখন আমাদের দেশের ধর্ম বিপন্ন, তখন যে সব বিদ্রোহী সমাজ-সংস্কারকদের আমরা পাই, তাঁহারা যদিও বাল্যকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অতিবাহিত করেন নাই, কিন্তু, তাঁহাদেরও জীবনের আদর্শ ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই আদর্শ। রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিকশিত করিয়াছেন।

এই ব্রহ্ম, এই সত্য সকল ধর্মেরই মূল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য, প্রতি ধর্মের ক্ষেত্রে নামটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর সুধী ও সাধকসমাজ বারংবার সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সুখশান্তির আশা নাই। কিন্তু কেবলমাত্র self-effort দ্বারা এই ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য self-effort প্রয়োজন, সাধনার ক্ষেত্র পাইলেও সকলে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় না, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্র না থাকিলে তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ পায়। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে সেরূপ ক্ষেত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই।

আমি অবশ্য ইহা দাবি করিতেছি না যে, আমাদের রাষ্ট্র গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়া দিন এবং সেখানে ছাত্রেরা দলে দলে গিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করুক। এরূপ ব্যবস্থা করিলে যে, রাতারাতি আমরা সকলে ধার্মিক হইয়া উঠিব, এ অসম্ভব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু, এ ক্ষোভ আমার আছে যে, ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোন ছাপ নাই, ভারতীয় রাষ্ট্রও পৃথিবীর অন্যান্য জড়বাদী রাষ্ট্রের অনুকরণমাত্র। আজ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশের চিন্তানায়কগণ জড়বাদের ভীষণ ভবিষ্যৎ দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আশা করিতেছেন যে, ভারত-ধর্মই পৃথিবীতে একদিন হয়তো শান্তির পথ প্রদর্শন করিবে, তখন ভারত-রাষ্ট্র কিন্তু নকল করিতেছে জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদের, তাহার সমস্ত উৎসাহ ও ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে কেবলমাত্র আধিভৌতিক উন্নতির উপর। পৃথিবীতে শান্তির পথ দেখাইতে হইলে জাতির চরিত্রে যে অধ্যাত্মবোধ জাগরূক করা দরকার, সে সম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্র উদাসীন। আজ একমাত্র বিনোবাজীর কর্মে ও বাণীতে ভারতের

শাশ্বত আহ্বান শোনা যাইতেছে, কিন্তু তিনি শাসন-পরিষদের কেহ নহেন। তিনিও দেশের আধিভৌতিক দুঃখমোচনের জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু, তাঁহার পদ্ধতিতে ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ সুরটি লাগিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর সভ্যসমাজ আজ মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়াছেন। আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রে সে সুর নাই। পরাধীনতার ফলে আমরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি, তাহা সত্য, আমাদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করা যে সর্বাগ্রে দরকার, এ কথাও সত্য, কিন্তু স্বদেশে সেই অন্নবস্ত্র উৎপাদন করিবার জন্য যে চারিত্রশক্তি প্রয়োজন, তাহার দিকে মন না দিলে সমস্তই বৃথা হইবে। হইতেছেও। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের দুঃখমোচনের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন ; চাষ, জমি, ট্রাক্টার, সার, জলসেচনের ব্যবস্থা, গরু, ছাগল, মুরগী, মৎস্যের উন্নতি, বড় বড় নদীকে বাঁধিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন ; এ সমস্তের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু, যে পরিমাণ সুফল আমরা আশা করিয়াছিলাম, সে পরিমাণ সুফল হয় নাই। তাহার কারণ, যে সুস্থ, সমর্থ, চরিত্রবান্ মানুষ সমস্ত কর্মের প্রথম ও প্রধান উপাদান, সে রকম মানুষই আমাদের দেশে বেশি নাই। যে ইংরেজীশিক্ষা আমরা স্কুলে, কলেজে এতদিন লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে গলদ ছিল, তাহা ধর্মহীন ছিল, ইংরেজেরা আমাদের শক্ত, সমর্থ, চরিত্রবান্ মানুষ করিতে চান নাই, মেরুদণ্ডহীন কেরানি করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষাপদ্ধতিতেও সে গলদ বর্তমান। আধিভৌতিক উন্নতির জন্য হয়তো আমাদের বাধ্য হইয়া এই অপটু, অসাধু লোকদের লইয়াই কাজ চালাইতে হইবে কি, যদি ভবিষ্যতের জন্য আমরা সাধু, সচ্চরিত্র কর্মী-সৃষ্টির আয়োজন না করি, আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না, সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যে আজ আধিভৌতিক জগতে এত উন্নত, তাহার কারণ, তাহাদের চরিত্র। তাহাদের শিক্ষাবিধিও চরিত্র-নির্মাণকেই প্রাধান্য দিয়াছে। কেবল, নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করাই সে দেশের চরম লক্ষ্য নয়। তাহাদের লক্ষ্য জীবনকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার শক্তি অর্জন করা। তাঁহাদের দেশের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Mr. Whitehead বলিয়াছেন—I lay it down as an educational axiom, that in teaching, you will come to grief as soon as you forget that your pupils have bodies. তাঁহাদের শিক্ষাটা ভোগমুখী, তাই তাঁহারা আজ ভোগের শিখরে সমাসীন। প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয় রাজারা রাজসিকতার আধার ছিলেন, তাঁহারাও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করিতেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাদের চরিত্রে সেই শক্তি সঞ্চার করিত, যাহা না থাকিলে ভোগও করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণও যদি আমরা করিতে চাই, তাহা হইলেও চরিত্র-নির্মাণ করিতে হইবে। ভোগের শিখরে চড়িয়া আজ পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা অবশ্য বুঝিতেছেন যে, ধর্মহীন ভোগসর্বস্ব শিক্ষার পরিণাম আণবিক বোমা, বহুকাল পূর্বে তাঁহাদেরই কবি Coleridge যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"If a man is not

rising upward to be an angel, depend upon it, he is sinking downward to be a devil. He cannot stop at the beast. The most savage of men are not beasts, they are worse, a great deal worse"—সেই বাণীর মর্ম তাঁহারা এখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাই, তাঁহাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এখন ভারতবর্ষের বেদে, উপনিষদে, গীতায়, তন্ত্রে angel হইবার সত্যপথ-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ, আজ তাঁহারাও বুঝিতেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র বিষয় নয়, বস্তু নয়, bodies নয়,—ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি।

আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ দেশবাসীদের চরিত্রবান্, কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই, তাহা হইলে ধর্মকেই শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পূর্বে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে—সত্যই কি আমরা চাই যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করুক? আমাদের সত্যই যদি সে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উপায়ের অভাব হইবে না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এ বাক্য মিথ্যা নহে। ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ হোক, ইহা আমরা অন্তরের সহিত কামনা করিয়াছিলাম ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কোন বাধাই আমাদের নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। আমাদের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস আমাদের ভাবনা-অনুযায়ী সিদ্ধির ইতিহাস। প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে অনুশীলন-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবকযুবতীরা মৃত্যুবরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পুলিসের লাঠির সম্মুখে তাহাদের উন্নত শির অবনত হয় নাই, কামান-বন্দুক, নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড তাহাদের ভীত করিতে পারে নাই। শুনিয়াছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু রাত্রে ঘরের খালি মেজেতে শুইয়া জেল খাটিবার মহড়া দিতেন। নির্যাতনের জন্য অনেক পূর্ব হইতেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের অগণ্য আবালবৃদ্ধবনিতা স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাণদান করিয়াছে, অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত আমরা নানাভাবে যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল বলিয়া সে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা চরিত্রে, মনে, স্বাস্থ্যে, শক্তিতে প্রকৃত ভারতবাসী হোক, এ আকাঙ্ক্ষা সত্যই যদি আমাদের মনে জাগে, তাহা হইলে তাহাও সফল হইবে।

কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সত্যধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। আমরা যে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছি, তাহা নয়, বহুকাল পরাধীনতার ফলে, আমাদের ধর্ম এক বিকৃত তামসিক রূপ ধারণ করিয়াছে। ধর্ম আজকাল আমাদের হেঁসেলে ঢুকিয়াছে, তাবিজে, মাদুলিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কতকগুলি লোককে অতি সাবধানী, ভীতু, কতকগুলি লোককে অতি ভণ্ড, ধাপ্পাবাজে পরিণত করিয়াছে, আবার কতকগুলিকে করিয়াছে পলাতক। এই ধর্মের প্রভাবে কোষ্ঠী

এবং পাঁজি আমাদের জীবনে কায়েমী আসন দখল করিয়াছে, ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন লিখিয়াছেন—

বুঝেছি আত্মা অবিনশ্বর, বুঝেছি মিথ্যা দুনিয়া
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি
তাই পথ চলি দিনখন দেখে খনার বচন শুনিয়া
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি
ইহলোকে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক
আমরা রহিনু পরকালে হাত পাতি।

আর একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

হারু সন্ন্যাসী বেশ তো—বাঃ
কামনা না যাক কামানো ঘুচেছে
বেড়ে চলে দাড়ি বেশ তোফা
কিছুই না করে বছর ভর খেতে চান
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান
বিনা খরচায় গাঁজাচর্চায় মেতে যান
অহো, নমো তায়,
পলাতক ইনি ছাড়ি সুত-জায়া
ছাড়ি যত মায়ামমতায়।
অহো, নমো তায়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে ও রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুকে এ জাতীয় ব্যঙ্গরচনা অনেক আছে। বস্তুতঃ, যে ধর্ম মানুষকে নিষ্কাম, নির্ভীক, শান্ত ও উদার করে, সেই ধর্মই তামসিকরূপে আজ অনেককে বিষয়ী, কামুক, অশান্ত ও নীচ করিয়া তুলিয়াছে। গুরু-করা আজ-কাল শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছে, বিরিঞ্চিবাবা-জাতীয় গুরুরও অভাব নাই, কিন্তু ধর্মে প্রকৃত আগ্রহ জাগিলে, রাত্রিশেষে সূর্যালোকবৎ যে আনন্দচ্ছটা জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়, সে রকম আনন্দিত জীবন তো বড় একটা দেখিতে পাই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি, ধর্মও পণ্য বা সামাজিক অসুবিধা পাইবার যন্ত্রমাত্র। আমি যাহা বলিলাম, সর্বক্ষেত্রে তাহা হয়তো সত্য নয়, প্রকৃত সাধুও সাধক নিশ্চয়ই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশের শাশ্বত ধর্মকে সেবায়, শিক্ষায়, কর্মে, সংস্কৃতিতে রূপদান করিবার জন্য যে সন্ন্যাসীর দল গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার নিদর্শন। ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের ভিতরের খবর আমি বেশি জানি না, কিন্তু বাহির হইতে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি,

তাহাতে ইহাদের সম্বন্ধে মনে শ্রদ্ধাই জাগিয়াছে। দেশে প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আছেন, তাহা না হইলে, দেশ রসাতলে যাইত।

কিন্তু, এ কথাও সত্য যে, সত্যধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাতির মনে ব্যাপকভাবে এখনও জাগে নাই। আমরা এখনও আন্তরিকভাবে কামনা করিতে পারিতেছি না যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত মানুষ হোক। লেখা পড়া শেখে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই—এ মোহ এখনও আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু, সে বিদ্যালয়ের আদর্শ আমাদের দেশবাসী তেমন উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন— দেশের যারা ভাল ছেলে, তারা আমার ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে খুব কম এসেছে। যে সব ছেলের কোথাও কিছু হল না, তারাই এসে আমার বিদ্যালয়ে ভিড় বাড়াতে লাগল…"

এইজন্যই ক্রমশঃ তাহা সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল এবং এখন যাহা বিশ্বভারতী নামে পরিচিত, তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণমাত্র।

আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শকে বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া যে বনিয়াদি শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাও আমাদের যে রাষ্ট্রে মহাত্মা গান্ধী Father of the Nation বলিয়া কীর্তিত, সেই রাষ্ট্রেও বনিয়াদি মর্যাদা দিতেছেন না। মুখ্যতঃ, যে চারিটি প্রস্তাবের উপর বনিয়াদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই—

(১) এই শিক্ষা প্রাথমিক, সর্বজনীন, অবৈতনিক (compulsory) এবং সাতবৎসরব্যাপী হইবে।

(২) শিক্ষার বাহন হইবে কর্ম। সমাজ ও পরিবেশের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকিবে।

(৩) এই শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে।

(৪) শিক্ষার ভিত্তি হইবে সত্য ও অহিংসা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল শিক্ষাদর্শের সহিত ইহার কোনও তফাৎ নাই। মহাত্মা গান্ধীকে বনিয়াদি শিক্ষায় ধর্মের স্থান কি হইবে, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—We have left out the teaching of religions from the Wardha Scheme of education, because, we are afraid that religions, as they are taught and practised to-day, lead to conflict rather than unity. But, on the other hand, I hold that the truths that are common to all religions can and should be taught to all children.

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। এই আদর্শের কথাই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিকাগো-বক্তৃতায় পৃথিবীর সজ্জন-সমাজকে শুনাইয়াছিলেন—

"As the differert streams having their sources in different places

all mingle their water in the sea, so, O Lord, different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee..."

আমাদের বর্তমান কনষ্টিটিউশনের সহিতও ইহার বিরোধ নাই—কিন্তু, তবু বুনিয়াদি শিক্ষা দেশবাসীর বা স্বদেশী রাষ্ট্রের আন্তরিক সমর্থনলাভ করে নাই।

শুনিয়াছি, যে সব ছাত্রের শহরের স্কুলে আসিয়া পড়িবার সুবিধা বা সামর্থ্য নাই, তাহারাই বনিয়াদি বিদ্যালয়ে গিয়া ভরতি হয়। শুনিয়াছি, গান্ধীভক্ত মন্ত্রীদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ-পরিচালিতস্কুলে গিয়াই ভরতি হইয়াছে, কিংবা ভরতি হইতে চায়। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ছেলেমেয়েদের বনিয়াদি বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চান না। ভাল শিক্ষকও সেখানে কম আছেন। শুনিয়াছি, যে সব শিক্ষকের অন্য কোথাও ভাল চাকরি জোটে না, তাঁহারাই অগত্যা গিয়া এই সব বনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

অর্থাৎ, দেশের লোকদের এ বিষয়ে সত্য আগ্রহ জাগে নাই। যদি জাগিত, তাহা হইলে রাষ্ট্রের সাহায্যভিক্ষা কাহারও প্রয়োজন আমরা অনুভব করিতাম না। গৃহেই আমরা এ ব্যবস্থা করিতাম। আমরা আমাদের ছেলেদের বিলাসী, অকর্মণ্য, পরনির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছি, কারণ, আমরা নিজেরাই বিলাসী, অকর্মণ্য, পরনির্ভরশীল। ছেলেদের সেই আদর্শে গড়িতে চাই, বুঝি না যে, ইহাতে কি সর্বনাশ হইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ ছিল না, কিন্তু, সেজন্য জ্ঞানের ধারা অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই, শিক্ষকেরা নিজ নিজ গৃহেই ছাত্রদের গ্রহণ করিতেন। ছাত্রেরা তাঁহাদের গৃহে গিয়া তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইতেন। আমরা ইচ্ছা করিলে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। এ ব্যবস্থায় আর কিছু না হউক, আর্থিক সুবিধা যে হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, সেকালে যাহার যেমন সামর্থ্য, সে তেমনই গুরুদক্ষিণা দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিত, এ বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম ছিল না। এ কালের শিক্ষকরাও এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই রাজি হইবেন, যদি তাঁহারা ছাত্রের মধ্যে প্রকৃত জিজ্ঞাসু এবং ভক্ত সেবককে দেখিতে পান। কিন্তু, তাহাই তাঁহারা পাইবেন না। এখানে ছাত্রের পিতামাতারা ছেলেদের গুরু-গৃহে ভৃত্যের মতো কাজ করিতে দিতে সম্মত হইবেন কি? সেকালে গুরুদক্ষিণা সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না বটে, কিন্তু, এ নিয়মটা আবশ্যিক ছিল—শিষ্যকে গুরু-গৃহে গৃহকর্ম করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবে কায়েন, মনসা, বাচা গুরুকে সেবা করা প্রত্যেক ছাত্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল। অধ্যাপক আলটেকার মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ছাত্র গুরুকে সেবা করিবে অগ্নির মতো, দেবতার মতো, রাজার মতো, পিতার মতো, ভর্তার মতো। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু গুরুকুলে—**"The student was expected to do personal service to the teacher like a son, suppliant or slave. He was to give him**

water and toothstick, carry his seat and supply him bath-water. If necessary, he was to cleanse his utensils and wash his clothes. He was further to do all sundry work in his monastery or his teacher's house like cleansing the rooms, bringing fuel, etc... Tradition asserts that even great personages like Srikrishna had deemed it an honour to do all kinds of menial work in their preceptor's house during their student days.

অভিজাত মুসলমান-সমাজেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলমগীরের পুত্র মহম্মদ নিজ হস্তে তাঁহার গুরুর কর্দমাক্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া দেন নাই বলিয়া আলমগীর বিরক্ত হইয়াছিলেন শুনিতে পাই।

যে Dignity of Labour লইয়া আজকাল আমরা মুখে আস্ফালন করি, কিন্তু, যাহার আভাস পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নাই, তাহারই পরিপূর্ণ রূপ কর্মযোগ। সেকালে গুরু-গৃহে এই কর্মযোগেরই ভিত্তি স্থাপিত হইত। অনেকে হয় তো বলিবেন. "মশাই, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু, সে রকম গুরু কোথায় ?"

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে ১৩১৩ সালে তাঁহার 'শিক্ষাসমস্যা' নামক প্রবন্ধে দিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু, গুরু তো ফরমাস দিলেই পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে, তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না, এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু, এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে, অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না, এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্য যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি, তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়, একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে, বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের-শিক্ষক করি, তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি, যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মস্তিষ্ক জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু, এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও, তবে স্বভাবতঃই তাঁহার হৃদয়-মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য, তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়েও কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি উত্থাপিত না হইলে, অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে,

দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে, তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে…”

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অন্তর হইতে এ প্রার্থনা এখনও উত্থিত হয় নাই। তাই, আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাই নাই; গান্ধীজীর বনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমন উৎসাহী নহি। তাহার কারণ, শিক্ষাকে এখনও আমরা অর্থের মানদণ্ডেই বিচার করিতে উৎসুক, সত্য-শিক্ষার মানদণ্ডে নয়। আমরা এ কথা এখনও অন্তর দিয়া উপলব্ধি করি নাই যে, অর্থ উপার্জন করিতে হইলেও ডিগ্রি অপেক্ষা সত্যের ভিত্তিতে নির্মিত চরিত্রই বেশি কার্যকরী। আমাদের এই বোধ জাগরিত না হইলে রাষ্ট্রের বা সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদের আপাত-উন্নতির বুদ্বুদ সামান্যতম আঘাতেই ফাটিয়া যাইবে। ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে, অন্নবস্ত্রের জন্যও তাই আমরা পরমুখাপেক্ষী। সত্যের একমাত্র উৎস যে সত্য-শিব-সুন্দর, তাহার প্রতি আগ্রহবান্ না হইলে আধিভৌতিক সুখসুবিধাও আমরা লাভ করিতে পারিব না। পিতামাতাদের মনে যদি এ আগ্রহ জাগে, তবেই আমরা ধর্মকে—সত্য-মানবধর্মকে—শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভারতবাসী নামের যোগ্যতা দান করিতে পারিবে।

এ আগ্রহ জাগাইবার কোনও উপায় আছে কি? একটি উপায় আছে। কিন্তু, সে উপায়ের পথও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সে উপায় সাহিত্য। সৎসাহিত্য মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারেই সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে, মহৎমানবত্বের দিকে আকর্ষণ করে। আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ ইচ্ছা করিলে ব্যাপকভাবে সৎসাহিত্য-প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাহিত্যের জন্য কিছু অর্থবরাদ্দ করিয়া বা সাহিত্যকে উৎসাহ দিবার নামে নিজেদের পেটোয়া লোকদের কিছু বকশিশ বা মেডেল দিলে তাহা সম্পন্ন হইবে না। আন্তরিকভাবে সেজন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আহ্বান করিয়া যাহাতে গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে সহজে সুলভমূল্যে কথকতা, অভিনয়, সিনেমা, লাইব্রেরি প্রভৃতির মাধ্যমে সৎসাহিত্য প্রচারিত হয়, জনসাধারণের অন্তরে যাহাতে তাহা প্রবেশ করে, এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। করা কিছু অসম্ভব নয়। ইউনিভার্সিটি কমিশনও ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যে ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য করিতে বলিয়াছেন, তাহা ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশের জন্য করা কি অসম্ভব? দেশের উন্নতির জন্য ছাগ-পরিদর্শক, মুরগী-পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছে, দেশের প্রকৃত উন্নতি যে সাহিত্যের মাধ্যমে হয়, সে সাহিত্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করিলে তাহা কি খুব অন্যায় দাবি হইবে?

প্রশ্ন উঠিবে, সাহিত্য বলিতে কি বোঝায়? যাহাই ছাপার অক্ষরে বাজারে বাহির হয়, তাহাই আজকাল সাহিত্য-পদবাচ্য। কিন্তু, মানুষের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত করে সৃষ্টিধর্মী কাব্য-সাহিত্য। পুরাকালে তপোবন সমাজের যে স্থান

অধিকার করিয়াছিল বর্তমান যুগে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এখন সৎসাহিত্যের উপবনেই আমরা সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাই।

আধুনিক জগৎ যখন বস্তুবাদের স্থূল চাপে ম্রিয়মাণ হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে, তখন আমরা বিবেকানন্দের সাহিত্য হইতে আশ্বাস পাই—Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free and you will be free.

রমা রলঁ্যা তখন উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—উত্তিষ্ঠত! চিত্তকে সকল আপস, সকল হীন মৈত্রীবন্ধন, সকল ছদ্মবেশী দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। চিত্ত কাহারও দাস হইতে পারে না। আমরাই চিত্তের দাস। আমাদের আর কোন প্রভু নাই। এই স্বাধীন চিত্তের আলো বহন করা, তাহাকে রক্ষা করা এবং পথভ্রান্ত মানুষকে ইহার আশ্রয়-ছায়ায় ডাকিয়া আনাই আমাদের কাজ—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আমাদের দেখাইয়া দেন—মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি হইবেন। তিনিই বলিয়া দেন, মাতৃপূজায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ধন নয়, ঐশ্বর্য নয়, এমন কি প্রাণও নয়, ভক্তি।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে' কেমন করে' সইব
বাতাস আলো গেল মরে' একী রে দুর্দৈব
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে—
গান আছে যার উঠ না গেয়ে—
চলবি যারা চল রে ধেয়ে—
আয় না রে নিঃশঙ্ক
ধূলায় পড়ে' রইল চেয়ে ঐ যে অভয়-শঙ্খ।

বস্তুতঃ, সৎসাহিত্যই এই যুগে অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। এই আণবিক বোমা-ভীত, ইজ্‌ম-কণ্টকিত স্বার্থপরতার যুগও কবির বাণীকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই। আজও আমরা সাগ্রহে বিশ্বাস করিতে চাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আর্ত, অসহায় মানব আজও উৎকর্ণ হইয়া প্রাচীন কবিঋষির উচ্ছ্বসিত বাণী শুনিতেছে—হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর, তমসার পরপারে আমি আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি।

সাহিত্যই আমাদের একমাত্র পথ, একমাত্র পথপ্রদর্শক। আধুনিক ভারতের নবজাগরণের মূলে ছিল এই সাহিত্য। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের এবং আরও অনেকের সাহিত্যসাধনাই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে। মহত্তর সংগ্রামে আমাদের যদি আবার অবতীর্ণ হইতে হয়, এই সাহিত্যই

আমাদের প্রেরণা জোগাইবে। জড়বাদের কোলাহলে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ, কিন্তু, সে কোলাহলের উর্ধ্বে এখনও উৎকৃষ্ট কাব্য বর্তমান এবং তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের চিরন্তন মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কি করিয়া রাখিয়াছে, তাহার রহস্য ব্রহ্মের রহস্যের মতোই অতি জটিল, অথচ অতি সহজ। যাঁহারা জড়বাদ-লব্ধ ধোঁয়াটে বুদ্ধি দিয়া ইহা বিশ্লেষণ করিতে যান, তাঁহারা জটিলতার সৃষ্টি করেন মাত্র, যাঁহাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, অন্তর রসগ্রাহী, তাঁহারা সহজেই ইহার মর্মে প্রবেশ করেন। উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী কাব্য সূর্যের মতোই স্বয়ম্প্রভ, স্বয়ম্প্রকাশ। তাহা তর্ক করে না, সুপারিশ সংগ্রহ করে না, একেবারে মর্মে গিয়া প্রবেশ করে, সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করিয়া দেয়।

এ কথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, যাঁহারা উচ্চকোটীর বিজ্ঞানী, তাঁহারাও সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী। তাঁহারা সে সন্ধান ভিন্নপথে করেন। কবিদের উপলব্ধি ও ইঁহাদের উপলব্ধিতে বিশেষ তফাৎ নাই। ইঁহাদের মনে হয়, তিলের মধ্যে তৈলের মতো, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের মতো, ভূগর্ভস্থ নদীর মধ্যে জলের মতো, কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে অগ্নির মতো, ক্ষুদ্র সত্যের অন্তরালে বৃহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। এই হিসাবে উচ্চকোটীর বিজ্ঞানীরাও সত্যসন্ধী, সত্যদ্রষ্টা কবি। আইনষ্টাইন তাই মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, সুলিভান তাই *Limitations of Science* লিখিয়াছেন, Julian Huxley তাই ভগবানের স্বরূপসন্ধানে ব্যস্ত, James Jeans তাই সৃষ্টির বিস্ময়ে আপ্লুত, অলিভার লজ তাই পরলোকের রহস্যে নিমগ্ন, H. G. Wells তাই বিজ্ঞানকে কাব্যে এবং কাব্যকে বিজ্ঞানে রূপ দিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র তাই 'অব্যক্ত' নামক অনুপম গ্রন্থের গ্রন্থকার। বস্তুতঃ, যেখানেই প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী, সেখানেই তাহার ধর্ম এক—সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাই তাই সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবান্বিত করে। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবানদের দায়িত্বও তাই অনেক বেশি।

কিন্তু, মুশকিল হইয়াছে, এ যুগের সৃষ্টিধর্মী কবি বা বিজ্ঞানীরা সকলে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি, এ যুগে সৎসাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যে যন্ত্রসভ্যতা মানবের শাশ্বত-সভ্যতাকে আজ গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহাই ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। যন্ত্রসভ্যতা অনেক প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য-স্রষ্টাকেও আত্মভ্রষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির দিকে তত মনোযোগী নহেন, যত মনোযোগী best-seller রচনার দিকে। Best-seller যে ভাল বই হইতে পারে না, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু, সাধারণতঃ best-seller সেই সব পুস্তকই হয়, যাহা অধিকাংশ লোকের সাময়িক উত্তেজনাকে তৃপ্ত করে, শাশ্বত সত্যের খবর যাহাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া এখন আমাদের দেশের কোনও শক্তিশালী লেখক যদি কাব্যরচনা করেন, তাহা হু হু করিয়া বিক্রয় হইবে। পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করা সহজ, কারণ, সাধারণ মানবের সুখশান্তির দিক হইতে বিচার করিলে কোন রাষ্ট্রই এখনও পর্যন্ত নিখুঁত হইতে পারে

নাই। G. B. S. এরূপ অনেক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। Swift-এর গালিভার্স ট্রাভল্‌স্‌ও ব্যঙ্গ-রচনা। ব্যঙ্গ-রচনা বা যে কোনও রচনা সৃষ্টি-হিসাবে তখনই সার্থক হয়, যখন তাহা শাশ্বত-রসবোধকে তৃপ্ত করে, যখন তাহাতে সত্য, শিব ও সুন্দর মূর্ত হয়।

আজকাল বাস্তববাদী এই ছাপ লইয়া যে সব সাহিত্য বাজারে বাহির হয়, তাহাতে দেখি, সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের যোগ নাই। সমাজের কতকগুলি কুৎসিত চিত্র বা মানবের কতকগুলি কুৎসিত প্রবৃত্তিই সে সব লেখার প্রধান উপাদান। তাহা সত্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু, শিব ও সুন্দরের সহিত বিচ্ছিন্ন যে সত্য, তাহা পূর্ণ সত্য নহে। যেমন ধরুন, *Lady Chatterley's Lover* নামক বিখ্যাত পুস্তকে যাহা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা আংশিক সত্য। কাম মানুষের একটা ক্ষুধা সন্দেহ নাই, কিন্তু, উহাই যে মানবের একমাত্র ক্ষুধা নহে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা একরূপ নহে—সহস্ররূপ। এই সহস্ররূপী ক্ষুধা কেবল কাম বা লোভের পথে নহে, নানাপথে যে সুধা সন্ধান করিতেছে, তাহার পরিচয় যদি কাব্যে না পাইলাম, তবে কাব্যের সার্থকতা কি? কামের কবলে তো সকলেই আমরা অল্পবিস্তর পড়িয়া আছি, কেবল তাহারই স্বরূপ জানিবার জন্য কাব্য পড়িবার প্রয়োজন নাই। আর একটা উদাহরণও মনে পড়িতেছে—মমের Rains নামক বিখ্যাত গল্পটি। এ গল্পের মূল কথাটি এই যে, একজন মিশনারি একটি পতিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই শেষে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। এ রকম ঘটনা প্রায়ই সমাজে ঘটে, ইহারই পুনরাবৃত্তি, এমন কি শিল্পায়িত পুনরাবৃত্তিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি নহে, কারণ, ইহাতে শিব ও সুন্দরের রূপ নাই। ঠিক এই একই উপাদান লইয়া আনাতোল ফ্রাঁস্ 'থেয়া' (*Thais*) লিখিয়াছেন এবং তাহা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ, তাহাতে পূর্ণ সত্য বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইয়াছে। রমাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ্' গ্রন্থের প্রথমভাগেও কামনার চিত্র আছে, কিন্তু, কেবলমাত্র ঐ চিত্রটি আঁকিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার কাব্য শেষ করেন নাই। নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়া তিনি নায়কের চিত্তকে বৃহতের দিকে, বিরাটের দিকে উন্মুখ করিয়াছেন, সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের শিল্প-সঙ্গত মিলন ঘটাইয়াছেন, তাই জাঁ ক্রিস্তফ্ আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে অমর কাব্য। ঠিক ওই কারণেই মমের *Of Human Bondage* সার্থক সৃষ্টি। আমাদের দেশে বৈষ্ণব-সাহিত্যে এমন অনেক চিত্র আছে, যাহা আধুনিক শ্লীলতার মানদণ্ডে অশ্লীল। কিন্তু কাম-লীলাই যে বৈষ্ণব-কাব্যের একমাত্র বক্তব্য নহে, তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব-কাব্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর মনে যে সুর বাজিতে থাকে, তাহা কামের সুর নয়, প্রেমের সুর, ভক্তির সুর, অন্তরের সুর।

কবির সৃষ্টিতে বাস্তব, অবাস্তব, গৌণ ব্যাপার। সার্থক সৃষ্টিতে ফুল অভিমান করে, পাখি উপদেশ দেয়, পশুরাও মানুষের ভাষা ব্যবহার করে, ঘড়ার ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হয়, রাবণের দশ মুণ্ড থাকে, রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগেন, রূপার

কাঠির স্পর্শে ঘুমান। শাশ্বত রস যেখানে জমিয়াছে, সেখানে কিছুই বেমানান মনে হয় না। বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াও যে সার্থকসৃষ্টি হইবে, তাহা কেবল বাস্তব হইবে না, তাহা সৃষ্টিও হওয়া চাই। বাস্তবকে কবি ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করিবেন, চিত্রকর যেভাবে তাঁহার চিত্র-পট ব্যবহার করেন। তাহা কাগজ, কাপড়, কাঠ, পাথর, লোহা, সোনা, তামা, পিতল, কাঁচ, যে কোনও জিনিস হইতে পারে, কিন্তু সেই জিনিসটার আস্ফালনই চিত্র হইবে না। চিত্রকরকে তাহার উপর ছবি আঁকিতে হইবে। সে ছবিতে কেবল অনন্যতা বা প্রতিভার রূপ থাকিলেই তাহা প্রথম শ্রেণীর শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে না তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে মনকে যদি উন্মুখ না করে। বাস্তবের পটভূমিকায় কবিও যাহা সৃষ্টি করিবেন, তাহা এই জাতীয় সৃষ্টি, তাহা বাস্তবের নকলমাত্র নয়। কবি চিত্রকর, ফটোগ্রাফার বা সাংবাদিক নহেন। প্রথমশ্রেণীর কবিরা যে কোনও পটভূমিকার উপরই সত্য-শিব-সুন্দরের সম্পূর্ণ সত্যের বাণীকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারেন। তাই শাশ্বত সাহিত্যের বাণীও উপনিষদের বাণীর মতো ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ। তাই শাশ্বত-সাহিত্যই শাশ্বত-ধর্মের বাহক। যে সব সাহিত্যিক বাস্তবতার অজুহাতে সমাজের মধ্যে যাহা কুৎসিত, যাহা অক্ষম, যাহা পঙ্গু, যাহা কর্দমাক্ত, যাহা কলঙ্কিত, তাই বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা জীবনের পূর্ণসত্যকে প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান, আলোকে ফুটাইবার জন্য কালো পটভূমিকা প্রয়োজন, আলো যদি না ফোটে, কালো পটভূমিকা অর্থহীন। সমাজে কুৎসিত চিত্র অনেক আছে, তাহারা সাহিত্যের বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু, বাছিয়া বাছিয়া কেহ যদি সেইগুলিকে কাব্যে স্থান দিয়া উগ্রবর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত করিতে থাকেন, তখন সন্দেহ হয়, লেখকের শিল্প-প্রচেষ্টার পিছনে অন্য মতলব আছে, সম্ভবতঃ, তিনি সাহিত্যিকবেশী মিস মেয়ো, ভাল কিছু তাঁহার চোখে পড়ে না, কেবল ড্রেনগুলিই তিনি দেখিতে পান।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বর্তমান যুগের যন্ত্রপতিরাই বর্তমান যুগের প্রভু। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে তো বটেই, শাশ্বত সত্যকেও ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের সুবিধামতো standardise করিতে চান। অনেক সাহিত্যিক ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির মোহে, অর্থের লোভে, অথবা কোন মিথ্যা আদর্শে মুগ্ধ হইয়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হস্তে ক্রীড়নকমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য তাই অনেকস্থলে আজ হীন প্রোপ্যাগাণ্ডামাত্র। অনেক বিজ্ঞানীরও ঠিক এই দশা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তাই আজ মানবসমাজের হিতকর না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। যাহা সঞ্জীবনীসুধা হইতে পারিত, তাহা বিষে পরিণত হইয়াছে। পুরাণের গল্পে শুনিয়াছি, দৈত্য-দানবদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া সৃষ্টিকর্তারা তাহাদের বর দিতেন এবং সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া দানবেরা মানবসমাজকে পীড়ন করিত। বর্তমান যুগের যাঁহারা স্রষ্টা, তাঁহারাও অনেকে আজ দৈত্যদানবদেরই বরদান করিয়াছেন।

একটিমাত্র আশার কথা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাধক পৃথিবীর সর্বত্র এখনও কিছু কিছু আছেন। পৃথিবী যখন জলপ্লাবিত হইয়াছিল, তখন নোয়া তাঁহার নৌকায় ভাল ভাল জিনিসের নমুনাগুলি তুলিয়া লইয়া সৃষ্টিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোনও অজ্ঞাত নোয়া হয়তো এই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের রক্ষা করিয়া মানবজাতিকে একদিন মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আমাদের ধর্মশিক্ষা দিতে অপারগ, নানা কারণে সে সামর্থ্য তাহার নাই। অথচ ইহাও সুনিশ্চিত যে, একমাত্র সত্যধর্মই আমাদিগকে প্রকৃত সুখশান্তির সন্ধান দিতে পারে, আত্মভ্রষ্টকে আত্মস্থ করিতে পারে, পরাধীন মনুষ্যত্বকে স্বাধীনতার আলোকে বিকশিত করিতে পারে। পৃথিবীর প্রতিদেশেই আজ সাধুরা লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্বের কণ্ঠরোধ করিয়া দিবার জন্য নানা মুখোস পরিয়া যন্ত্রশক্তি আজ উদ্যত। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবিরাই এখন মানবজাতির আশা। তাঁহারাই আজ মানবজাতির সেই বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, যে বিবেক অবিচলিতকণ্ঠে বলিবে 'যন্ত্র বড় নয়, মানুষ বড়। মানুষ যন্ত্রের দাস নয়, যন্ত্রই মানুষের দাস।' শুদ্ধচিত্ত, নির্ভীক বিজ্ঞানীদের আজ বলিবার সময় আসিয়াছে—মাদাম কুরীর প্রতিভাশালী কন্যা যেমন এক সভায় বলিয়াছিলেন—বিজ্ঞানের শক্তিকে আমরা বণিকদের হস্তে তুলিয়া দিব না, মানবের কল্যাণে নিয়োগ করিব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের মনুষ্যত্বকে যে নূতন কারাগারে বন্দী করিয়াছে, সেই কারাগারের মধ্যেই নূতন যুগের শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া ধর্মসংস্থাপন করিবেন, যদি আধুনিক যুগের সত্যদ্রষ্টা কবি ও বিজ্ঞানীরা তাঁহাকে তেমন করিয়া আহ্বান করিতে পারেন। বর্তমান যুগের নিপীড়িত মানব সত্যদ্রষ্টাদের কণ্ঠে সেই উদাত্ত আহ্বানবাণী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য*

সমাগত ভদ্রমহিলাগণ ও সুধিবৃন্দ,

আজ আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগলাভ করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এই আনন্দের সহিত বিষাদও মিশ্রিত আছে। বাঙলা-সাহিত্যের তিনজন কৃতী সাধকের তিরোধানে বাঙলাসাহিত্য-সংসার আজ ম্রিয়মাণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে

*নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন, অষ্টবিংশতিতম অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ। অধিবেশন কটকে হইয়াছিল।

একজন দিক্‌পাল ছিলেন। তাঁহাদের অকালমৃত্যু শুধু বাঙলা-সাহিত্যেরই নয়, ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেরই ক্ষতিজনক। তাঁহাদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণকামনা করিতেছি।

তাহার পর প্রণাম নিবেদন করিতেছি এই কলিঙ্গভূমিকে, যাহার সহিত বঙ্গের নাম ইতিহাসে, গল্পে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, দৈনন্দিন জীবনের স্মৃতিসংস্কারে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, প্রণাম নিবেদন করিতেছি সেই সব কৃতী কলিঙ্গ-কবিদের, যাঁহাদের প্রাদেশিকতা-বর্জিত উদার সাহিত্য-সাধনা বঙ্গের মনীষাকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

একসঙ্গে এতগুলি শ্রদ্ধেয় গুণীর সান্নিধ্যলাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। বর্তমান সময়ে এরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনও আছে। আজ সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে আপনাদের নিকট যাহা নিবেদন করিব, তাহা রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গসাহিত্যের বিস্তারিত সমালোচনা নয়, রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গসাহিত্যের নানা বিভাগে গর্ব করিবার মতো অনেক কৃতিত্ব সঞ্চিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা লইয়া আস্ফালন অথবা বাগাড়ম্বর আমি করিব না। জাতি হিসাবে আমরা আজ বিপন্ন, যে জীবন সাহিত্যের উৎস, আমাদের সেই জীবনই আজ দুর্দশাগ্রস্ত, আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ করিয়া এ নিদারুণ সত্যকে চাপা দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে পৃথিবীর সকল জাতির জীবনে দুঃখ যেমন নানা মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল, আমাদের জীবনেও তেমনি তাহা দেখা দিয়াছে। সেই দুঃখের ভারে আজ আমরা নিষ্পিষ্ট, সেই দুঃখের করাল কবল হইতে মুক্তি পাইবার শক্তি আমাদের আছে কিনা এবং আজ আমরা যে স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গ, সেই রাষ্ট্রের কোনও কর্তব্য আমাদের প্রতি আছে কি না—এই অভিভাষণে তাহাই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। আমরা যদি এ বিপদে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আমি রাজনৈতিক নহি, আমি সাহিত্যিক। আমি সেই সরস্বতীর উপাসক, যিনি তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তি, যিনি কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা, সকল বর্ণের সমসম্মিলনে যে শ্বেতবর্ণের উদ্ভব, তাহাই সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়া যিনি সর্ব-শুক্লা, সর্বস্বরের শোভন-সমন্বয়ে যে সঙ্গীত, তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে যিনি বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা, সর্বজ্ঞানের প্রতীক পুস্তকমালা বাম অঙ্কে ধারণ করিয়া যিনি পুস্তকধারিণী, যাঁহার পদ্মাসন একদল নহে—শতদল, যাঁহার বাহন আকাশচারী মানসসরোবরবাসী, যিনি ভগবতী, নিঃশেষজাড্যাপহা, যিনি ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতির্দেবৈঃ বন্দিতা, সত্যশিবসুন্দরের এই চিরন্তন প্রকাশ-প্রতিমার উপাসনা করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি যে, আমাদের জীবনে অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের ছায়াপাত হইয়াছে। সে ছায়া প্রতিদিন ঘনতর হইতেছে। আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার বিচার করিয়া

অবিলম্বে আমরা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হই, আমাদের সাধনা, সংস্কৃতির জগতে আমাদের কৌলীন্য অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

রাজনীতিই যাঁহাদের উপজীব্য, তাঁহারা বহু দলে বিভক্ত হইয়া রাজনৈতিক কৌশলে এ সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের সে প্রয়াস কতটা আন্তরিক, কতটা দাবার চাল, কতটা বিপক্ষকে হীন করিবার কৌশল, তাহা আমি জানি না। তাহার আলোচনা করিয়া অনধিকার-চর্চাও আমি করিব না। আমি যাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি, তাহাই আজ অকপটে ব্যক্ত করিব।

বাঙালীজাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতিশয় আত্মসচেতন জাতি এই বাঙালী। ইতিহাসের পাতা উলটাইলেই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন রাষ্ট্রস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, নিজের স্বাধীন সত্তাকেই কেন্দ্র করিয়া শৌর্যে-বীর্যে-মহিমায়, রূপে-রসে-রঙে-প্রস্ফুটিত হইবার আগ্রহ বহু প্রাচীনকাল হইতেই তাহার অন্তরে বদ্ধমূল। এই বৈশিষ্ট্যটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুগে যুগে সে প্রাণপাত করিয়াছে, গৌরবের তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করিয়াছে, গ্লানির কর্দমেও অবলিপ্ত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য তাহাকে উন্নতির আলোকেও যেমন লইয়া গিয়াছে, অবনতির অন্ধকারেও তেমনি টানিয়া আনিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদের মতে দ্রাবিড়, আদি-অস্ট্রেলীয়, নিগ্রোবটু ও আর্যজাতির সংমিশ্রণে আমাদের উৎপত্তি। অস্ট্রিক জাতিরই উত্তরাধিকার আমরা ভোগ করিতেছি আমাদের কৃষিকর্মে। আমাদের ধান, কলা, নারিকেল, পান প্রভৃতিও নাকি তাহাদেরই দান। আমাদের উদ্ভবের এই বৈচিত্র্যই হয়তো আমাদের শিল্পীও করিয়াছে। বস্তুতঃ, চিন্তা করিলেই এই কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আহারে-বিহারে, সমাজ-ব্যবস্থায়, রীতিনীতিতে, তৈজসপত্রে, গৃহনির্মাণে, ধর্মে, প্রথায় আমাদের যে প্রতিভা ব্যক্ত, তাহা শিল্প-প্রতিভা। যুগ যুগ ধরিয়া তাই আমরা শিল্পিজনসুলভ স্বতন্ত্রতার পক্ষপাতী, অনন্যতার সাধক, সেইজন্যই আমরা গুণগ্রাহী, সেইজন্যই আমরা কথায় কথায় বিদ্রোহ করি, দলে দলে শহীদ হইয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া পড়ি।

ইতিহাসের পটভূমিকায় আলোচনা করিলে, কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, প্রাচীন আর্য ঋষিগণ বাঙালীদের উপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে তদানীন্তন বঙ্গবাসী সম্বন্ধে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা প্রশংসাসূচক নহে। দস্যু, পক্ষী, ম্লেচ্ছ, পাপ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁহারা আমাদের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে একটি কথাই সূচিত হয় যে, তাঁহারা তদানীন্তন বঙ্গবাসীদের সুনজরে দেখিতেন না। কোনও বিজেতাই দুর্দমনীয় শত্রুকে সুনজরে দেখেন না। মুসলমানরা আমাদের কাফের বলিতেন, ইংরেজরা বলিতেন—Black niggers.

আর্য-উপনিবেশের প্রত্যন্ত-প্রদেশে যে সকল জাতি তখন বাস করিতেন, যদিও তাঁহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত, কিন্তু, তাঁহাদের ধরণ-ধারণ, আচার-আচরণ, চিন্তাপ্রণালী

একইপ্রকার ছিল। পৌরাণিক গল্পে ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচ পুত্রের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। বৈজ্ঞানিকদের মতেও প্রত্যন্তবাসী এই সমস্ত জনগণ একই গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নানা বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। বিজয়ী বৈদিক আর্যসভ্যতার প্রতি বিরূপতায় ইহারা সকলেই একদলভুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী পরবর্তী যুগে যদিও ভাবপ্রবণ বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অসিধারী শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রত্যন্তবাসী অঙ্গ, বঙ্গ যে সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত মহাভারতে বর্তমান। পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত সন্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন।

ইহা তদানীন্তন বাঙালী মনের স্বকীয়তার পরিচায়ক। কিন্তু, পরবর্তী ইতিহাস হইতে ইহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, আর্যসভ্যতাকে বাঙালী চিরকাল বর্জন করিয়া থাকিতে পারে নাই। অবশেষে তাহাকে সে গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ ইহার যে সামরিক ও সামাজিক কারণ অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু, আমার মনে হয়, বাঙালী গুণগ্রাহিতা, অভিনবত্বের প্রতি বাঙালীর স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং নূতন কিছুকে অনুকরণ করিবার স্পৃহাও বঙ্গদেশে আর্য-সভ্যতার পথ কম সুগম করে নাই। আর্যপ্রতিভার বলিষ্ঠতা, বৈদিক যজ্ঞের আড়ম্বর বাঙালীর শিল্পীমানসকে অভিভূত করিয়াছিল, পিঙ্গলকেশ, নীলচক্ষু, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ আর্যদের দেখিয়া বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই তাহাদের বরণ করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করে নাই। যাহা নূতন, তাহা যদি মনোহর হয়, তাহাতে যদি উচ্চ আদর্শের অথবা বিরাট কল্পনার খোরাক থাকে, বাঙালী তাহাকে সাগ্রহে বরণ করে। নূতন কিছুর প্রতি বাঙালীর এই আগ্রহ লক্ষণীয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যদিও ব্যঙ্গের সুরে একদিন গাহিয়াছিলেন, "নূতন কিছু কর, একটা নূতন কিছু কর"—কিন্তু, নূতন কিছু করিবার বাসনাই বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। সম্পূর্ণ নূতনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব করিবার ক্ষমতাও বাঙালী-চরিত্রে আছে।

আর্য-সভ্যতা বঙ্গদেশে আসিল, কিন্তু বেশিদিন টিকিল না। বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্মের মধ্যে বৈষম্যের বীজ নিহিত ছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সে সভ্যতার শিরোমণি, একমাত্র দ্বিজ ক্ষত্রিয়ই সে সভ্যতায় শক্তির প্রতীক এবং দ্বিজ বৈশ্যই বাণিজ্য-সম্রাট, বাকি সকলে শূদ্র—দাস। ভেদনীতি-পূর্ণ এই আর্য-আভিজাত্য বাঙালী সহ্য করিল না। তাই যখন মগধে ইহার প্রবল প্রতিবাদ বাঙ্ময় হইল, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমানের নবধর্মপ্রচারে এবং কপিলবাস্তুর রাজবংশে আর্যসভ্যতাপুষ্ট ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থের উদাত্তকণ্ঠে, তখন বাঙালী জনসাধারণ—আর্যসভ্যতা বরণ করিবার পূর্বে যাহারা পঞ্চায়েত-চালিত গণতন্ত্রে অভ্যস্ত ছিল তাহারা—এই সাম্যের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইল। বৈদিক সভ্যতায় যাহারা শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছিল, তাহারা দলে দলে বৌদ্ধ হইতে লাগিল। সাম্য ও প্রেম—এই দুইটিই তো বাঙালীর প্রাণের কথা। যুগ যুগ ধরিয়া ইহার জন্যই সে

তৃষিত। ইহারই অন্বেষণে বহু আলেয়া, বহু মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। আজও হইতেছে।

অনার্য বাঙালী আর্য হইল, আর্য বাঙালী বৌদ্ধ হইল, কিন্তু, তাহার অন্তরের পিপাসা মিটিল না। কিছুকাল পরে সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ভগবান বুদ্ধের বাণীতে অথবা জিনাচার্যগণের ধর্ম-উপদেশে সাম্যবাদের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল, কার্যক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ, বৌদ্ধ রাজা এবং বৈদিক সম্রাট্ প্রজাসম্পর্কে উভয়েই সু-উচ্চ সিংহাসন-সমাসীন। কেহ হয়তো প্রজাপীড়ক, কেহ প্রজারঞ্জনকারী, কিন্তু, কার্যতঃ উভয়েই প্রজাশোষক। যে অনাবিল প্রেম ও উদার সাম্যের প্রতিশ্রুতি বৌদ্ধধর্মে বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহা রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো নহেই—ধর্মের ক্ষেত্রেও সব সময় রক্ষিত হইল না। বৌদ্ধদের মহাযান মতই বাঙলাদেশ সাগ্রহে বরণ করিয়াছিল; কারণ, মহাযান উদারতর, তাহার আকাঙ্ক্ষা শুধু আত্মোদ্ধার নয়—জগতের উদ্ধার। বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্মই মহাযানে বড়। এই মহাযান শেষে সহজযানে রূপান্তর লাভ করিল। সহজযানী বলিলেন, মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপপুণ্য বলিয়া কোন জিনিসই নাই। ইহা প্রাণধর্মী বাঙালীর চিত্তকে প্রথম প্রথম খুবই মাতাইয়া দিয়াছিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলাদেশে সে যুগে নানারাগে সন্ধ্যাভাষায় যে কাব্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূল সুর—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়—"বাপু হে, সবই তো শূন্য, সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য, তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোঁকামাত্র। এই ধোঁকার পশরা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে, কিছুই কিছু নয়। সুতরাং, আনন্দ কর। আনন্দই শেষ পর্যন্ত থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।" এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাশবিক পঞ্চকাম-উপভোগে পরিণত হইল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই বলিতেছেন, "যে পঞ্চকামোপভোগ-নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্রবিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযান মহত্তর, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য আর্যদের 'চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্রবিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল।…" ধর্ম ব্যভিচারপূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহাতে সাম্যও থাকে না, মহত্বও থাকে না। সত্যশিব-সুন্দরের পূজারী বাঙালী পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিল।

বৈদিক আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী মনীষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ, বাঙালী গৌড়মীমাংসক শালিকনাথ, ভবদেব ভট্ট, তাহার প্রমাণ, বাঙালী হলায়ুধ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, তাহার প্রমাণ, মধুসূদন সরস্বতী, মহেশ্বর, বাসুদেব সার্বভৌম।

সাংখ্যের প্রবর্তক বাঙালী কপিল। তাঁহার আশ্রম নাকি ছিল গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। পতঞ্জলির যোগ-দর্শন আর্যসভ্যতার একটি বিশেষ দান। এই পথে বাঙ্গালীর দানও কম নয়। আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পথের গুরু। এই সব পথে বাঙলাদেশ যোগমতেরও একটা বিশিষ্ট পথ নির্দেশ করিয়াছে। এ সব সত্ত্বেও বৈদিক আর্যসভ্যতা যেই অসাম্যনীতিদুষ্ট দম্ভের প্রতীক হইয়া উঠিল, তখন বাঙলাদেশ তাহাকে বর্জন করিতে ইতস্ততঃ করিল না।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মও ঠিক ওই কারণে বাঙলায় টিকিল না। উক্ত দুই ধর্মের বীজ বাঙলার উর্বর মৃত্তিকায় বিস্ময়কর ফসল ফলাইয়া গেল বটে,—ইতিহাসে দেখিতে পাই, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু বাঙালী, মহাযান-আচার্য শান্তরক্ষিত বাঙালী, নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ শীলভদ্র বাঙালী, তিব্বতের ধর্মগুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙালী, চর্যাপদে ও দোহাকোষে বাঙ্গালীর প্রতিভা দেদীপ্যমান, সে যুগের ভাস্কর্যে বাঙালী শিল্পীর দান ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে, তবু কিন্তু, বৌদ্ধ রাজত্বকে বাঙালাদেশ সহ্য করিল না তাহার যথেচ্ছাচারের জন্য। তাহার শিল্পীমনই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। শশাঙ্ক-প্রমুখ বুদ্ধবিদ্বেষী শক্তিশালী সম্রাটের উদ্ভব হইল এবং যে বঙ্গদেশ একদা সাম্যের আশায় বৌদ্ধধর্মকে বরণ করিয়াছিল, সেই বঙ্গদেশই বৌদ্ধধর্মকে সাম্যের পরিপন্থী এবং কুনীতির আকর বলিয়া বিদলিত করিতে লাগিল। অন্যায়কে, অসুন্দরকে, উন্নাসিক আধিপত্যকে বাঙালী কোনদিনই সহ্য করে নাই। আদর্শ-প্রীতির জন্য বাঙালী অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। বাধ্য বালকের মতো সেদিন বাঙালী যদি কোনও শক্তিশালী বৌদ্ধরাজার নিকট অবনতিস্বীকার করিত, তাহা হইলে পরবর্তী যুগে তাহাকে বোধ হয় একাধিক বৈপ্রান্তিক আক্রমণে বিব্রত হইতে হইত না, মাৎস্যন্যায়ের কবলেও পড়িতে হইত না। কিন্তু, যাহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, বাঙালী তো কিছুতেই তাহার নিকট শির নত করে না, কিছুদিনের জন্য করিতে-বাধ্য হইলেও অবশেষে সে যে সেই অবাঞ্ছনীয় শৃঙ্খল ছিন্ন করে, ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। ইহাই বাঙালীর মজ্জাগত স্বভাব।

ইহার পরবর্তী যুগে বাঙলার ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি বাঙালী সাধারণতন্ত্র বা রিপাব্লিক স্থাপন করিয়াছে। মাৎস্যন্যায়ের পাশবিকতায় সমস্ত বাঙলাদেশ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন সহসা বাঙালী-প্রতিভা যেন আত্ম-আবিষ্কার করিল। বাঙলার ক্ষুদ্রবৃহৎ নায়কেরা এবং বাঙলার প্রকৃতিপুঞ্জ একমত হইয়া গোপালদেবকে রাজপদে বরণ করিলেন, একটি কেন্দ্রীভূত শাসনপরিষদের সহায়তায় দেশের সুখশান্তি ফিরাইয়া আনিলেন, বহিঃশত্রুর প্রতিরোধ করিলেন। 'বাঙালীর ইতিহাস'-পুস্তক-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"এই শুভবুদ্ধির ফলে বাংলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল। শুধু, বাংলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এ ধরণের সামাজিক বুদ্ধি

এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল। পালরাজাদের লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই নির্বাচনকাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও তাহা যথোচিত কীর্তন ও মর্যাদালাভ করে নাই…।"

শূদ্র গোপালদেব যে পালবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাদিক্রমে সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। পৃথিবীর আর কোথাও কোন একটি বংশ এত দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজত্ব করে নাই। এই শূদ্রবংশের প্রভাবে বাঙলাদেশ এককময় উত্তর-ভারতে সার্বভৌমত্ব করিয়াছে। এই বংশের দেবপালের সময় পালসাম্রাজ্যের খ্যাতি ও মর্যাদা ভারতবর্ষের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং মলয় উপদ্বীপের অধিপতি যে দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং নানারূপ ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই পালরাজাদের আমলেই শিল্পী ধীমান ও বিটপাল, শিল্পী মহিধর, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী শশীদেব প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু, আলোর পর যেমন অন্ধকার আসে, এই গৌরবময় যুগের পর তেমনি লজ্জাকর যুগও আসিয়াছিল। মাৎস্যন্যায়ের যুগে স্ব-স্ব-প্রধান আত্মকর্তৃত্ব দেশকে যেমন উৎসন্নের পথে লইয়া গিয়াছিল, সেই আত্মকর্তৃত্ব আবার নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিল এবং পালরাজ্যের অধঃপতনের কারণ হইল। ব্যক্তিগত বা দলগত অহমিকার যূপকাষ্ঠে যখনই সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শকে বলি দেওয়া হইয়াছে, তখনই বাঙালী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গোপালদেব যে পালবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই পালবংশের বংশধরেরা যে বাঙালীর আদর্শবোধকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ, মহীপালের সময় উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত-বিদ্রোহ। অল্প-স্বল্প বিদ্রোহ নয়, দুই পুরুষ ধরিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ, উদ্দেশ্য—পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপন করা। এই বিদ্রোহ করিয়া কিন্তু বাঙালী অভিজাতদের দমন করিতে পারে নাই, প্রকৃতিপুঞ্জ-নির্বাচিত রাজাও আর বাঙলার সিংহাসনে বসিবার সুযোগ পান নাই। ইহার পর আমরা রাজত্ব করিতে দেখি বর্মবংশকে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বর্মবংশ হয় পাঞ্জাব, না হয় উৎকল হইতে আসিয়াছিলেন। কিছুই আশ্চর্য নয়। বাহির হইতে সমাগত (হয়তো বাঙালীদের দ্বারা আনীত) রাজবংশের কর্তৃত্ব বাঙালী একাধিকবার সহ্য করিয়াছে, কিন্তু, অধঃপতিত নিজের লোকের প্রভুত্ব সে স্বীকার করে নাই। স্বজাতি-প্রীতি অপেক্ষা আদর্শ-প্রীতি, শিল্প-প্রীতি তাহার চরিত্রে প্রবলতর। ইহার পরবর্তী সেন-রাজগণও বাঙালী নহেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ নাকি সুদূর দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটক-দেশবাসী ছিলেন। এই সেনরাজারা বাঙালী পালবংশকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া বাঙলাদেশের একচ্ছত্র রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। বাঙালী বহুকাল ধরিয়া সে প্রভুত্ব সহ্যও করিয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে এই কথাই মনে হয় যে, আদর্শ-বাদী বাঙালী জীবনে ও সমাজের উচ্চ আদর্শরক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করিতে পারে, এবং সে আদর্শের মূল সুর সাম্য ও শিল্পবোধ। অশিল্পী বর্বর, অসাম্যবাদী দাম্ভিক ব্যক্তি যদি

তাহার আপনজনও হয়, তাহাকে বিষবৎ ত্যাগ করিতে বাঙালী কোনদিন দ্বিধা করে নাই। প্রাণধর্মী শিল্পসঙ্গত আদর্শই তাহার অন্তরের বস্তু। অতি বিশুদ্ধ কাঠখোট্টা আদর্শও সে বরদাস্ত করিতে পারে না. তাহার সাম্যবোধ পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের মানদণ্ডে নির্ণীত নহে, তাহার আদর্শের মাপকাঠি আছে তাহার প্রাণধর্মী শিল্পচেতনায়। এই আদর্শ ই তাহার সব। দেশপ্রেম যতক্ষণ তাহার এই আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে খাপ খায়, ততক্ষণ সে দেশপ্রেমিক, রাজা যতক্ষণ তাহার আদর্শে আঘাত না করে, ততক্ষণ সে রাজভক্ত, দেশের প্রচলিত ধর্ম যতক্ষণ তাহার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করে, ততক্ষণ সে ধার্মিক। কিন্তু, আদর্শে ঘা লাগিলেই বাঙালী বিদ্রোহী। দেশ, ধর্ম, আত্মীয়স্বজন কেহই তখন তাহার আপন নয়, যে তাহার আদর্শকে রক্ষা করিবে, সেই তখন তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন, সে ব্যক্তি স্বদেশী, বিদেশী, বৈদিক, বৌদ্ধ যে-ই হোক, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না, বাঙালী তাহাকেই অন্তরের বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবে। বাঙালী-চরিত্রের এই আদর্শপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া বহু বিদেশী বাঙলাদেশে আসিয়া আসর জমাইতে সমর্থ হইয়াছে।

পালরাজগণ—যাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গে কৈবর্তগণ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন—সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। তাই বোধ হয়, নির্যাতিত, অধঃপতিত বাঙলার জনসাধারণ মুক্তির আশায় বৌদ্ধধর্মবিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজগণকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। নির্যাতন কিন্তু কমিল না। কারণ, সেনরাজগণ নির্মমভাবে বৌদ্ধদলন আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ, দরিদ্র জনসাধারণকেই পীড়ন করিতে লাগিলেন। কারণ, বর্ণাশ্রম-ধর্মী বৈদিক আর্যসভ্যতায় যাহাদের গৌরবের স্থান ছিল না, যাহারা অনার্য, শূদ্র, দাস প্রভৃতি অপমানজনক আখ্যালাভ করিয়া সমাজের নিম্নস্তরে হীন জীবনযাপন করিতেছিল, তাহারাই একদা বৌদ্ধ হইয়াছিল। সেনরাজগণের বৈদিক শাসন ইহাদিগকেই নির্মম-ভাবে পেষণ করিতে লাগিল। অর্থাৎ, বৌদ্ধ অভিজাত-সম্প্রদায়ের কবল হইতে পরিত্রাণের আশায় বাঙলার জনসাধারণ বৈদিক রাজার আধিপত্যস্বীকার করিল, মানে, তপ্ত কটাহ হইতে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুকাল পেষণ চলিল। বৌদ্ধ ও বৈদিক-ধর্মের সংঘর্ষে অভিজাত-সম্প্রদায়ের অবিচার-অত্যাচার যখন ঘরে, বাহিরে কোথাও শান্তি রহিল না, তখন ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিল মুসলমান। ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে আগেই তাহারা হানা দিয়াছিল এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল বঙ্গ-বিহারের দিকে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, উত্তর-প্রদেশের গাহড়বাল রাজন্যশক্তিই নাকি মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু, লক্ষ্মণসেন মগধ জয় করিয়া এবং প্রয়াগ পর্যন্ত সমরাভিযান করিয়া উক্ত গাহড়বাল রাজন্যবর্গকে দুর্বল করিয়া দেন। প্রতিরোধকারীরা যখন দুর্বল হইয়া গেল, তখন মুহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি বিনা বাধায় বিহার ও বঙ্গ জয় করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না। জরার সঙ্গে যৌবনের যুদ্ধে জরাকেই হার মানিতে হয়। বাঙলাদেশের রাজতন্ত্র তখন মৃতপ্রায়, লক্ষ্মণসেনের

স্বপক্ষে জনসাধারণের আনুকূল্যও ছিল না, আত্মকর্তৃত্বের বল্মীক-সিংহাসনের ভিত্তিকেও জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। শোনা যায়, অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে, মাত্র সতরোজন অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। পলায়ন করা ছাড়া লক্ষ্মণসেনের গত্যন্তর ছিল না।

বঙ্গদেশে মুসলমান আসিল এবং এমন একটা সাম্যের আদর্শ লইয়া আসিল, যাহা বিস্ময়কর; যাহার নিকট ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শূদ্র সকলেই সমান, যাহার চক্ষে স্পেনের মুসলমান এবং বাঙলার মুসলমান একজাতি, আরবের মুসলমান এবং চীনের মুসলমানে কোনও তফাৎ নাই; যে ধর্ম ভৃত্যকে প্রভুর সহিত একাসনে বসিয়া এক পাত্র হইতে অন্নগ্রহণ করিতেও বাধা দেয় না, যে ধর্ম ক্রীতদাসকেও প্রভু-কন্যার পাণিপীড়নে অনুমতি দেয়। বাঙালীর অন্তর উদ্বুদ্ধ হইল। ইসলামসভ্যতার শিল্প-শ্রীও তাহাকে কম মুগ্ধ করিল না। তাহাদের সদর ও অন্দরের নবাবী বৈশিষ্ট্য, তাহাদের সুমার্জিত, সুমিষ্ট ভাষা, এক কথায় তাহাদের ইসলামী চালচলন বাঙালীর শিল্পীমনকে যে নাড়া দিয়েছিল তাহার প্রমাণ, তাহার সাহিত্যে, শিল্পে, ভাষায় আজও জাজ্জ্বল্যমান। বাঙালী কবি অশ্বারোহী মুসলমানকে ত্রাণকর্তা কল্কি অবতার বলিয়া বন্দনাই করিয়া বসিলেন।

নির্যাতিত বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল, রাজধর্ম বলিয়া অনেক অভিজাত শ্রেণীর লোক মুসলমান হইতে লাগিল। হয়তো সমস্ত দেশই মুসলমান হইয়া যাইত, যদি না পুনরায় বাঙালী-প্রতিভা তাহাতে বাধা দিত। বাঙালীর ইহাও একটা বৈশিষ্ট্য। বাঙালী নূতন আদর্শে মুগ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাকে সোৎসাহে গ্রহণ করে, কিন্তু, যখনই সে আদর্শের গলদ ধরা পড়ে, অমনই তাহার প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিভা নূতন পথের সন্ধান করিতে থাকে এবং এমন একটা পথ বাহির করে, যাহা বাঙালী-প্রতিভারই উপযুক্ত। পাঠান-শাসনের প্রবল প্রতিবাদ দুইজন বাঙালী বীরের কীর্তিতে অমর হইয়া আছে। একজন রাজা গণেশ, দ্বিতীয়জন দনুজমর্দনদেব। ইঁহারা সম্মুখ-সমরে দুর্ধর্ষ পাঠান-রাজাদের পরাভূত করিয়া তাহাদের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, চিন্তার ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে, উচ্চকোটীমানবতার ক্ষেত্রে বাঙালী-মনীষা সে সময় যে দিব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা আরও বিস্ময়কর, তাহা সত্যই যুগান্তরকারী। একদিকে আগমবাগীশ প্রভৃতি তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের দল বাঙালীর রক্ষণশীল মনের উপযোগী আন্দোলন করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব এমন একটা মধুর প্রেমের ধর্ম প্রচার করিলেন, যাহার অবাধ উদারতা, যাহার মর্মস্পর্শী প্রেমময় আবেদন, সাম্যবাদী, রসপিপাসু বাঙালী-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিল। বিনা রক্তপাতে একটা বিরাট রাজনৈতিক বিদ্রোহ হইয়া গেল। বৈদিক, বৌদ্ধ, মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, উন্নত-পতিত, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকেই প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া বাঙালী-প্রতিভা যেন চরিতার্থ হইল।

বৈষ্ণবধর্ম স্রোতের মুখ ফিরাইয়া দিল। ইসলাম ধর্মের সাম্য-মোহ বাঙালীকে আর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না। বরং, অবশেষে সেই পুরাতন সত্যই সে পুনরায় আবিষ্কার করিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণের ন্যায় মুসলমানেরাও রাজা, সাম্যের মহিমা প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন নাই, আসিয়াছেন প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিবার জন্য। অর্থাৎ, আর একটা সমস্যা বাড়িল—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। মুসলমান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রকে বিফল করিয়া দিবার জন্য ও ষড়যন্ত্রকারীদের শাসন করিবার জন্য মুসলমান-রাজাদের নানাবিধ প্রচেষ্টা—ইহাই হইল সংক্ষেপে তখনকার রাজনীতি।

মুসলমানদের অত্যাচারে অবশেষে ভদ্র বাঙালীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই দুরূহ হইয়া পড়িল। নিরুপায় বাঙালী অবশেষে তাহাই করিল, যাহা সে চিরকাল করিয়াছে। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পলাশীর যুদ্ধাঙ্গনে বাঙালী তাহাকে যে শিক্ষা দিল, তাহা ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তিরই নিদর্শন এবং অতিশয় মর্মান্তিক।

একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। শত্রুকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বাঙালী বারংবার বাহিরের লোক ডাকিয়া আনিয়াছে কেন? এই সেদিনও তো নেতাজী জাপানের সাহায্য লইতে গিয়াছিলেন। বাঙালীর কি নিজের শক্তি নাই?

ইহার উত্তরে প্রথমেই একটা কথা বলা আবশ্যক। বাহির হইতে শক্তিশালী লোককে আহ্বান করিয়া অত্যাচারী গৃহশত্রুকে উচ্ছেদ কেবল বাঙালীই করে নাই, আরও অনেক জাতি করিয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী প্রভৃতির জাতীয় ইতিহাসে ইহার একাধিক সাক্ষ্য বর্তমান। ইহা রাজনীতিরই একটা অঙ্গ। ইহাকে যদি কলঙ্কই বলিতে হয়, তাহা হইলে ইহা সমগ্র সভ্যজাতির কলঙ্ক, একা বাঙালীর নহে। কারণ, পৃথিবীর কোন সভ্যজাতিই তাহার আদিম রূপ বজায় রাখিতে পারে নাই, অধিকতর শক্তিশালী জাতির সংমিশ্রণ অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই অনিবার্যভাবে ঘটিয়াছে এবং সে সংমিশ্রণের ইতিহাস বাঙালীজাতির ইতিহাসের ভিন্ন সংস্করণমাত্র।

তবে, এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার আছে। যদিও পৌরাণিক গল্পে আমরা দেখিতে পাই যে, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং পৌণ্ড্র রাজেরা, যদিও রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছিলেন বাঙালী তাম্রধ্বজ, ভীমের দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন বাঙালীরা, অর্জুনকেও সম্মুখ সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন বাঙালীরা, এবং এ সবের বহুপূর্বে দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গেও যদিও বাঙালী বীরেরা চতুরঙ্গসেনা সাজাইয়া শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইতিহাসে যদিও আমরা গঙ্গা-রাঢ়ীদের বিবরণ, কৈবর্ত-বিদ্রোহ, বিজয়সিংহ, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল, রাজা গণেশ, দনুজমর্দনদেব, কেদার রায়, চাঁদ রায়, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, বাঙলার লাঠিয়াল প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করি, যদিও

আধুনিক যুগের অরবিন্দ, বারীন, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, রাসবিহারী, বিনয় বোস, সূর্য সেন প্রভৃতি বাঙালী বীরেরা বাঙলার, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রণী নেতারূপে জ্যোতির্ময় গৌরবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান, আমাদের নেতাজী যদিও এই সেদিন অদ্ভুত সাহস, কৌশল ও বীর্যবলে সম্মুখ সমরে শত্রুকে পরাজিত করিয়া বাহুবলে-অর্জিত স্বাধীন ভারতভূমিতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও এই কিছুদিন আগেই কাশ্মীর-রণাঙ্গন হইতেও বাঙালী বীর রঞ্জিত রায়ের কীর্তি চতুর্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে, তবু কিন্তু, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পেশীতান্ত্রিক সমরপ্রতিভা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নহে। বাঙালী যুগে যুগে বিদ্রোহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু, সে বিদ্রোহ মনোজগতের বিদ্রোহ, মারামারি, কাটাকাটি নহে। যখনই মারামারি-কাটাকাটির প্রয়োজন ঘটিয়াছে, বাহির হইতে পালোয়ান জুটিয়াছে এবং বাঙালী বুদ্ধি তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে। বাঙালীর এই সমরবিমুখতার কারণ বঙ্গদেশের প্রকৃতি। যে দেশে প্রভূত পরিশ্রম না করিলে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না, লুণ্ঠন করিয়া না আনিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যায় না, যে দেশের প্রকৃতি এত বিরূপ যে, অহরহঃ শারীরিক পরিশ্রম না করিলে রক্তস্রোতই সচল থাকে না, অর্থাৎ, যে দেশে নিছক জীবনযাপন করিবার জন্যই অবিরাম পেশী-সঞ্চালন করিতে হয় (এবং সেইজন্যই যে দেশের দর্শন উদার নয়, উদরকেন্দ্রিক) সেইদেশেই পেশীশক্তিশালী, পরস্বাপহারী, সামরিক জাতি জন্মগ্রহণ করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই এ সব হয়। শস্যশ্যামল বঙ্গভূমিতে এ রকম বীর জন্মিবে কেন ? যে দেশের গাছে গাছে ফল, মাঠে মাঠে ফসল, যে দেশের গঙ্গায়, ব্রহ্মপুত্রে, যে দেশের ইছামতী-ময়ূরাক্ষী-কপোতাক্ষে, যে দেশের চূর্ণী-রূপনারায়ণ-দ্বারকেশ্বরে, সুবর্ণরেখায়, কংসাবতীতে, দামোদরে, অজয়ে, জলাঙ্গীতে, মহানন্দায়, পদ্মায়, মেঘনায় বিগলিত পর্বতের প্রসাদলীলা তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত, ঋতুতে ঋতুতে যে দেশের আকাশে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের দীপালী, মেঘমহিমার মহোৎসব, সে দেশের লোক স্বপ্ন দেখিবে, দার্শনিক হইবে, কাব্য লিখিবে, আদর্শসৃষ্টি করিবে। শখের জন্য বা সাময়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পেশীচর্চা করিলেও, পেশীচর্চাই তাহার জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। যে দেশ বেদ-উপনিষদের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে, বুদ্ধের অভিনব দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, চৈতন্যের প্রেমের ধর্মে অবগাহন করিয়াছে, সে দেশে কি বর্বরমনোবৃত্তি সৈনিকের উদ্ভব হইতে পারে ? স্বাভাবিক নিয়মেই পারে না। তাই বাঙালীর শৌর্য চিন্তায়, পেশীতে নহে। তাহার সাম্য-অনুসন্ধিৎসু মন তাই বারংবার বহিরাগত বিদেশীর সাহায্য লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়াছে। বহিরাগত সভ্যতাকে সে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু, সে সভ্যতার কাছে সে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করে নাই।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বাহন হইয়া অধঃপতিতকে উদ্ধার করিবার সাধু মনোভাব লইয়া সাম্যের ও ন্যায়ের ছদ্মবেশ পরিধানকরতঃ ইংরেজবণিক বঙ্গে পদার্পণ করিলেন। নূতন কিছু দেখিলেই বাঙালী আত্মহারা হইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে বাঙালী ভাবে,

ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে পাকা সাহেব হইয়া উঠিল। সেকালের ইয়ং-বেঙ্গলদের মতো পাকা সাহেবী-মনোভাবাপন্ন লোক ভারতবর্ষের অন্যত্র তো নহেই, ইংলণ্ড ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু, সাহেবিয়ানার মধ্যেও খাদ ছিল, হিন্দুধর্মের খাদ এবং নবাবী আমলের খাদ। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে ইহার স্বরূপ চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:—"ইংরেজি আমলের অনতিপূর্বে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম এবং মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের রীতিনীতি উভয়ে বিবাহপাশে বাঁধা পড়িয়া বঙ্গদেশে নূতন এক সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল ; সে সভ্যতার প্রধান আড্ডা ছিল কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সেই হিন্দুসভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদনিক্ষেপ করিয়া কলিকাতায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার অধিনায়ক-পদে বরণ করিল। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবী হিন্দুসভ্যতাকে জ্ঞানোজ্জ্বল ইংরেজি সভ্যতার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন, নব্যবঙ্গ সেই বিবাহের শুভফল।"

মুসলমান-রাজত্বের শেষদিকে, ইংরেজ আসিবার কিছু আগে পর্যন্ত বাঙালী-প্রতিভা যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। একটা অত্যুর্বর জমি চাষের অভাবে যেন পতিত হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার বীজ পড়িয়া সে জমিতে সোনার ফসল ফলিয়া উঠিল। ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালীর মনীষা সর্ববিভাগে ভারতের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের উষালগ্নে বাঙালী-প্রতিভার সূর্য দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া দিল। মাত্র কয়েকটি নাম করিতেছি। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট — উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম গবর্ণর—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, প্রথম আই সি. এস.—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম নোবেল পুরস্কার পাইলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয় মনীষী—রাজা রামমোহন রায়, প্রথম হাইকমিশনার—অতুল চ্যাটার্জি, প্রথম কর্ণেল—সুরেশ বিশ্বাস, প্রথম শবব্যবচ্ছেদক— মধুসূদন গুপ্ত, প্রথম ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রথম বৈমানিক—ইন্দ্রলাল রায়, প্রথম সার্জন-জেনারেল—মন্মথনাথ চৌধুরী, প্রথম চীফ-জাস্টিস—রমেশচন্দ্র মিত্র, প্রথম র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু, প্রথম হাইকোর্টের জজ—রমাপ্রসাদ রায়, কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রেসিডেণ্ট—সরোজিনী নাইডু, ভারতীয় চিত্রশিল্পের ধারা পুনঃপ্রবর্তক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম 'সত্যাগ্রহ'—বাঙলার নীলকরদের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন, অনশনে প্রাণবিসর্জন করিলেন—যতীন দাস, ইংরেজী ভাষায় প্রথম ভারতীয় মহিলা কবি—তরু দত্ত, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ডি. এস-সি.—জগদীশচন্দ্র বসু, প্রথম লর্ড ও আইন-সচিব—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন প্রথম —স্যার্ অতুল চ্যাটারজি, সাংবাদিকতার জনক—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রথম ভাইসচ্যান্সেলার হন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ইঞ্জিনিয়ার—নীলমণি মিত্র, প্রথম

মহিলা গ্রাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু, প্রথম এম. বি.—ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, আমেরিকায় বেদান্তধর্মের প্রথম প্রচারক—স্বামী বিবেকানন্দ, মাউণ্ট এভারেস্ট আবিষ্কারক—রাধানাথ শিকদার, ইয়োরোপে প্রাচ্য-নৃত্যের প্রথম জনপ্রিয় প্রদর্শক—উদয়শঙ্কর, আমেরিকায় জনপ্রিয় প্রথম ভারতীয় নট—শিশির ভাদুড়ী। আরও কত আছে।

অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনের সর্ববিভাগে প্রতিভার এমন বিস্ময়কর আবির্ভাব আর বোধ হয় কোথাও ঘটে নাই।

ইংরেজী সভ্যতার তীব্র স্রোতে ভাসিয়াও বাঙালী কিন্তু আত্মসম্মান হারাইয়া আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হইয়াও বাঙালীত্ব বজায় রাখিলেন; রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, রাধানাথ, রামতনু সমাজ-বিদ্রোহী হইয়াও মনে-প্রাণে স্বদেশী রহিলেন, মাইকেল মধুসূদন হোমার-মিল্‌টনের ভজনা করিয়া অবশেষে 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' লিখিলেন, রামমোহন রায় সাহেবদের অধীনে দেওয়ানি করিয়াও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া খ্রীষ্টধর্মমুখী বাঙালী-চিত্তকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পাইলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কট্‌কি চটি, থান ও চাদর পরিয়া লাটসাহেবের প্রাসাদ পর্যন্ত বিচরণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের অধীনে ডেপুটিগিরি করিতে করিতে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, নবীনচন্দ্র লিখিলেন 'পলাশির যুদ্ধ,' হেমচন্দ্র গাহিলেন 'ভারত-সঙ্গীত', ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাস্তিক-প্রকৃতি নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দ হইলেন, ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডিকে সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত করিয়া বাঙালী কেশবচন্দ্র সর্বধর্মসমন্বয়ের বিরাট পরিকল্পনা করিলেন, বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া বাঙলার পল্লীপ্রান্তে আসিয়া বিশ্বভারতীর আসন পাতিলেন, বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর প্রেম-বৈরাগ্য-ভরে ঐশ্বর্যের শিখর হইতে দেশের ধূলিতে নামিয়া আসিতে পারিলেন, ইংরেজের প্রভুত্ব-প্রতীক লোভনীয় আই. সি এস. চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্র স্বদেশের জন্য কারাবরণ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

আদর্শবাদী বাঙালী কোনও সভ্যতার সংঘাতেই আদর্শচ্যুত হয় নাই। আদর্শের জন্য সে সব করিতে পারে। কেবল অসাম্য ও সঙ্কীর্ণতা সে সহ্য করিতে পারে না।

একটা কথা প্রায়ই অনেকের মুখে শুনিতে পাই, বাঙালীর নাকি সর্বভারতীয় দৃষ্টি নাই, তাহার মনোভাব নাকি বড় বেশি প্রাদেশিক, তাহার নিখিল-ভারতীয় প্রেম-শিক্ষা করা উচিত। ইহা যেন জীবনকে অপত্য-স্নেহ শিক্ষা দেওয়া।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:
—"শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাংলাদেশ নিখিল ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া

চলিত—কাশ্মীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামরূপ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, সুবর্ণদ্বীপে, পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও তাহার যোগাযোগ নানাসূত্রে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কাজেই প্রান্তীয় দেশ বলিয়া বাংলাদেশ শুধু তাহার পুকুরপাড়ে, বটের ছায়ে, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লইয়া একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করিত, এমন মনে করিবার কারণ নাই . ।"

ইহা গেল প্রাচীন বাঙলার কথা। মাঝে কিছুদিন—সেন-পর্বের শেষভাগে সে হয়তো কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু, তাহার পরেই আবার দেখি, তাহার চৈতন্য প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। বাঙলার চণ্ডীদাস গান ধরিয়াছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

আধুনিক যুগের ইতিহাস তো সকলেরই সুবিদিত। কংগ্রেস হইবার বহু পূর্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নিখিল-ভারতীয় প্রতিভার সংস্পর্শে আনিবার জন্য সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথই। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে সর্বভারতীয় বিদ্বৎসমাজকে বাঙালীই আমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই বাঙালীর উপরই ইংরেজের রাগ সর্বাধিক। ইংরেজ জানিত যে, বাঙালীই তাহার একমাত্র শত্রু, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদে ফাটল ধরাইয়াছে বাঙালীই। তাই, বাঙালীকে জব্দ করিবার আয়োজন সে বরাবর করিয়াছে এবং ভারতত্যাগ করিবার পূর্বে ভালভাবেই করিয়া গিয়াছে। আজ আমরা যে দুর্দশাভোগ করিতেছি, ইংরেজের বিরাগ তাহার অন্যতম কারণ। অগ্নিযুগের বোমা-বিস্ফোরণ এবং তৎপরবর্তী যুগের স্বদেশী আন্দোলন যে শুধু ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল তাহা নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুখের ঘরেও আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। লর্ড কার্জন বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার জন্য বঙ্গবিভাগ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙালীরাই ইংরেজের একমাত্র শত্রু। তাই বাঙালীকে হীনবল করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বীজ তখনই তিনি বপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা তখন সফল হয় নাই, এখন হইয়াছে। এক আদর্শভ্রষ্ট স্বাধীনতালাভ করিবার জন্য জনকয়েক নেতা আজ পাঞ্জাব ও বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর বারণও শোনেন নাই। এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালী একদিন রক্তপাত করিয়াছিল, আজও তাহার রক্তমোক্ষণ চলিতেছে। বস্তুতঃ, বাঙালী যেদিন হইতে সর্বভারতীয় স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করিয়াছে, সেদিন হইতেই তাহার দুর্দশার আরম্ভ। তাহার পরই ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড কায়েম করিয়াছেন, আইনের পর আইন প্রণীত হইয়াছে বাঙালী-দলনের জন্য। বেহার ফর বেহারীজ, আসাম ফর আসামীজ প্রভৃতি প্রাদেশিক বুলিও শোনা গিয়াছে বাঙালীর স্বদেশী-আন্দোলনব্রত গ্রহণ করিবার পর

হইতে। এখনও শোনা যাইতেছে ইংরেজের আমলে তবু খানিকটা ন্যায়বিচার ছিল, গুণের আদর ছিল, এখন যেন তাহাও নাই। প্রাদেশিকভিত্তিতে প্রদেশগঠনের ফলে আমরা ক্রমশঃ উগ্রভাবে প্রাদেশিক হইয়া উঠিতেছি, বাহিরে একটা সাম্যের ঢং বজায় আছে বটে, কিন্তু, তাহা যে একটা রঙ্গমঞ্চীয় প্রসাধনমাত্র, বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট তাহা একটুও অগোচর নাই। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ আর্যাবর্ত্ত, মগধ, গৌড়, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, সমতট, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বঙ্গাল, চোল, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিত। আমাদের অতি-আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রও নানা প্রদেশে বিভক্ত, তাঁহারা খোলাখুলিভাবে পরস্পরকে আক্রমণ না করিলেও মনে মনে এবং মাঝে মাঝে ফতোয়া জারি করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছেন। আমার মনে হয়, পাকিস্তানের বীজ যেন প্রত্যেক প্রদেশেই উপ্ত হইয়া আছে, যে কোন মুহূর্তে তাহা আত্মপ্রকাশ করিলে বিস্ময়ের কিছু হইবে না। এই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙালীর ধাতে সহ্য হয় না। কারণ, রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় উদার স্বাধীনতার জন্যই সে জেলে গিয়াছে, ফাঁসি গিয়াছে, দ্বীপান্তরে গিয়াছে, জীবনের সমস্ত সুখশান্তিকে বিসর্জন দিয়াছে, আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার সর্বভারতীয় দৃষ্টি তো সুবিদিত। বর্তমানের প্রদেশ-বিভাগের ফলে তাহাকে আজকাল বলিতে হইতেছে বটে যে, বেঙ্গল ফর বেঙ্গলীজ, কিন্তু, ইহাতে তাহার প্রাণের সুর ঠিক যেন লাগিতেছে না। বাঙলাদেশের আধুনিক সাহিত্য খ্রীষ্টান মিশনারিদের জয়গানে মুখরিত, বিদেশী ডেভিড হেয়ার আমাদের আপন লোক, অবাঙালী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙলা-সাহিত্যের পূজ্য লেখক, এণ্ড্রুজ সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙালী আকুল পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগীয় সাধুদের যে বাণী সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা কেবল বাঙালী সাধুদেরই বাণী নহে, তাহা সর্বভারতীয় সাধনার সঞ্চয়ন-ভাণ্ডার। এই সেদিন পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের উচ্চাসন নির্দিষ্ট থাকিত প্রকৃত গুণীর জন্য, কেবলমাত্র বাঙালীর জন্য নহে। অধ্যাপক রমন, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্, বর্তমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তিব্বতী লামাগণ, আরবী-পার্সীর মৌলবীবৃন্দ সকলকেই বাঙলাদেশ তাঁহাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে।

বাঙালীর প্রতিভা চিরকালই সর্বভারতমুখী, বিশ্বমুখী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। 'ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে' প্রেম প্রেম নয়। যে বাঙালীর বাঙালীপ্রেম নাই, অথচ, যিনি ভারত-প্রেমে উদ্বাহু, তাঁহার ভারত-প্রেম সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। মনে হয়, ওটা আপাত-উজ্জ্বল মেকি একটা জিনিস। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়—"প্রেমবিস্তারের একটা বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম গৃহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা দেশে বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের

স্বভাবই প্রসারিত হওয়া। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাতসমুদ্রপারে উত্তীর্ণ হইয়া আসর জমাইয়া বসে, তবে, সে প্রেমের ভিতর কোন পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই—তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বরমাত্র। এ সকল ইঁচড়ে-পাকা প্রেম হাঁটিতে শিখিবার পূর্বেই দৌড়িতে ও লম্ফ দিতে আরম্ভ করে। আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না পাইতেই অপর লোককে মা-বাপ বলিতে শেখে। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ কেহ বলেন, সার্বভৌমিক উদারতা, কেহ বলেন বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা, আমরা বলি, গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি।…"

বলা বাহুল্য, সুস্থমনা কোনও বাঙালীর এরূপ হাস্যকর ভারত-প্রেম নাই। বাঙালীর গুণকীর্তন করিবার জন্য আমি বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। ইতিহাসের নজিরে আমি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, কোথায় বাঙালীর শক্তি, কোথায় তাহার দুর্বলতা। আমার ধারণা হইয়াছে, বাঙালী আদর্শপ্রিয়, ভাবপ্রবণ, শিল্পীর জাতি। তাহার সঙ্গীতে ছন্দপতন ঘটিলেই, তাহার জীবনবীণা বেসুরা বাজিলেই সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছে, রাজ্যের উত্থানপতন ঘটাইয়াছে। এই শিল্পীর জাতি যখনই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে, তখনই তাহার জীবনে প্রতিভার দীপ্তি নানাদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সে একবার পাইয়াছিল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আমলে। ঐতিহাসিকদের মতে সেই যুগই ভারতের স্বর্ণযুগ, সেই স্বর্ণযুগের দ্যুতি বাঙলাকেও উজ্জ্বল করিয়াছিল। ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগেও দেখি, বাঙালী-প্রতিভা সমস্ত ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত করিয়াছে, তাহারও একমাত্র কারণ, ইংরেজশাসনের প্রথম যুগে বাঙালীরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল , ভাত-কাপড়ের জন্য তাহাকে এমনভাবে আত্মবিক্রয় করিতে হয় নাই। যখনই বাঙালীকে পেটের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, তখনই তাহার চরিত্র শুধু যে নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে তাহা নয়, তাহার শিল্পীমন তির্যকপথে তাহার চরিত্রে এমন সব দোষের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা লজ্জাকর। বাঙালীর একতা নাই, বাঙালী পরশ্রীকাতর, বাঙালী পরনিন্দা' করে, বাঙালী চাকুরি-প্রিয়। আমার মনে হয়, এ সমস্তই দারিদ্র্যপীড়িত শিল্পীচরিত্রের বিকৃত রূপ অথবা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ, তাহার শিল্পসৃষ্টি মানবতাকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত, অত্যুচ্চ মহামানবতার প্রতি তাহার তেমন টান নাই। প্রাচীন বাঙালী কবিদের কাব্য সাধারণ লোকদেরই জীবনলীলার আলেখ্য। চর্যাপদের কবি তো ডোম্বিনীর প্রেমে মাতোয়ারা, আনন্দই তাহার লক্ষ্য, জাতিকুলের আড়ম্বর নয়, শুষ্ক জ্ঞানচর্চা নয়, আধ্যাত্মিকতার কৃচ্ছ্রসাধন নয়। স্বর্গের দেবদেবীরাও তাঁহাদের মহিমান্বিত রূপে বাঙালীর কাছে আমল পান নাই, আমল পাইয়াছেন ধূলায় নামিয়া আসিয়া বাঙালীদের সহিত ঘরকরনা করিয়া। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বাংলাদেশ দেবভূমি নয়, এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ

করে নিয়েছে। বাংলার শিবে-দুর্গায়, বাঙালী চরিত্রেরই প্রকাশ। গঙ্গা-গৌরীর কোন্দলে, শিব-দুর্গার কলহে আমাদেরই ঘরোয়া ঝগড়া। ভালোমন্দ সব নিয়েই আমাদের শিব, আমাদেরই আপনমানুষ। বাঙালীর রাম তো বাল্মীকির রাম নন। আমাদের কৃষ্ণকেও শাস্ত্রে খুঁজে পাই নে, অথচ আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁকে খুবই দেখতে পাই...।" বাঙালীমাত্রেই অনুভব করিবেন, রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি কত সত্য। অমন যে প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্যদেব, বৈদিক-কবি গুরুগম্ভীর সংস্কৃত-মন্ত্রে যাঁহার স্তব করিতেছেন উদাত্ত ভাষায়—

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

সেই সূর্য বাঙালীর ব্রতকথায় একেবারে ঘরের মানুষ—

আসবেন সূর্য বসবেন পাটে
নাইবেন, ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে
গা হেলাবেন সোনার খাটে
পা মেলাবেন রূপোর পাটে।

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যেও দেখি 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' রামের অপেক্ষা রাবণই বেশি মহিমান্বিত। রবীন্দ্রনাথ সেদিনও তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"দেখতে পাই, ফলস্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফলস্টাফকে বাদ দিলে। সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে, কিন্তু, স্বয়ং বীর হনুমান, তার যত বড় লাঙ্গুল, তত বড়ই সে মর্যাদা পেয়েছে। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র, যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন, তাঁর চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব, যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত···।" এই রবীন্দ্রনাথেরই বিখ্যাত কবিতা এবং বাঙালী জনসাধারণের মর্মবাণী—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।···

এই বন্ধনময় ভাবাবেগই বাঙালী শিল্পীর বিশিষ্টতা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বৈদিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে রবীন্দ্র-সাহিত্যও চিরকাল ভাবাবেগ-প্রধান থাকিতে পারে নাই, ক্রমশঃ তাহা বিশুদ্ধ বুদ্ধির মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু, যে-ই উঠিয়াছে, অমনি তাহা সাধারণ বাঙালীর রসবোধের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। মুষ্টিমেয় কৃতবিদ্য অথচ রসিক বাঙালী ছাড়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসাস্বাদন কয়জন করিতে সক্ষম? সাধারণ বাঙালী পান করিতে চায় তাহার দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ-মন্থিত অমৃত। বাঙলার বাজারে তাই 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' অপেক্ষা 'বিন্দুর ছেলে' 'অরক্ষণীয়া'র

চাহিদা বেশি। রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয় অবশ্য, কিন্তু, তাহা ঔপনিষদিক বা আধ্যাত্মিক আবেদনের জন্য নহে, জনপ্রিয় তাহাদের নিতান্ত-মানবিক আবেদনের জন্য।

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি!

ইহার মধ্যে হয়তো গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আছে, কিন্তু, বাঙালী ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইহার অতি-স্পষ্ট করুণ কোমল ভাবটির জন্য। বাঙালীর ভাবধারা উদ্বেলিত তাহার মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া। সে ভোগী। তাহার যত কিছু আত্মত্যাগ, তাহার কংগ্রেস, তাহার অগ্নিযুগের মৃত্যুপণ, তাহার তান্ত্রিকের শবসাধনা, তাহার বৈষ্ণবের প্রেমবিলাস সমস্তই জীবনকে বিচিত্ররূপে ভোগ করিবার জন্য। জীবনশিল্পী বাঙালী জীবনকে শিল্পীর মতোই উপভোগ করিতে চায়। সামাজিক জীবনে সেইজন্যই তাহার সাম্য-প্রীতি, সেইজন্যই তাহার স্বাধীনতার জন্য তপস্যা।

তাই, মনে হয়, বাঙালীর পরশ্রীকাতরতা হয়তো দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালীর সাম্যপ্রিয়তার বিকৃত রূপ, তাহার পরনিন্দাশীলতা হয়তো তাহার সমালোচক মনেরই বক্র পরিণতি, তাহার চাকুরিপ্রিয়তা হয়তো তাহার শিল্পীমনের অবসরপ্রিয়তার অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর। বাঙালীর একতা হইবে কি করিয়া? বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে প্রতি বাঙালীর চরিত্রে এমন একটা উদার অথচ বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, কোনও একটা বিশেষ মতবাদের গণ্ডিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়া বাঙালীর স্বভাব-ধর্ম নহে। তাহার চিন্তাধারা সত্যই ধারা, স্থিতিশীল নহে—গতিশীল। যে বাঙালী ইংরেজকে ডাকিয়া রাজপদে বসাইয়াছে, সেই বাঙালীই কংগ্রেস গড়িয়াছে, সেই বাঙালীই বোমা ছুড়িয়াছে, সেই বাঙালীই খদ্দর পরিয়া অহিংস-সংগ্রাম করিয়াছে এবং সেই বাঙালীই এখন আবার মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা করিয়া রুশদেশে প্রবর্তিত কমিউনিজ্‌মের সাম্য-স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু, সাম্যনীতি-অনুমোদিত রাষ্ট্রস্থাপন করিতে হইলে যে একরঙা মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা বাঙালীর নাই। স্ব-স্ব-প্রধান থাকাই তাহার ধর্ম, তাই একই বাঙালী-পাড়ায় পাঁচটা ক্লাব, ছয়টা থিয়েটারের আখড়া, তাই একাধিক বারোয়ারিতে একাধিক পূজার জন্য একাধিক মোড়ল ব্যস্ত। সকলে একত্র হইয়া কিছু করা আমাদের স্বভাব নয়।

কেবল একটি ক্ষেত্রে বাঙালীর একতা আছে। সে ক্ষেত্রে সে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধকেও বোধ হয়, কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া যায়। তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, যখন সে প্রতিভার দুর্লভ জ্যোতি দেখিতে পায়। প্রতিভাবান ব্যক্তির মতবাদকে বা কীর্তিকে সে হয়তো সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণে জর্জরিত করিয়া দেয়, কিন্তু, প্রতিভাবান ব্যক্তিটি তাহার মাথার মণি। বৈদিক ধর্মকে বাঙালী পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই, কিন্তু বেদ-উপনিষদের ঋষিরা আজও বাঙালীর নমস্য; বৌদ্ধধর্ম বাঙলায় টিকিল না, কিন্তু,

বুদ্ধদেব বাংলার অবতারদের মধ্যে একজন ; চৈতন্যদেবের শিষ্যানুশিষ্যগণ বাঙালীর কাছে অনেক স্থলে উপহসিত, কিন্তু, নবদ্বীপের নিমাই বাঙালীর অন্তরের ধন ; রঘুনন্দনের বিধান বাঙালী সম্পূর্ণ মানিল না, কিন্তু, রঘুনন্দনকে লইয়া বাঙালীর গর্বের অন্ত নাই ; রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম বাঙলাদেশের জনসাধারণ গ্রহণ করিল না, কিন্তু, রামমোহন রায়ের ছবি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে ; বিদ্যাসাগরের সারাজীবনের সাধনা বিধবা-বিবাহ-প্রচলন বাঙলাদেশে অপ্রচলিত, কিন্তু, কোন্ বাঙালী বিদ্যাসাগরের নামে উল্লসিত হইয়া উঠেন না ? শান্তিনিকেতনের সহিত সাধারণ বাঙালীর প্রাণের যোগ নাই, কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেক বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর। মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনায় বাঙালী পঞ্চমুখ, কিন্তু, মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিটিকে সে পূজা করিতে কখনও ইতস্ততঃ করে নাই। আজকালকার কথাই ধরুন না, আমাদের প্রধান-মন্ত্রীর প্রধান সমালোচক বাঙালী রাজনৈতিক , কিন্তু দুরন্ত, দামাল, হঠকারী, তেজস্বী জওহরলালকে, শিল্পী, সাহিত্যিক জওহরলালকে কোন্ বাঙালী ভাল না বাসে ? কেবল স্বদেশী নয়, বিদেশী প্রতিভা সম্বন্ধেও বাঙালীর এই মনোভাব। বাঙালী শিল্পী এবং শিল্পীর সমঝদার। তাহার চরিত্রও শিল্পীসুলভ। বাহবা পাইবার জন্য, কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, কিন্তু, আধিভৌতিক সুখ-সুবিধার জন্য কিছু করিতে সে অপারগ। বড় বড় সাম্রাজ্যের বড় বড় আপিসের আয়ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব বাঙালীই চিরকাল রাখিয়াছে, কি করিয়া অর্থাগম হইতে পারে, তাহার নানা বুদ্ধি সে অপরকে বলিয়া দিতেছে, নিজে কিন্তু সে দরিদ্র। টাটানগরের বিরাট সম্ভাবনা বাঙালী প্রমথনাথ বসুর মনীষাতেই একদা প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু, তাহাকে রূপ দিল অন্য আর একজন অ-বাঙালীর কর্মদক্ষতা। বাঙালী আপিসের বেতনেই সন্তুষ্ট। যে একটানা অধ্যবসায় থাকিলে অর্থোপার্জন করা যায়, তাহা বাঙালীর নাই। অথচ, অর্থের প্রতি তাহার বৈরাগ্যও নাই, দারিদ্র্য তাহার প্রতিভাকে বিকৃত করে। সে ভোগী, সে শিল্পী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, বিশুদ্ধ আদর্শনিষ্ঠা, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত-সমন্বয় বাঙালী-চরিত্রে বস্তুতান্ত্রিকতার ও ভাবপ্রবণতার, শক্তির ও দুর্বলতার অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে সে যেমন শক্তিধর, অন্যদিকে সে তেমন অসহায়। এই শিল্পীজাতিকে যদি কোনও রাষ্ট্র সন্তুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে বিপ্লবের সম্ভাবনা। শিল্পপ্রতিভা অনেকটা আগুনের মতো। তাহাকে যদি ঠিকমতো যথাস্থানে রাখা যায়, তাহা হইলে সে রাষ্ট্রের পরম বন্ধু। সে অমাবস্যার অন্ধকারকে দীপালীর মহিমায় উদ্ভাসিত করে, দুর্গম পথযাত্রীদের হস্তে মশাল-আলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়, ফ্যাক্টরি চালায়, কামানে গর্জন করে, রান্নাঘরের চুল্লীতে থাকিয়াও অন্নব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য সম্ভব করে। কিন্তু, এই অগ্নি লইয়া অবহেলাভরে খেলা করিলেই বিপদ, অগ্নি তখন ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠে।

অনুভব করিতেছি, বাঙালীর জীবনে এই অগ্নি আজ কল্যাণকর মূর্তিতে নাই।

ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য যে, যখনই একটা রাষ্ট্রের অবসান হইয়া নূতন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই বাঙালীজাতির জীবনে এই অগ্নির, বাঙালীর শিল্পীমনের বিকৃতি ঘটিয়াছে। তখন দারিদ্র্যের পেষণে পুরুষরা অর্থহীন, আশাহীন, উদ্যমহীন, বাগাড়ম্বর-প্রিয়, আর নারীরা অপমানিতা, ধর্ষিতা বা ভ্রষ্টা। ইংরেজরা প্রথমে যখন এ দেশে আসিয়াছিল, তখন বাঙলাদেশের সামাজিক অবস্থা ভয়াবহ ; সাহিত্য-শিল্প মৃতপ্রায়, ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মন্বন্তর-রাক্ষসের অট্টহাস্যে বাঙলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। কিন্তু, কিছুদিন পরে ইংরেজের সংস্পর্শে যে-ই সে আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করিল, অমনি সঞ্জীবিত হইল তাহার প্রতিভা। সাহিত্যে-সমাজে-ধর্মে বাঙালী-প্রতিভার অগ্নি অভূতপূর্ব জ্যোতিতে সমগ্র ভারতকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। ইংরেজ আমলের শেষের দিক হইতেই কিন্তু সে অগ্নি ম্লান হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লইয়া অত্যধিক আস্ফালন যেন আমাদের মানসিক দৈন্য সূচিত করিয়াছে। কবিদের পুরস্কার-প্রাপ্তিপ্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িতেছে। কবি কৃত্তিবাস একদিন নাকি গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণের সভায় আসিয়া তাঁহাকে স্বরচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। শুনিয়া গৌড়েশ্বর পরম হৃষ্ট হইলেন, তাঁহার পারিষদেরা বলিলেন, "গৌড়েশ্বর আপনার উপর খুশি হইয়াছেন, এখন আপনি কি পুরস্কার চান, বলুন। যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন।" কৃত্তিবাস উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কবি, আমি ভিক্ষুক নই। কবিতার বিনিময়ে সম্পদলাভ করিতে আমি আসি নাই। 'কারো কিছু নাহি লই, গৌরবমাত্র সার'।" কোন কবিই পুরস্কারলাভের আশায় কাব্যরচনা করেন না, রবীন্দ্রনাথও করেন নাই, পুরস্কারটা আকস্মিকভাবেই তাঁহার জীবনে আসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, ইহা লইয়া আমাদের আস্ফালনটা যেন একটু বেসুরা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতেই বাঙালীর সাহিত্য-সাধনাও যেন মূলতঃ একটা অর্থকরী পেশা হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও একটু বাহবা পাইবার জন্য, একটা পুরস্কার পাইবার জন্য আমরা যেন আজ লোলুপ। ইহা লইয়া প্রতিযোগিতার অন্ত নাই। সাহিত্য-সাধক তাঁহার সাধনার জন্য অর্থলাভ করুন, পুরস্কারলাভ করুন—ইহা তো আনন্দের কথা। কিন্তু, যখনই তিনি অর্থ বা পুরস্কারের লোভে ক্রেতা বা পুরস্কার-দাতাদের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইবেন, তখনই তাঁহার পতন। নিদারুণ অর্থাভাবের সহিত বিলাস-লালসা সংযুক্ত হইয়া আজ অনেক প্রতিভাবান বাঙালী লেখককে বিভ্রান্ত করিতেছে। সিনেমা-অধিপতিদের নিকট আত্মসম্মান বিকাইয়া অনেকেই আজ যে কর্মে নিযুক্ত, তাহা দেশের এবং জাতির পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ, আজকাল দেখিতেছি, অধিকাংশ সিনেমারই লক্ষ্য, আমাদের পশুত্বকেই উত্তেজিত করা।

যে স্বাধীনতার জন্য বাঙালী তাহার সর্বস্ব খোয়াইয়াছে, সেই স্বাধীনতা আজ সমাগত। কিন্তু, বাঙালী-জীবনের সেই অগ্নি কোথায় ? নির্বাপিত হয় নাই, রূপ-পরিবর্তন করিয়াছে। শিল্প-প্রতিভা, কবি-প্রতিভা যখন বিকৃতরূপ ধারণ করে, তখন তাহা

আতঙ্কজনক, নারী যখন নগ্নিকা হয়, তখন সে ভয়ঙ্করী কালী হইয়া উঠে—শিবের বুকে পা দিতেও তখন তাহার আপত্তি নাই, বরং, তাহার উল্লাস। ইংরেজ-রাজত্বের অবসানে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রপত্তনের সূচনায় অভাবের, অন্যায়ের, অবিচারের কবলে পড়িয়া বাঙালীজাতি আজ আর্তনাদ করিতেছে। ইতিহাসে তাহার এই আর্তনাদ শুনিয়াছি মাৎস্যন্যায়ের যুগে, পালরাজ্যের অবসানে, সেনরাজ্যের অধঃপতিত অবস্থায়, মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগে। আজও বাঙালীর দুর্দশার নানা অভিব্যক্তি চতুর্দিকে করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে, দেখিতে পাইতেছি। ঘরে, বাহিরে কোথাও তাহার স্থান নাই, সর্বত্রই সে যেন প্রবাসী, তাহার উপার্জনের পথ রুদ্ধপ্রায়, তাহার সামাজিক বন্ধন শিথিল, তাহার ভাষা বিপন্ন, তাহার প্রতিভা অস্বীকৃত এবং সেইজন্যই উন্মার্গগামী, প্রতিদিনই মুখোসধারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতারা তাহার আদর্শপ্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তাহার পুত্রকন্যারা গতানুগতিক পন্থায় পঠদ্দশা শেষ করিয়া অবশেষে অনিশ্চিত তিমিরে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বর্তমান সাহিত্যেও ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট, কারণ, পেটের দায়ে পপুলার হইবার জন্য অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক আজ সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত। প্রকৃত সাধক সংখ্যায় খুব বেশি নাই। তাই দেখি, আমাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী নানা সুরে ইনাইয়া বিনাইয়া বলা, অন্তঃসারশূন্য বীরত্বের ফাঁকা আওয়াজ করা, নানা ছুতায় জঘন্য যৌন-প্রকৃতিকে উদ্দীপ্ত করা, শ্রমিক-মজদুরদের লইয়া নকল ক্ষোভ প্রকাশ করা, পরনিন্দার মসলায় মুখরোচক করিয়া গালগল্প সাজাইয়া-গুজাইয়া বলা—এই সবই বর্তমানে অধিকাংশ বাঙালী কবির উপজীব্য। রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের সমৃদ্ধিরও দিক আছে, আমি আজ সে আলোচনা করিতেছি না। সে আলোচনা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোকে নিশ্চয়ই একদিন করিবেন, কিন্তু, আজ আমি নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছি যে, আমাদের সাহিত্য ও জীবন এক প্রস্থ ফসল ফলাইয়া আবার নূতন ফসলের আশায় রিক্তশ্রী হইতেছে। যে আবর্জনা ও জঞ্জাল আজ আমাদের জীবনে স্তূপীকৃত হইতেছে, তাহাই একদিন সারে পরিণত হইয়া নবীন সৃষ্টিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিবে। তাহার এই দীনতা, তাহার এই ক্ষোভ, তাহার এই উচ্ছৃঙ্খলতা আসন্ন বিপ্লবেরই প্রাথমিক ভূমিকা। বাঙালী বারংবার বিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু, তাহার আদর্শ-উদ্বুদ্ধ শিল্পচেতনা তাহাকে বারংবার সঞ্জীবিতও করিয়াছে। অন্যায়কে, অসত্যকে, অসুন্দরকে, অশিবকে উৎখাত করিবার জন্য সে বহুবার জীবনপাত করিয়াছে, আশা আছে, আবার করিবে।

আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। একটি ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

জয়যাত্রায় বাহির হয়েছি কতকাল আগে মোরা
যাত্রা হয় নি শেষ

গিরি-মরু-বন কত অগণন একে একে হ'ল ঘোরা
বদল হ'ল যে বেশ,
দূর দিগন্ত পানে বার বার চাই
সেদিনের সাথী-সঙ্গীরা কেহ নাই
বুকভরা আশা ছিল যাহাদের
দেখিবে নূতন দেশ
দুর্গম পথে চলিতে চলিতে
হ'ল তারা নিঃশেষ।

তোমরা আসিবে নূতন পথিক নূতন বার্তা নিয়া
নূতন পথের বাঁকে
নবীন যুগের যুগন্ধরেরা দশদিশি সচকিয়া
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে
তোমাদের মুখে শুনিব বিজয়বাণী
হবে হবে জয় হবে হবে জানি জানি
স্বপনে যাহারে দেখেছি আমরা
পাব তার উদ্দেশ
কণ্টক ভেদি' হবেই একদা
কুসুমের উন্মেষ।

ভাগলপুর
১লা পৌষ, ১৩৫৯

কাব্য-প্রসঙ্গ*

যে মানসিক উৎকর্ষের জন্য মানুষ পশু হইতে বিভিন্ন, সাহিত্য সেই মানসিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। আমাদের আত্মদর্শন, আত্মবিচার, আত্মপ্রসাদ সমস্তই সাহিত্যের মাধ্যমে। সাহিত্যের সাহায্যেই বাস্তবের রূঢ়লোক হইতে প্রস্থান করিয়া আমরা স্বপ্নের গূঢ়লোকে আত্মহারা হই। সাহিত্যই আমাদের আনন্দ দেয়, সান্ত্বনা দেয়, আশা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরের ইহাই নিগূঢ়তম সেতু, সত্যতম সম্বন্ধ এবং দৃঢ়তম বন্ধন।

সাহিত্যের গণ্ডি আজ যদিও অতিশয় ব্যাপক—ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র,

* জামসেদপুরের চলন্তিকা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ।

রাজনীতি, সমাজনীতি, বস্তুতঃ, মানবমনীষা-প্রসূত সমস্ত কিছুই যদিও আজ সাহিত্যের অঙ্গীভূত, কিন্তু, 'সাহিত্য' বলিতে সাধারণতঃ আমরা সৃষ্টিধর্মী কাব্য-সাহিত্যই বুঝি। যে সাহিত্য-আলোচনা করিবার জন্য আপনারা এই সভার আয়োজন করিয়াছেন, তাহা কাব্য-সাহিত্যই—ইতিহাস, বিজ্ঞান বা রাজনীতি নহে।

সুতরাং, কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধেই সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

কাব্যই আমাদের প্রাণের আশ্রয়-ভূমি।

ইতিহাস যখন অতীতের নজির তুলিয়া বারংবার প্রমাণ করে যে, আমরা পশু ছাড়া আর কিছু নই, চিরকাল নখদন্ত বিস্তার করিয়া যুদ্ধই করিতেছি, রাজনীতি যখন নানা কৌশলে, নানা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জঘন্য স্বার্থপরতাকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে থাকে, অর্থনীতি, সমাজনীতি—কোন নীতিই যখন আমাদিগকে পাশবিক স্বার্থনীতির ঊর্ধ্বে লইয়া যাইতে পারে না, বিজ্ঞান যখন স্পষ্ট ভাষায় বলে—তুমি তো পশুই, আত্মরক্ষাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম—তখন struggle for existence-এর জ্ঞানগর্ভ বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র কবিই আমাদের বিভ্রান্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে—

"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

সুখের সন্ধানে যখন আমরা চতুর্দিক তোলপাড় করিয়া বেড়াই, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গুরু-বন্ধু, অর্থ-সম্পদ কেহই যখন আমাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে না, তখন কবির কাছেই আমরা কেবল সুখের সন্ধান পাই

"সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো। শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত, বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি, চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হতে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন।
... ...
এই স্তব্ধ নীলাম্বর, স্থির শান্ত জল
...সুখ অতি সহজ, সরল।"

আমাদের সাবধানী মন যখন অতি-সঞ্চয়ের বিজ্ঞতায় সব দিক সামলাইতে গিয়া শেষ পর্যন্ত কোন দিক সামলাইতে পারে না, কবির বাণীই তখন আমাদের উপদেশ দেয়—

"ফুরায় যা দে রে ফুরাতে
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাহি না বুঝিতে
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে
পূরিল না যাহা কে রবে বুঝিতে তারি গহ্বর পূরাতে
যখন যা পাস, মিটিয়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে।"

চতুর্দিকে যখন হতাশা, চতুর্দিকে যখন অন্ধকার, তখন একমাত্র কবিই বলিতে পারেন—অন্ধকার সত্য নয়, অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ।

আজকাল কিন্তু অনেকে কবির এই-জাতীয় বাণীতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা কাব্যে রাজনৈতিক রিয়ালিস্‌ম্ সন্ধান করেন, তাহাতে অতি-আধুনিকতার প্রগতি দেখিতে চান।

রিয়ালিস্‌মের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই কি লোকে কাব্যের শরণাপন্ন হয় না?

একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী কাব্যকে—Interpretation of life বলেছেন। কথাটা সম্পূর্ণ হইত—Poet's interpretation of life বলিলে। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সমাজতন্ত্রী, ধনিক, শ্রমিক প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক একটা Interpretation of life আছে, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটি হয়তো বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, যুক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু, কেবল কবির Interpretation-ই কাব্য। তাহাই মনোহারী এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইলেও তাহাই চিরন্তন সত্যের আধার। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, আরব্য-উপন্যাস, ডিভাইন কমেডি, ফাউস্ট, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, রবিন্সন ক্রুসো প্রভৃতি অমর কাব্যগুলিতে রিয়ালিস্‌ম্ আছে কি? শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক, কালিদাসের কাব্য কি রিয়ালিস্টিক? এমন কি, ডল্‌'স হাউসের রিয়ালিস্‌ম্ কি সত্যই রিয়ালিস্‌ম্? যাহা বাস্তব, তাহাতে রং না লাগাইলে কি কাব্য হয়? যাহা স্থূল, তাহার স্থূলতার আবরণ উন্মোচন না করিলে কি তাহার সূক্ষ্ম মর্ম বোঝা যায়? যাহা স্থূল, যাহা বাস্তব, যাহা ঘটিতেছে, তাহা তো চোখের সম্মুখেই অহরহঃ রহিয়াছে, তাহার পরিচয়লাভের জন্য কবির কাছে যাইবার প্রয়োজন কি? চোখ খুলিয়া রাখিলেই হইল। বিস্তৃততর বিবরণের জন্য খবরের কাগজ আছে—কবিকে খবরের কাগজের রিপোর্টারের পর্যায়ে নামাইয়া আনিবার এ হাস্যকর প্রয়াস কেন বুঝি না। কবি এমন কোন প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারেন না, যাহার বাজার-দর আছে। যে রত্ন তিনি অন্বেষণ করেন, তাহা অরূপ-রতন—যে লোকে তিনি উত্তীর্ণ হইতে চান, তাহার ঠিকানা নিজেই তিনি জানেন না, অসহায়ভাবে কেবল আবৃত্তি করিতে থাকেন—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"। অন্তরের অন্তরতম লোকে

তিনি যাহা অনুভব করেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষাই তিনি খুঁজিয়া পান না সব সময়ে—

"নবীন চিকণ অশথপাতায়
আলোর চমক কানন মাতায়
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে
কি চাই কি চাই বচন না পাই
মনের মতন রে।"

এই অনুভূতিই তাঁহার কাছে রিয়েল এবং ইহারই প্রতিধ্বনি রসিকের চিত্তে সত্যকে মূর্ত করিয়া তোলে।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা বিচলিত হইলেও কবি-সত্তা সহসা বিচলিত হয় না। কারণ, যিনি কবি, তিনি অসাধারণ। সাধারণ লোক যে রাজনৈতিক কারণে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয়, সে রাজনৈতিক কারণ কবির কাব্যলোককে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। রাজনৈতিক সমস্যা কবির সমস্যাই নয়, রাজনৈতিক খবর আর কাব্যলোকের খবর এক নয়। যুদ্ধের খবর লইয়া যখন সবাই উন্মত্ত, তখন কবির মনে হয়—

ফাটিতেছে বোমা, কাঁপিছে ধরণী কামান-রবে
টুঁটির উপর চাপিয়া বসেছে দাঁতের পাটি—
নূতন খবর খুব কি বন্ধু? শকুনি শবে
চিরকাল ধ'রে জুড়িয়া রয়েছে ধরার মাটি।
চিরকাল ধ'রে মরেছে জন্তু, শকুনি তাদের খেয়েছে ছিঁড়ে,
চিরকাল ধ'রে অসহায় চাল চ্যাপ্টা হইয়া হয়েছে চিঁড়ে,
চিরকাল ধ'রে তবু মহাকাল মরণ-বীণায় নিখুঁত মীড়ে
জীবনের সুর বাজায় খাঁটি,
চিরকাল ধ'রে বুক দিয়ে ঘিরে নূতন জননী নূতন নীড়ে
নূতন জীবনে বাঁচাইয়া রাখে কি পরিপাটি!

চিরকালের চিরন্তন খবরই কাব্যলোকের খবর, সমসাময়িক রাজনৈতিক খবর নয়।

কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। বিখ্যাত কবিদের কাব্যে তাঁহাদের সমসাময়িক আন্দোলনের কতটুকু পরিচয় আমরা পাই? ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-হোমার-ভার্জিল-গয়টে-দান্তের কাব্যে আমরা চিরন্তন মানব-মনের প্রতিচ্ছবিই দেখি, মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আকুতির আলোকেই সেগুলি দেদীপ্যমান, কিন্তু, সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ ছবি, বিশেষ একটা দলের বা মতের স্বপক্ষে ওকালতির কোন চিহ্ন তো সে সবে নাই। শেক্‌স্‌পীয়রের

কাব্যে আমরা এলিজাবেথান যুগের বিক্ষোভের কতটুকু প্রতিফলন দেখি? মিলটন তাঁহার প্রথম জীবনে রাজনীতি লইয়া মাতিয়াছিলেন, রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধও হইয়াছিলেন, রাজনীতি লইয়া কিছু কিছু রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেইজন্যই কি আমরা মিল্টনকে মনে রাখিয়াছি? মিল্টনের সেই রাজনৈতিক জীবনে মিল্টন নিজেই অনুভব করিয়াছেন যে, he was neglecting his great gift of Poetry. তাঁহার সেই রচনাগুলি আমরা এখনও মাঝে মাঝে পড়ি প্যারাডাইস লস্টের কবির রচনা বলিয়া। প্যারাডাইস লস্টে কমন্‌ওয়েল্‌থের কোন উল্লেখ নাই। শেলী, কীটস, বায়রন কেহই সমসাময়িক রাজনীতিকে অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করেন নাই। কেহ কেহ হয়তো দুই-চারিটা সনেট লিখিয়াছেন, কিন্তু, সেগুলি কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়। টল্‌স্টয়ের জীবদ্দশায় রুশদেশ যখন জারের পীড়নে আর্তনাদ করিতেছিল, তখন তিনি অ্যানা কারেনিনার প্রেমের কাহিনী লিখিয়াছিলেন। জারের অত্যাচার তাঁহার কোন কাব্যের বিষয় হয় নাই। যে সব কাব্যের জন্য ডস্টয়েভ্‌স্‌কি শেখব জগদ্বিখ্যাত, তাহা চিরন্তন মানব-মানবীর কাব্য—বিশেষ একটা রাজনৈতিক মতবাদের নয়। অথচ, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবন রাজনৈতিক আবর্তে আবর্তিত হইয়াছিল।

বাঙলা-সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উদাহরণ বর্তমান। সিপাহী-বিদ্রোহের ধূমে ও গর্জনে যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগন আচ্ছন্ন, মাইকেল মধুসূদন তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া পুলিস-আদালতে চাকুরি করিতেছেন। তাহার পরই—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—তিনি যে সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন, তাহা সিপাহী-বিদ্রোহ-বিষয়ক কাব্য নয়—রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ। সিপাহী-বিদ্রোহের মতো অত বড় একটা রাজনৈতিক ঘটনা তাঁহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিল না। তিনি যখন মেঘনাদবধকাব্য লিখিতেছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের কবলে। তাঁহার কাব্যে সে দুর্ভিক্ষের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না। ইহার পরই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি যখন দুর্গেশনন্দিনীর রোমান্স রচনা করিতেছিলেন, তখন লর্ড এল্‌গিন ওহাবী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের বিদ্রোহ-নিবারণে ব্যস্ত। সে বিদ্রোহ বা তাহা নিবারণের প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে তিলমাত্র বিচলিত করে নাই। তাহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড লিটনের আমলে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষে, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে, আফগান-যুদ্ধে আলোড়িত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা সমসাময়িক ঘটনা লইয়া নয়। ওই কাব্যগুলিতে যে সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহা চিরন্তন। সর্বদেশের, সর্বকালের সকল মানবকে তাহা উদ্বুদ্ধ করিবে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক-জীবনেও বহু উত্তেজনাজনক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু, সে সব লইয়া তিনিও কোন উল্লেখযোগ্য কাব্যরচনা করেন নাই। অগ্নিযুগের বিদ্যুৎবহ্নি বা মহাত্মাজীর দাণ্ডিমার্চ তাঁহার কাব্যের খোরাক যোগায় নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড লইয়া তিনি একটা ঐতিহাসিক লিপি রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার

জন্যই তিনি সাহিত্যজগতে বিখ্যাত নহেন। তাঁহার পূর্বে সুব্রহ্মণ্য আয়ার অনুরূপ পত্র লিখিয়া উপাধিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু, কাব্যজগতে সেজন্য তাঁহার স্থান হয় নাই। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে কয়টা গান, প্রবন্ধ, আলোচনা বা পত্র লিখিয়াছেন, তাহা কাব্যজগতে তাঁহারও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে। গোরা এবং চার অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অনেকটা স্বদেশী হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহাতে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা সনাতন, বৃন্দাবনী সুর।

"কেন আন বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল।"

এবং এই চিরন্তন সুর লাগিয়াছে বলিয়াই ইহা অমর হইয়া আছে। নীলদর্পণ আজকাল আর কেহ পড়ে না, গোরা, চার অধ্যায় কিন্তু চিরকাল সকলে পড়িবে। নীলদর্পণ কেহ না পড়িলেও কাব্যহিসাবে ইহা যে সার্থক সৃষ্টি, সে কথা আমি স্বীকার করিতেছি। সমসাময়িক রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা কবির মনে যে কখনও রেখাপাত করে না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। আঙ্কল টম'স কেবিন, মাদার, নীলদর্পণ, অরক্ষণীয়া, অমৃতলালের নাটকাবলী, গালিভার্'স ট্রাভেল্স, ভল্টেয়ারের রচনা, জার্নি'স এণ্ড অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, ভার্জিন সয়েল আপ্রূটেড, রেন্বো, প্রত্যেকটি রসোত্তীর্ণ সার্থক কাব্য এবং রসোত্তীর্ণ কাব্য বলিয়াই অর্থাৎ ওইগুলিতে চিরন্তন মানব-মানবীর শাশ্বত মূর্তি রসের তুলিকায় পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই সাহিত্য-গ্রন্থাগারে উহাদের স্থান আছে—রাজনৈতিক কারণে নহে। যাঁহারা সত্যকার কবি, তাঁহারা শাশ্বতের চারণ, সমসাময়িকের নহে। সমসাময়িক ঘটনা প্রায়ই তাঁহাদের কাব্যের বিষয় হয় না, যদি বা হয়, তখন তাঁহারা তাহার মধ্যেই শাশ্বতকে প্রত্যক্ষ করেন। সমসাময়িক জনতার পদোৎক্ষিপ্ত ধূলির উর্ধ্বে বিচরণ করিতে পারেন বলিয়াই কবিরা অসাধারণ ব্যক্তি।

কবির কাছে অতি-আধুনিকতার দাবি যাঁহারা করিতে চান, তাঁহারা একটা কথা বিস্মৃত হন যে, কবির চক্ষে 'অতি-আধুনিক' বলিয়া কোন কিছু' নাই। মানুষের যে মন লইয়া কবির কারবার, মানুষের সে মন বদলায় নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মহত্ত্ব, প্রতিভা, ক্ষমা, তিতিক্ষা সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনই আছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যে প্রগতি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা বস্তুর প্রগতি, মনের প্রগতি নহে। মহাভারত-রামায়ণ-জাতকে মানবচরিত্রের যে বিচিত্র বিকাশ আমরা দেখি, তদপেক্ষা বিচিত্রতর বা নবতর কোন চরিত্র আধুনিকতম কোনও কাব্যে বা ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমাদের মনীষাও যে পূর্বাপেক্ষা বেশি বাড়িয়াছে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। যে বৈজ্ঞানিকগণ আজ নানা অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার

করিয়া শত্রুর প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের প্রতিভা যে গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের প্রতিভা অপেক্ষা বেশি, এমন কথা মনে করিবার কোন হেতু দেখি না। আর্কিমিডিস যে মনীষাবলে রোমবাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনীও প্রাচীন বলিয়া কম বিস্ময়কর নহে। গরুর গাড়িও একদিন মানবসমাজের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। আজ গরুর গাড়ি পুরাতনের পর্যায়ে পড়িয়াছে, এরোপ্লেনও একদিন পড়িবে। যে মানুষ একদা গরুর গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইত, সেই মানুষই আজ এরোপ্লেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু, সে উন্নততর প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, এমন কথা ভাবিবার সঙ্গত কারণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-সভ্যতার বহির্বেশের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, মানসিকতা বদলায় নাই। পূর্বে তাহারা গদা লইয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, এখন প্লেনে চড়িয়া বম ফেলিয়া যুদ্ধ করিতেছে—তফাৎ শুধু এইটুকু। এমন কি, যে কমিউনিজ্‌ম্‌কে মানব-সভ্যতার আধুনিকতম প্রকাশ বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, ইতিহাসের সাক্ষ্য মানিলে তাহারও আধুনিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ঐতিহাসিকদের মতে মুখোসটা শুধু বদলাইয়াছে, অন্তর্নিহিত রূপটা ঠিক আছে। যখনই কোন দেশের দুর্বল জনসাধারণ সবল দ্বারা নিপীড়িত হইতে থাকে, তখনই সেই দেশে কমিউনিজ্‌মের সূত্রপাত হয়। দুর্বলেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করে এবং অবশেষে সেই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিবলে সবলকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজেরাই শাসনভার গ্রহণ করে। কিছুকাল তাহারা ন্যায় ও সাম্যের মর্যাদা রক্ষা করিতেও যত্নবান হয়, কিন্তু, তাহা কিছুকালমাত্র। অসাম্য আবার আত্মপ্রকাশ করে—নিপীড়িতদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারাই প্রভুত্ব করিতে থাকেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিন লেখক উইল ডুরাণ্টের মতে উদ্ধৃত করিতেছি—

Communism tends to appear chiefly at the beginning of Civilizations…It flourishes most readily in times of dearth when the common danger of starvation fuses the individual into the group. When abundance comes and danger subsides, social cohesion is lessened and individualism increases ; communism ends where luxury begins…

বৈজ্ঞানিক, কমিউনিস্ট কাহারও সহিত কবির বিরোধ নাই। মানব-মনের মানব-চরিত্রের মানব-সভ্যতার প্রকাশ হিসাবে তাহা কবি-মানসকে আবিষ্ট করে। অবৈজ্ঞানিক ক্যাপিটালিস্টও করে। কোন একটা যুগকে, দলকে বা ইজ্‌ম্‌'কে অতি-আধুনিক বা অতি-প্রগতিশীল নাম দিয়া তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না। কোনকালেই হয় নাই। কারণ, তাঁহারা জানেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্‌।

যে আমরা এখন আছি, সেই আমরা পূর্বেও ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকিব। আধুনিক বা পুরাতন বলিয়া কিছু নাই। কবির চক্ষে সমস্তই চির-পুরাতন এবং চির-নূতন। একমাত্র কবিই সেই সত্যকে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন যাহা—ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। সুতরাং কোন সমসাময়িক ঘটনার উচ্ছ্বাস খবরের কাগজের সম্পাদক অথবা প্রোপাগ্যাণ্ডা-লেখককে যতটা বিচলিত করে, কবিকে ততটা করে না। ইহার জন্য তাহাদের যদি একঘরে করিতে চান করুন, কিন্তু, ইহাই তাহাদের স্বভাব।

সমসাময়িক ঘটনা লইয়া না মাতিলেও ভগবানের সৃষ্টি আলো-বাতাস, জল-মাটি যেমন জীবনবিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কবির সৃষ্টি কাব্যও তেমনই সভ্য-মানবের চিত্তবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কবির কাব্যে চিরন্তন ক্ষুধার সুধা সঞ্চিত থাকে।

তাই, মাইকেল মধুসূদন সিপাহীবিদ্রোহ-দুর্ভিক্ষ লইয়া কাব্য না লিখিলেও বাঙালীর মনকে বৃহতের দিকে, মহতের দিকে, সুন্দরের দিকে উন্মুখ করিয়া গিয়াছেন, ইল্‌বার্ট বিল বা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টকে কাব্যে স্থান না দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর মনকে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, বোমা অথবা খদ্দরবিষয়ক কাব্য না লিখিয়াও রবীন্দ্রনাথ জগতের সুধিসমাজকে ভারতবর্ষের মহত্ব সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের আজ দুর্দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, আমাদের ইতিহাসে আমাদের জাতীয় জীবনে এরূপ দুর্দিন বহুবার আসিয়াছিল এবং আরও বহুবার হয়তো আসিবে। দুর্দিন আসিয়াছে বলিয়াই কি কবিকে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে? কাব্য-সিংহাসন হইতে বঁধুকে অপসারিত করিয়া কোন বিশেষ ইজ্‌ম্‌কে সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজন কোনকালেই হয় না।

"টুটলো কত বিজয়তোরণ, লুটলো প্রাসাদচূড়ো
কত রাজার কত গারদ ধূলোয় হ'ল গুঁড়ো।

.. ..

ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।"

আজ নাদিরশাহ, তৈমুরলঙ্গ কোথায়? বাগানে কিন্তু জুঁইফুলের হাসি আজও তেমনই শুভ্র, তেমনই অম্লান। দুর্দিন আসিয়াছে বলিয়া জুঁইফুল উচ্ছেদ করিয়া পটলের চাষ করিলে আমাদের দুঃখ ঘুচিবে এবং অত্যাচারী জব্দ হইয়া যাইবে, এ কথা আর যে-ই মনে করুক, কবি মনে করিবে না।

এ দুর্দিনে কবির কি তবে কোন কর্তব্য নাই?

আছে বই কি। একমাত্র কর্তব্য তো কবিরই। নিগূঢ়ভাবে, সুন্দরভাবে সে তাহা সম্পন্ন করিবে। তাহার কর্তব্য, সেই সনাতন প্রাণশক্তিকে আহ্বান করা, যাহা যুগে যুগে

শিকল ভাঙিয়াছে, যাহা সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াসে অসাধ্যসাধন করিয়াছে, দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছে, বৃহতের আকর্ষণে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, মহতের পদে আত্মনিবেদন করিয়া আদর্শের জন্ত আত্মবলি দিয়াছে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে, কিন্তু, সত্য, শিব, সুন্দরও চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। সত্য-সন্ধী, শিব-পন্থী সুন্দরের ধ্বজাবাহক সেই যৌবনকে আবাহন করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ*

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন-কাহিনী পৃথিবীর সুধিসমাজে সুবিদিত। তাঁহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী সকলেই জানেন। কিন্তু, এ কথাটা হয়তো অনেকে জানেন না ঐতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমাত্র। সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিসংঘাত থাকে, যে আবেগ, যে প্রতিভা, যে প্রেরণা থাকে, তাহার রহস্যই জীবন-রহস্য। সামান্য মানুষের জীবন-রহস্য-উদ্‌ঘাটনও সহজ নহে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বিরাট জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা আরও দুরূহ। তাঁহাকে অনেকটা চিনিয়াছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। পরমহংসদেবের পূর্ণ রূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যতটুকু যেভাবে বুঝিয়াছি, তাহাই কেবল আপনাদের নিকট আজ নিবেদন করিব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একদল অন্ধ একবার একটি হাতী দেখিতে গিয়াছিল। হাতীটিকে ঘিরিয়া হাত দিয়া দিয়া তাহারা হাতীর স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা হাতীর পা-টাই স্পর্শ করিল, তাহারা বলিল, হাতী থামের মতন, যাহারা কানটা স্পর্শ করিল, তাহারা বলিল, হাতী কুলার মতন, যাহারা শুঁড়টা স্পর্শ করিল, তাহাদের ধারণা হইল, হাতী সাপের মতন। আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি লোকেরা যখন মহাপুরুষ-জীবন আলোচনা করিতে যায়, তখন এইরূপ হাস্যকর ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তবু যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলিব, নিজের স্বার্থের জন্যই বলিব, কারণ, মহাপুরুষের নামকীর্তনই হয়তো আমার অন্ধত্বমোচন করিয়া দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁহার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে বিধৃত হইয়া আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে অবতার বলি।

মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? প্রাণি-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা-অনুসারে মানুষও একপ্রকার পশু। পশু হইলেও তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি সে বৈশিষ্ট্য? কেহ বলেন, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, কেহ বলেন, সে বিবেকী, কাহার মতে মানুষ সামাজিক।

*কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

Burke বলিয়াছেন—"Man is an animal that cooks his victuals." Adam Smith মানুষের আরও বৈষয়িক সংজ্ঞা দিয়াছেন—"Man is an animal that makes bargains." কবি বায়রণের ভাষায়—"Man is half dust, half deity, alike unfit to sink or soar, a pendulum betwixt a smile and tear." শেক্‌সপীয়রের ভাষায়—"What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties!" কিন্তু, গীতায় বিশ্বরূপদর্শন-অধ্যায়ে মনুষ্যরূপী শ্রীভগবান এবং দেবীসূক্তে অম্ভৃণ-মহর্ষির কন্যা বাক্‌ মানুষের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ স্রষ্টা। অন্যান্য প্রাণীরাও সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু, তাহাদের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য নাই। উইপোকা উই-ঢিপি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, যুগযুগান্ত ধরিয়া সে উহাই করিতেছে। একজাতীয় পাখী একজাতীয় নীড়নির্মাণ করিতেই দক্ষ। অতি স্থুল আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। মানবসভ্যতা স্রষ্টা মানবের কীর্তি নব নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। সৃষ্টিই মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, নিত্য নূতন দৃষ্টিতে সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তাহার মনীষা নিত্য নূতন লোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উন্মুখ, এজন্য যুগে, যুগে বহু বিপদকে সে বরণ করিয়াছে—সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে, পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছে, ব্যাধজীবনের অবসান করিয়া কৃষিসভ্যতার পত্তন করিয়াছে, অরণ্য কাটিয়া পল্লী বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে রূপান্তরিত করিয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায়। বিশ্বপ্রকৃতির মতো তাহার প্রকৃতিও যেন সতত সংগ্রামশীল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—

"তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম
ফলে, শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে, স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণ-রঙ্গ-ভূমি
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের বিজয়বার্তা"

তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সম্বন্ধেও সমান সত্য।

মানব পশু বটে, কিন্তু. সে বিদ্রোহী পশু। প্রকৃতির প্রতিভাবান, দুরন্ত, অশান্ত সন্তান সে। প্রকৃতির কোনও শাসনকেই সে মানিয়া লয় নাই। সে রাত্রের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়াছে, দিবসের প্রখর আলোকে রুদ্ধঘরে বসিয়া কৃত্রিম অন্ধকার উপভোগ করিয়াছে। আহারে, নিদ্রায়, প্রজননে প্রকৃতির কোনও বিধান, কোন সীমা, কোন গণ্ডিকে সে মানে নাই। ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে, তবু মানে নাই। নানাবিধ আবিষ্কারের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার সভ্যতার পরিচয়। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ বেতার, বিমানপোত, টেলিভিশন, পুস্তক,

মুদ্রাযন্ত্র, বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কারে তাহাকে নিত্য নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে। নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই যেন অতিক্রম করিতে চাহিতেছে। পথ দুর্গম, কিন্তু, তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই তাহার পাথেয়। নিত্য নব আনন্দের সন্ধানে বস্তুজগতে নিত্য নব আবিষ্কার করিতে করিতে মানুষ অবশেষে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করিল, যাহা তাহার সমস্ত পূর্ব-আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিল, যাহার নিকট সমস্ত বস্তু-মহিমা তুচ্ছ হইয়া গেল। এতকাল যে পশু-মানব আহার-নিদ্রাদির বৈচিত্র্যসাধনে তৎপর ছিল, সহসা সে আত্ম-আবিষ্কার করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-আলেয়াকে অনুসরণ করিতে করিতে মানবের সৃষ্টিপ্রতিভা যখন তমসাচ্ছন্ন লোকে বিভ্রান্ত, তখন সহসা ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ", ধ্বনিত হইল, যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা—নিষ্কলং, নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরবদ্যং, নিরঞ্জনম্, তাহা—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, তাহা—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তাহার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গেল। সুখের সন্ধানেই তাহার যাত্রা শুরু হইয়াছিল, সহসা সে আবিষ্কার করিল—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। এই আত্ম-আবিষ্কার, এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অধ্যাত্মজগতের নূতন আলোকে তাহার আধিভৌতিক জগৎ স্বপ্নের মতো অলীক হইয়া গেল। তাহার মনে নূতন চিন্তা জাগিল কি শ্রেয় এবং কি প্রেয় এবং এই চিন্তাধারা তাহার প্রগতির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিল। উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।"

শ্রেয় এবং প্রেয়—ধর্মবুদ্ধি এবং বিষয়বুদ্ধি—সম্মিলিতভাবে প্রত্যেক মানুষকেই আশ্রয় করে। বুদ্ধিমান লোক শ্রেয়কে এবং অল্পবুদ্ধি লোক প্রেয়কে বরণ করিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, অল্পবুদ্ধি লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে চিরকাল বেশি। বস্তুজগতে প্রাধান্যলাভ করিবার জন্য অধিকাংশ মানুষ তখনও যুদ্ধ করিত, এখনও করিতেছে। বন্যমানবের নখদন্ত সভ্যমানবের নানা অস্ত্রশস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। পৌরাণিক যুগের অসি, গদা, মুষল, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, তোমর, অঙ্কুশ, ক্ষুরপ্র, নারাচ, পরশু, পট্টিশ, ভল্ল, চক্র, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, চর্ম প্রভৃতি বর্তমানে গুলি, গোলা, বন্দুক, কামান, শ্র্যাপ্‌নেল, আণবিক বোমা, উদ্‌বোমায় পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ মানুষই জীবনটাকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারবিন জীবনযাত্রার নামকরণই করিয়াছেন struggle for existence. আমাদের পুরাণের গল্পের অধিকাংশ গল্পও যুদ্ধের গল্প। দেব-অসুর, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের চণ্ডী

রণরঙ্গিণী, আমাদের দেবতারা কেহ ত্রিপুরারি, কেহ কংসারি, কেহ বৃত্রনিসূদন। শুধু আমাদের পুরাণেই নয়, মিশরীয় পুরাণের রা এবং আইসিসের গল্প, ব্যাবিলনের ইয়া এবং তিয়াম্মতের কাহিনী, প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকার ওবেলিথের গল্প, সবই দ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস, অল্পবুদ্ধি প্রেয়কামী মানব-মানসের প্রতিচ্ছবি। আমাদের আধুনিক ইতিহাসও তাই। ব্যক্তির বা জাতির অতি স্থূল বৈষয়িক জয়-পরাজয় তাহাতে প্রাধান্য-লাভ করিয়াছে। শ্রেয়কামীর সংখ্যা এখনও অল্প। অধিকাংশ মানবই প্রেয়কামী এ কথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য, সমস্ত মানবজাতি ওই মুষ্টিমেয় শ্রেয়কামী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষদের দিকেই সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে—যাহারা জীবনকে 'যুদ্ধ' না বলিয়া 'লীলা' বলিয়াছেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা যে করা হয় নাই, তাহা নয়, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজের অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধা ইঁহাদেরই চরণে সমর্পিত হইয়াছে। ঘৃণ্যতম ভোগীও অবশেষে ত্যাগীর চরণেই শির অবনত করিয়াছে।

অধিকাংশ মানুষই লুণ্ঠনকারী দস্যু, কিন্তু, মনে হয় সেজন্য তাহারা যেন মনে মনে লজ্জিত, তাই, লুণ্ঠন করিবার সময় তাহারা ধর্মের মুখোস পরিয়া লুণ্ঠন করে। এই ভণ্ডামি দেখিয়া আমরা অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই বটে, কিন্তু, ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই, ওটা সুলক্ষণ, ওই মুখোসের দ্বারাই তাহারা বাঁকা পথে সত্য, শিব, সুন্দরকে অভিনন্দন করিতেছে।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই মহাবাণীর নিগূঢ় সত্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছে।

ইহারা সংখ্যায় বেশি বলিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ধূলিকণা অসংখ্য, কিন্তু, সূর্য এক। সেই একটি সূর্যের ভাস্বরতায় অসংখ্য ধূলিকণা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। বস্তু-জগতে বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার যেমন পূর্বতন আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে—বিমানপোতের নিকট গরুর গাড়ি আজ যেমন অকিঞ্চিৎকর, হাইড্রোজেন বোমার কাছে বন্দুক যেমন হাস্যকর—মানবজাতির অগ্রগতিতে অধ্যাত্ম-জগতের আবিষ্কারের কাছে আধিভৌতিক জগতের ঐশ্বর্য আজ তেমনি হীনপ্রভ। শ্রেষ্ঠ মানবমনীষা আর অনিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ নাই, নিত্যবস্তুর সন্ধানে সে উৎসুক। তাহাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম অর্থ-নৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে নয়, আসক্তি-বন্ধনের বিরুদ্ধে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গুণাতীত হইতে চান—

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

যাঁহার কাছে সুখদুঃখ সমান, যিনি আত্মস্থ, যাঁহার কাছে মাটি, পাথর, সোনা তুল্য-মূল্য, প্রিয়-অপ্রিয়, মান-অপমান, শত্রুমিত্র, স্তুতিনিন্দা যাহার দৃষ্টিতে সমান, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী নন—তিনিই গুণাতীত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতেই সমুৎসুক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু, তথাপি তাঁহাদেরই সাধনা সংখ্যাগরিষ্ঠ পশুর দলকে ধীরে ধীরে পশুত্বের স্তর হইতে মুক্ত করিতেছে। অধ্যাত্মজগতে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই জয়ী নয়।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয় যে, পশুমানবের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইল কি প্রকারে ? তাহার উত্তর মৃত্যু এবং মানবমনের অন্তহীন কৌতূহল। সে চিরকালই প্রকৃতিকে জানিতে চাহিয়াছে, বুঝিতে চাহিয়াছে, তাহার অমোঘ বিধানকে অতিক্রম করিবার সাধনা করিয়াছে। এজন্য তাহার কৌশল ও তপস্যার অন্ত নাই। এই পথেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে, যাহা কিছু বস্তুসংশ্লিষ্ট তাহাই ক্ষণভঙ্গুর। জীবন, যৌবন, পুত্র, কলত্র, মান, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার পরিণাম সমস্তই কালক্রমে বিনষ্ট হয়। এ সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যক্ষ মৃত্যুই মানবের প্রথম ধর্মগুরু। তাই, বোধ হয়, কঠোপনিষদের ঋষি মানবসন্তান নচিকেতাকে যমের সম্মুখীন করিয়া যমের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মৃত্যুই—এই অনিত্য-বিধ্বংসী মহাকালই—শেষে তাহার নিকট দেবতা-রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরুষরূপে যিনি মহাকাল, স্ত্রীরূপে তিনিই মহাকালী। নানারূপে, নানা মূর্তিতে, নানা প্রতিমায় মহাকাল ও মহাকালীর পূজা মানবসমাজে প্রচলিত। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শুভঙ্কর রূপও তাহার নিকট ক্রমশঃ প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্যুই যে নবজীবনের সূচনা করে, ধ্বংসের মধ্যেই যে নব-সৃষ্টির বীজ নিহিত আছে, এ সত্য মানবকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। ধ্বংসকর্তা মহেশ্বরের সহিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণুও তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। মহাকালীর হস্তে কেবল খড়্গ এবং ছিন্নমুণ্ডই নাই, বরাভয়ও আছে।

এই পথেই—জীবনের সমস্ত কিছু নশ্বর এই উপলব্ধির ফলস্বরূপই—সে আর একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছে—ভালবাসা। যাহা থাকিবে না, একটু পরেই চলিয়া যাইবে, তাহাকে ঘিরিয়া যে মোহ, যে মায়া তাহাই ভালবাসার আদি রূপ, তাহাই পরিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে। পরমহংসদেবের বিচিত্র অধ্যাত্মজীবনের দিগ্‌দর্শনও এই দুইটি জিনিস—মহাকালী এবং প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মজগতের একজন দিকপাল। বস্তু-জগতের দিকপালেরা যেমন বিশিষ্ট প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের কীর্তিকলাপ যেমন সৃষ্টিধর্মী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি বিশেষ একটি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিক কীর্তিকলাপ তেমনি সৃষ্টিধর্মী। প্রথম জীবনে তাঁহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা কবি ও ভক্তের রূপ। তাঁহার কবিকল্পনা ও ভক্তি, তাঁহার সৌন্দর্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয় তাঁহাকে অনন্য করিয়াছে। তাঁহার যদি কেবলমাত্র কবি-কল্পনা থাকিত, তাহা হইলে তিনি আর

পাঁচজন সাধারণ কবির মতো কবিতাই রচনা করিতেন, আমরা সাধক রামকৃষ্ণকে পাইতাম না। তিনি যদি কেবলমাত্র ভক্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা একজন সাধক পাইতাম বটে, কিন্তু, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র কবি রামকৃষ্ণকে পাইতাম না।

যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে!"

সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তিনি রোমাঞ্চিত হইয়া ভাবিয়াছেন —এই কি তিনি, এই কি তিনি! তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষও করিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের পল্লবগ্রাহীরা হয়তো ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। অনেকে তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাই তো প্রত্যাশিত। শফরীরা গণ্ডুষমাত্র জলেই তো ফরফর করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে, কেবল বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝি বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়। এ যুগের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. Alexis Carrel কিন্তু বলিতেছেন—"Intelligence alone is not capable of engendering science." তিনি আরও বলিতেছেন—"Certainty derived from science is very different from that derived from faith. The latter is more profound."

এই profound (গভীর) বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে profound দৃষ্টিভঙ্গিও প্রয়োজন। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তরে কৃষ্ণমেঘের পটভূমিকায় সাদা বকের সারি যে বালককে অভিভূত করিয়াছিল, যাত্রার শিব সাজিয়া শৈশবেই যিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীপ্রতিমার স্পর্শমাত্র যাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল, ম্যাডোনার ছবি দেখিয়া যিনি যিশুখৃষ্ট-মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাষাণ-প্রতিমাকে সজীব দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় যিনি আহার, নিদ্রা, বস্ত্র, উপবীত সমস্ত ত্যাগ করিয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে করিতে দিনের পর দিন কাটাইয়াছিলেন, যিনি কালী, দুর্গা, শিব, সীতা, রাম, হনুমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত কবি-মানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অবিশ্বাসীর নাই। যাহা অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায়, তাহা খালি চোখে দেখা যেমন সম্ভব নহে, বেরসিক ব্যক্তি যেমন কাব্যরস উপভোগ করিতে পারে না, অবিশ্বাসীর পক্ষেও তেমনি ভক্তের মর্মোদ্ভেদ করা অসম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার এই যে, তাঁহার কবিমানসের

কল্পনা ভক্তহৃদয়ের আকুলতায় বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মানস-দেবতাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্যসাধন করিবার জন্য তিনি কোথাও যান নাই, কোন শাস্ত্রচর্চা করেন নাই, কাহারও নিকট উপদেশভিক্ষা করেন নাই। তাঁহার কবিমানস অগাধ বিশ্বাস লইয়া যাহাই কল্পনা করিয়াছে, তাহাই সফল হইয়াছে। Plato-র Utopian স্বপ্ন সফল হয় নাই, কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু জড় প্রতিমাই সজীব হইয়া ওঠে নাই, তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে সাধনমার্গের সুকঠিন, দুর্গম পথ অতি সহজে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সবিকল্প সমাধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার গুরুরা স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ, শিষ্যই গুরুর সন্ধান করে, কিন্তু, তাঁহার ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতই ঘটিয়াছে—প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে তোতাপুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজেদের তাগিদেই যেন তাঁহাকে সাধনমার্গে আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভৈরবী আসিয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি তোমাকেই খুঁজিতেছি। প্রত্যাদেশ পাইয়া আমি তোমারই কাছে আসিয়াছি।'

শুধু যে তাঁহার গুরুরা আসিয়াছিলেন, তাহাই নয়, বাঙলাদেশের তদানীন্তন মনীষিবৃন্দ—গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাগ মহাশয়, তখনকার ইয়ং বেঙ্গলের দল, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ—দলে দলে সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ ও তাঁহার অনাগত শিষ্যদের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কেবল ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন—ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদের ডাক দিতেন—"ওরে কোথায় তোরা, আয়, আমি যে আর তোদের ছেড়ে থাকতে পাচ্ছি না।" তাঁহারা একে একে আসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী দেশে, দেশান্তরে ছড়াইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তাঁহার কল্পনা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সাধনা লইয়া অটল হিমাদ্রির মতো একস্থানেই তিনি বসিয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুগচেতনার মর্মমূলে আজও বোধ হয় আছেন এবং ভবিষ্যতে নূতন যুগের নূতন আলোকে, নূতন পৃথিবীতে যে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে, তাহার প্রাণকেন্দ্রেও তিনি তেমনইভাবে বসিয়া থাকিবেন।

এই ধর্মরাজ্য-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

> "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অনেকেই বলেন—পাপে তো পৃথিবী ভরিয়া গেল, পাপীরাই তো বিজয়পতাকা উড়াইয়া সদম্ভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সাধুদের কষ্টের অবধি নাই, পরিত্রাতা ভগবান কবে, কি ভাবে, কোথায় আসিয়া ধর্ম-স্থাপন করিবেন?

ভারতের ঋষি বলিয়াছেন—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। ভগবান কখন কি ভাবে

আসিয়া যে ধর্মসংস্থান করিবেন, প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার সে প্রয়াস চলিতেছে কি না, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা সহজ নহে। সর্বযুগেই যে তিনি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপেই জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন না-ও হইতে পারে। তিনি যে নিশ্চিন্ত নাই, তাহার কিছু আভাস আমাদের ইতিহাসেই আছে। ভারতে যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কিংবা তাহার সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছে, তখনই একজন করিয়া মহাপুরুষ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যদিও শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের হুবহু নকল নন, কিন্তু, উক্ত দুই অবতারের বাণী এবং আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক ধর্মের অধঃপতনে সমস্ত আর্যাবর্ত যখন কর্মকাণ্ডের প্রাণহীন নিষ্ঠুরতায় কাতর, তখন প্রথমে মহাবীর, তাহার পর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও যখন কালক্রমে গ্লানিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন ধর্মজগতে জন্মগ্রহণ করিলেন শঙ্করাচার্য এবং রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিলেন মুসলমান। অধঃপতিত বৌদ্ধেরা অনেকেই মুসলমান হইতেছিল, সুলতান মাহমুদ যখন ভারতলুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রামানুজ। তাহার পর বাঙলাদেশে পাঠানদের হিন্দুবিদ্বেষ যখন চরমে উঠিয়াছে তখন নিষ্ঠুর হিন্দুবিদ্বেষী সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বাঙলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন চৈতন্য এবং পাঞ্জাবের মাটিতে নানক। তাহার পর প্রায় তিন শত বৎসর অন্ধকার। মোগলযুগই ভারতবর্ষের ধর্মজগতে অন্ধকারময় যুগ। তবু, এই অন্ধকারময় যুগের শেষভাগেও যখন ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম বিপন্ন, তখন যে বীরের কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি রামভক্ত রামদাসের শিষ্য শিবাজী। তাহার পর আসিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন বাংলাদেশে শাসনের নামে যথেচ্ছাচারিতা করিতেছেন, তখন ভারতবর্ষের যে আত্মচেতনা ভবিষ্যতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটাইবে সেই শক্তির প্রথম উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে। ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের যখন ফাঁসি হয়, তখন রামমোহন চারি বৎসরের শিশু। তাহার পর ইংরেজের হস্তে তৃতীয় মারাঠা, যুদ্ধে ভারতের শেষ হিন্দুশক্তি যখন বিধ্বস্ত হইতেছে, তখন ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে— জন্মগ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাঙলাদেশে নব্য হিন্দুধর্মের প্রথম উদ্‌গাতা, এবং তাহার কিছুদিন পরেই—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে—দয়ানন্দ সরস্বতী, আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মোহ এবং নূতন ধরণের পাশ্চাত্ত্য গোঁড়ামির বিষ আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া আমাদের বিভ্রান্ত করিয়াই সেই ইংরেজী ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হয় ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে। যাঁহার জীবন ভবিষ্যতে সকলপ্রকার মোহ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিবে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিলেন, ঠিক তাহার এক বৎসর পরে—১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে। তাহার দুই বৎসর পরেই জন্মিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। দশ

বৎসর পরে স্বরেন্দ্রনাথ—সেই মন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা। ইহার কিছুকাল পরে—১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে - ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ—ইংরেজ ঐতিহাসিক যাহার নাম দিয়াছেন 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। সে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিতে পারি নাই, ভারতসন্তানের রক্তেই ভারতভূমি সিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু, সে রক্ত শুকাইতে না শুকাইতে, যে কয়জন ভারতসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে বিবেকানন্দ, ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী, ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে একটা কথা স্বতঃই মনে হয় যে, শ্রীভগবান নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু, সমস্ত সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিতে শ্রীরামচন্দ্রও পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণও পারেন নাই—দুই-একটা রাবণ, কংস, জরাসন্ধ, দুর্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে মাত্র। এত বড় বিরাট একটা কাজ—পাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং পুণ্যের সার্বভৌম প্রবর্তন—সহজে অল্প সময়ে হয় না। বহু কল্প প্রয়োজন। পৃথিবী এককালে জলময় ছিল—বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে স্থলের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মরাজ্যও একদিন সংস্থাপিত হইবে; নিগূঢ় অন্তরালে তাহার আয়োজন চলিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাবেই কি তাহার ইঙ্গিত নাই? যে মানব একদিন বর্বর, বন্য পশু ছিল, তাহাদেরই মধ্যে এমন লোক কেন জন্মিল, যাঁহার চরিত্রে শঙ্করের প্রতিভা, বুদ্ধের অহিংসা, যীশুখ্রীষ্টের ক্ষমা, ইসলামের মহত্ব, শ্রীচৈতন্যের প্রেম একইসঙ্গে বিরাজমান, যিনি ভয়ঙ্করী কালীপ্রতিমার মধ্যে শুধু করুণাময়ী জননীকেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, 'শুক্রম্, অকায়ম্, অব্রণম্, অস্নাবিরং, শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধম্' ব্রহ্মকে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কোনও ধর্মের সহিত কোনও ধর্মের বিরোধ নাই, যাঁহার দৃষ্টিতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতা-দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একই তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরমাত্র, যিনি জানিয়াছিলেন কিছুর সহিতই কোনও কিছুর মূলতঃ প্রভেদ নাই—কারণ, সমস্ত কিছুই সেই বিরাট ঊর্ধ্বমূল নিম্নশাখ ক্ষণস্থায়ী অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাপ্রশাখামাত্র—সমস্ত কিছুরই মূল ঊর্ধ্বে শাশ্বত ব্রহ্মে। এরূপ লোকের মানবসমাজে আবির্ভাবের কি কোনও অর্থ নাই?

অর্থ যে আছে, তাহা আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বকে যে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই সমন্বয়ের স্বর যেন আজ পৃথিবীতে মানসক্ষেত্রে ধ্বনিত হইতে শুরু করিয়াছে। হয়তো ক্ষীণভাবে, কিন্তু, শুরু যে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিকদের যেন নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের চক্ষে জড় ও জীবের সীমারেখা আজ অস্পষ্ট। বিভিন্ন বস্তুর বৈষম্যের যে কারণ আজ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহাও সমন্বয়ধর্মী, সমস্ত বস্তুরই বাহিরের স্থূলরূপ যে পরমাণু-নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তিকণার নানাবিধ সমাবেশ ও স্পন্দনের উপরই নির্ভরশীল এ কথা আজ

তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইতেছে। স্বর্ণ ও লৌহের বৈষম্য আপাতবৈষম্য—আসলে তাহারা ইলেকট্রন-প্রোটনের বিভিন্ন লীলামাত্র এ কথা আজ সর্বস্বীকৃত সত্য।

রাজনৈতিক জগতেও আজ এই সমন্বয়দৃষ্টি দেখা দিয়াছে। সর্বদেশের মনীষীরাই আজ সমন্বয়ের আলোকে রাজনীতির জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চাহিতেছেন। বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকার Wendel Wilkie তৎপ্রণীত *One World* পুস্তকে বলিয়াছেন—পৃথিবীর মানসিক ভারকেন্দ্র ধীরে ধীরে স্থান-পরিবর্তন। Aldous Huxley এবং Maugham-রা বেদান্ত-উপনিষদের বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছেন, রম্যাঁ রল্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীবনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। হাওয়া বদলাইতেছে সন্দেহ নাই। League of Nations অথবা United Nations-এর ব্যর্থতায় হতাশ হইলে চলিবে না, হয়তো আরও এই-একটা মহাযুদ্ধ আমাদের বিভ্রান্ত করিবে, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত মিলনের পথ মিলবেই। মানুষকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ সেই পথ-প্রস্তুতির আয়োজন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অন্যতম।

আজ আমরা নিকটে আছি বলিয়া তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু, আমাদের পরবর্তীরা সুদূর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিরাট হিমালয়ের অভ্রভেদী বিরাটরূপ দেখিতে পাইবে। সম্রাট অশোকের সমসাময়িক ব্যক্তিরা অশোককে চিনিতে পারেন নাই, আজ আমরা অশোককে চিনিয়াছি।

আজ আমাদের ঘোর দুর্দিন, সন্দেহ নাই। দুঃখের কারণ শুধু বাহিরেই নাই, আমাদের ভিতরেও আছে। যে ধর্ম ভারতের প্রাণ-স্বরূপ, আজ আমরা সেই ধর্মচ্যুত হইয়াছি। আমাদের মনের সমস্ত ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে রাজনীতির উপর—যে রাজনীতির মূল লক্ষ্য স্বার্থপরতা। আমরা সকলেই ক্রমশঃ স্বার্থপর পশু হইয়া পড়িতেছি। পাশব-শক্তির আপাত-উন্নতি আমাদের সকলকেই পশুত্বের স্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ। আমরা বিপদে পড়িলে আজকাল ভগবানের কাছে আর প্রার্থনা করি না, সভায় বা সংবাদপত্রে আন্দোলন করি। দুর্দিন পুরাকালেও বহুবার আসিয়াছিল। তখন আর্ত মানব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। কংসের অত্যাচারে যখন সকলে সন্ত্রস্ত, তখন আর্ত মানবমানবী যে প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। আসুন, আমাদের এই দুর্দিনে পুরাণকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

"হে দেবতা, জাগ্রত হও। বিভীষিকাময়ী রজনী সমুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে কর্দম-পিচ্ছিল পথ ; মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুতে ও মেঘ-গর্জনে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্রিয়পরিজনের কাঁচা মাংস ও তপ্তরক্তের উপর দিয়া চলিতেছি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া আছে। সকলেরই নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মতো

আর যাহারা চলিতেছে, তাহাদের সহিত মুখোমুখি হইলেই হিংস্র পশুর মতো পরস্পর চাহিয়া দেখিতেছি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা, অথচ যেন পরস্পরকে হনন না করিয়া চলিবার উপায় নাই। রাক্ষস কংসের অনুচরেরা অন্ধকারে পাগলের মতো ঘুরিতেছে, তাহাদের চোখেও ঘুম নাই। আমরা তাহাদের বন্দী, আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতেছি—হে দেবতা, জাগ্রত হও। পাপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; জননীর বক্ষে স্তন্য নাই, শিশুরা ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে। অসহায়া নারীদের আর্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। এত আঘাত সহ্য করিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে। শাসনে, পীড়নে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। হে অন্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।”

তাঁহাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। আমরাও যদি তেমনি করিয়া প্রার্থনা করি, ভগবান আবার আবির্ভূত হইবেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-জীবন আলোচনা করিয়া এই শিক্ষাই যেন আমরা লাভ করি।

বুদ্ধদেবের জীবনে নারী*

ধর্মজগতের মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে একটি কৌতুকজনক ব্যাপার প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদের অনেকেই নারীসঙ্গ পরিহার করিয়া সংসারত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু, নারীরা কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। ঘটনাচক্রে পাকে-প্রকারে তাঁহাদের জীবনে নারীর ছায়া অনিবার্যভাবে পড়িয়াছে। ইহার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

যিশুখ্রীষ্ট—মেরী মডলিন, প্যাপ্‌নুশিয়াস—থেয়া, এবলার্ড—হেলাইস্‌ প্রভৃতির কাহিনী সুপরিচিত। এ দেশে চৈতন্যদেব তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু, বৈষ্ণবীদের এবং বন্ধুপত্নীদের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে নাই। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বিবাহিত পত্নীর সহিত আজীবন বাস করিয়াছেন, একজন ভৈরবীর নিকট তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষাও লাভ করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার আরাধ্য দেবতাও ছিলেন নারী—মহাকালী।

আজন্মব্রহ্মচারী স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নে হয়তো প্রবেশাধিকারই পাইতেন না, যদি একজন মহিলা তাঁহাকে প্রফেসার রাইটের সহিত পরিচয় করাইয়া না দিতেন। প্রফেসার রাইটের সুপারিশপত্র পাইয়াও তাঁহার সুবিধা হয় নাই—শিকাগো শহরের রাস্তায়, রাস্তায় তিনি বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন,

* ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বুদ্ধপূর্ণিমা-সম্মেলন সভায় পঠিত।

তখন আর একজন মহিলা Mrs. G. W. Hale তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পার্লামেন্টে লইয়া যান। এই দুই নারীর সাহায্য না পাইলে, নারীসঙ্গ-বিরোধী বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় হয়তো সম্ভবপরই হইত না। ইঁহারা ছাড়াও স্বামীজীর জীবনে আরও অনেক নারী আসিয়াছিলেন। Miss Macleod, Mrs. Ole Bull, Sister Nivedita প্রভৃতির নাম বিবেকানন্দের নামের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

ভগবান বুদ্ধের জীবনেও নানা সময়ে, নানা বেশে নারী-সমাগম হইয়াছিল—বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভগবান বুদ্ধ আজন্মব্রহ্মচারী ছিলেন না। তাঁহার বাল্যকাল ও যৌবনের অধিকাংশ সময় বিলাসেই অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে তিনটি বাড়ি তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। একটি গ্রীষ্মকালের জন্য, একটি বর্ষাকালের জন্য এবং একটি শীতকালের জন্য। এই সব বাড়িতে তিনি একা থাকিতেন না, নৃত্যগীতবাদ্যরতা সুন্দরী কামিনীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। বর্ষাকালে দোতলা হইতে নামিতেনই না—এ সকল কথা বুদ্ধ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

ষোল বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নিজেই একটি রূপসী, নানা সদ্‌গুণভূষিতা শাক্যকুমারীকে নির্বাচন করিয়া বিবাহ করেন। পালিশাস্ত্রে "রাহুলমাতা" নামে এই মহিলার উল্লেখ আছে। সংস্কৃত, তিব্বতী, সিংহলী প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে কিন্তু সিদ্ধার্থের পত্নীর অনেক নাম পাওয়া যায়—গোপা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা, ভদ্রা, বিম্বা ইত্যাদি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁহার একাধিক পত্নী ছিল, কারণ, সেকালে একাধিক বিবাহ করাই সামাজিক নিয়ম ছিল, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে। তাঁহার একাধিক পত্নী ছিল কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে একাধিক নারীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধার্থকে বিলাসে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য শুদ্ধোদনের অনেক সুন্দরী কামিনী-নিয়োগের কথা অনেক গ্রন্থে আছে। কৃশা গৌতমী নামে একজন তন্বী শাক্যযুবতী সিদ্ধার্থের রূপের প্রশংসা করেন। ইহাতে সিদ্ধার্থ তাঁহাকে নিজের গলার মুক্তাহার খুলিয়া উপহার দিয়াছিলেন। ইহার অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেকে করিয়াছেন—কিন্তু, ইহাকে সাধারণ মানবোচিত দৌর্বল্য বলিয়া স্বীকার করিলেও বুদ্ধমহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি তো সাধারণ রাজপুত্রের জীবনই যাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি গৃহত্যাগ করেন।

গভীর রাত্রে নিদ্রিতা নর্তকীদের স্রস্ত বসন, আলুথালু কেশপাশ, বিসদৃশ অঙ্গ-বিক্ষেপ প্রভৃতি নাকি তাঁহার মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল। রমণীদের প্রতি বিতৃষ্ণার এই প্রথম বর্ণনা তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায়।

গৃহত্যাগের পূর্বে শিশুপুত্রকে তাঁহার একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। সন্তর্পণে পত্নীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পত্নীর বাহুতে শিশুর মুখ ঢাকা। বাহু সরাইতে গিয়া

পাছে পত্নী জাগ্রত হইয়া গমনে বাধা দেন, এই ভয়ে তিনি পত্নীকে আর জাগান নাই, নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। প্রথমে গয়ার নিকটবর্তী এক পাহাড়ে এবং পরে নৈরঞ্জনাতীরে উরুবিল্ব নামক এক গ্রামে। তাঁহার তপস্বি-জীবনের প্রথমভাগে রক্তমাংসময়ী কোন রমণীর আবির্ভাবের কথা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। মায়াময়ী "মার" অবশ্য নানা বেশে আসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু, সফল যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ, তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার তপস্বি-জীবনের শেষভাগে বুদ্ধত্বলাভের অব্যবহিত পূর্বে—নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া যখন তিনি মৃতপ্রায়, তখন তাঁহার জীবনে একটি করুণাময়ী রমণীর আবির্ভাব দেখিতে পাই—গোপকন্যা সুজাতা। সুজাতা-হস্তের পায়সান্ন তাঁহার তপস্যাশীর্ণ দেহে বলসঞ্চার করিয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে এই সরলা গ্রাম্যনারীর বহু যশ কীর্তিত হইয়াছে।

ইহার পর তিনি বোধিলাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন এবং সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি এই আর্য-আষ্টাঙ্গিক মার্গ জনসমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রচার-জীবনে তিনি ঋষিপত্তনে আসিয়া প্রথম বর্ষাযাপন (বস্‌সো) করিয়াছিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীরা সারা বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু, বর্ষার কয় মাস কোথাও যাইতে পারিতেন না, পথঘাট জলে, কাদায় দুর্গম হইয়া পড়িত বলিয়া তাঁহারা একস্থানে বাস করিতেন। বর্ষার পর বুদ্ধ যখন ঋষিপত্তন হইতে উরুবিল্বের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, সেই সময়কার একটি ঘটনা হইতে নারীদের সম্বন্ধে বুদ্ধের তদানীন্তন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একটি বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকট যুবা কয়েকটি স্ত্রীলোকসহ আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন বারাঙ্গনাও ছিল, একটু পরে বারাঙ্গনাটি তাহাদের জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলাইয়া গেল। যুবকরা তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। বুদ্ধদেবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোন স্ত্রীলোককে যাইতে দেখিয়াছেন কি না। বুদ্ধ প্রশ্ন করিলেন—স্ত্রীলোকে তাহাদের কি প্রয়োজন ? তাহারা চুরির ব্যাপার জানাইলে তিনি তাহাদের বলিলেন—আচ্ছা, কি ভাল বল দেখি, স্ত্রীলোকদের খোঁজ করা, না নিজেদের খোঁজ করা ?

আত্মানুসন্ধানের পথে স্ত্রীলোকেরা যে বিঘ্নস্বরূপ, ইহাই তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু, স্ত্রীলোকদের তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই।

অল্প কিছুদিন পরেই স্বদেশে ফিরিয়া দুইটি স্ত্রীলোকের কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন।

বুদ্ধত্বলাভ করিয়া তিনি যখন কপিলাবাস্তুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন—যেখানে একদা রাজপুত্র ছিলেন, সেখানে ভিক্ষুকবেশে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে

করিতে যখন পিতৃভবনের সম্মুখে সমাগত হইলেন, তখন রাজা শুদ্ধোদন, পাত্র, মিত্র, অমাত্য, প্রজাবর্গ সকলে ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—কিন্তু, আর একজনও আসিলেন, যাঁহাকে বুদ্ধদেব এই জনতার মধ্যে দেখিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করেন নাই—তাঁহার পালিকা মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী। রাণীর সমস্ত মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আলুলায়িত-বেশে দীর্ঘ আট বৎসর পরে গৃহ-প্রত্যাগত সন্ন্যাসীপুত্রকে দেখিবার জন্য বহির্ভবনে ছুটিয়া আসিয়াছেন স্বয়ং মহাপ্রজাবতী!

বুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—আত্মীয়স্বজন, প্রিয়পরিজন দলে দলে সকলে আসিল: কেহ প্রণাম করিল, কেহ চুম্বন করিল, কেহ আলিঙ্গন করিল—সকলেই আসিল—আসিল না কেবল একজন—তিনি তাঁহার পত্নী রাহুলমাতা। তিনি নিজের ঘরে বসিয়া রহিলেন।

পুরনারীরা তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দিলেন—আমার যদি কোন মূল্য থাকে, তবে আমার স্বামী নিজেই আমার নিকটে আসিবেন।

বুদ্ধকে যাইতে হইয়াছিল। রাহুলমাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিতেই তিনি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধোদন বুদ্ধকে বলিলেন যে, যেদিন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন, সেইদিন হইতে রাহুলমাতা সকলপ্রকার আমোদ ও বিলাস ত্যাগ করিয়াছেন, যেদিন শুনিলেন, স্বামী কেশচ্ছেদন করিয়াছেন, ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে তিনিও অনুরূপ কার্য করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন।

বুদ্ধ এতটা প্রত্যাশা করেন নাই!

মহাপ্রজাবতীর আত্মবিস্মৃতি ও রাহুলমাতার আত্মসম্মানবোধ দুই-ই তাঁহাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

ইহার পর তাঁহার সঙ্ঘজীবন।

বৌদ্ধধর্মানুমোদিত জীবনযাপনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তিনি সঙ্ঘস্থাপন করিতে লাগিলেন। নারীদের সঙ্ঘ-প্রবেশের নিয়ম ছিল না। নারীদের সঙ্গ তিনি সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন এবং শিষ্যদেরও চলিতে উপদেশ দিতেন। একদিন কিন্তু অঘটন ঘটিয়া গেল। বুদ্ধ বৈশালীতে মহাবনের কূঠাগারশালায় বাস করিতেছিলেন, সহসা আনন্দ আসিয়া খবর দিল যে, কূঠাগারশালার দ্বারদেশে বহু নারী-সমাগম হইয়াছে। স্বয়ং মহাপ্রজাবতী আসিয়াছেন। তিনি চীবর-পরিহিতা ও ছিন্নকেশা। তাঁহার সঙ্গে অভিজাতবংশীয়া অনেক শাক্যরমণীও আছেন। তাঁহারা সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি চান। বুদ্ধ বলিলেন—না আনন্দ, তাহা হইতে পারে না। শুনিয়া সমস্ত রমণীরা রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কপিলাবাস্তু হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, মহাপ্রজাবতীর পা ফুলিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, অভিজাতবংশীয়া শাক্যনারীরাও শ্রান্তক্লান্ত, বিক্ষতপদ—তাঁহারা এত কষ্ট সহ্য

করিয়াছেন শুধু সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি-আশায়। অনুমতি মিলিবে না? সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে বুদ্ধকে অবশেষে অনুমতি দিতে হইয়াছিল। নারীরা সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন। অনুমতি দিয়াই কিন্তু বুদ্ধের মনে হইয়াছিল যে, ভুল করিলাম। আনন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন—স্ত্রীলোকেরা যখন সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইল, তখন এই সদ্ধর্ম ৫০০ বৎসরের বেশী স্থায়ী হইবে না। যেমন, উত্তম ধান্যক্ষেত্রে ছাতাপড়া, সেতট্ঠিকা রোগ লাগিলে সে ক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না, যেমন উত্তম ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেট্ঠিকা নামক রোগ লাগিলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, সেইরূপ যে ধর্মনিয়মে স্ত্রীলোকদের সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে দেওয়া হয়, তাহাও চিরস্থায়ী হয় না।

অনুমতি দিবার পর কিন্তু নারীদের সংস্রব তিনি আর পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্যাধকন্যা চাঁপা হইতে শুরু করিয়া, শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখা, অনাথপিণ্ডদসুতা সুপ্রিয়া, চুল্ল সুভদ্রা, কৃশা গৌতমী, সুজাতা, চৌরবধূ ভদ্রা, কুণ্ডলকেশা, বৈশালীর গণিকা আম্রপালী (বা অম্বপালী), বাগ্মিনী নন্দুত্তরা প্রভৃতি অনেক রমণীই তাহার পর ভগবান বুদ্ধের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন গৃহস্থ রমণী নিমন্ত্রণ করিলেও বুদ্ধ তাহা আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার এরূপ বহু কাহিনী উল্লিখিত আছে। রাজগৃহের দাসী পুণ্যার পোড়া রুটিও তিনি সানন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া বহু নারী যে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার অজস্র প্রমাণ আমরা "থেরীগাথা" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই। সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি দিয়া বুদ্ধ সে যুগের সভ্য নারীসমাজে একটা আন্দোলনই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজকাল "কমরেড" হওয়া যেমন একটা গৌরবজনক ফ্যাসান, ইয়োরোপে 'Nun' এবং 'Sister' হওয়া যেমন এককালে মহীয়সী মহিলাদের সদগতি ছিল, বৌদ্ধযুগেও ঠিক তেমনি 'ভিক্ষুণী' হওয়া নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে আদৃত হইত। বহু পুণ্যাত্মা রমণীর সংস্পর্শ বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্মকে যে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু, স্ত্রীলোকদের হাতে বুদ্ধকে লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছিল অনেক। দুই-একটা উদাহরণ দিতেছি। বুদ্ধের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য একবার চিঞ্চা মানবিকা নাম্নী এক ভ্রষ্টা যুবতীকে নিযুক্ত করে। সে বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে যাইবার ছুতায় প্রায়ই জেতবনে যাইত। কিছুদিন পরে তাহার সহিত বুদ্ধের নাম যুক্ত করিয়া তাহারা নানা কলঙ্ক রটাইতে আরম্ভ করিল। চিঞ্চা নিজেই বুদ্ধকে মিথ্যাবাদী, ধর্মধ্বজী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইত। সুন্দরী নাম্নী আর একটি ব্রাহ্মণকন্যার সহিতও বুদ্ধের নাম অনুরূপভাবে জড়িত। সত্যকথা অবশ্য কিছুদিন পরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাগন্দিরা নাম্নী আর এক ব্রাহ্মণকন্যাও বুদ্ধকে অনেক নির্যাতন করিয়াছিল। বসন-ভূষণে সাজিয়া সে বুদ্ধকে জয় করিতে গিয়াছিল—কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা

হইয়া ফিরিয়া আসিল। এ অপমান সে ভোলে নাই। পরে যখন কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন তাহাকে বিবাহ করে, তখন রাজরাণীপদে অধিষ্ঠিতা মাগন্দিয়া গুণ্ডা লাগাইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ভগবান বুদ্ধকে অপমান করিয়াছিল।

সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইয়া অনেক নারীই যে সেখানে গিয়া স্বেচ্ছাচার করিত, তাহারও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে গিয়া তাহারা গোপনে সুরাপান পর্যন্ত করিত। বিশাখার অনুরোধে একবার সমাগতা কয়েকটি মহিলাকে উপদেশ দিতে গিয়া বুদ্ধদেব লক্ষ্য করিলেন যে, তাহাদের এমন মত্তাবস্থা যে তাহারা টলিয়া পড়িতেছে।

সঙ্ঘে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের নানা কুফলও তিনি জীবিত-কালেই দেখিয়া গিয়াছেন।

উৎপলবর্ণার কাহিনী, সুন্দর-সমুদ্রের গল্প, অনাথপিণ্ডদের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেমের ক্রিয়াকলাপ, সিরিমার আখ্যান প্রভৃতি পড়িলে মনে হয়, নারীদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ জীবনে অনেক অশান্তিভোগ করিয়া গিয়াছেন।

রূপসী জনপদ কল্যাণীর সম্মুখে একটি মায়াময়ী সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাকে এক সন্তানের মাতা, মধ্যবয়স্কা, বৃদ্ধা ও ব্যাধিগ্রস্তাতে পরিণত করিয়া রূপযৌবনের অসারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাতে যেন তাঁহার বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন করিয়া আগায় জলঢালার মতো ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

অবশেষে তিনি ভিক্ষুণীদের রক্ষার জন্য নগরের মধ্যে ভিক্ষুণীবিহার বানাইয়া দিতে রাজা প্রসেনজিৎকে অনুরোধ করেন।

কুশীনগরের নিকটবর্তী শালবনে অন্তিমশয্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ যখন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখন হঠাৎ আনন্দ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—"স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?"

"আনন্দ, স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাইও না।"

"যদি তাকাইতে হয়, তবে আমরা কি করিব?"

"বাক্যালাপ করিও না।"

"যদি বাক্যালাপ করিতেই হয়, কি করিব?"

"সাবধানে করিবে।"

স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ইহাই বুদ্ধের শেষ উপদেশ।

তবু, এ কথা আমরা কিছুতে ভুলিতে পারি না যে, অজাতশত্রুর মতো দুর্ধর্ষ রাজার বিরুদ্ধাচরণকে উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধপূজা করিতে গিয়া আপনার জীবন যে বিসর্জন দিয়াছিল, সে একজন নারী—তাহার নাম শ্রীমতী।



বনফুল

রচনাবলী ১২